অভাজনের মহাভারত

মাহবুব লীলেন

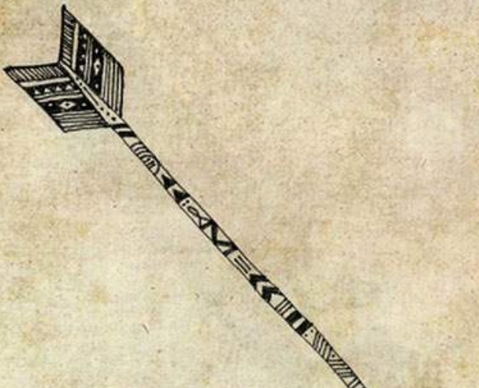

মন জোগাতে নয়, মন জাগাতে
শুদ্ধস্বর ২০১৫

অভাজনের মহাভারত
মাহবুব লীলেন

© লেখক

প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০১৫
প্রথম ইবুক সংস্করণ: জুন ২০১৭
ISBN : 978-984-429-037-2

প্রকাশক
আহমেদুর রশীদ চৌধুরী
শুদ্ধস্বর
shuddhashar@gmail.com
www.shuddhashar.com

প্রচ্ছদ : তৌহিন হাসান

Obhajoner Mahabharat| Mahbub Leelen

Publisher
Ahmedur Rashid Chowdhury
Shuddhashar

First Published in February 2015
First e-book edition: June 2017
এই বইয়ের আংশিক বা পূর্ণ অংশ লেখক ও প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ফটোকপি, রেকর্ড অথবা অন্য কোনো তথ্যসংরক্ষণ পদ্ধতিতে যান্ত্রিক অথবা বৈদ্যুতিক মাধ্যমে অনুলিপি করা যাবে না।

উৎসর্গ

পাললিক প্রান্তী
আত্মজা আমার

কেউ যদি না ডরায় আর কেউ যদি না ডর দেখায়
তবে অলৌকিক বলে কিছু নেই

সূচিপত্র

ভণিতা - ০১

বাড়তি ভণিতা - ৫৯

ক. মহাভারতের কৃষ্ণায়ণ এবং রামের বৈষ্ণবায়ন - ৬২

খ. বেদবিরোধী গীতার বৈদিকায়ন এবং রামায়ণের অতীতযাত্রা - ৮০

অভাজনের মহাভারত - ৯৭

পাঠ নির্দেশিকা

সূচিপত্র থেকে নির্দিষ্ট কোন অধ্যায়ে যেতে সেই অধ্যায়ে ক্লিক করুন।
যেকোন পৃষ্ঠা থেকে সূচিপত্রে আসতে পৃষ্ঠা নম্বরে ক্লিক করুন।

মাহবুব লীলেন-এর অন্য বই

ছোটগল্প
২০১১: সাকিন সুন্দরবন
২০১০: বেবাট
২০০৮: নিম নাখারা
২০০৫: উকুন বাছা দিন

উপন্যাস
২০০৯: তৃণতুচ্ছ উনকল্প

কবিতা
২০১২: নম্র বচন
২০১০: ট্যারাটক
২০০৭: খেরোখাতা
২০০৬: বাজারিবাটু
২০০৫: মাংসপুতুল
২০০৪: কবন্ধ জিরাফ

ভণিতা

০১

কবিরা যুক্তি মানেন না আর ধার্মিকেরা যুক্তি বানান। এতে কোনো ঝামেলা নাই কারণ কাব্যকাহিনি যারা পড়েন আর ধর্মকথন যারা মানেন তারা ভিন্ন ভিন্ন লোক; ভিন্ন ভিন্ন রঙের অন্তর নিয়া তারা বসবাস করেন ভিন্ন ভিন্ন জগতে; যদিও দুই দলই ভিত্তি করেন মূলত কল্পনায়। পার্থক্য শুধু এই যে কাব্যভক্তরা কল্পনারে কল্পনা জাইনা বিনোদিত হন আর ধর্মভক্তরা কল্পনারে সত্য জাইনা করেন বিশ্বাস...

এতেও কোনো ঝামেলা নাই। কিন্তু ঝামেলা তখনই বাঁধে যখন কবিরা ধর্মকথা কইতে যান কিংবা ধার্মিকেরা আসেন কাব্য রচনায়। আর তখনই তৈরি হয় বিশ্বাসের কাব্য কিংবা কাব্যিক বিশ্বাস কিংবা দুনিয়ার সব থাইকা বড়ো ভজঘট; মহাভারত...

উল্টাপাল্টা কিছু কইরা তারে জায়েজ করতে গেলে মাইনসে যুক্তি দেখায়- এতে কি মহাভারত অশুদ্ধ হইল? আসোলে মহাভারত এমন একখান অশুদ্ধ জিনিসের শুদ্ধতম উদাহরণ যে কোনোমতেই তারে অশুদ্ধ করার সাধ্যি কারো বাপেরও নাই। অন্তত এইটা আমার উপলব্ধি...

০২

আইজ থাইকা সাড়ে চাইর হাজার বছর আগে তৈরি হওয়া একখান কাহিনি কথক পালাকারের মুখে ঘুরতে ঘুরতে লিপিবদ্ধ পুস্তকের চেহারা পাইছে মাত্র হাজার দুয়েক বছর আগে। এই যে কথাটা কইলাম সেইখানেও কিন্তু বিশাল ভজঘট আছে। কারণ প্রাচীন দুই গণিতবিদ আর্য ভট্ট আর বরাহ মিহিরের রেফারেন্স টাইনা যেইখানে ড. অতুল সুর কন যুধিষ্ঠিরের রাজ্য অভিষেক হইছিল খ্রিস্টপূর্ব ২৪৪৮ সালে; সেইখানে প্রাচীন শাস্ত্র ঘাঁইটা আর বিস্তর গোনাগুনতি কইরা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কন কুরুযুদ্ধ হইছে খ্রিস্টপূর্ব ১৪৩০ সালে। প্রাচীন দুই গণিতবিদের মতো অতুল সুর কুরুযুদ্ধের অস্তিত্বে সন্দেহ

করলেও কুরুযুদ্ধ আর যুধিষ্ঠিরের রাজ্য অভিষেক যেহেতু পিঠাপিঠি জিনিস তাতে সহজেই বলা যায় যে এই দুই মহারথীর গোনাগুনতির মইদ্যেও ফারাক প্রায় হাজার বছরের। এর বাইরেও আরো কথা আছে। কইতে কইতে কেউ কেউ সাক্ষী দলিল দেখাইয়া মহাভারতের ঘটনারে টানতে টানতে আরো বহু কাছাকাছি; মানে তৃতীয় চতুর্থ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত নিয়া আসেন। তো এইটা হইল মহাভারতের ঘটনাবলির সময়কাল নিয়া গ্যাঞ্জাম। একইভাবে ভিন্ন ভিন্ন যুক্তি আর সিদ্ধান্ত আছে পুস্তক হিসাবে মহাভারত লিখিত হইবার সময়কাল নিয়া; যেইটা মোটামুটি খ্রিস্টপূর্ব ২০০ থাইকা ৬০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আটশো বছরের ঘাপলাকাল...

যে কালেই শুরু হউক আর যে কালেই লেখা হউক না কেন; মূল কতা হইল শুরু হইবার পর এই পুস্তক বহু জায়গায় বহু চেহারা পাইছে ভিন্ন ভিন্ন দেশে; ভিন্ন ভিন্ন গোত্র; ভিন্ন ভিন্ন মানুষের হাতে। এইটার চেহারা বদলাইছেন কবিরা; চেহারা বদলাইছেন ধার্মিকেরা; চেহারা বদলাইছেন রাজনীতিবিদেরা। মাঝে মাঝে নিজের জাতিরে ঐতিহ্যবান দেখাইতে গিয়া তৈরি হইছে লাখে লাখে উপকাহিনি- মহাভারতে বর্ণিত অমুক জায়গাখান কিন্তু মোগো বাসস্থান কিংবা কুরুযুদ্ধের অমুক চরিত্র হইল মোগো পূর্বপুরুষ। যদিও নৃতাত্ত্বিকেরা মহাভারতের কিছু ঘটনা আর কিছু কেন্দ্রীয় ভূগোলের ঐতিহাসিক বাস্তবতা স্বীকার কইরা নিলেও সম্পূর্ণ সন্দেহ করেন কুরুযুদ্ধের অস্তিত্ব নিয়া। তারা কন কোনোকালেই কুরুযুদ্ধ নামে কিছু হয় নাই। এর পক্ষে পয়লা দুইটা যুক্তি হইল দ্বৈপায়নের মহাভারত লেখার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বয়ানকার বৈশম্পায়ন আর সৌতি যে কথাগুলা বলেন তার মধ্যেও যেমন কুরুযুদ্ধের কথা নাই তেমনি কুরুযুদ্ধের কোনো নামগন্ধ নাই ঋগ্বেদের পাতায়...

বেদের কথাবার্তায় মহাভারত ভরপুর থাকলেও বেদ কিন্তু তৈরি হইছে মহাভারতের বহুত পরে। ঋগ্বেদরে যারা অনেক প্রাচীন কইতে চান তারা কন এইটা তৈরি হইছে খ্রিস্টপূর্ব ১৩০০-তে আর যারা এরে আরো নবীন বলেন তারা কন খ্রিস্টপূর্ব ১২০০-তে; মানে বঙ্কিমচন্দ্রের হিসাবে কুরুযুদ্ধের কমপক্ষে ১৩০ বছর আর অতুল সুরের হিসাবে কমপক্ষে প্রায় সাড়ে এগারোশো বছর পর। বাকি বেদগুলার রচনাকাল খ্রিস্টপূর্ব হাজার থাইকা নয়শো পর্যন্ত হইলেও সেইগুলাতেও কুরুযুদ্ধের কোনো তথ্য-তালাশ নাই...

কেউ কেউ কন হইলে হইতে পারে মহাভারতের দশ-বিশজন পালোয়ান কোনো এক সময় কিছু কিলাকিলি আর লাঠালাঠি করছিল: আবার এমনও হইতে পারে যে কুরু-পাঞ্চাল মারামারিরে ফুলাইয়া-ফাঁপাইয়া কবিগণ আঠারো দিনের কুরুযুদ্ধ বানাইয়া ফালাইছেন। তবে এইটাও মনে রাখা দরকার যে পাঞ্চালজাতি সম্পর্কেও কিন্তু বেদে পরিষ্কার কিছু নাই; যদিও অনেকে অনুমান-টনুমান করেন যে বেদের অমুক কথায় বোধ হয় পাঞ্চালের কথা কওয়া হইছে। কিন্তু কারো কতার লগেই কারো কতা মিলে না। একজন একখান পুস্তক রচনা কইরা এক বয়ান করে তো আরেকজন তা অন্য রচনায় বাতিল কইরা কন- তিনি যা কইছেন তা ঠিক না; মূলত মহাভারত কইছে অন্যকথা...

তয় এইটা ঠিক যে মহাভারত কইছে বহুত কিছু কিংবা মহাভারতরে দিয়া কওয়ানো হইছে বহুত কিছু। মহাভারত চতুর্বর্ণের কথা কইছে। কিন্তু গুণীজন হিসাব কইরা কন চতুর্বর্ণের সংবিধান মনু সংহিতার রচনাকাল মাত্র খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতক। কেউ কেউ কন আরো পরে; খ্রিস্টপূর্ব ২০০ থাইকা ২০০ খ্রিস্টাব্দ। মহাভারতের পরতে পরতে আছে কর্মফল- জন্মান্তরবাদ আর পূর্বজন্মের কাহিনি। কিন্তু ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের উর্বর মগজ থাইকা এই জন্মান্তরবাদের থিওরিখান নাকি বাইরাইছে খ্রিস্টপূর্ব ৫০০’র দিকে; বর্ণপ্রথা চালুর সময়। মহাভারত জুইড়া অবতারগো বিশাল দাপট; স্বয়ং কৃষ্ণ সেইখানে অবতার; কিন্তু এই অবতারবাদের উদ্ভব হইছে যিশুখ্রিস্ট জন্মাইবার তিন থেকে চাইরশো বছর পরে; গুপ্ত সাম্রাজ্যের সময়; যেইখানে এইটারে জোরালো বিশ্বাসে পরিণত করছে বৌদ্ধ ধর্মের জাতক কাহিনি। কুরুযুদ্ধে বহুত ভারী ভারী লোহার অস্ত্রের বর্ণনা পাওয়া গেলেও মানবজাতি কিন্তু লোহা আবিষ্কার করছে মাত্র খ্রিস্টপূর্ব ১২০০ সালে আর তার ঠিকঠাক ব্যবহার করতে পারছে আরো বহু পরে...

তো কথা হইল তাইলে মহাভারতে অত বর্ণপ্রথা জন্মান্তরবাদ অবতারবাদের থিউরি আর লোহার অস্ত্র সাপ্লাই দিলো কেডায়?

সাপ্লাই দিছে এখন থাইকা মাত্র দেড়-দুই হাজার বছর আগের কবিদল; মানে পুরাণ রচয়িতাগণ। পুরাণগুলারে যারা অনেক প্রাচীন কইতে চান তারা কন

খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ থাইকা শুরু হইয়া ৫০০ খ্রিস্টাব্দের মইদ্যে রচিত হইছে এইগুলা আর যারা পুরাণের বয়স কমাইবার পক্ষে তারা কন এইগুলা খ্রিস্টজন্মের ৬ থাইকা ১২ শতাব্দী সময়কালে উৎপাদিত জিনিস। আর ড. অতুল সুর কন মহাভারতখান লিখিত রূপ পাইছে খ্রিস্টপূর্ব ৪০০ থাইকা ৪০০ খ্রিস্টাব্দের মইদ্যে। মানে যা কারিগরি হইবার তা হইছে এই সময়টাতেই; মহাভারত লিখিত হইবার সময়। এই সময়ে লেখকগো হাতে মগজে বোঁচকায় যার যত অ্যাজেন্ডা আছিল সব তারা ঢুকাইয়া দিছে মহাভারতের পাতায়; আর তাতে চেহারায় বিষয়ে গল্পে পুরা ভজঘট পাকাইয়া হইয়া উঠছে বর্তমান লিখিত মহাভারত। যদিও লিখিত প্রাচীন মহাভারতও কিন্তু এক মহাভারত না; ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন ভার্সনের অস্তিত্ব বিদ্যমান; যদিও সকলেই নিজেরটা সম্পর্কে দাবি করেন- ইহাই আদি ও অকৃত্রিম দ্বৈপায়নের রচনা...

০৩

উপমহাদেশে আদি মহাভারত নামে যেইগুলা প্রচলিত তার মইদ্যে আছে কাশ্মীরি দেবনাগরি মৈথিলি নেপালি তামিল তেলেগু মালয়ালাম আর বাংলা মহাভারত; যদিও একটার লগে কাহিনি বহুত জায়গায় মিলে না আরেকটার...

বাংলায় মহাভারতের খণ্ড খণ্ড অংশ বহু আগে থাইকা অনুবাদ হইলেও ১৫১৫-১৫১৯ সালের মইদ্যে চট্টগ্রাম অঞ্চলে রচিত পরাগলি মহাভারতই হইল পরথম পূর্ণাঙ্গ বাংলা মহাভারত; যদিও সংক্ষিপ্ত...

সূত্রমতে গৌড়ের সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহ'র চট্টগ্রাম অঞ্চলের লস্কর বা শাসনকর্তা পরাগল খাঁ কিংবা পরাগ আলী খাঁ মহাভারতের এই অনুবাদ করান তার সভাকবি পরমেশ্বর দাসরে দিয়া-

"এই সব কথা কহ সংক্ষেপিয়া

দিনেকে শুনিতে পারি পাঁচালি পড়িয়া"

মানে এক দিনের মইদ্যে পুরাটা শোনা যায় এমন সাইজে মহাভারতের বাংলা পাঁচালি ভার্সন করতে কবি পরমেশ্বররে কইছিলেন পরাগল খাঁ। পরাগল খাঁর কথামতো কবি পরমেশ্বর দাস পাণ্ডববিজয় কাব্য; মতান্তরে বিজয়পাণ্ডব কাব্য নামে মহাভারত অনুবাদ কইরা কবীন্দ্র উপাধি পান; যে কারণে পরাগলি মহাভারতখান কবীন্দ্র মহাভারত নামেও পরিচিত। ড. কল্পনা ভৌমিকের সম্পাদনায় বাংলা একাডেমি কবীন্দ্র মহাভারত নামেই দুই খণ্ডে প্রকাশ করছে বইখান। বইখান খুবই কম প্রচারিত আর পরিচিত হইলেও এই বইখান প্রকাশ করতে গিয়া কল্পনা ভৌমিক যে বিস্তর গবেষণা করছেন তার সব তথ্য-উপাত্ত-ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও সংযুক্ত আছে দুই খণ্ডে কবীন্দ্র মহাভারতে। সাহিত্য মহাভারত নিয়া যারা ঘাঁটাঘাঁটি করতে চান তাগো যাত্রা শুরুর পয়লা ধাপ হইতে পারে ড. কল্পনা ভৌমিকের এই মহামূল্যবান গবেষণা...

তবে কেউ কেউ অবশ্য কিছু ঝামেলা পাকান পরাগলি মহাভারত নিয়া। তারা কন কবীন্দ্র পরমেশ্বর আর শ্রীকর নন্দী মূলত একই মানুষ। কিন্তু সত্য কথা হইল শ্রীকর নন্দী আলাদা মানুষ যিনি জৈমিনি মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব অনুবাদ করছিলেন পরাগল খাঁর পোলা ছুটি খাঁর অনুরোধে; যা আবার পরিচিত আছিল ছুটিখানী মহাভারত নামে। জৈমিনি মহাভারত কিন্তু দ্বৈপায়ন মহাভারত থাইকা কিছুটা আলাদা; মূলত এর অশ্বমেধ পর্বটা; আর দ্বৈপায়ন মহাভারত নামে আমরা এখন যা পাই তা মূলত বৈশম্পায়ন ভার্সন; যা সৌতি শুনছিলেন জন্মেজয়ের যজ্ঞে আর আর সৌতির মুখ থাইকা শুইনা সেইটা আমাগো বলতে আছেন অন্য কোনো এক অজ্ঞাত কথক...

দীনেশ চন্দ্র সেন অবশ্য কইতে চান যে সঞ্জয় রচিত মহাভারতই হইল পয়লা বাংলা মহাভারত। মানে পরাগলি মহাভারতেরও আগে তা রচিত হইছিল যা পরবর্তীতে সঞ্জয় ভারত নামে প্রকাশিতও হয়। দীনেশ চন্দ্ররে কেউ কেউ সমর্থন করলেও দীনেশ চন্দ্রসহ কেউই এই যুক্তির পক্ষে কোনো প্রমাণ হাজির করতে পারেন নাই। অবশ্য সেই যুগে পরাগলি মহাভারত থাইকা সঞ্জয় ভারতের প্রচার আর প্রসার দুইটাই আছিল বেশি। পরাগলি মহাভারতখান কোনো কারণে পরাগল খাঁর প্রাসাদের বাইরে তেমন একটা বাইরায় নাই; উল্টাদিকে সঞ্জয় ভারত সেই যুগে পরিচিত আছিল সিলেট-ত্রিপুরা-

নোয়াখালী-চট্টগ্রাম-ফরিদপুর-বিক্রমপুর এবং রাজশাহী এলাকার সাধারণ মানুষের কাছে...

সঞ্জয় ভারতখান হইল মহাভারতের জৈমিনি ভার্সনের অনুবাদ। কেউ কেউ কন যে সঞ্জয় মূলত কবীন্দ্র মহাভারতেরই একখান কপি করছিলেন নিজের মতো কইরা; যদিও কবীন্দ্র মহাভারত হইল বৈশম্পায়ন ভার্সন। তবে এইটা সত্য যে বিভিন্ন জনের রচনা হইলেও সকল প্রাচীন মহাভারতেই কিছু কিছু জিনিস অবিকলভাবে কপি-পেস্ট পাওয়া যায়। এইটার কারণ হিসাবে দীনেশ চন্দ্র সেন কন; লিখিত হইবার আগেও মহাভারতের বিভিন্ন গল্প কামরূপ আর সিলেট অঞ্চলে বসতি করা মগধের ভাট ব্রাহ্মণরা এই দিকে সেই দিকে বিভিন্ন সভায় গাইয়া বেড়াইতেন; সেইগুলারই কিছু কিছু অংশ কাটিং অ্যান্ড ফিটিং হইয়া ঢুইকা গেছে বিভিন্ন অনুবাদকের মহাভারতে; আর তাই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জনের অনুবাদ হইলেও মিলের সংখ্যা প্রচুর...

সঞ্জয় ভট সুনামগঞ্জের তাহিরপুরের মানুষ। ২০১৭ সালে সুনামগঞ্জ শিল্পকলা একাডেমিতে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে সঞ্জয় স্মারকস্তম্ভ নির্মাণের একটা উদ্যোগ নেওয়া হইছে। এইটা একটা খুশি হইবার মতো উদ্যোগ। এই উদ্যোগের পেছনে মূল মানুষ কবি মোহাম্মদ সাদিক। তিনারা সঞ্জয়রে প্রথম বাংলা মহাভারত লেখক হিসাবেই উল্লেখ করছেন সেই স্মারকস্তম্ভে...

সন্দেহ নাই বাংলা মহাভারত পয়লাবারের মতো লেখার দাবিদার দুইজনের মইদ্যে একজন সঞ্জয় ভট। কিন্তু এককভাবে তিনারে মহাভারতের পয়লা বাংলা লেখক কিংবা অনুবাদক কইবার দাবিটা বিতর্কহীনভাবে প্রমাণিত না। যুক্তি আর প্রমাণে এই ক্ষেত্রে বরং পরাগলি মহাভারতের লেখক কবীন্দ্র পরমেশ্বরই আগায়া আছেন...

তো আমি তিনাদের প্রস্তাব দিছিলাম সঞ্জয় স্মারকস্তম্ভে পয়লা বাংলা মহাভারত লেখার অন্য দাবিদার চট্টগ্রামের কবীন্দ্র পরমেশ্বরের কথাখানও একটু ঢুকাইয়া দিতে। এতে সঞ্জয়ের কীর্তি স্মরণ করার লগে লগে ইতিহাসের বিতর্ক থাইকাও সঞ্জয়রে মুক্তি দেওয়া হইত। কিন্তু আমার প্রস্তাবখান মোহাম্মদ সাদিক গ্রহণ করেন নাই। তিনারা শুধুই তিনাদের এলাকার সন্তানরে শ্রদ্ধা দেখাইতে চান...

পরাগলি মহাভারতের প্রায় দুই শো বছর পরে রচিত হইলেও বাংলায় সব থিকা জনপ্রিয় আর প্রচারিত মহাভারতখান কাশীরাম দাসের। এইটা মহাভারতের কাব্যিক ভাবানুবাদ। মহাভারতের অনেক বিষয় যেমন এইটাতে বাদ পড়ছে তেমনি মহাভারতের বাইরের বিষয়ও যোগ হইছে। আবার কাশীরামের নিজস্ব জিনিসও ঢুকছে এইখানে। ষোলো শতকের শেষ থাইকা সতেরোর প্রথমাংশ শতাব্দীকালে ভারত পাঁচালি নামে রচিত এই বইটা প্রকাশ হইছিল ব্রিটিশগো ইচ্ছায় এবং পয়সায় ১৮০১ থাইকা ৩ সাল পর্যন্ত। এই পুস্তকখান এখনো পাওয়া যায়; যদিও এইটার কোনটা যে আদি কাশীদাসি ভার্সন তা নিয়া যেমন বহুত মারামারি আছে তেমনি এর কতটা মূল কাশীদাসের আর কতটা অন্যদের অনুবাদ তা নিয়াও আছে বহুত মতামত দ্বিমত...

কালীপ্রসন্ন নিজে মহাভারত অনুবাদ করার শুরুর দিকে এই কাশীদাসের বহুত সমালোচনা করছেন এইটা বাদ দিছে ওইটা জুইড়া দিছে সেইটা কাব্য করছে কইয়া। কিন্তু নিজে একদল মানুষ নিয়া আট বছর মহাভারত ঘাঁটানির পর বোধ হয় বুঝছেন যে একলা কাশীদাসের কী অমানুষিক খাটনিখান গেছে পুরা মহাভারতের পদ্য অনুবাদ করতে। তাই পরের দিকে দেখি কালীপ্রসন্ন কথায় কথায় কাশীদাসরে সম্মান দিয়া কতা কন। আবার নিজেই উদ্যোগী হইয়া কাশীদাসের জীবনীও ছাপাইতে চান কিন্তু কাশীদাস সম্পর্কে বিশেষ কিছু উদ্ধার করতে পারেন নাই তিনিও। তবে যদ্দুর নিশ্চিত তা হইল কাশীদাস আছিলেন বর্ধমান জেলার মানুষ...

যাই হউক। কাশীদাসি মহাভারতখানই বাংলায় সব থাইকা জনপ্রিয় মহাভারত। এইটা তার নিজস্ব একখান মহাভারত। পদ্যে রচিত এই পুস্তকখান হেইলা-দুইলা সুর কইরা পড়ার লাইগা যেমন দারুণ; তেমনি রাক্ষস-খোক্কশের কাণ্ড কারখানা দেইখা হাসার লাইগাও দারুণ আবার ভক্তিতে গদগদ হইয়া চোখ বন্ধ কইরা ঝিমানোর লাইগাও দারুণ; কিন্তু তার পদ্যের ঠেলায় সেইখান থাইকা রক্তমাংসের মানুষগুলারে চিনা বড়োই কঠিন; ছন্দে যেদিকে টাইনা নিয়া যায় সেই দিকে তিনি মহাভারতরে ঠেইলা নিয়া গেছেন...

দুইখণ্ডে রচিত কালীপ্রসন্ন সিংহের বাংলা মহাভারতখানের সাইজ দেইখা সহজে কেউ হাত দিবার সাহস করে না। অতি বিস্তৃত অতি বিশাল। কাহিনি-উপকাহিনির ছোটখাটো বিষয়গুলাও তিনি ছাইড়া যান নাই। কাশীদাসি মহাভারতে কাশীদাস যেসকল জায়গা জটিল বইলা ছাইড়া গেছিলেন কিংবা ছাইটা ফালাইছেন কিংবা কাব্য কইরা গুলাইয়া ফালাইছেন কিংবা নতুন কাহিনি জুইড়া দিছেন সেই সব জায়গা তিনি ভরাট কইরা দেন গদ্য অনুবাদে। পুস্তকখান তার একলা অনুবাদ নয়; অনেকের অনুবাদ যার দলনেতা আছিলেন তিনি। দাবি করছেন তার পুস্তকখান মূলানুগ। এই বিষয়ে কিছু কওয়ার বিদ্যা আমার নাই; কিন্তু তার গ্রন্থের উৎসর্গপত্রখান দেখলে কেমন যেন মনের মইদ্যে খচাখচ করে...

তিনার অনুবাদখানও ব্রিটিশগো অনুদানের ফসল। তিনার বইখান তিনি উৎসর্গ করছেন উপনিবেশের মহারানি ভিক্টোরিয়ারে মারাত্মক তেলাইয়া আর যবন-মোগলগো কিলাইয়া চিরদুখি ভারতরে উদ্ধার করার লাইগা ব্রিটিশ জাতিরে ভারতের উদ্ধারকর্তা হিসাবে ধন্যবাদ দিয়া। পুরা মহাভারত জুইড়াই পরিষ্কারভাবে রাজা-বাদশাগো তেলাইবার কথা কওয়া হইছে। কওয়া হইছে যে রাজায় যারে কিলাইব তার লাশ পাইলেও যেন প্রজারা দুই-চাইরখান লাত্থি বসাইয়া দেয় রাজারে খুশি করার লাইগা; সেইখানে যিনি ব্রিটিশ জাতি আর রানি ভিক্টোরিয়ার চির অনুগত প্রজা কইয়া নিজের পরিচয় দেন; তার হাতে মহাভারতের কাহিনিখান কি কোনো জায়গায় এই দিক-সেই দিক হয় নাই ব্রিটিশরে তেলানোর খাতিরে?

হইলে হইতে পারে। কিন্তু বড়ো কথা হইল বাংলায় তিনার আটখান বচ্ছরের পরিশ্রমই বোধ হয় এখনো আমাগো বিস্তৃতি মহাভারত পাঠের সব থাইকা নির্ভরযোগ্য সূত্র...

০৪

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উঁচা বর্ণের ধর্মবিশ্বাসী মানুষ। তিনি কৃষ্ণরে ভগবান মাইনা মহাভারতে খুঁজতে যান কৃষ্ণের তত্ত্ব-তালাশ সূত্র আর ইতিহাস। কিন্তু কৃষ্ণ সন্ধানে গিয়া তিনি উন্মুক্ত করেন মহাভারতের পরতে পরতে ভজঘটের

মহাসূত্রাবলি। কবিদের উপর তিনি মহাখাপ্পা হইয়া প্রথমে শুরু করেন মহাভারত শুদ্ধি অভিযান। একটার পর একটা প্রসঙ্গ ধইরা কইতে থাকেন এইটা প্রক্ষিপ্ত ওইটা প্রক্ষিপ্ত। মানে মূল রচনায় আছিল না; পরে কেউ ঢুকাইয়া দিছে; মহাভারতরে পুরাই আউলাইয়া ফালাইছে কবিরা; এর বংশতালিকা ভুল; সংখ্যার হিসাব ভুল; পাঞ্জিপুঁথি ভুল; সেনাসৈনিক ভুল; মহাভারতের কৃষ্ণও ভুল; মানে ভগবান কৃষ্ণরে সেইখানে খুঁজতে যাওয়া একখান যাচ্ছেতাই বিষয়...

তো মহাভারতে ভগবান কৃষ্ণরে না পাইয়া নিজের ভগবানের জীবনী নিজের মতো কইরা লিখতে যাইবার আগে তিনি কর্ণরে মনোহর হিসাবে চারিত্রিক সনদপত্র দিয়া মহাভারতের যে প্রক্ষিপ্ত ঘটনার তালিকা তৈয়ার করেন সেইটা ধইরা মহাভারত এডিট করতে গেলে অবশ্য মহাভারতে সাকুল্যে পঞ্চাশখান পৃষ্ঠা টিকব কি না আমার সন্দেহ। সেইটা যাই হউক না কেন; মহাভারত নিয়া ঘাঁটাঘাঁটি করতে গেলে বঙ্কিমের কৃষ্ণ চরিত্র পুস্তকের বিশ্লেষণগুলা মূল্যবান জিনিস; বিশেষত মহাভারতের চুরি ধরার কৌশল বয়ান। এইটা চুরি কি না সেই বিষয়ে সন্দেহ আছে। কারণ দুনিয়ার অন্যসব জায়গায় যেখানে মাইনসে অন্যের লেখা নিজের নামে চালায়; সেইখানে উপমহাদেশে মাইনসে নিজের লেখা অন্য কোনো বিখ্যাত মাইনসের নামে চালায়। হয়ত বুইড়া মাতব্বরের সমাজে চ্যাংড়া পোলাপানগো কথায় পাত্তা না দিবার সংস্কৃতি থাইকা তরুণরা এই জিনিসটা উদ্ভাবন করছে- ব্যাটা আমার কথা যখন শুনবি না তখন তোর বাপের নামে কই...

তবে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রক্ষিপ্ত তালিকা আর প্রক্ষিপ্ত বাছাইর টেকনিক কিন্তু বিনা প্রশ্নে অনেকেই মানতে নারাজ। আবার কৃষ্ণ চরিত্র নির্মাণে মহাভারত ঘাঁটাঘাঁটিতে তিনার উদ্দেশ্যখানও খুব একটা সৎ আছিল না...

বঙ্কিমচন্দ্রের মূল খায়েশ আছিল ইংরেজগো কাছে গ্রহণযোগ্য একখান হিন্দুধর্ম নির্মাণ করার। কারণ বেদের মেয়াদোত্তীর্ণ বিধিবিধান আর শত শত পৌরাণিক কাহিনি কিংবা দেবদেবী মিল্লা যুক্তির টেবিলে হিন্দু ধর্মরে এক্কেবারে ছ্যারাবেরা কইরা থুইছে বহুকাল। তিনার বিশ্বাস আছিল ইংরেজগো কাছে যুক্তি দিয়া হিন্দু ধর্মরে গ্রহণযোগ্য কইরা তুলতে পারলে

ইংরেজি শিক্ষিত কিংবা যুক্তিসঙ্গত ভারতীয়গো কাছেও হিন্দু ধর্মখান বিনা-শরমে পালনযোগ্য হইয়া উঠতে পারে। তো এই মিশনের লাইগা পয়লা তিনি নির্মাণ করলেন শ্রীকৃষ্ণের জীবনী; কৃষ্ণচরিত্র। পুরাণ আর লোক সাহিত্যের কৃষ্ণসংক্রান্ত আউলাঝাড়া কাহিনিগুলারে কোথাও যুক্তি দিয়া; কোথাও গায়ের জোরে মুচড়াইয়া এবং বাইবেল থাইকা যীশু খ্রিস্টের জীবনের ছায়া-মায়া ছিটাইয়া তিনি নির্মাণ করলেন প্রায় একখান তথাকথিত ঐতিহাসিক এবং প্রায় দয়ালু এবং প্রায় একজন মাত্র নারীর স্বামী শ্রীকৃষ্ণের জীবনী...

এই কাম করতে গিয়া মহাভারতরে তিনি মোটামুটি তিনার বামুনদণ্ড দিয়া বহুত জায়গায় ধর্ষণও করছেন অবলীলায়। তবে সেই জীবনীতে কোত্থাও কৃষ্ণের কোনো ভগবানত্ব নাই; ভগবানত্ব আরোপের চেষ্টাও করেন নাই। সেইখানে তিনার মূল চেষ্টাটা আছিল কৃষ্ণের একখান ক্লিন ইমেজ তৈয়ারি করা। এমনকি রুক্মিণী ছাড়া কৃষ্ণের অন্য বৌদের ঘরের সন্তানগো কোনো খোঁজ পাওয়া যায় না; এইরকম একটা আবাল যুক্তি দিয়া তিনি উপসংহার টাইনা দিলেন যে কৃষ্ণ আসলে একটার বেশি বিবাহই করেন নাই...

কোনো কোনো গবেষকে কন; সিরিয়া থাইকা আসা আভীর জাতির খ্রিস্টান মানুষ ভারতে বসতি করার পর তাগো কাছ থিকা শোনা খ্রিস্ট কথাটা লোকাল উচ্চারণে বদলাইয়া কেষ্ট হইয়া উঠছে। মানে যীশু খ্রিস্টের জীবনী থাইকা রচিত হইছে কৃষ্ণের জীবনী। ওই যুক্তিটা মিলে না। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণ চরিত্র পড়লে মনে হইতে পারে যে কৃষ্ণ আসলেই যীশুর একটা কালো পুত্তুলিকা মাত্র...

তো মনমতো কৃষ্ণ-গপ্প লেখা শেষে বঙ্কিমচন্দ্র কইলেন- আমি কিন্তু কৃষ্ণরে ভগবান বইলা মানি...

মানেন অসুবিধা নাই। নিজের ভগবানের জীবনী নিজে তৈয়ার করার ক্ষ্যামতা খুব কম মানুষেরই থাকে...

আমার হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থখান সব কিছুর পরেও কৃষ্ণ বিষয়ক একখান ভালো পুস্তক। বিশেষত যারা মথুরার কৃষ্ণ আর মহাভারতের কৃষ্ণরে আলাদা মানুষ বইলা ভাবেন তারা নিজেগো পক্ষে বহুত যুক্তি পাইবেন এই পুস্তকে...

কিন্তু পণ্ডিতে যখন মৌলবাদ আক্রান্ত হয় তখন তারে ভণ্ডামি না কইরা উপায় থাকে না। বঙ্কিমচন্দ্র চূড়ান্ত কিছু ভণ্ডামি কইরা বসেন কৃষ্ণচরিত্রের সিকুয়াল তার 'শ্রীমদ্ভগবদগীতায়'। এই পুস্তকটার মূল উদ্দেশ্য আছিল ইংরেজ আর ইংরেজি শিক্ষিতগো কাছে গীতার গ্রহণযোগ্য বিশ্লেষণ কিংবা টিকা তৈয়ারি...

গীতা বেদোত্তর দর্শন। বহুক্ষেত্রে বেদবিরোধী। পৌরাণিক দেবদেবীরে সাইডলাইনে সরাইয়া আর বৈদিক ঝাঁপসা আর অচল ধর্ম দর্শনরে বাতিল কইরাই তৈয়ারি হইছে গীতার ভক্তিবাদী দর্শন...

গীতারে মহাভারতের কুরুযুদ্ধ চ্যাপ্টারে ঢুকাইয়া কৃষ্ণ-অর্জুনের ডায়লগ আকারে উপস্থাপন করায় প্রাথমিকভাবে এইটা হত্যার দর্শন মনে হইলেও এর মূলমন্ত্র কিন্তু ভক্তিবাদ; যেই জিনিসটা বেদে আছিল সম্পূর্ণ অনুপস্থিত...

গীতার ভক্তিবাদের যুক্তিগুলা তৈয়ারি হইছে আত্মা- জন্মান্তরবাদ-কর্মফল আর চতুবর্ণ প্রথার ঘাড়ে ভর কইরা। আত্মা-জন্মান্তরবাদ-কর্মফল আর চতুর্বর্ণ প্রথার প্রেক্ষাপট মাথায় না রাইখা গীতা পড়তে গেলে আসলে কোনো মানেই খাড়ায় না পুস্তকটার...

তো ধার্মিকেরা যখন গীতার ব্যাখ্যা বা টিকা লিখছেন তখন তারা সকলেই আত্মা-জন্মান্তর এইসবে বিশ্বাস রাইখা সেই প্রেক্ষাপটে বিশ্বাসীগো লাইগা কথা কইছেন। মানে ধর্মের প্রেক্ষাপটে ধর্মের ব্যাখ্যা; পৌরাণিক প্রেক্ষাপটে পুরাণের বিশ্লেষণ...

কিন্তু ইংরেজগো ব্যাখ্যায় গীতা পড়া চূড়ান্ত মূর্খতা ঘোষণা কইরা বঙ্কিমচন্দ্র কাইল্লা ইংরেজগো লাইগা যেই গীতাখান রচনা করছেন; সেইখানে তিনি ধর্মের প্রেক্ষাপটে ধর্মরে উপস্থাপন না কইরা আত্মা-জন্মান্তরবাদ-কর্মফল এইগুলার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা-প্রমাণ দিবার একখান বেহুদা চেষ্টা চালাইছেন। বহুত বাণী কপচাইছেন চুতর্বর্ণ প্রথা আর বিধবা নারীগো প্রতি ঘিন্নারে সামাজিক বিজ্ঞানের সূত্র দিয়া যুক্তিযুক্ত করার...

ধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হয় মূর্খতা না হয় ভণ্ডামি। বঙ্কিমচন্দ্র মূর্খ আছিলেন না। তিনি জাইনা বুইঝাই আত্মা আর জন্মান্তরবাদের বৈজ্ঞানিকতা প্রমাণের

ভণ্ডামিটা করেন; সমাজবিজ্ঞান কপচাইয়া চতুবর্ণপ্রথা আর বিধবা-ঘিন্নারে জায়েজ করার নোংরামিটা করেন...

কৃষ্ণচরিত্র রচনার স্টাইলে গীতায়ও তিনি যেইসব শ্লোকের শেষ পর্যন্ত কোনো গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দিতে পারেন না; সেইগুলারে গায়ের জোরে প্রক্ষিপ্ত কইয়া ফালাইয়া দেন...

বৌদ্ধ ধর্মরে ছ্যা ছ্যা দূর দূর করলেও বঙ্কিমের কৃষ্ণভক্তির ফর্মুলাটা প্রায় বৌদ্ধদের নির্বাণ-সূত্রেরেই কাছাকাছি। মানে অর্জুনরে তিনি কৃষ্ণের উপদেশের ব্যাখ্যা দিয়া প্রায় বৌদ্ধ শমন পর্যায়ে নিয়া যান। পাশাপাশি তার কৃষ্ণের ভিতর থাইকা যেমন নাজারতের ক্ষমাশীল যীশু উকিঁ মারেন তেমনি তার গীতার পাতা ফুইড়া মাঝে মাঝেই উঁকি মারে বাইবেলীয় রোমান সুসমাচার...

কৃষ্ণ বিষয়ে যাগো অধিক আগ্রহ আছে আমি তাগোরে নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ীর মহাভারতের ভারতযুদ্ধ এবং কৃষ্ণ বইখান পড়তে সুপারিশ করি। অসাধারণ একটা পুস্তক। নৃসিংহপ্রসাদ কৃষ্ণ বিষয়ে পিএইচডি গবেষণা করছেন সুকুমারী ভট্টাচার্যের সুপারভিশনে। কিন্তু সুকুমারী যেমন ঠনঠন কইরা হাড্ডিা বাজাই কৃষ্ণরে বিশ্লেষণ করেন; নৃসিংহপ্রসাদ সেইপথ নেন না। আবার বঙ্কিমের পূর্ব নির্ধারিত ভগবান বিশ্লেষণের পথেও যান না...

নৃসিংহপ্রসাদের বইটার ধরন বইয়ের ভূমিকায় তারই দুইটা মন্তব্য থাইকা দারুণভাবে পাওয়া যায়; যার একটা হইল- কৃষ্ণের জীবনকালেই কৃষ্ণরে বহুবিধ কারণে অভিযুক্ত করা হইছে বহুবার; মহাভারতেও হইছে; মহাভারতের বাইরেও হইছে। সুতরাং সেইগুলা কৃষ্ণপুরাণেরই অংশ; বেহুদা যুক্তি দিয়া সেইগুলা খণ্ডণ করতে যাওয়া কোনো কামের কথা না...

আর দ্বিতীয় কথাটা হইল- ভগবত্তা দিয়া কৃষ্ণের সামাজিক কলঙ্কমোচনের গুরুদায়িত্ব আমার নাই; এমনকি কৃষ্ণ কোন কাজ সঠিক না বেঠিক করছেন সেইটা বিচারের দায়িত্বও নাই...

এই বইটা কৃষ্ণের রাজনৈতিক জীবনের বই; কোন প্রেক্ষাপট আর কোন পরিস্থিতির ফলাফলে এক সাধারণ তরুণ ভারতকর্তা হইয়া উঠে তার বিবরণ।

তার লগে কৃষ্ণ বিষয়ক বিখ্যাত সব রচনার অসাধারণ লিটারেচার রিভিউ; খণ্ডণ- সমর্থন দুইটাই...

কৃষ্ণ বিষয়ক অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রচনাগুলার রিভিউ পড়ার লাইগা এই বইটার কোনো তুলনা নাই। বঙ্কিমের কৃষ্ণ চরিত্রের একটা বিশাল রিভিউও আছে এই বইটাতে...

তবে নৃসিংহপ্রসাদ রাধার কৃষ্ণ আর মহাভারতের কৃষ্ণরে আলাদা মানুষ না; বরং একই মানুষ বইলা মনে করেন; যেইটার লগে আমার দ্বিমত থাকলেও তিনার যুক্তিগুলারে ফুৎকার দিয়া ফালাইয়া দিবার সুযোগ নাই...

তবে নৃসিংহপ্রসাদ কিন্তু নৃতাত্ত্বিক গবেষক না। পৌরাণিক গবেষক। তিনি পুরাণের সূত্র দিয়াই পৌরাণিক চরিত্রগুলারে মূর্তিমান করেন। সেইটা করতে গিয়া তিনি বস্তুবাদী বহুত জিনিস বাদ দিয়া যান। যেইটা তার গবেষণার ধরনের লাইগা গুরুত্বপূর্ণও...

এই বইটা কৃষ্ণরে নিয়া হইলেও একই সাথে বইটা কিন্তু একটা ‘ভরত পুরাণ’। মানে ভরত থাইকা ভারতবর্ষের সূচনার যে পৌরাণিক কাহিনি; তার একটা অসাধারণ রূপরেখা আছে বইটায়...

একটা বিশাল বংশধারা বর্ণনা করছেন তিনি এই পুস্তকে। কেমনে তখনকার ভারতবর্ষের প্রায় সব রাজারা ভরতের বংশধর হইল সেইটা। তার সূত্রগুলা বিভিন্ন পুরাণ থাইকা নেওয়া। কিন্তু একটা জিনিস তিনি ছাইড়া গেছেন; হয়ত সচেতনভাবেই। সেইটা হইল সব ভরদ্বাজি বামুন কিংবা পরশুরামি বামুন যে রক্ত সম্পর্কিত না; বরং ভরদ্বাজ কিংবা পরশুরামের ইস্কুলে পড়ার কারণে অনাত্মীয় হইয়াও সকলেই ভরদ্বাজ কিংবা পরশুরাম বইলা পরিচিত; সেইটা বেদে আর পুরাণে আছে বইলাই নৃসিংহপ্রসাদ উল্লেখ করলেও তিনি কিন্তু পাশ কাটাইয়া যান ক্ষত্রিয়গো বংশ তালিকার ফাঁক...

ভরত থাইকা ভারতবর্ষের সব বড়ো গোষ্ঠীর উৎপত্তি এইটাতে যতটা না ভরত বংশের কৃতিত্ব তার থাইক কিন্তু বেশি কৃতিত্ব পুরাণ লেখক বামুন আর যারা নিজেগো ভরতের বংশধর বইলা দাবি করছেন তাদের...

ঘটনাটা হইল সেইকালে সকল অখ্যাত আর নতুন রাজারাই কিন্তু নিজেরে প্রতিষ্ঠিত বংশের মানুষ প্রমাণ করার লাইগা বামুনগো পয়সা দিয়া পুরাণের নতুন নতুন ভার্সন লেখাইতেন। কেউ কেউ নতুন নতুন কাহিনি তৈয়ারি করতেন। আর সকল পুরাণের লেখকই কিন্তু পেশাদার। সেইসব পেইড বামুনগো কাম একটাই আছিল; সেইটা হইল প্রচলিত ভরত পুরাণ টাইনা একটা লতা ধইরা সেইখানে নতুন রাজারে প্রক্ষিপ্ত কইরা দেখাইয়া দেওয়া যে এই রাজা নতুন হইলেও কিন্তু সেই মহান ভরতবংশের উত্তরাধিকার...

এইটা এক্কেবারে পয়সা নিয়া ভার্জিলের ইনিড লেখার মতো। যেইখানে তিনি অজ্ঞাত অক্টাভিওনরে ইনিয়াসের বংশধর বানাইবার লাইগা মহাকাব্যখান লেখছিলেন...

তো শেষ পর্যন্ত যে বিপত্তিটা খাড়ায় সেইটা হইল এইসব পুরাণ এক জায়গায় জড়ো কইরা দেখলে দেখা যায় যে ভারতে আসলে ভরতের বংশধর ছাড়া গনবার মতো কোনো মানুষ নাই। নৃসিংহপ্রসাদের মহাভারতের ভারতযুদ্ধ এবং কৃষ্ণ বইটার দ্বিতীয় অধ্যায় কিন্তু সেই পৌরাণিক ভরতবংশ বর্ণনা; যেইটা নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস দিয়া যাচাই করলে বহুকিছুই প্রশ্নবোধক হইয়া পড়বে...

এই কথাটা নৃসিংহপ্রসাদের সবগুলা বইর বেলাতেই ঠিক। তবে এইটাও ঠিক যে তিনি নৃতাত্ত্বিক না; পৌরাণিক গবেষক। তার বইগুলা পৌরাণিক ইতিহাস না; বরং ইতিহাসের পুরাণ...

০৫

বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণ চরিত্র পুস্তকে মহাভারত বিশ্লেষণের কিছু সূত্র দিলেও তিনার উদ্দেশ্যখান সৎ আছিল না দেইখা শেষ পর্যন্ত তিনার সূত্র দিয়া মহাভারতের কোনটা আদি ভার্সন আর কোনটা প্রক্ষিপ্ত সেইটা বিচার করতে যাওয়া বেকুবি। তিনি আসলে তিনার মনমতো কৃষ্ণ চরিত্র আবিষ্কার করার লাইগাই মহাভারতর ঘাঁটাইছেন...

তবে মহাভারতের মোটামুটি গ্রহণযোগ্য একখান প্রায় আদি বৈশম্পায়নী ভার্সন আছে এখন। সম্পূর্ণ বিতর্কহীন না হইলেও এইটা দিয়া ২৪ হাজার

শ্লোকের মহাভারতের বৈশম্পায়নী ভার্সন 'বিজয়' বা 'ভারত' এর একটা চিত্র পাওয়া সম্ভব। আর একেবারে আদি দ্বৈপায়নী ভার্সন 'জয়' আছিল আরো ছোট; মোটামুটি নয় হাজার শ্লোকের...

মহাভারতের এই ভার্সনটা বাইর করছে পুনার ভাণ্ডারকর গবেষণা কেন্দ্র। 'মহাভারত সংশোধন সমিতি' নামে একটা গ্রুপ গবেষণার পর মোট ২২ খণ্ডের পয়লা খণ্ড বাইর করে ১৯৩৩ সালে। ড. বিষ্ণু সুথংকর আছিলেন দলনেতা। তিনি মারা যান ৪৩ সালে। মারা যাবার আগে পর্যন্ত বেশ কয়েকটা খণ্ড বাইর হয়। তিনার পর এই টিম লিড দেন ড. কৃষ্ণপদ ভেলকর। ড. ভেলকরের নেতৃত্বে সর্বশেষ খণ্ড বাইর হয় ১৯৬৬ সালে। শেষ খণ্ড প্রকাশের আগেই ড. ভেলকর মারা যান। তবে তিনি মারা যাবার আগেই মহাভারতের উপাঙ্গ 'হরিবংশ'; যেইটারে মহাভারতের অংশ বইলা কেউই মানে না; সেইটা ছাড়া বাকি সবটার মূল পাঠ উদ্ধার হইয়া যায়...

বর্তমানে প্রচলিত ১ লাখের বেশি শ্লোকের মহাভারত থাইকা ২৪ হাজার শ্লোকের ভার্সন উদ্ধার করতে ভাণ্ডারকর যে ২২ খণ্ড পুস্তক বাইর করছে সেইখানে যেইসব শ্লোক বাদ দেওয়া হইছে সেইগুলা প্রতিটা ধইরা ধইরা বিশ্লেষণ করা হইছে। কেন বাদ দেওয়া হইছে; কোন প্রদেশের কোন ভার্সনে কোনটা আছে আর কোন ভার্সনে কোনটা নাই; তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা আছে। আর সেইটা কইরা তারা ২৪ হাজার শ্লোকের আদি ব্যাখ্যা আর যুক্তিসহ বৈশম্পায়নী ভার্সনখান চিহ্নিত করছেন...

এইটার একটা বাংলা অনুবাদও আছে। শিশির কুমার সেন নামে এক রিটায়ার্ড বিচারপতি সেইটা করছেন ১৯৯০ সালের দিকে...

তবে নেহাৎ গবেষণার দরকার না পড়লে ওইটা কাউরে পড়তে সুপারিশ করি না আমি। কারণ ওইটা মহাভারতের সাহিত্য না; নৃতত্ত্ব। সাহিত্য মহাভারতের ক্ষেত্রে বুদ্ধদেব বসুর কথাখানই সবথিকা দামি; সেইটা হইল- বহু হাত পার হইয়া আমাগো কাছে এখন যে পুস্তকখান আছে সেইটাই পূর্ণ সাহিত্য মহাভারত; বাকিগুলা গবেষণার উপাদান...

০৬

বর্তমান যুগে বাংলায় মহাভারত নিয়া কথা কইতে গেলে চাইরজন মানুষ সম্পর্কে না কইলে মহাভারতমূর্খ কইতে হয় নিজেরে। তার পয়লাজন উপেন্দ্রকিশোর রায় দ্বিতীয়জন রাজশেখর বসু তৃতীয়জন বুদ্ধদেব বসু আর চতুর্থজন নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী...

উপেন্দ্রকিশোর যেখানে ছোটবেলায় মহাভারত পড়তে আগ্রহ তৈরি করেন; রাজশেখর বসু সেইখানে বড়ো হইবার পর মহাভারত বুঝাইয়া দেন। নির্লিপ্তভাবে পক্ষপাতহীন সাবলীল ভাষায় তিনি পুরা মহাভারতের মূল গল্পগুলা বর্ণনা কইরা যান। কোনো কিছু যোগও করেন না; কোনো কিছু বাদও দেন না নিজের থাইকা। নিরপেক্ষ থাইকা সংক্ষেপে খালি বুঝাইয়া দেন। আমি কই; কারো মহাভারতপাঠ শুরু কিংবা শেষ হওয়া উচিত না রাজশেখর বসুর মহাভারত বাদ দিয়া...

তুলনামূলক সাহিত্যের বিচারে কেউ মহাভারত দেখতে চাইলে তার লাইগা সেরা পুস্তক বুদ্ধদেব বসুর মহাভারতের কথা। সাহিত্যের চোখ দিয়াই সাহিত্য বিশ্লেষণ। দুনিয়ার সেরা সাহিত্যকর্মগুলার সাথে এক টেবিলে ফালায়া মহাভারতের আলাপ। কোনটা প্রক্ষিপ্ত আর কোনটা আদি; কোনটা ইতিহাস আর কোনটা রূপকথা সেইসব খটখটানি বাদ দিয়া আমাগো হাতে বর্তমানে যা আছে সেইটাই পূর্ণাঙ্গ 'সাহিত্য মহাভারত'; আর আলোচনা সেইটারে নিয়াই...

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী বাইর কইরা আনেন মহাভারতের চরিত্রগুলারে। একেকটা চরিত্রই যেন একেকটা মহাকাব্য। তা হোক মহাভারতের নায়ক আর হোক প্রতিনায়ক কিংবা প্রবীণ কিংবা নারী কিংবা কৃষ্ণ। মহাভারতের মানুষগুলারে তিনি জীবন্ত কইরা তোলেন মহাকাব্যিক অসংগতিগুলা সংশোধন কইরা। আমার মনে হয় তিনি বিশ্বাস করেন যে মহাভারতখান একক কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের লেখা। দ্বৈপায়নের সবকিছুরে যেমন তিনি যুক্তি দিয়া প্রতিষ্ঠা করেন তেমনি দ্বৈপায়নের নামে চলা জিনিসগুলারেও প্রমাণ করতে চান আদি ও অকৃত্রিম দ্বৈপায়নেরই অবদান কইয়া...

তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের পণ্ডিত লোক; হইলে হইতে পারে সংস্কৃত তর্কশাস্ত্রের নিয়মনীতিগুলা তিনি মাইনা চলেন। যেইখানে বেদ নিয়া তর্ক হয় আগে বেদ বিশ্বাস কইরা; বিশ্লেষণ কিংবা শ্লোকের পক্ষে যুক্তি পরিষ্কার করার লাইগা। কিন্তু কোনোভাবেই কোনো চ্যালেঞ্জ করার সুযোগ নাই সেইটা মাইনা নিয়া। তিনি সেই স্টাইলেই মূলত মহাভারতে গাওয়া দ্বৈপায়নের সবকিছুরে জাস্টিফাইড করতে চান যুক্তি দিয়া। বহুত দুর্বল যুক্তিও দেন; কিন্তু দুর্বল যুক্তিরেও কেমনে আকর্ষণীয় কইরা কইতে হয় সেইটা একই সাথে সংস্কৃত আর বাংলার পণ্ডিত এই মানুষটা মারাত্মক ভালোভাবে জানেন...

মহাভারতের চরিত্রগুলারে আধা পুরাণ আর আধা বাস্তবের আবহে রক্তমাংস নিয়া চিনবার লাইগা নৃসিংহপ্রসাদের কাজগুলার থাইকা ভালো কাজ আছে কি না আমার জানা নাই...

মহাভারত সম্পর্কিত একটা বই নিয়া বহুত আলোচনা শোনার পরও প্রায় দুই যুগ ধইরা মহাভারত ঘাঁটাঘাঁটির সময়কালে সেই বইটা সংগ্রহ কইরা দেখতে পারি নাই; বইটা হইল প্রতিভা বসুর মহাভারতের মহারণ্যে। এই বইটা পড়তে না পারার আফসুস জানাইয়াই আমি আমার অভাজনের মহাভারত বইখান পয়লা প্রকাশ করছিলাম...

কিন্তু অভাজনের মহাভারত প্রকাশ হইবার এক বছর পর সেই বইটা পইড়া মনে হইল মহাভারতের মহারণ্যে বইটা না পড়াই মঙ্গল হইছে আমার। কারণ ওইটারে মহাভারত সংক্রান্ত পুস্তক না কইয়া দ্বৈপায়ন- বিদুর আর যুধিষ্ঠিরের বিরুদ্ধে বর্ণবাদী পুলিশের তদন্ত প্রতিবেদন বলাই বোধহয় সব থিকা ভালো। যদিও বিদুর যে মূলত একখান ভিলেন চরিত্র সেইটা খিটখিট করতে করতে তিনি বহুত ভালো কইরাই দেখাইয়া দিছেন...

কিন্তু আগাগোড়া অবৈধ সন্তান- অবৈধ সন্তান কইয়া খিটখিট করা এই লেখক সম্পূর্ণ এড়াইয়া গেছেন যে মহাভারতের কালে কোনো মানুষের জন্মই অবৈধ হিসাবে গণ্য হইত না। মহাভারতে বহুত আদিমতা থাকলেও যেকোনোভাবে যেকোনো মনুষ্য জন্মরে স্বাগত জানাইবার মতো উদারতাখান আছিল তাদের। মনুষ্যজন্মরে অবৈধ বলার সংস্কৃতিটা মূলত যীশুপুরাণ প্রভাবিত ইউরোপিয়ান সভ্যতার দান...

আর সেই ইউরোপিয়ান সভ্যতার বর্ণবাদী চশমা দিয়া প্রতিভা বসু মহাভারতের দিকে তাকান বইলাই সারা মহাভারতে তিনি খালি অসভ্য কালা মানুষ আর অবৈধ সন্তানদের আবিষ্কার করেন...

মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কিছু নাই; এই কথাখান দুনিয়ার প্রাচীন সাহিত্যগুলার মাঝে একমাত্র মহাভারতেই উচ্চারিত হইছে; জিনিসটা চোখেও পড়ে না প্রতিভা বসুর...

প্রতিভা বসুর মহাভারতের মহারণ্য একখানা কুৎসিত পুস্তক। মহাভারত সম্পর্কে এত বর্ণবাদী কোনো পুস্তক আমি এর আগে আর পড়ি নাই...

০৭

ইন্দোনেশিয়ার পুরা সংস্কৃতি মহাভারতীয়; বহুত কাহিনি-উপকাহিনি আছে মহাভারতের। কিন্তু আমি কোনো ইন্দোনেশিয়ান অখণ্ড মহাভারতের সন্ধান পাই নাই। সম্রাট আকবরও নাকি ফারসি ভাষায় মহাভারতের একখান অনুবাদ করাইছিলেন; সেইটার কোনো আলোচনা-বিশ্লেষণ সংগ্রহ করার সুযোগ হয় নাই আমার...

ভারতীয় ভাষার বাইরেও মহাভারতের বিস্তার বহু। এশিয়ার বহু জায়গায় এর কাহিনি পাওয়া যায়। ইংরেজিতে আছে এর ভূরি ভূরি ভার্সন আর বিশ্লেষণ। ইংরেজিগুলা মূলত দুই ধরনের লোকজনের কাম; পয়লা দল হইলেন ভারতীয়; যারা এইখানকার কোনো আখ্যান ইংরেজিতে অনুবাদ করছেন আর দ্বিতীয় দল হইল অভারতীয়; যারা নিজেরাই নিজের বুঝ থাইকা লিখছেন মহাভারতের ঘটনা কিংবা কাহিনি কিংবা বিশ্লেষণ। এর মাঝে সব থিকা উল্লেখযোগ্য হইল আশির দশকে পিটার ব্রুকের রচনা ও পরিচালনায় ৯ ঘণ্টা দীর্ঘ ইংরেজি মঞ্চনাটক; যেইটারে তিনি পরে ৬ ঘণ্টার টিভি সিরিজ আর ৩ ঘণ্টার চলচ্চিত্র বানান। এইটারে নিয়া বহুত সমালোচনা থাকলেও আমার মনে হয় দুইটা জিনিস তিনি খুব ভালো কইরা করছেন; পয়লাটা হইল মহাভারতের অলৌকিক ঘটনাগুলার মানবিক চেহারাদান আর মহাভারতখানরে মানবজাতির রাজনৈতিক ইতিহাসের অংশ হিসাবে দেখা...

তবে ইংরেজি লেখাগুলায় বহুত উল্টাসিধা আছে তথ্য বানান আর উচ্চারণের ঝামেলায়। তারা কৃষ্ণ আর কৃষ্ণা একই বানানে পড়তে আর লিখতে গিয়া মাঝে মাঝে দ্রৌপদী আর যাদব কৃষ্ণের মাঝে যেমন গুলাইয়া ফেলায় তেমনি ইংরেজি ওয়াই বর্ণ দিয়া যাদব বানানের লগে যবন বানান মিলাইয়া কইয়া দেয় হইলে হইতে পারে কৃষ্ণ মূলত যবন; মানে গ্রিক বংশজাত। আবার কেউ কেউ রামায়ণের কুম্ভকর্ণের লগে মহাভারতের কর্ণরে মিলাইয়া কিছু আজাইরা হাইপোথিসিসও খাড়া কইরা দেয়...

মহাভারত নিয়া বাংলায় কবিতা বেশুমার। নৃতাত্ত্বিক গবেষণাও বেশুমার। সেইগুলা পড়তে যারা আগ্রহী তারা আগ্রহমতে উঁকি দিয়া দেখতে পারেন...

মহাভারতের কৃষ্ণসহ বাকি নায়কদের নিয়া যেইখানে প্রচুর ধর্মকাহিনি আছে; সেইখানে মহাভারতের প্রতিনায়ক কর্ণ দুর্যোধন আর অন্যদের নিয়া আছে অসংখ্য নাটক আখ্যান আর উপন্যাস। সব থিকা বেশি নাটক আর সিনেমা হইছে কর্ণরে নিয়া। এইটার একটা অর্থ হইতে পারে যে ধার্মিকেরা যাগোরে ফালাইয়া দিছে পাপী কইয়া; সংস্কৃতিকর্মীরা তাগোরেই কুড়াইয়া নিছে মানবিক মানুষ কইয়া। তয় সব থাইকা বেশি ছোটদের কমিক বই কিন্তু আছে ভীমেরে নিয়া; ধর্মে-অধর্মে কামে-আকামে ভীমের থাইকা জনপ্রিয় বোধ হয় কোনো পৌরাণিক চরিত্র নাই...

মহাভারত নিয়া ইন্টারনেটনির্ভর তরুণগো কাজকর্ম বিস্ময়কর রকমের বিশাল। মহাভারতের চাইর-পাঁচটা সম্পূর্ণ বাংলা এবং ইংরেজি ভার্সন অন্তত এখন ইন্টারনেটে মাগনায় গুঁতা মারলে পাওয়া যায়; পিডিএফও আছে আবার টেক্সটও আছে। কেউ কেউ ছোট ছোট খণ্ডে নিজেদের ব্লগে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করে তার পছন্দমতো কোনো এক ভার্সন। এইটা মোটেই সোজা কাম না; কারণ মহাভারতের মানুষ জায়গা আর জিনিসপত্রের নামগুলা এতই অপ্রচলিত যে প্রতিটা বানান পুস্তক দেইখা দেইখা টাইপ কইরা তিন-চাইরবার প্রুফ না দেখলে ভুল হইবার ভয় নিরানব্বই ভাগ। অথচ ইন্টারনেটের ভার্সনগুলা ছাপা ভার্সন থাইকা বেশি নিখুঁত। এর বাইরে আছে মহাভারত-সম্পর্কিত লাখে লাখে তথ্য বিশ্লেষণ আর আলোচনা; যার পুরাটাই মহাভারত ভালো লাগা থাইকা এই যুগের তরুণগো বেগার খাটনির ফসল; বেশির ভাগ

ক্ষেত্রেই যারা নিজেদের নামটাও লুকাইয়া রাখে। এই তরুণগো লাইগা মহাভারতীয় কায়দায় আমার সাষ্টাঙ্গে প্রণাম। কারণ এদের অবদানগুলা সহজলভ্য না হইলে মহাভারত নিয়া অত প্যাঁচাল পাড়ার ক্ষমতা হইত না আমার...

তো এই বিষয়ে কতা শেষ করি রবীন্দ্রনাথের উপর কবিগিরি কইরা। তিনি মহাভারতরে কইছেন- ইহা কোনো ব্যক্তিবিশেষের রচিত ইতিহাস নয়; ইহা একটি জাতির স্বরচিত স্বাভাবিক ইতিহাস...

হ। কথা প্রায় সত্য। তয় ইহা একটি জাতির স্বরচিত স্বাভাবিক ইতিহাস নহে; ইহা বহু জাতির রচিত ঘাপলা ইতিহাস...

০৮

মহাভারতের কুরুযুদ্ধরে গীতার উৎপত্তিস্থল হিসাবে বিশ্বাস করা হয়। আত্মীয়স্বজন আর গুরুজনের বিপক্ষে অস্ত্র চালাইতে বিমুখ অর্জুনরে দায়িত্ব পালন আর কর্মফলের হিসাব-নিকাশ বুঝাইবার লাইগা কৃষ্ণ যে কথা যুক্তি আর উপদেশগুলা শোনান; দাবি করা হয় সেইগুলাই হইল গীতার মূলসূত্র। কিন্তু মূলত মহাভারতের লগে গীতার কোনো সম্পর্ক নাই। কুরুযুদ্ধ শেষে সম্রাট হইবার পর যুধিষ্ঠির কিন্তু কৃষ্ণরে খেদাইয়া দেয়। হস্তিনাপুর থাইকা নির্বাসিত হইবার পর বিষণ্ন কৃষ্ণের জীবনে সামরিক আর কূটনৈতিক অধ্যায় শেষ হইয়া শুরু হয় এক লোকজ-দার্শনিক অধ্যায়। সেই সময়েই উৎপত্তি হয় গীতার...

মহাভারত আছিল বৈদিক ঘরানার উপাখ্যান আর গীতা হইল বেদবিরোধী ঘরানার দর্শন। পরবর্তীকালে গীতাবাদী দর্শনরে ভিত্তি কইরা বৈষ্ণব ধর্ম তৈয়ারি হইবার পর সমস্ত বেদের বৈষ্ণবায়ন ঘটাইবার কালে মহাভারত এডিট কইরা গীতাখান ঢুকাইয়া দেওয়া হয় গীতা দর্শনের প্রধান প্রতিপক্ষ দ্বৈপায়নের রচনা মহাভারতের ভিতর...

গীতা আমি সম্পূর্ণ বাদ দিয়া গেছি আমার গল্প থাইকা...

আমি আমার গল্পটারে কইছি সম্পূর্ণ অলৌকিকত্ব বাদ দিয়া। রক্তমাংসের মানুষের গল্প। কৃষ্ণরে আবিষ্কার করতে চাইছি একজন কূটনীতিবিদ এবং যুদ্ধকলা বিশারদ হিসাবে। খণ্ড খণ্ড গোত্রপ্রধানগো শাসনের যুগে প্রথম সাম্রাজ্য চিন্তা আর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার নায়ক হিসাবেই কৃষ্ণ আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। একইসাথে দ্বারকায় রাজতন্ত্র উচ্ছেদ কইরা অভিজাততন্ত্র প্রতিষ্ঠায় তার এক্সপেরিমেন্টখানাও রাজনীতি বিদ্যার ইতিহাসে আমার লাইগা আকর্ষণীয়। ব্যস এই হইল আমার কৃষ্ণ; রক্তমাংসের এক বুদ্ধিমান মানুষ...

আমি ইতিহাস আর নৃতত্ত্বের বইগুলা ঘাঁইটা চেষ্টা করছি রক্তমাংসের ঘটনাগুলারে বাইর কইরা আনার। যেইখানে বইপুস্তক থাইকা নৃতাত্ত্বিক কিংবা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাই নাই সেইখানে নিজেই কিছু লৌকিক ব্যাখ্যা দাঁড় করাইছি নিজের মতো করে; মানে নিজেই মহাভারতের একজন কবি হইয়া গেছি আরকি...

০৯

যত দিন ধইরাই লেখা হউক আর যত মাইনসেই কাহিনি যোগ করুক না ক্যান; মহাভারতের কাহিনিখান এখনো প্রচারিত আছে একক মানুষ বেদব্যাস কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের নামে; এবং মহাভারতের প্রধানতম ভজঘট হইলেন স্বয়ং এই বেদব্যাস কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন। তো এই কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের একখান কাব্যিক বর্ণনা দিছেন রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায় তার অন্নদামঙ্গলের পাতায়:

“দাঁড়াইলে জটাভার

চরণে লুটায় তাঁর

কক্ষলোমে আচ্ছাদয়ে হাঁটু

পাকা গোপ পাকা দাড়ি

পায়ে পড়ে দিলে ছাড়ি

চলেন কতক আঁটুবাঁটু”

কক্ষলোম মানে হইল বগলের লোম। বগলের লোমে নাকি দ্বৈপায়নের হাঁটুগুলাও ঢাইকা গেছিল। বুইঝেন কিন্তু; স্বভাব কবিরা স্বাধীনতা পাইলে পদ্য মিলাইবার লাইগা কত দূর পর্যন্ত যাইতে পারে। মাইনসের বগলের লোমে নাকি হাঁটু পর্যন্ত ঢাইকা যায়...

তো এমন মইনসের চুল আর দাড়িগোঁফ দিয়া যে রাস্তা মাপার সার্ভেয়ারগো গজফিতা বানানো যাইব সেইটা তো স্বাভাবিক কথা। এইখানে কিন্তু যুক্তি; বিজ্ঞান; আর ইতিহাস পুরা অচল। মহাকবি নামে পরিচিত কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন নিজেই হাজার বছর ধইরা শত শত কবির রচনায় স্বয়ং একখান মহাকাব্যে পরিণত হইছেন। তার জীবনী পড়লে মনে হইব চুলদাড়ি জটাজুট নিয়া তিনি যেই জন্মাইছিলেন তারপর খালি হাঁটতেই আছেন তো হাঁটতেই আছেন। হাঁটতে হাঁটতে তিনি বেদমন্ত্রগুলারে চাইরভাগে ভাগ করেন; রচনা করেন বেদের ব্যাখ্যা বেদান্ত; রচনা করেন আঠারোখান পুরাণ আর আঠারোখান উপপুরাণ এবং সর্বশেষ রচনা করেন একখান মহাভারত। মোট আটত্রিশখান গ্রন্থ প্রচলিত আছে তার নামে; যদিও হিসাবে নিকাশে গবেষণায় তার নামে প্রচলিত সব কর্ম নিয়াই আছে লাখে লাখে প্রশ্ন; যার মইদ্যে প্রধানতম প্রশ্ন হইল তার নামে প্রচলিত বেশির ভাগ পুস্তকই স্বাভাবিক নিয়মে তিনি মইরা যাইবার পরের রচনা...

মাইমল কন্যা সত্যবতীর গর্ভে ব্রাহ্মণ পরাশরের ঔরসে জন্ম নেওয়া এই দ্বৈপায়ন শুকদেব ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু ও বিদুরের পিতা আর মহাভারত-কাহিনির একখান চরিত্র...

কালা রঙের কারণে কৃষ্ণ আর দ্বীপ বা চরে জন্ম নিবার কারণে দ্বৈপায়নের পাশাপাশি মুখে মুখে আউলাঝাউলা হইয়া ছড়ানো বেদমন্ত্রগুলারে তিনি বিষয়ভিত্তিক চাইরভাগে ভাগ করেন বইলা তার সম্মানজনক নাম বেদব্যাস মানে বেদের ভাগকর্তা। বেদের পাঠ যাতে নির্ভুল হয় সেজন্য তিনি বেদরে ভাগবাঁটোয়ারা করার পর চাইর শিষ্য; পৈল বৈশম্পায়ন সুমন্ত আর জৈমিনি; প্রত্যেকরে একখণ্ড কইরা আর পুত্র শুকদেবেরে মুখস্থ করাইছিলেন একসাথে চাইর খণ্ড বেদ; যাতে শুকদেবের পাঠের লগে অন্যগো পাঠ মিলাইয়া সঠিক

পাঠখান পাওয়া যায়। নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী আরেক ধাপ আগাইয়া গিয়া কন- দীর্ঘ দিন থাইকা শূদ্র আর নারীগো বেদপাঠ বিষয়ে যে নিষেধাজ্ঞা আছিল তা তিনি উঠাইয়া দিয়া সকলের লাইগা বেদ উন্মুক্তও কইরা দেন। দ্বৈপায়ন সম্পর্কে তার আরো তিনটা আবিষ্কার দারুণ। তিনি কন দুনিয়াতে প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে দ্বৈপায়নই প্রথম উদ্যোক্তা; এক জায়গায় বেশি দিন থাকলে বনের ক্ষতি হয় এবং বনের পশুপাখি ধ্বংস হয় বইলা বনবাসকালে তিনি পাণ্ডবগো ঘন ঘন বন বদলাইতে পরামর্শ দিছেন; দ্বিতীয়ত দুনিয়াতে তিনিই পয়লা যুদ্ধকালীন নিয়মকানুন নির্ধারণ করেন। আর দুনিয়াতে যুদ্ধ সাংবাদিকতা এবং যুদ্ধক্ষেত্রে সাংবাদিকের অবাধ অধিকার তিনিই পয়লা চালু করেন। সেই হিসাবে সঞ্জয় হইল দুনিয়ার পয়লা প্রোফেশনাল সাংবাদিক...

তো এই দ্বৈপায়ন ব্যাসরে তার মা সত্যবতী ডাইকা আনছিলেন মৃত সৎ ভাই বিচিত্রবীর্যের বৌদের গর্ভে সন্তান জন্ম দিতে। মায়ের বিবাহ রাজবাড়িতে হইলেও মা না ডাকা পর্যন্ত জীবনেও তিনি রাজবাড়ি আসেন নাই। মহাভারতের শেষ দিকে ভীষ্মের বয়ানে তখনকার যে সংস্কৃতি পাওয়া যায় সেই সূত্রে তিনি মায়ের বিবাহকারণে মায়ের স্বামী রাজা শান্তনুর পোলা আর উত্তরাধিকার হইবার কথা। কিন্তু নিজে তিনি ঋষি মানুষ; নিয়ম মানেন না বরং নিয়ম বানান। তাই মায়ের বিবাহ রাজা শান্তনুর লগে হইলেও তিনি যেমন রাজবাড়িতে যান না; তেমনি নিজেরেও পরিচয় দেন না শান্তনুপুত্র কিংবা শান্তনুর উত্তরাধিকার হিসাবে; বরং নিজেরে তিনি পরিচয় করান মুনি পরাশরের সন্তান কইয়া...

পয়লা দিকে হরিভক্ত এবং শেষ দিকে হরভক্ত এই ঋষি টোল চালাইয়া বইপুস্তক লেইখা ঘুইরা বেড়াইবার পরেও আছিলেন বহুত সংসারী মানুষ। জঙ্গল জীবনেই টেম্পোরারি বৌ ঘৃতাচীর গর্ভে তার আছিল এক পোলা; শুকদেব। যিনি পরে হইয়া উঠেন চতুর্বেদী ঋষি। কিন্তু এই শুকদেব যখন সন্ন্যাসী হইয়া গেলো; কাব্যমতে বৃদ্ধ বাপের কান্দনে জঙ্গলের গাছ কাঁইপা উঠলেও শুকদেব ফিরল না; তখন অন্যের খোপে পাইড়া যাওয়া ডিম ফুইটা যে তিনটা বাচ্চা হইছিল তার; তাগো কাছেই বিনা নিমন্ত্রণে বারবার ছুইটা আসছেন ব্যাস দ্বৈপায়ন। বড়ো পোলা ধৃতরাষ্ট্রটা আন্ধা আর লোভী; মাঝে মাঝেই মহাভারতে দেখি পোলারে আইসা বোঝান পিতা দ্বৈপায়ন। মাইজা

পোলা পাণ্ডুটা অসুস্থ আর আঁটকুড়া; কিন্তু ক্ষেত্রজের যুগে যখন নির্বাসনে যুধিষ্ঠির জন্মাইল পুত্রবধূ কুন্তীর গর্ভে; রাজবাড়িতে পরবর্তী উত্তরাধিকার জন্মাইবার সংবাদটাও পৌঁছাইয়া দিলেন দ্বৈপায়ন; যাতে তখনো অপুত্রক ধৃতরাষ্ট্র পরে কোনো বাগড়া না দেয় পোলাপাইনগো মাঝে যুধিষ্ঠিরের বড়োত্ব নিয়া। গান্ধারীর গর্ভসংকট? সেইখানেও দ্বৈপায়ন...

পাণ্ডু অকালে মইরা গেলেও রাজবাড়িতে তার পাঁচ পোলা নিশ্চিন্ত আছিল ভীষ্মের ছায়ায়। কিন্তু যখন জতুগৃহ পুড়াইয়া তারা পলাইল? তখন এই পাঁচ নাতির আক্ষরিক অর্থেই অভিভাবক আবার দ্বৈপায়ন। বুদ্ধি দেওয়া; নিজে হাত ধইরা ছদ্মবেশ পরাইয়া নিজের শিষ্যের বাড়িতে রাখা আর নিজে পুরোহিত হইয়া পাঁচ নাতিরে দ্রুপদের মাইয়ার লগে বিবাহ দিয়া আবারো শক্তিশালী করা...

তার ছোট পোলা বিদুর; বিচিত্রবীর্যের দাসীর গর্ভে জন্মাইছিল বইলা রাজ বংশে উত্তরাধিকার পায় নাই। কিন্তু তিনি যেমন বিদুরের মায়ের দাসত্ব মুক্ত কইরা দেন তেমনি ধৃতরাষ্ট্র আর পাণ্ডুর ক্ষেত্রে যেখানে কন তারা অম্বিকা আর অম্বালিকার পোলা; সেইখানে বিদুরের ক্ষেত্রে কন- আমার সন্তান। আবার পুত্রহীন বিদুর মরার কালে তার শেষকৃত্যের লাইগা সম্রাটরেও মনে করাইয়া দেন- তুমি কিন্তু বিদুরেরই অংশ যুধিষ্ঠির...

সবখানেই মহাভারতের লেখক দ্বৈপায়ন মহাভারতের সক্রিয় চরিত্র হইয়া মারাত্মক প্রকট; এমনকি কুরুযুদ্ধেও দেখি তিনি ঋষির গাম্ভীর্য নিয়া খাড়াইয়া দেখতে আছেন নিজের বংশনাশ...

কাব্যকাহিনি মতে ইনি নিজে কলম দিয়া লিখতেন না। লেখাইতেন গণেশরে দিয়া। কিন্তু নৃতত্ত্বমতে আর্যঘরানার মানুষগুলা আছিল আকাট নিরক্ষর; লেখাপড়া জানতই না তারা। লেখাপড়া জানত এই অঞ্চলের আদিবাসী মানুষ; মানে খ্রিস্টপূর্ব ২৮০০ থাইকা খ্রিস্টপূর্ব ১৭০০ পর্যন্ত চলা সিন্ধু সভ্যতার মানুষ; যার মইদ্যে আছিল বিনায়ক বা গণেশ; যাগোরে আর্যঘরানার প্রাচীন সাহিত্যে রাক্ষস আর সিদ্ধিনাশক কইয়া বহুত গালাগালি করা হইছে। গণেশ নাকি তাগো সব সিদ্ধি নাশ কইরা দিত। কিন্তু বচ্ছরের পর বচ্ছর মাইনসের মুখে মুখে ঘুইরা যখন মহাভারত পাল্টাইয়া যাইতে শুরু করল; তখন তারা

ভাইবা দেখল যে এইটারে লেইখা বান্ধাইয়া না থুইলে মাইনসে নতুন নতুন ভার্সন বানাইতেই থাকব দিনের পর দিন। আর সেই উদ্দেশ্যে তারা গিয়া গণেশরে শুরু করে তেলানি- মোগো পুস্তকখান লেইখা দেও মাস্টর...

কিন্তু গণেশ মাস্টার কি আর সহজে রাজি হয়? রাজি হয় না সে। তারপর আর্যরা তারে লোভায়- সিদ্ধিনাশক থাইকা তোমারে সিদ্ধিদাতার পদে প্রমোশন দিমু মাস্টর; পুস্তকে তোমারে সম্ভ্রান্ত বংশজাত দেবতা কইয়া নমো নমো কইরা সকল দেবতার আগে করব তোমার পূজা...

বহুত তেলানোয় গণেশ রাজি হয় আর আমরা বিশ্বাসী মহাভারতে দেখি দ্বৈপায়ন মুখে মুখে শোলক বইলা যাইতাছেন আর শিবনন্দন গণেশ তা লিখতাছেন একটার পর একটা; যদিও গণেশের নামে যত কাহিনি আছে তার অর্ধেক কাহিনিতেও শিব-পার্বতীর লগে গণেশের কোনো সম্পর্ক নাই...

এইখানে একটা কথা কইয়া যাওয়া দরকার; তা হইল আর্য কিন্তু কোনো জাতি আছিল না; আছিল একটা ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ। এই আর্যগোষ্ঠীর মইদ্যে বহুজাতির মানুষ যেমনি আছিল তেমনি অসুর নামে পরিচিতরাও কিন্তু আর্য। শুরুতে বোধ হয় দেবতা আর অসুরে কোনো ফারাকও আছিল না। প্রাচীন সাহিত্যে প্রায় সব দেবতারেই যেমন কোনো না কোনো সময় অসুর কওয়া হইছে তেমনি অন্যদেরও কওয়া হইছে আর্য...

যাই হউক; কম্মজীবনে দ্বৈপায়ন বেদ বিভাগকর্তার পাশাপাশি বেদান্ত; আঠারো পুরাণ এবং আঠারো উপপুরাণের রচনাকার; এই বিষয়ে আগেই বহুত প্যাঁচাল পাইড়া আসছি। সেইগুলা আমার বিষয়ও না। কিন্তু আমার হিসাবে কয় মহাভারত গ্রন্থখানও সত্যবতীপুত্র এবং শুকদেব ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু বিদুরের পিতা বেদব্যাস কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের লেখা না। এইটা হইতেই পারে না। হইতে পারে এইটা বেদব্যাস কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের মা এবং তার বংশের কাহিনি কিন্তু কোনোভাবেই তার লেখা না। কারণ মহাভারতমতে ব্যাস জীবিত আছিলেন জন্মেজয়ের সময়। জন্মেজয়ের লাইগাই তিনি স্লিম সাইজের ‘জয়’ নামে মহাভারতের আদিপুস্তক রচনা কইরা শিষ্য বৈশম্পায়নরে পাঠান জন্মেজয়রে তা শুনাইয়া আসতে। জন্মেজয় হইল দ্বৈপায়নের নাতির নাতি পরীক্ষিতের পোলা। তো জন্মেজয়ের সময় পর্যন্ত কর্মক্ষম অবস্থায় বাঁচতে

হইলে দ্বৈপায়নের কর্মজীবী বয়স হইতে হয় কমপক্ষে দেড়শো বছরের বেশি। এইরকম দীর্ঘ কর্মজীবী বয়স তখনই সম্ভব যখন বহুত প্রজন্ম মানুষের কাহিনি এক মানুষের নামে চালাইয়া দেওয়া হয়; অথবা এক মানুষের জীবনী কয়েকশো প্রজন্মের মানুষ লেখে; অথবা বয়সটা যখন ধর্মবিশ্বাস দিয়া মাপা হয়; অথবা যখন মাইনসের বয়স গুনার দায়িত্বখান কবিদের হাতে পড়ে তখন। কিন্তু ইতিহাস আর বিজ্ঞানমতে মানুষ বর্তমানে যতটা দীর্ঘজীবী; ইতিহাসের কোনো কালেই তার থিকা বেশি আছিল না কোনো দিন; বরং বহুত সংক্ষিপ্ত আছিল পুরানা মানুষের জীবনী আর সক্ষমতার কাল...

এই ক্ষেত্রে মহাভারতের বয়ানকার সৌতির কথাখান ধরলে কিছু ভরসা পাওয়া যায়- কয়েকজন কবি এই ইতিহাস পূর্বে বলে গেছেন...। শুধু দরকার তার বাক্যের দুইটা শব্দ ‘ব্যাসপ্রোক্ত মহাভারতকথা’ কথাটারে বদলাইয়া যদি কওয়া হয় ‘ব্যাসের জীবনী মহাভারত কথা’ তাইলেই ধইরা নেওয়া যায় ব্যাসের বংশে ঘটা ঘটনা আগেও বহু কবি বইলা গেছেন; যা জন্মেজয় শুনছেন অন্য কোনো ব্যাসের কাছে আর শুনছেন সৌতিও...

সুকুমারী ভট্টাচার্যের হিসাবে বেদ এবং পুরাণের লগে বেদব্যাস দ্বৈপায়নের কোনো সম্পর্ক থাকারই কথা না...

দ্বৈপায়নের নামে যতগুলা রচনা প্রচলিত আছে সেইগুলার তালিকা দিয়া সুকুমারী ভট্টাচার্য কন; একজন মানুষরে এই সবগুলা পুস্তক রচনার কাম করতে হয়; তাইলে তার বাইচা থাকতে হবে কমপক্ষে আড়াই হাজার বছর। তাই ব্যাস মূলত একখান ‘সংজ্ঞা মাত্র’ কইয়া দ্বৈপায়ন সম্পর্কে ভারতীয় পুরাণের সবথিকা গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতিটা তিনি তুইলা ধরেন- ‘ব্যাসের মৃত্যুর কথা শাস্ত্রে লেখে না...

১০

কুরুযুদ্ধখান পুরাটাই রিটায়ার যাইবার বয়সী বুইড়াদের যুদ্ধ। কুরুযুদ্ধের সময় অত কারিশমার মহানায়ক অর্জুনের বয়স গল্পের খাতিরে মেকাপ-গেটাপ দিয়া কমাইতে কমাইতেও ৫৭ বছরের থাইকা কমানো সম্ভব হয় নাই আমার;

যেইটা আবার একটু মেকাপ উঠাইয়া দিলে গিয়া খাড়ায় ৮০'র উপরে। অর্জুন থাইকা ভীম এক বছরে বড়ো; তার থিকা এক বছরে বড়ো যুধিষ্ঠির আর অর্জুনের এক বছর কইরা ছোট হইল যমজ নকুল সহদেব। কর্ণ যুধিষ্ঠির থাইকা কমপক্ষে চাইর বছর বড়ো; দুর্যোধন ভীমের সমবয়সী এবং কৃষ্ণের বয়স অর্জুন আর ভীমের মাঝামাঝি; কয়েক মাস এদিক-সেদিক...

কুরুযুদ্ধের সময় যাতে অন্তত অর্জুনের গায়ে তির-ধনুক চালাইবার তাকত রাখা যায় তার লাইগা আমি যুদ্ধের সময় ৫৭ বছর হিসাব ধইরা আগাইছি। কিন্তু তাতে আবার ঝামেলা বাঁইধা গেছে অন্যখানে। এই হিসাবে আগাইলে স্বয়ংবরার সময় দ্রৌপদীর বয়স গিয়া খাড়ায় মাত্র ৪ বচ্ছর; বুইঝেন কিন্তু। ...তো কেমনে আমি কুরুযুদ্ধে তিরাতিরির লাইগা অর্জুনের বয়স ৫৭-তে আটকাইয়া দিছি এইবার সেই হিসাবটা কই...

মহাভারতমতে পাণ্ডু মরার পর পোলাগো নিয়া কুন্তী যখন হস্তিনাপুর আইসা খাড়ায় তখন যুধিষ্ঠিরের বয়স ১৬। তারপরে মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের বয়স পাই যখন যুবরাজ হিসাবে তার অভিষেক হয় তখন সে ২৪। এক বচ্ছর যুবরাজগিরি কইরা বারণাবতে যাইবার সময় তার বয়স খাড়ায় ২৫। সময় উল্লেখ না থাকলেও বারণাবতে তারা কিন্তু বহু দিন বসবাস করে। ধরি কমপক্ষে ১ বছর। সেই হিসাবে জতুগৃহ পুড়াইয়া পাণ্ডবরা যখন হিড়িম্বের দেশে আসে তখন যুধিষ্ঠির ২৬। এইখানে হিড়িম্বার লগে ভীমের বিবাহ আর পোলা ঘটোৎকচের জন্ম হয়। এইখানে আড়েগড়ে আরো ১ বছর ধরলে জ্যাঠা যুধিষ্ঠির গিয়া খাড়ায় ২৭...

ঘটার জন্মের পর কুন্তী তার পোলাগো নিয়া মৎস্য কীচক ত্রিগর্ত আর পাঞ্চাল দেশ ঘুইরা একচক্রা নগরে আইসা বসবাস করে। ভীমেরে বক রাক্ষস মারতে পাঠাইবার আগে কুন্তী জানায় বহুকাল তারা এইখানে বসবাস করছে। বহুকাল মানে কতকাল জানি না কিন্তু বারণাবত থাইকা পাঞ্চালীর স্বয়ংবরা পর্যন্ত কমপক্ষে এক বছর ধরাই লাগে। কারণ মৎস্য দেশ মানে রাজস্থানের জয়পুর আর ড. অতুল সুর কন একচক্রা হইল বীরভূম। এই দীর্ঘ মানচিত্র হাঁটাহাঁটি কইরা পার হইতে ঘোড়ারও তো কমপক্ষে এক বচ্ছর লাগার কথা। তো যাই হোক; নায়কগো বয়স যখন কমাইতে বসছি তখন কমাইয়াই তারে ধরলাম

এক বচ্ছর। তার মানে দ্রৌপদীর স্বয়ংবরার সময় যুধিষ্ঠিরের বয়স ২৮ আর অর্জুনের বয়স ২৬। এই পর্যন্ত নায়কেরা তরতাজাই আছে। তো আসেন এইবার বসি দ্রুপদের মাইয়া দ্রৌপদীর কুষ্ঠী গনায়...

দ্রুপদ মিয়া মাইয়ার বাপ হইল কবে? মহাভারত কয় দ্রুপদের মাইয়া হইছে কুরু পাণ্ডবের হাতে তার পরাজয় আর অর্ধেক রাজ্য হারাইবার পর। সেই ঘটনা ঘটে যুধিষ্ঠির যুবরাজ হইবার এক বছর আগে; মানে যুধিষ্ঠির তখন ২৩ আর অর্জুন ২১। তার এক বছর পর যখন অর্জুনের বয়স ২২ তখন ধৃষ্টদ্যুম্নের লগে যমজ হিসাবে জন্মায় দ্রুপদের মাইয়া দ্রৌপদী। এই হিসাবে দ্রৌপদী অর্জুন থাইকা কমপক্ষে ২২ বছরের ছোট আর বিয়ার সময় ৪ বছরের শিশু...

কিন্তু মহাভারতে কোথাও স্বয়ংবরার সময় দ্রৌপদীরে শিশু হিসাবে পাওয়া যায় নাই; তারে তরুণী যুবতিই কওয়া হইছে। অবশ্য সেই যুগে পিরিয়ড শুরু হইলেই মাইয়াগো যুবতি বইলা ধরা হইত। সেই হিসাবে স্বয়ংবরার সময় দ্রৌপদীর কমপক্ষে ১১-১২ বছর বয়স হইতেই হয়। আবার নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী বাপের বাড়িতে দ্রৌপদীর যে বিদ্যাশিক্ষার ব্যাপ্তি আর বিবরণ দিছেন তাতে তার বয়স আরো বাইড়া কমপক্ষে গিয়া খাড়ায় ১৬-১৭। কিন্তু দ্রৌপদীর বয়স বাড়াইলে তো অর্জুনেরও বয়স বাড়ে। স্বয়ংবরায় দ্রৌপদীর বয়স ১১ ধরলে অর্জুনের হয় ৩৩ আর কুরুযুদ্ধের সময় গিয়া খাড়ায় ৬৪; মানে লাঠি ভর দিয়া হাঁটার বয়স। আর বিয়ার সময় দ্রৌপদীর বয়স আরো বাড়াইলে অর্জুনের বয়স কই গিয়া খাড়ায় তা নিজেরা হিসাব কইরা দেখেন..

স্বয়ংবরায় দ্রৌপদীরে যুবতি ধইরা নিতে হইলে পাণ্ডবগো বয়স আরো বাড়াইতে হয়; না হয় ধইরা নিতে হয় কুরু-পাণ্ডবগো হাতে রাজ্য হারাইয়া দ্রুপদের যজ্ঞমজ্ঞের ঘটনা হইল ভুয়া জোড়াতালি। মূলত দ্রুপদ যখন কুরু-পাণ্ডবগো হাতে ধরা খায় তখনো তার পোলা-মাইয়া বেশ বড়োসড়ো আছিল। কেউ কেউ কন কুরুযুদ্ধে ব্রাহ্মণ দ্রোণের মরা জায়েজ করার লাইগা পরবর্তীতে ধাম্মিকেরা দ্রুপদরে দিয়া যজ্ঞমজ্ঞ করাইছেন; যাতে তার পোলা ধৃষ্টদ্যুম্নের হাতে দ্রোণ মরায় পাণ্ডবরা যেমন কোনো ব্রহ্মহত্যার পাপে পাপিষ্ঠ না হয়; তেমনি পরবর্তীতেও কেউ যেন বামুনের দিকে অস্ত্র তোলার সাহস না করে। কারণ মহাভারতসূত্রমতে ব্রাহ্মণ হত্যা মানে পুরা গোষ্ঠীর নরকযাত্রা; একমাত্র

দ্রুপদের পোলা ধৃষ্টদ্যুম্ন ব্যতিক্রম; কারণ যজ্ঞ থাইকা সে ব্রাহ্মণ মারার অনুমতিপত্র নিয়া জন্মাইছে। তবে নকুল সহদেবের লগে দ্রৌপদী যেভাবে মায়ের মতো আচরণ করে; যেভাবে অর্জুন আর কৃষ্ণের লগে সমবয়সীর মতো বইসা আড্ডাটাড্ডা মারে আর দ্রৌপদীর যমজ ভাই ধৃষ্টদ্যুম্ন যেভাবে ভীমেরে পর্যন্ত নাম ধইরা তুমিতামি কইরা কথাবার্তা কয় তাতে মনে হয় দ্রৌপদী বরং অর্জুনের থাইকা বয়সে বড়োই...

এইবার আগাই কুরুযুদ্ধকালে পাণ্ডবগো বয়সের দিকে। বিয়ার কমপক্ষে ১ বছর পর যুধিষ্ঠির রাজা হয় ২৯ বছর বয়সে। তারপর ১৬ বছর রাজাগিরি কইরা শকুনির লগে পাশা খেইলা যখন নেংটি পর্যন্ত হারায় তখন তার বয়স ৪৫। তারপরে ১২ বছর বনবাস ১ বছর অজ্ঞাত বাস আর ১ বচ্ছর যুদ্ধের প্রস্তুতি। কয় বছর হইল? যুধিষ্ঠির ৫৯ আর অর্জুন ৫৭...

বয়স নিয়া আর বেশি কথা কমু না। তয় খালি কইয়া দেই যে অর্জুনের বয়স বাড়লে কিন্তু কর্ণের বাড়ে কমপক্ষে ৬ বছর; অশ্বত্থামার বাড়ে ৮-১০ বছর; অশ্বত্থামার বাপ দ্রোণেরও বাড়ে; আর সবচে বেশি বাড়ে সর্বপ্রধান মহানায়ক ভীষ্মের বয়স। ভীষ্ম হইলেন অর্জুনরে বাপ পাণ্ডুর বাপ বিচিত্রবীর্য থাইকা কমপক্ষে ৩০ বছরের বড়ো; দ্বৈপায়নের মা সত্যবতীর বয়সের কাছাকাছি; সেই হিসাবে কুরুযুদ্ধের সময় ইনার বয়স ব্যাটারি খুইলাও ক্যালকুলেটারে তিন ডিজিটের নীচে আনা অসম্ভব...

১১

কুরুযুদ্ধের একটা বিশাল অংশ জুইড়া আছে লোহার অস্ত্রপাতি; অথচ মহাভারতের ঘটনার সময় পর্যন্ত দুনিয়াতে লোহাই আবিষ্কার হয় নাই। অবশ্য তামা আবিষ্কার হইছে আরো বহু আগে; খ্রিস্টপূর্ব সাড়ে চাইর হাজার বছরে। ড. অতুল সুর কন তখনকার দিনে বর্তমান বাংলা অঞ্চলে আছিল তামার খনি আর ব্যাপারীরা সেই সব খনিজ দ্রব্য আর সামগ্রী চালান দিত সিন্ধু সভ্যতায়। আর্যগোষ্ঠী সিন্ধুসভ্যতা তছনছ কইরা দিলেও হইলে হইতে পারে তামার যাতায়াত বাংলা থাইকা তখনো কুরুক্ষেত্র অঞ্চলে আছিল। কিন্তু মহাভারতের কোনো অস্ত্রপাতিতে তামার উল্লেখ নাই। মহাভারতে একবার তামার কথা

আছে দ্রৌপদীর এক হাঁড়ির বেলায়; যা তারে পুরোহিত ধৌম্য দিছিলেন। ঘটোৎকচের বেলায় কওয়া হইছে সে পরতো কাঁসার বর্ম আর অনুমান করা যায় কর্ণের অভেদ্য বর্মখানও আছিল তামার তৈয়ারি। কারণ দ্রৌপদীর হাঁড়ি আর কর্ণের বর্ম; দুইটার বেলাতেই সূর্যের একটা কইরা কাহিনি যুক্ত আছে। হইলে হইতে পারে মাটির বাসনের যুগে তামার একমাত্র হাঁড়িতে সূর্যের আলো পইড়া ঝিকমিক করত বইলা এর নাম সূর্যদত্ত হাঁড়ি আর পশুর চামড়া-টামড়া দিয়া বর্ম বান্ধনের যুগে কর্ণের তামার বর্মেও রোদ পইড়া ঝকমক করত দেইখা তারে কওয়া হইত সূর্যপ্রদত্ত বর্ম। তামার অস্ত্র না থাকলে পুরা মহাভারতে আর কোনো ধাতুর অস্ত্র থাকবার কথাও না। হিসাব মতে ওই সময়ে সব লড়াই আছিল হাতে গদায় লাঠিতে বর্শায়। এমনকি তিরের বিষয়েও অনেকে সন্দেহ করেন। কিন্তু তির বাদ দিয়া মহাভারত কেমনে কয়?

হড় কিংবা সাঁওতাল জাতিতে তিরের ব্যবহার অন্য বহুত জাতির থাইকা আগে। ড. অতুল সুর পাঞ্চাল রাজ্যের বর্ণনা দিতে গিয়া কন এইটা বর্তমান বীরভূম জেলা আর সাঁওতাল পরগনার কাছাকাছি; এই পাঞ্চাল এলাকাটাই দ্রোণের জন্মস্থান। হইলে হইতে পারে আদিবাসীগো কাছ থিকা শিখে দ্রোণই তির-ধনুক রপ্তানি করছেন হস্তিনাপুরে তার শিষ্যগো মাঝে। পঞ্চমবর্ণের নিষাদেরা তির চালাইতে জানত না দেইখা নিষাদপুত্র একলব্য লুকাইয়া লুকাইয়া দূর থাইকা দ্রোণের তিরাতিরি দেইখা তির-ধনুক চালানো শিখে। অন্য কোথাও তির শিক্ষার ব্যবস্থা থাকলে নিশ্চয়ই এতটা কষ্ট করত না সে...

মহাভারতে প্রথম জেনারেশনে যত তিরন্দাজ দেখি তারা কোনো না কোনোভাবে দ্রোণের শিষ্য; অর্জুন কর্ণ সাত্যকি জয়দ্রথ অশ্বত্থামা ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী সবাই। কিন্তু এইখানে প্রশ্ন আইসা যায় তাইলে ভীষ্ম কেমনে তির চালান? তিনি তো আর দ্রোণের শিষ্য না। আমার উত্তর হইল ভীষ্ম মানুষ আছিলেন নাকি সেনাপতি পদের নাম আছিল ভীষ্ম সেইটা কেউ খুঁইজা দিতে পারলে কুরুযুদ্ধের সময় তার তিন ডিজিট বয়সী হাতে খালি তির কেন; আমি কামানও ধরাইয়া দিতে পারি। দেবতাগো রাজার পদের নাম যেমন আছিল ইন্দ্র; আমার ধারণা কৌরবগো প্রধান সেনাপতি পদের নামও তেমনি আছিল ভীষ্ম; মানে ভীষণ; মানে জাঁদরেল; মানে জেনারেল; মানে কমান্ডার...

কর্ণ তিরাতিরি লাইগা বিখ্যাত হইলেও সে কিন্তু অন্য ধরনের হাতিয়ার অস্ত্রই বেশি চালায়; বর্শা ভল্ল খড়গ গদা আর ভার্গবাস্ত্র। ভার্গবাস্ত্র মানে ভৃগু বংশজাত পরশুরামের কাছ থিকা পাওয়া অস্ত্র। সোজা বাংলায় কুড়াল। কুড়াল বাদ দিয়া বাকিসব অস্ত্রগুলা ভীমেও চালায়। কর্ণের মল্লযুদ্ধের কাহিনিও পাওয়া যায় জরাসন্ধের লগে...

আমি যদি কই যে তখন তির-ধনুকের প্রচলনই হয় নাই তয় পাব্লিকে আমারে কিলাইব। কারণ তাইলে দুই মহানায়ক কর্ণ আর অর্জুনরে কুরুযুদ্ধের সাইড লাইনে বসাইয়া আঙ্গুল চুষাইতে হইব যুদ্ধের আঠারো দিন। কিন্তু তারপরেও কই; তির-ধনুকের যুদ্ধে অত আজাইরা কথাবার্তা কওয়ার সুযোগ কই? যেমনে তারা গালাগালি দিয়া লড়াই শুরু করে; নিজের লম্বা পরিচয় দেয়; আবার পেন্নাম-টেন্নামও করে; তির-ধনুকের নাগালের বাইরে অত দূর থাইকা অত খাজুইরা আলাপ যেমন সম্ভব না; তেমনি তিরাতিরি হইব কিন্তু একটা পাব্লিকেরও চোখে তির গাঁথব না এইটা কীভাবে সম্ভব? কুরুযুদ্ধে তির খাইয়া কিন্তু কারো চোখ নষ্ট হইবার কোনো কাহিনি নাই; অথচ ধুলাবালি থাইকা বেশি ছুটানো হইছে তির...

কৃষ্ণের চক্রখানের হিসাব মিলাইতে পারি নাই। সুবর্ণচক্রের বাইরেও কৃষ্ণ একবার যেমন রথের চাকা খুইলা ভীষ্মরে দাবড়ানি দেয়; ঠিক একইভাবে তার শিষ্য আর ভাগিনা অভিমন্যুও কিন্তু রথের চাকা নিয়া কৌরবগো দাবড়ায়। এতে কৃষ্ণ ঘরানায় চাকাজাতীয় অস্ত্রে সাবলীলতা বোঝা যায়। কিন্তু সুবর্ণচক্রখান এক্কেবারে চাকতি জাতীয় কিছু হইলে খুব ভালো অস্ত্র হইবার কথা না জুইতমতো ধরার জায়গার অভাবে। চক্রখান কিন্তু সে ছুঁইড়া শত্রুরে আঘাত করে...

আইচ্ছা কৃষ্ণের চক্র কি বুমেরাং-জাতীয় কিছু? যা চক্কর দিয়া মাইরা আবার চক্কর দিয়া ফিরা আসে দেইখা চক্র? নাকি আইজ পর্যন্ত শিখগো মাঝে প্রচলিত চক্রমই হইল কৃষ্ণের চক্র?

কৃষ্ণের চক্র যদি শিখগো চক্রম এর মতো কিছু হইয়া থাকে তবে সেইটা দিয়া শিশুপালের মাথা কাটা সম্ভব হইলেও যুদ্ধের মাঠে সেইটা দিয়া খুব বেশি সুবিধা আদায় করা আদৌ সম্ভব কি না সন্দেহের বিষয়...

অবশ্য কৃষ্ণর কি আদৌ অস্ত্র হাতে সামনা সামনি যুদ্ধ করার কোনো ইতিহাস আছে? আমার তো মনে হয় না...

১২

মহাভারতমতে যাদব আর পাণ্ডব বংশ দুইটা শুরু হইছে ভৃগুমুনির পুত্র শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানী এবং তার সতিন; রাজা বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠার গর্ভ থাইকা রাজা যযাতির ঔরসে। দেবযানী গর্ভজাত রাজা যযাতির বড়ো পোলা যদু থাইকা যাদব বংশ যার শেষ মাথায় পাই কৃষ্ণরে। শর্মিষ্ঠাগর্ভজাত যযাতির ছোট পোলা পুরু থাইকা পয়লা পুরু বংশ তার পর কুরু বংশ তারপর পাণ্ডব বংশ; যার শেষ মাথায় পাই পঞ্চপাণ্ডব। তো শর্মিষ্ঠার পোলা পুরু থাইকা আগাইলে দেখা যায় যে ২৪ নম্বর প্রজন্মে আছে যুধিষ্ঠির; যা ভৃগু থাইকা গুনলে হয় ২৬...

অন্য দিকে ঋষি অঙ্গিরার বংশধররাও মহাভারতে আছেন। যার শেষ মাথায় যুধিষ্ঠির থাইকা কয়েক বছরে বড়ো অশ্বত্থামারে দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু অশ্বত্থামা অঙ্গিরার মাত্র ৫ নম্বর প্রজন্ম। অথচ ঋষি অঙ্গিরা আর ভৃগু মুনি যেমন আছিলেন সমবয়সী তেমনি অঙ্গিরাপুত্র বৃহস্পতি আর ভৃগুপুত্র শুক্রাচার্যও আছিলেন সমবয়সী সতীর্থ। তো একই টাইম লাইনে যেইখানে অঙ্গিরা বংশ মাত্র ৫ প্রজন্ম গিয়া থামে সেইখানে ভৃগুর পোলা শুক্রাচার্যের মাইয়ার সতিনের বংশ কেমনে ২৬ পর্যন্ত পৌঁছাইয়া যায়? অথচ ভৃগুমুনির আরেক পোলা ঋচীকের বংশও কিন্তু অত উর্বর না। ঋচীকের পোলার ঘরের নাতি পরশুরাম হইলেন মুনি ভৃগু থাইকা চতুর্থ প্রজন্ম; যা অঙ্গিরার চতুর্থ প্রজন্ম দ্রোণাচার্যের লগে মিলে যায়; পরশুরাম দ্রোণের বয়সে বড়ো এবং গুরু; কিন্তু দুইজনই অঙ্গিরা এবং ভৃগুর চতুর্থ প্রজন্ম...

এইখানে প্রজন্মের ইতিহাস না খুঁইজা বরং মহাভারত এডিটের ইতিহাসের দিকেই নজর দেওয়া ভালো। কওয়া হয় মহাভারত সবচে বেশি এডিট হইছে ভার্গব ব্রাহ্মণগো হাতে। ভার্গব ব্রাহ্মণ মানে ভৃগুমুনির বংশধর। এই এডিটের মূল উদ্দেশ্য আছিল মহাভারতের মহাক্ষেত্রে নিজেগো প্রতিষ্ঠা করা। এইটার পিছনে অবশ্য আরো পুরানা একখান ইতিহাস আছে...

বর্তমান তাজাকিস্তানের পশুরজন অঞ্চলের মানুষগুলারে আর্যরা সেনাপতি ইন্দ্রের নেতৃত্বে ভিটামাটি থাইকা পিটাইয়া খেদাইয়া দেয়। পশুরজনের এই পলানো মানুষগুলা পরবর্তীকালে পরিচিত হয় পারস্য- পারসিক বা পার্সিয়ান নামে...

ইন্দ্রের দলের আর্যরা নিজেগো কইত দেবতা। এককালের সেনাপতি ইন্দ্র পরবর্তী কালে পরিণত হন দেবরাজ ইন্দ্র নামে। অন্য দিকে ভূমি থাইকা উচ্ছেদ হওয়া পার্সিয়ানগো স্পিতামা গোত্রের মানুষ হইলেন মুনি ভৃগু। এই মানুষগুলা জীবনেও নিজেগো ভিটা হারানোর ইতিহাস ভুলতে পারে নাই। বলা হয় দেবরাজ ইন্দ্রের নামের লগে যত চুরি-চামারির কাহিনি আছে সব এই পার্সিয়ান গোত্রেরই সংযোজন। এমনকি দীপাবলির রাইতে যে বাত্তি জ্বালানো হয় তাও নাকি প্রচলন হইছে ইন্দ্র যাতে বলির পশু চুরি করতে না পারে তার লাইগা। মানে ইন্দ্র পুরাই একটা চোর বদমাশ লম্পট...

এই গোত্রের ভার্গব বংশে বহু বড়ো মানুষও জন্মাইছেন। চ্যাবন শুক্র জমদগ্নি পরশুরাম সবাই এই বংশের। ভৃগুমুনির পোলাগো মইদ্যে চ্যাবন ভেষজ-বিদ্যার বিশেষজ্ঞ তো শুক্র আছিলেন যুদ্ধ বিশারদ আর শল্য-বিদ্যার বিশেষজ্ঞ। অঙ্গিরা বংশ সর্বদাই ইন্দ্রের দলে থাকত বইলা ভৃগুপুত্র শুক্রাচার্য সব সময় থাকতেন অপজিশন; মানে অসুর রাক্ষস আর দানবগো লগে। একলার বুদ্ধি আর কৌশলেই তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীগুলারে টিকাইয়া রাখতেন দেবতাগো আক্রমণের মুখে। তিনি নিজে ব্রাহ্মণ হইয়া; সংহিতামতে নিষিদ্ধ হইবার পরেও নিজের মাইয়া দেবযানীর বিবাহ দেন ক্ষত্রিয় রাজা বৃষপর্বার লগে। এই পার্সিয়ান স্পিতামা গোত্রের অন্য ধারায় আরেকজন বিখ্যাত মানুষ হইলেন পার্সিয়ান ধর্মের প্রবর্তক জরথ্রুস্ট। যিনি তার জেন্দাবেস্তায় ভালো পন্থাগুলারে কন স্পেন্ত মৈনু মানে স্পিতামা গোত্রের পথ আর খারাপ পথগুলারে বলেন অঙরা মৈনু; মানে অঙ্গিরার পথ...

ভূমি হারানো এই মানুষগুলাই যুগের পর যুগ ধইরা ইন্দ্র আর অঙ্গিরা বংশরে ধরা খাওয়ানোর লাইগা কাঞ্চি চালাইছে পুঁথিপুস্তকের পাতায়। আর একই লগে মহাভারতের যাদব-পাণ্ডব দুই বংশরেই নিজেগো পকেটে ঢুকাইতে গিয়া

প্রজন্ম গণনা আর বংশ-লতিকায় পাকাইয়া ফালাইছে বিশাল ভজঘট। যদু থাইকা যাদব বংশ এবং কৃষ্ণ পর্যন্ত আসতেও বহুত গোঁজামিল দিছে তারা...

মহাভারতে কিছু মাইনসের কোনো নাম নাই। গান্ধার রাজের মাইয়া বইলা ধৃতরাষ্ট্রের স্ত্রী গান্ধারী; তার আর কোনো নাম নাই। তেমনি নাম নাই নকুল সহদেবের মা মাদ্রীর। দেশের নামেই তাগোরে ডাকা হইছে আজীবন। দ্রৌপদীরেও দেশের নামে পাঞ্চালী আর বাপের নামে দ্রৌপদী ডাকা হইলেও তার মূল নাম কৃষ্ণা পাওয়া যায়। আবার কিছু মানুষের নাম পুরাই বিকৃত কইরা দেওয়া হইছে। যেমন শকুনি দুঃশাসন দুর্যোধন। দুর্যোধনের মূল নাম আছিল সূর্যোধন; সেইটা পাওয়া গেলেও ধৃতরাষ্ট্রের বেশির ভাগ পোলাগো মূল নাম মোটেই উদ্ধার করা সম্ভব না মহাভারত থাইকা। পাণ্ডবপক্ষের ভক্তরা পুরাই খাইয়া ফালাইছে তাগোরে। তবে পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিবার কারণেই বোধ হয় ধৃতরাষ্ট্রের দাসীগর্ভজাত পোলার নামখান বেশ নাদুসনুদুসই আছে- যুযুৎসু...

এর বাইরে কিছু মাইনসেরে ডাকা হইছে জাতিবাচক নামে; যেমন হিড়িম্ব হিড়িম্বা। হিড়িম্ব হিড়িম্বা শুনলে কেমন জানি হড় জাতির লগে একটা মিল পাওয়া যায়। সাঁওতালরা নিজেগো জাতেরে কয় হড় জাতি। আর একইসাথে যখন ড. অতুল সুর কন সাঁওতাল পরগনার পাশে বীরভূমে আছিল হিড়িম্বার বাস আর এখনো সেইখানে আছে ঘটোৎকচের পোলার রাজ্যের চিহ্ন পাণ্ডুরাজার ঢিবি; তখন মনে হয় ঘটোৎকচের মা হিড়িম্বা মূলত আছিল সাঁওতাল বংশজাত নারী...

১৩

কুরুযুদ্ধে নাকি অংশ নিছিল ১৮ অক্ষৌহিণী সৈনিক; যাগো লগে হাতিঘোড়াও আছে আরো আছে জোগানদার কবিরাজ দাসদাসী বাদ্যকার বাবুর্চি পশুরাখাল দোকানদার এমনকি বেশ্যাও। তো ১৮ অক্ষৌহিণীরে বর্তমান সংখ্যা দিয়া কনভার্ট করলে খাড়ায় ৪৭ লক্ষ চব্বিশ হাজারের মতো। এর সাথে অন্য লোকজন যোগ দিলে পুরা যুদ্ধে বলতে হয় আছিল ৫০-৫৫ লক্ষ লোক; এবং তারা নাকি যুদ্ধ করছে একটা মাঠেই...

দুনিয়াতে সেই যুগে অর্ধকোটি মানুষ খাড়াইবার মতো কোনো মাঠ আছিল কি না আমার জানা নাই। তার উপ্রে আবার সেই মাঠে ছুটছে ঘোড়া; দাবড়াইছে হাতি; উড়ছে তির। মানে মানুষগুলার মাঝখানেও কমপক্ষে কোয়ার্টার কিলো জায়গা ফাঁকা আছিল ধাওয়া দেওয়া আর নিজেগো চান্দি সুরক্ষার লাইগা। সেইখানে মানুষ হাজির হইছিল যেমন; তেমনি মরছেও বেশুমার। একেকজন বীর একেটা তির মাইরা একলগে দশ-বিশ হাজার মানুষ মাইরা ফালাইছেন। তলোয়ার দিয়া কোপাইয়া এক বেলাতেই মাইরা ফালাইছেন হাজার দশেক সৈন্য। আরে বাপ; যে কুড়ালি কুড়াল দিয়া গাছ কাটে সেও দিনে দশ হাজার কোপ বসাইতে পারে না নিরীহ নির্জীব গাছের উপর। আর সৈনিকরা নিশ্চয়ই গলা পাইতা খাড়াইয়া আছিল না; তারাও কোপাইছে; তারাও কোপ ফিরাইছে। তাছাড়া সেই সময় পুরা ভারতে অত মানুষ আছিল কি না সেইটা যেমন একটা প্রশ্ন তেমনি ইতিহাসবিদরা কন খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে মগধের নন্দ সাম্রাজ্যের আগে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এমন কোনো যোগাযোগ প্রায় আছিলই না যাতে রাজনৈতিক সম্পর্কের কারণে দুই পক্ষে অতগুলা মানুষ গিয়া জড়ো হইতে পারে। তয় যেহেতু এই মগধের নন্দ সাম্রাজ্যের সময়েই মহাভারত বিশাল আকার পাইয়া লিখিত হইছে; সেইহেতু মহাভারতের সংখ্যা রাজনীতি আর রাজনৈতিক ভূগোলটাও বোধ হয় রপ্তানি হইছে মগধের নন্দ সাম্রাজ্য থাইকা...

এতে অবশ্য মহাভারত পড়তে অসুবিধা হয় না; মাঝে মাঝে খালি বিরক্তি লাগে। তবে যেইখানে বলা হইছে অর্জুন তিরের বৃষ্টি চালায় সেইখানে ধইরা নিতে হইব যে একই ডিরেকশনে অর্জুনরে বাহিনী তিরাইতাছে। কারণ তির যুদ্ধের সাধারণ টেকনিকটাই হইল তাই; শত্রু নিশানায় আকাশের দিকে মুখ কইরা ঝাঁকে ঝাঁকে তির ফালাইয়া শত্রু বাহিনীরে ছত্রভঙ্গ করা। এই ক্ষেত্রে তির কাউরে টারগেট কইরা ছাড়া হয় না বরং তির ছাড়া হয় শত্রু বাহিনীরে টারগেট কইরা...

কুরুক্ষেত্রে সেই আঠারো দিনের যুদ্ধে নাকি বেশির ভাগ মানুষই মইরা গেছিল। সেই হিসাবে আঠারো দিনে যদি আঠারো অক্ষৌহিণী লোকের মরতে

হয় তবে দৈনিক কমপক্ষে মরতে হয় আড়াই লক্ষর বেশি লোকের। এই পরিমাণ মানুষ যদি এক দিনে একটা মাঠে মরে তবে মরার গন্ধেই তো টিকা যাইব না কয়েক মাস। সেইখানে কেমনে বাকিরা হাইসা-খেইলা আঠারো দিন যুদ্ধ করে? তার উপরে আবার খাজুইরা আলাপও করে পিরিতি মাখাইয়া?

মহাভারতে আরেকখান গোলমাইল্লা সংখ্যা হইল গান্ধারীর গর্ভে ধৃতরাষ্ট্রের একশো পোলা। হইলে হইতে পারে অনেক বুঝাইতে শত ব্যবহার করছে কবিরা। আবার হইতে পারে রাজা যেহেতু অন্যগোও পিতা বইলা সম্মানিত হইতেন সেই হিসাবে ধৃতরাষ্ট্র তার বিশেষ বাহিনীরে পুত্র কইতেন আর তারাও তারে পিতা বইলা সম্বোধন করত। কারণ ভীষ্মের দাপটের সামনে ধৃতরাষ্ট্রের একটা নিজস্ব বাহিনী তখন অনিবার্য আছিল। হইলে হইতে পারে স্বয়ং দ্বৈপায়ন বিভিন্ন গ্রাম থাইকা আইনা একশোটা পোলা জোগাড় কইরা দিছেন ধৃতরে; সেইগুলা একলগে লাউয়ের খোলের দোলনায় দোল খাইত বইলা লাউ কাইট্টা পোলা জন্ম দিবার কাব্যিক কাহিনি জন্ম নিছে পরে। দাসীপুত্র যুযুৎসুসহ ধৃতরাষ্ট্রের একশো এক পোলার যে নামের তালিকাখান পাওয়া যায়; সেইটার মইদ্যে কয়টা আদৌ মানুষের নাম আর কয়টা খাইস্টা বিশেষণ তা দেখলেই বুঝতে পারা যায়...

এক নারীর পক্ষে সর্বোচ্চ কতটা সন্তান জন্ম দেয়া সম্ভব সেই প্রশ্নটা বাদ দিয়া গেলেও সন্তান যতটাই হউক মায়ে অন্তত সবগুলারে চিনব; সবগুলার কথা বলব; আর মরলে সবগুলার লাইগাই কানব; এইটাই সোজা হিসাব হইবার কথা। কিন্তু আমার যত দূর মনে পড়ে অত বড়ো মহাভারতে গান্ধারী চাইর-পাঁচটার বেশি পোলার নাম মুখেও আনেন নাই; আবার কান্দেনও নাই চাইর-পাঁচজনের বেশি পোলার মরণে। ...তো?

১৪

ভূগোল নিয়া বহুত ঝামেলা পাকাইছে মহাভারত। মগধ সময়কালের মানচিত্র আর রাজনীতি যে মহাভারতে ঢুইকা গেছে সেই প্যাঁচালও আগে পাইড়া আসছি। এর বাইরে মহাভারতের মূল জায়গাগুলারে বর্তমান কালে চিহ্নিত করা গেছে ঠিকঠাকমতোই। কুরুক্ষেত্র আর হস্তিনাপুর আছিল হরিয়ানায়।

দ্বারকা হইল বর্তমানের গুজরাট। মৎস্যদেশ হইল রাজস্থানের জয়পুর; তক্ষক নাগের রাজধানী তক্ষশিলা হইল রাওয়ালপিন্ডি; গান্ধার হইল কান্দাহার। মদ্রদেশ পাঞ্জাবে। মানে মূল ঘটনাটা ওই অঞ্চলের কাহিনি কারবার। কিন্তু যখনই এর লগে মাইনসে মহাভারতের সূত্র ধইরা কয় বর্তমান মণিপুরের কথা মহাভারতে আছে তখনই বাঁধে ঝামেলা। হিসাব মিলে না। রাজশেখর বসুও কন সেই মণিপুর এই মণিপুর না। কিন্তু তাতে মণিপুরের মানুষের মহাভারতের কাহিনির লগে নিজেগো কাহিনি মিলাইয়া ঐতিহ্য সন্ধান থাইমা থাকে না...

ড. অতুল সুর নৃতাত্ত্বিক সাক্ষীসাবুদ ভূগোল ইতিহাস ঘাঁইটা কন যে দ্রৌপদী আছিল বাঙালি নারী। এতে বাঙালিরা খুশি হইলেও অন্যরা কিন্তু যুক্তি দিয়া কিলাইতে পারে। কারণ অতুল সুর বারণাবত থাইকা পাণ্ডবগো নৌপথে পলাইয়া বীরভূম পর্যন্ত আসার একটা যুক্তিসংগত বিবরণ দিলেও পাঞ্চালের লগে হস্তিনাপুর বা বীরভূমের লগে হরিয়ানার অত দ্রুত যোগাযোগ কেমনে হইল সে বিষয়ে যেমন কিছু বলেন না; তেমনি মহাভারতের অন্য কোথাও নৌ যোগাযোগের কোনো সংবাদও পাওয়া যায় না...

আমার ধারণা অতুল সুর বিজ্ঞানচর্চা করতে গিয়াও আবেগি বাঙালি হইয়া কবিগো মতো কিছু ভাঙ্গা যুক্তি দিয়া দাবি কইরা বসছেন যে দ্রৌপদী হইল বাঙালি নারী। তার উপরে অনেকেই কন যে কর্ণের অঙ্গ রাজ্যের ভিতরে আছিল বর্তমান বাংলা অঞ্চল; মানে কর্ণ আছিলেন বাঙালির রাজা; এমনিতেই রবীন্দ্রনাথের কর্ণ-কুন্তী সংবাদ পইড়া বাঙালিজাতি কর্ণের লাইগা যে কান্দনটা কান্দে; তার উপ্রে যদি প্রমাণিত হয় যে কর্ণ আছিল বাংলার রাজা তাইলে তো বাংলার কবিরা কৃষ্ণ অর্জুনরে ভর্তা বানাইয়া নতুন মহাভারত লিখতে বইসা যাইব কাইল...

কর্ণের অঙ্গরাজ্য কিংবা পাঞ্চালের লগে বাংলার সম্পর্কসূত্র খাড়ার উপ্রে বাতিল করতে না পারলেও হরিয়ানার লগে যখন আসামের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটাইয়া দেওয়া হয়; তখন পুরাই আউলা হইয়া উঠে মহাভারতীয় ভূগোলের পাঠ...

ভগদত্ত নামে একখান চরিত্র আছে মহাভারতে। তিনি দুর্যোধনের স্ত্রী ভানুমতির বাপ। প্রাগজ্যোতিষপুরের রাজা নরক-এর পোলা। তার বাহিনীর

মূল শক্তি হইল হাতি আর তার সৈনিকরা হইল চীনা আর কিরাত। দাবি করা হয় মহাভারতের প্রাগজ্যোতিষপুর হইল পরবর্তীকালের কামরূপ রাজ্য যার সীমানায় পড়ছে বর্তমান সময়ের আসাম এবং বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চল...

আসাম থাইকা দিল্লির আকাশ-দূরত্ব দুই হাজার কিলোমিটারের মতো। আধুনিক মিলিটারিগো হিসাবমতে গ্রাউন্ড ডিসটেন্স কমপক্ষে এয়ার ডিস্টেন্সের ডাবল হয়। সেই হিসাবে আসাম থাইকা দিল্লির কাছাকাছি হরিয়ানার স্থল-দূরত্ব কমবেশি চাইর হাজার কিলোমিটার। যে যুগে ট্রেন বাস বিমান জাহাজ নাই; রাস্তাঘাট নাই; নদীতে ব্রিজ বা ফেরি নাই; থাকা-খাওয়ার লাইগা দোকানপাট কিংবা হোটেলপাতি নাই; সেই যুগে আসাম থাইকা হরিয়ানা যাইতে কত দিন লাগতে পারে?

মিলিটারিরা কয় ভালো রাস্তায় সৈনিকগো হাঁটার কার্যকর গতি গড়ে ঘণ্টায় ৫ কিলো। আর যেইখানে রাস্তাঘাট তেমন নাই সেইখানে গড়ে তা নাইমা আসে ৩ কিলোতে। দৈনিক কার্যকর হাঁটার ঘণ্টা হইল ১০ আর বচ্ছরে পায়ে হাঁটার কার্যকর মাস হইল সাত। মানে ২১০ দিনের কার্যকর বচ্ছর। তো এই অবস্থায় এই গতিতে আসাম থাইকা রওনা দিয়া একলা এক সৈনিকের হরিয়ানা যাইতে হইলে হাঁটতে হইব মোট ১৩৪ দিন; মানে প্রায় ৮ ক্যালেন্ডার মাস। তাও যদি সবগুলা নদী-উপনদীতে তার লাইগা নৌকা রেডি থাকে তয়...

তো সেই যুগে বাহিনী আর হাতি নিয়া হাঁটার হ্যাপাগুলা কী? পয়লা কথা হইল সেনাপতিরা হাতিতেই যাউক আর ঘোড়াতেই যাউক; দলের মালপত্র টানা মুটে-মজুরগো চলার গতিই আছিল তাগো অগ্রগতির গড় গতি। সেনাপতিগো কিছুদূর গিয়া থামতে হইত; পায়েদল মজুররা আসার অপেক্ষায়। তারপর তারা আইসা আশপাশ থাইকা খাবারদাবার জোগাড় করত; রান্নাবান্না করত; থাকার ব্যবস্থা বানাইত; হাতিঘোড়ার খাবার দিত; বিশ্রাম দিত। তার উপরে ঝড়বাদলা বৃষ্টিতে থাইমা অপেক্ষা করতে হইত; অসুখ-বিসুখে মানুষ মরত; কাহিল হইয়া পড়ত; পাহাড়-জঙ্গলের ভিতর রাস্তা বানাইতে হইত; লোকাল মাতবর কিংবা ডাকাত-ফাকাতের লগে মারামারি করতে হইত; তারপর হইত আগাইতে। কিন্তু নদীতে কী উপায়?

নৌকা বহুত পুরানা জিনিস। কিন্তু হাতি কেমনে নদী পার করে? সাঁতরাইয়া? সেইটা সম্ভব না। কারণ হাতি সাঁতরায় শরীর ডুবাইয়া শুঁড় পানির উপরে ভাসাইয়া। হাতিরে পানিতে ভাসাইয়া তার ঘাড়ে বইসা বড়ো নদী পার হইতে গেলে মাহুত ভাইসা যাইবার কথা। মহিষের মতো হাতির ল্যাঞ্জে ধইরাও সাঁতরানো সম্ভব না; কারণ সাঁতরাইবার সময় হাতির ছোট ল্যাঞ্জাটা ডুইবা থাকে পানির কয়েক ফুট নীচে। ছোটখাটো নৌকায় তুইলা হাতিরে পার করাও সম্ভব না। হাতিরে পার করতে হইলে সেই যুগে বাঁশ আর কলাগাছ দিয়া বিশাল ভেলার কোনো বিকল্প আছিল বইলা মনে হয় না আমার। সেইটা বানাইতে হইত প্রচুর সময় নিয়া এবং নদী পার হইতে হইত আরো বেশি ধীরে; ঝড়-বাদলা দেইখা...

বলা হইছে ভগদত্ত কুরুযুদ্ধে অংশ নিছে এক অক্ষৌহিণী সৈনিক নিয়া। এক অক্ষৌহিণী মানে হইল ১ লক্ষ ৯ হাজার সাড়ে তিনশো পায়দল সৈনিকের লগে ২১ হাজার ৮৭০টা কইরা রথ আর হাতি এবং ৬৫ হাজার ৬১০টা ঘোড়া। তো এইবার একেকটা হাতির লগে দুইজন কইরা মাহুত আর রথে কমপক্ষে একজন কইরা সারথি আর জোগানদার কামলা যোগ কইরা গুইনা দেখেন মোট পাব্লিক কত হইতে পারে এক অক্ষৌহিণী সৈনিকের ভিতর; এবং সেই বিশাল বাহিনীরে সেই যুগে আসাম থাইকা হরিয়ানা নিয়া যাইতে কত বছর লাগতে পারে? তো একজন রাজা; যার নিজের আছে বিশাল একখান রাজ্য; সে কেমনে কথায় কথায় গিয়া আসাম থাইকা অত বড়ো বাহিনী নিয়া হরিয়ানা হাজির হয়? তার উপরে আবার বিবাহ-শাদির সম্বন্ধ পাতায়? কেমনে সম্ভব? কেমনে সম্ভব গুজরাট থাইকা আসামে আইসা কৃষ্ণের পক্ষে ভগদত্তের বাপেরে মাইরা ফালানো?

মহাভারতের লগে ভগদত্তরে জুইড়া দেওয়ার কারিগরি ইতিহাস অন্য আরেকটা জায়গার ইতিহাস খুঁজলে বোধ হয় পাইলেও পাওয়া যাইতে পারে। ভগদত্ত প্রাগজ্যোতিষপুরের রাজা নরকের পোলা; যারে বামুন ঘরানার সাহিত্যে কইত নরক রাজ্য। সেই নরক রাজ্য যখন চতুর্থ শতকে বর্মন রাজ বংশের শাসনামলে প্রাগজ্যোতিষপুর নাম পাল্টাইয়া হইল কামরূপ; তখন বর্মন রাজারা দেশের মাইনসেরে শিক্ষাদীক্ষা দেওয়া আর বৈষ্ণব ধর্ম প্রতিষ্ঠার লাইগা মগধ সাম্রাজ্য থাইকা কামরূপে আমদানি করছিল ব্যাপক ব্রাহ্মণ।

বামুনরা কিন্তু সহজে কামরূপে আসতে চাইত না। তারা বাংলারে কইত পক্ষী জাতীয় মানুষের দেশ আর কামরূপরে কইত নরক। কোনো বামুন এই দিকে আসলে ফিরা যাইবার সময় তারে প্রায়শ্চিত্ত কইরা ঢুকতে হইত নিজের সমাজে। তো দেশ আর আত্মীয়-স্বজন ছাইড়া যেই সব বামুন সেই নরক রাজ্যে আসতে রাজি হইত তারা মূলত আছিল নিজেগো অঞ্চলে খাইতে না পাওয়া কিংবা পতিত কিংবা আকাম কইরা পলাইয়া থাকা বামুনের দল। কালে কালে তাই পতিত আর অকর্মা মানুষগো সর্বশেষ ঠিকানা হিসাবে নরক হইয়া উঠে সকলের ধর্মীয় গন্তব্যের নাম...

তো সেই নরকে কিংবা কামরূপে কিংবা আসামে-সিলেটে যে বামুনরা আসলো; মাইনসেরে শিক্ষাদীক্ষা দিলো; সেইটার প্রভাব কিন্তু এখনো রইয়া গেছে সিলেটি আর অহোমিয়া ভাষার শব্দে আর উচ্চারণে। এই ভাষাগুলায় সংস্কৃত শব্দবাহুল্য; দীর্ঘ ক্রিয়াপদ আর উচ্চারণ এখনো বহন করে সেই ভাট বামুনগো অবদানের চিহ্ন। কিন্তু একবারও কি ভাইবা দেখা যায় না যে ৩৫০ থাইকা ৬৫০ সাল পর্যন্ত শাসন করা বর্মন রাজারা খালি নরকরে প্রাগজ্যোতিষপুর থাইকা কামরূপ বানাইয়া শিক্ষিত আর বৈষ্ণব করার পিছনেই পুরা ইনভেস্টমেন্ট খরচা করে নাই; বরং নতুন কামরূপের ঐতিহ্য নির্মাণেও তারা ইনভেস্টমেন্টের একটা বিশাল অংশ খরচা করছে?

ভিন্ন সমাজে এইরকম আরেকখান উদাহরণ দেখার লাইগা এইবার একটু ভার্জিলের ইনিড মহাকাব্যখানের শানেনুজুল স্মরণ কইরা নেন। গোত্র-পরিচয়হীন অক্টাভিওন যখন অগস্টাস সিজার হইয়া জুলিয়াস সিজারের উত্তরাধিকার হইলেন; তখন তার মা আতিয়া বালবা কবি ভার্জিলরে দায়িত্ব দিলেন পোলার একখান ঐতিহ্যময় বংশকাহিনি বানাইয়া দিতে...

তো সেই অ্যাসাইনমেন্ট নিয়া ভার্জিল হোমারের ইলিয়াড থাইকা ট্রয় যুদ্ধের সূত্র ধইরা একখান চরিত্র বাইর করলেন- ইনিয়াস। তারপর তিনি লিখতে থাকলেন ইনিড। কাহিনি বানাইয়া কইয়া দিলেন যে ট্রোজান রাজ বংশের পোলা ইনিয়াস ট্রয় থাইকা পলাইয়া আইসা প্রতিষ্ঠা করছেন রোমান জাতির। মানে তিনি রোমান জাতির পিতা। তো যাই হউক ভার্জিল ইনিয়াসরে দিয়া রোমান জাতিটাতি প্রতিষ্ঠা করার পর কইলেন যে আতিয়াপুত্র অক্টাভিওন;

মানে অগস্টাস সিজার হইলেন সেই মহান ইনিয়াসের বংশধর; মানে অতি সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান...

তো কি এমনো হইতে পারে যে কামরূপের বর্মন রাজারা নিজেগো বৈষ্ণব ঘরানায় ঐতিহ্যশালী করার ইচ্ছায় সংস্কৃত পণ্ডিতগো পয়সা-পাতি দিছে মহাভারতে তাগোরে ঢুকাইয়া দিবার লাইগা? হইলে হইতে পারে সেই সব পেইড কবিরাই ছক কইরা কৃষ্ণরে দিয়া ভগদত্তের বাপ নরকরে হত্যা করাইয়া কৃষ্ণের নাম ধইরা নিজেগো দেশ থাইকা পয়লা নরকের গন্ধ ছাড়ায়; তারপর কুরুযুদ্ধের মাঠে নিয়া কৃষ্ণ আর অর্জুনের হাতে প্রাগজ্যোতিষপুরের রাজা ভগদত্তরে মারে; তারপর শুরু করে বর্মন রাজ বংশের অধীনে বামুন প্রভাবিত বৈষ্ণব ঘরানার নয়া কামরূপ...

মহাভারতের স্বর্গও কিন্তু বর্তমানের স্বর্গ না। অক্ষাংশ দ্রাঘিমাংশ হিসাব কইরা অতুল সুর কন মহাভারতের স্বর্গ হইল মূলত হিমালয়ের উত্তর অংশ যেইখানে আছিল দেবরাজ ইন্দ্রের নগর আর রাজধানী অমরাবতী। যাই হউক মহাভারতের পুরা ভূগোলই কিন্তু এইরকম ব্যাপক ক্রিয়েটিভিটিতে ভরা...

ভীমের পোলা ঘটোৎকচরে নিয়াও বেশ আউলাঝাড়া কাহিনি আছে। মহাভারতে সে গোঁয়ার; মহাভারতের কবিরা তারে পুরা রাক্ষসও বানাইয়া থুইছেন। কিন্তু মহাভারতের ইন্দোনেশিয়ান কাহিনিগুলায় সে আবার অন্যরকম হিরো। আমার হিসাবে মহাভারতে যত উচ্চশিক্ষিত আর উচ্চ সংস্কৃতির চরিত্র আছে তাগো মাঝে মনে হয় ঘটোৎকচ পয়লা সারির একজন...

সেই সময় গুণী কইন্যাগো লাইগা বহু স্বয়ংবরা প্রচলিত আছিল; কিন্তু সেই সব স্বয়ংবরায় পাত্ররা কইন্যা জয় করত নিজের শানশওকত কিংবা বাহাদুরি দেখাইয়া। ঘটোৎকচও বিবাহ করছে স্বয়ংবরার আসর জিতা; কিন্তু সেইটা আছিল বুদ্ধি পরীক্ষার স্বয়ংবরা। এই রকম বুদ্ধি পরীক্ষার স্বয়ংবরা আমি দ্বিতীয়টা পাই নাই কোথাও। যদিও স্বয়ংবরায় বুদ্ধি পরীক্ষার প্রশ্নগুলা আমি উদ্ধার করতে পারি নাই; সবখানেই বলা হইছে অহিলাবতী স্বয়ং কিছু কঠিন কঠিন প্রশ্ন করছে পাত্রগো আর সেই সব কঠিন কঠিন প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়া ঘটা তারে জিতা নিছে। কিন্তু এতে অন্তত তার বুদ্ধির একটা ঝিলিক

পাওয়া যায়। দ্বিতীয় বিষয়টা হইতাছে মহাভারতে যেইখানে সকলেই নিজের পোলাপানগো বীর আর যোদ্ধা বানাইবার লাইগা অস্থির সেইখানে ঘটোৎকচ পড়ালেখা শিখাইয়া নিজের ছোট পোলারে বানাইতে চায় ঋষি। তার ছোট পোলা বর্বরীক ঋষি হয়ও। রাজস্থানে এক নামে আর নেপালে আরেক নামে বর্বরীকের মন্দিরও আছে...

এইটা কেমনে সম্ভব? একটা মানুষের ঐতিহ্যে যদি শিক্ষা-সংস্কৃতি আর বুদ্ধিচর্চার অস্তিত্ব না থাকে তবে হিড়িম্বার পোলা কেমনে বুদ্ধি পরীক্ষার স্বয়ংবরায় গিয়া নাগরাজ মুরুর মাইয়া অহিলাবতীরে বিয়া করে আর নাতি হয় ঋষি? মূলত আদিবাসী মানুষগুলারে বড়ো বেশি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা হইছে মহাভারতে; যার প্রমাণ এই ঘটোৎকচ...

অবশ্য ঘটোৎকচের বৌ নিয়া কিছু ভিন্ন মত আছে। কোনো সূত্রে অহিলাবতী যাদব বংশজাত। কোনো সূত্রে কয় সে নাগ বংশজাত। ঘটোৎকচের আরেক বৌয়ের সন্ধান পাওয়া যায় ভার্গবী নামে। কোনো সূত্রে দেখা যায় ভার্গবী যাদব বংশজাত; আবার কোনো সূত্র বলে ভার্গবী হইল অর্জুনের মাইয়া; সুভদ্রা গর্ভজাত। অবশ্য নেপালে যারা ইয়ালাম্বর নামে বর্বরীকের পূজা করে আর বলে যে সেই হইল নেপালি প্রথম কিরাত রাজা; তারা আবার ঘটোৎকচরেও কিরাত বানাইয়া ফালায়। কিরাতরা আবার অন্য কোথাও দানব নামে পরিচিত আর বৈশিষ্ট্যে মঙ্গোলয়েড গোত্রজাত। সেই ক্ষেত্রে কিন্তু মহাভারতের অস্ট্রিক গোত্রজাত ঘটোৎকচের লগে দুই কাহিনির একটা প্যাঁচ লাইগা যায়...

এক কাহিনি বলে ঘটোৎকচের পোলা বর্বরীক কৃষ্ণের সামনে আত্মবলিদান দেয় আর অর্জুনের পোলা ইরাবান মরে কুরুযুদ্ধে। কিন্তু অন্য কাহিনি বলে যুদ্ধের আগে আত্মবলিদান দেয় অর্জুনের পোলা ইরাবান। যারা দ্বিতীয় কাহিনি বিশ্বাস করে তারা আবার ইরাবানরে দেবতা ইরাবৎ কইয়া পূজাও করে...

আমার কাহিনিতে আমি হিড়িম্বারে সাঁওতাল কইন্যাই কইছি; ঘটার বৌ অহিলাবতীর লাইগা বাইছা নিছি নাগ বংশের পরিচয়...

শিখণ্ডীরে অনেকেই হিজড়া কন; কিন্তু এই বিবাহিত ব্যাডার রীতিমতো পোলাপান আছে। মনে লয় ভীষ্মের মরণরে মহান বানাইতে গিয়া অম্বার পুনর্জন্ম-টুনর্জন্ম জুইড়া দিয়া শিখণ্ডীরে ছাইয়া বানাইয়া থুইছে কবিরা। আর

ভীষ্ম যে হিজড়া দেখলে অস্ত্র ছাইড়া দেন সেইটাও কিন্তু পুরা ভুয়া। কারণ শিখণ্ডী তার লগে সাত নম্বর আর নয় নম্বর দিনেও যুদ্ধ করছে; কিন্তু তখন তো তিনি তারে দেইখা কুফা কইয়া অস্ত্র ছাড়েন নাই। তাইলে দশ নম্বর দিনে আইসা হঠাৎ শিখণ্ডীরে দেইখা ভীষ্ম অস্ত্র ছাইড়া দিবার নাটক করলেন ক্যান?

মহাভারতে বর্ণিত বংশ আর ভূগোলের একখান ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা করছেন নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী তার মহাভারতের ভারযুদ্ধ এবং কৃষ্ণ পুস্তকে। নৃসিংহপ্রসাদ বড়ো বেশি দ্বৈপায়ন-ভক্ত মানুষ। তিনি কৃষ্ণ দ্বৈপায়নরে যেমন একক ব্যক্তি হিসাবে বিশ্বাস করেন তেমনি দ্বৈপায়নের নামে লিখিত প্রতিটা অক্ষররে ভক্তিসহকারে বিশ্বাস করেন। এবং সেই অনুযায়ী তিনি মহাভারতে বর্ণিত ভরত থাইকা প্রবাহিত বংশের যেমন এখানা বর্ণনা উপস্থাপন করেন বিভিন্ন পুরাণের সূত্র দিয়া তেমনি পৌরাণিক সূত্র দিয়াই মহাভারতীয় ভূগোলের একখানা মানচিত্রও উপস্থাপন কইরা ফালান তিনার এই পুস্তকে...

কিন্তু কথা হইল পুরাণগুলা যেইখানে রচিত হইছে অন্যসব পুরাণের উপর ভিত্তি কইরা; সেইখানে শুধু পৌরাণিক রেফারেন্স দিয়া রচিত বই পৌরাণিক গবেষণা হিসাবে ঠিকাছে; কিন্তু কোনোভাবেই পুরাণের নৃতাত্ত্বিক গবেষণা নয়। অবশ্য সেই দাবি নৃসিংহপ্রসাদ নিজেও করেন নাই; তিনি পুরাণের মইদ্যেই থাকতে চাইছেন। সেই দিক দিয়া বিশ্বাসী মানুষদের লাইগা নৃসিংহপ্রসাদের এই গবেষণাটা একখানা ভালো রেফারেন্স পুস্তক...

১৫

একটা বিষয় নিশ্চিত যে মহাভারত পরিবারের দুই প্রধান পুরুষ ভীষ্ম এবং দ্বৈপায়ন দুইজনই আছিলেন নদীমাতৃক মানুষ; একজন গঙ্গাপুত্র তো আরেকজন দ্বৈপায়ন। কৃষ্ণসহ মহাভারতের বেশির ভাগ মানুষই আছিল দেখতে কালা; শিবপূজারি আর রাজা-বাদশা সকলেই বসবাস করত খড়কুটা কিংবা মাটির ঘরে। বারণাবতে যুবরাজের লাইগা ধুমধাম কইরা যে ঘর বানানো হয় সেইটা কিন্তু একটা বাঁশ বেত শণের ঘর। একই সাথে দেখা যায় সেই সময় মানুষ মাটির নীচে কিংবা গুহায়ও বসবাস করত। তার প্রমাণ সেই বারণাবতেই পাওয়া যায়। বিদুর এক কারিগর পাঠায় যে মাটির নীচে গুহাঘর

বানানোয় এক্সপার্ট। তখন যদি এই জাতীয় ঘর বানাইবার প্রচলনই না থাকত তবে এক্সপার্ট মিস্ত্রি আইল কেমনে?

সিংহাসন মনে হয় খালি নামেই আছিল কিংবা পরে ঢুকানো হইছে। কামের ক্ষেত্রে চেয়ার জাতীয় কোনো আসন-টাসনের সন্ধান পাই নাই। মনে লয় মাটিতে আসন পাইতাই বসত সবাই। পোশাক-আশাকেরও কোনো বিস্তারিত নাই। সুতা আর কাপড়ের প্রচলন তখন থাকলেও কথায় কথায় পশুর চামড়া আর ছালবাকলার পোশাকের বর্ণনা দেইখা মনে হয় একইসাথে গরিবগুর্বাগো মাঝে ছালবাকলার পোশাকের ব্যাপক প্রচলন আছিল তখন। বনবাসে অর্জুনরেও একবার ছালবাকলার পোশাক বানাইতে দেখা যায়। প্রচলন না থাকলে অতি সহজে যেমন পাওয়া যাইত না তেমনি অর্জুনও বানাইতে পারত না অত সহজে। সেই সূত্র ধইরা দ্রৌপদীর পোশাক নিয়া কথা কওয়া বিপজ্জনক। তবে রাজরানির পোশাক থান কাপড় জাতীয় কিছু হইলেও হইতে পারে; মানে পুরুষে পরলে হইত ধুতি আর নারীতে পরলে হইত শাড়ি। তয় মিলিটারিগো চিনার লাইগা কুরুযুদ্ধে ইউনিফর্মের সন্ধান পাওয়া যায়। অর্জুন না মরা পর্যন্ত কর্ণের জুতা না পরার প্রতিজ্ঞা থাইকা অনুমান করা যায় সেই যুগে জুতারও প্রচলন আছিল...

যুদ্ধের ব্লকিং নিয়া বহুত কথা থাকলেও বহুত হিসাব আবার মিলে না। যেই যুগে মহাভারতে কুরুযুদ্ধ ঢোকানো হইছে সেই যুগের মানুষেরা যুদ্ধে তির-ধনুক আর ঘোড়ার নিশ্চিত ব্যবহার করত। কিন্তু ঘোড়া আর তির-ধনুকের ব্লকিং যখন লাঠি গদা আর মল্লযুদ্ধের যুগের মহাভারতে ঢুকাইয়া দেওয়া হইছে তখনই লাগছে ভজঘট। কারণ ঘোড়া আর তির-ধনুকের ব্লকিং করতে গেলে ভীমেরে গদা চালাইবার জায়গা দেওয়া যায় না। আবার গদা আর মল্লযুদ্ধের অনিবার্য অংশ; মা-বাপ তুইলা গালাগালি করা কিংবা গুরুজনরে প্রণাম-টনাম রাখতে গেলে তির-ধনুক আর ঘোড়া বাদ দিতে হয়। তার উপরে আবার ঢুকছে চাইর-ছয় ঘোড়ার ফ্যাশনেবল রথ; যেইটা মোটেই সামনাসামনি যুদ্ধের উপযোগী কোনো বাহন হইতে পারে না; না গতিতে; না আকারে। তো এতে যা হইছে তা হইল সবকিছু মিলা একটা খিচুড়ি পাকাইয়া গেছে; যেইটা কাব্যে পড়তে সুন্দর; সিনেমায় দেখতে সুন্দর কিন্তু যুদ্ধবিদ্যার গ্রামারে কোনোভাবেই বাস্তবসম্মত না...

১৬

নকুল-সহদেবরে মহাভারতে হালকার উপর মাদ্রীর পোলা কইলেও কাহিনি পইড়া তাগোরে কুন্তীর সতীনের পোলা মনে হয় না। অনেকেই দাবি করেন তারা কুন্তীরই পোলা। আমারো তাই মনে হয়। নকুল-সহদেব মাদ্রেয় না; কৌন্তেয়...

সেই কালের নিয়ম মতো কোনো নারী চাইরজনের বেশি পুরুষের লগে যৌনতা করলে বেশ্যা বইলা গণ্য হইত। সেই সূত্রমতেই পাঁচ পাণ্ডবের লগে বিছানা ভাগ করার কারণে দ্রৌপদীরে বেশ্যা কইয়া খোঁটা দিছিল কর্ণ...

কর্ণ থাইকা অর্জুন পর্যন্ত জন্ম দিতে গিয়া বাইরের চাইরজন আর স্বামী পাণ্ডুরে নিয়া কুন্তীর কিন্তু পাঁচ পুরুষের লগে যৌনতা করা হইয়া যায়...

কেউ কেউ কন; শুধু চাইরজনের অধিক পুরুষের বিছানায় সে যায় নাই এইটা প্রমাণ করতেই পরে আর কর্ণের জন্ম স্বীকার যায় না কুন্তী। এর উপরে নকুল সহদেবের গর্ভ স্বীকার করতে গেলে কর্ণের জন্ম লুকাইলেও কুন্তীর পাঁচ পুরুষের বিছানাযাত্রা প্রমাণ হইয়া পড়ে...

এর লাইগাই নকুল-সহদেবরে কুন্তী মাদ্রীর পোলা বইলা প্রচার করে। এতে কর্ণরে বাদ দিলে তার পুরুষসঙ্গীর সংখ্যা চাইরের বেশি হয় না...

কুন্তী ছাড়া পাঁচ পাণ্ডবের জন্ম আর পাণ্ডু-মাদ্রীর মৃত্যুর অন্য কোনো সাক্ষী কিন্তু মহাভারতে নাই। পাণ্ডু আর মাদ্রীর লাশের লগে ষোলো থাইকা তেরো বছর বয়েসি পাঁচটা পোলা নিয়া যখন কুন্তী হস্তিনাপুরে আইসা হাজির হয় তখন তার সাথে আসছিল কয়েকজন বনবাসী ঋষি। যারা হড়বড় কইরা পাঁচটা পোলারে মৃত পাণ্ডুর পুত কইয়া হস্তিনাপুর রাজবাড়িতে পরিচয় করাইয়া দিয়া এক্কেবারে গায়েব হইয়া যায়; আস্ত মহাভারতে সেই লোকগুলারে আর দ্বিতীয়বার দেখা যায় না; পাণ্ডু-মাদ্রীর মরণ কাহিনী থাইকা পাঁচ পাণ্ডবের জন্ম সবকিছুরই একমাত্র জীবন্ত সূত্র শুধু কুন্তী...

১৭

আইচ্ছা কর্ণ কি আদৌ কুন্তীর পোলা?

সন্দেহ হয় আমার। কওয়া হইছে যে কুন্তী তারে ভাসাইয়া দিবার পর সন্তানহীন সূত অধিরথ তারে কুড়াইয়া আইনা পোষে। কিন্তু অধিরথের তো আরো পোলাপান আছে। কুরুযুদ্ধেই তারা যুদ্ধ করে। বলা হয় তারে স্তন্যদান করে সন্তানহীন রাধা। কিন্তু সন্তানহীন বন্ধ্যা নারী কেমনে স্তন্য পান করায়?

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী কন আরো বহু লোকই জানত যে কর্ণ কুন্তীর পোলা; কুন্তীর সন্তান দানের ক্ষমতা নিশ্চিত জাইনাই ভীষ্ম পাণ্ডুরে কুন্তীর স্বয়ংবরায় পাঠান। কারণ তার বংশটা আগের জেনারেশনে বহুত ভুগছে বংশের বাত্তি নিয়া; তাইলে প্রশ্ন হইল কৌরব আর পাণ্ডবরা এই কথা জানতো না ক্যান?

সেই কালের নিয়ম অনুযায়ী কুন্তীর কানীন সন্তান হিসাবে কর্ণ পাণ্ডুর পুত্র হিসাবে গণ্য হইবার কথা। এইটা প্রচলিত বিষয়। রাখঢাকের কিছু নাই। কিন্তু পাণ্ডুর অত সন্তানসংকট গেলেও একবারের লাইগাও কুন্তী কেন তারে কর্ণের কথা কইল না?

মহাভারতে বলা হইছে ভীষ্ম কৃপ দ্রোণ বিদুর জানতেন যে কর্ণ কুন্তীর পোলা। ভীষ্ম কৃপ দ্রোণ বিদুর বহুত চেষ্টা করছেন দুর্যোধনরে যুদ্ধ থাইকা ফিরাইতে। কিন্তু একমাত্র কর্ণের ভরসায় সে ফিরে নাই। তো ইনারা জানলে দুর্যোধন জানত না কেন? আর তারা যদি দুর্যোধনরে কর্ণের এই পরিচয়টা দিতেন তাইলেই তো কর্ণের উপর থাইকা তার বিশ্বাস আর ভরসা উইঠা যাইত। তাছাড়া তারা তারে বহুত গালাগালিও করছেন কিন্তু একবারের লাইগাও তো এই কথা কন নাই...

পোলাপাইন বয়সীগো মাঝে কৃষ্ণ জানত যে কর্ণ কুন্তীর পোলা; তাইলে কেমনে বিশ্বাস করা যায় যে যুধিষ্ঠির অর্জুন আর দ্রৌপদী তা জানে না?

একটা আখ্যান আছে যেইখানে কর্ণের পরিচয় গোপন রাখার লাইগা সম্রাট হইবার পরে যুধিষ্ঠির কুন্তীরে অভিশাপ দেয়- নারীজাতি কিছুই লুকায়ে রাখতে পারবে না কোনো দিন...

এই অভিশাপটা যুধিষ্ঠিরের মুখে কতটা মানায়? যে যুধিষ্ঠির জীবনে একবারের লাইগাও কুন্তীর চোখের দিকে চোখ তুইলা কথা কয় নাই। মায়ের সম্মান রক্ষার লাইগা বলতে গেলে যেকোনো কিছু যে করতে রাজি। সেই যুধিষ্ঠির হঠাৎ কইরা কুন্তীরে কেমনে অত তাচ্ছিল্য কইরা অভিশাপ দেয়?

আর সর্বশেষ ভীম। ভীম হইল মায়ের পোলা। মায়ের রান্নাবাড়া থাইকা মায়েরে কান্ধে নিয়া হাঁটা পর্যন্ত একলাই করছে ভীম। সেই ভীম কেন কর্ণরে কুন্তীর পোলা জানার পরেও পাপিষ্ঠ কইয়া তার শেষকৃত্যের লাইগা পয়সা দিতে রাজি হইল না? সে কেন কইল পাপিষ্ঠ কর্ণের শেষকৃত্য কুন্তী তার নিজের তহবিল থাইকা করবেন? ভীমের চরিত্রে ইতরামি মানায় কিন্তু কুন্তীরে ঠেস দিয়া কতা কওয়া মাইনা নেওয়া কঠিন...

ধৃতরাষ্ট্রের পোলাগো শেষকৃত্য হইল অর্জুন আর যুধিষ্ঠিরের ব্যক্তিগত পয়সায়। কিন্তু কর্ণের শেষকৃত্য কেন শেষ পর্যন্ত করল না কেউ? না পাণ্ডব না কুন্তী?

আমার খটকা লাগে। মনে লয় রাজ বংশ ঘরানার বাইরে সাধারণ পরিবারের এই সন্তানের উইঠা আসা যেমন তার আশপাশের লোকজন মানতে পারে নাই তেমনি কবিরাও মানতে পারে নাই যে সে কোনো সম্ভ্রান্ত বংশজাত নয়। তাই কাহিনি জুইড়া তারে কুন্তীর পোলা বানাইয়া দিছে। যেমন ষাইট সত্তুর দশকে সিনেমায় রাজার পোলারে ধুমায়ে বাইদানির লগে প্রেম করানোর পর বিবাহের সময় দেখানো হইত সেই বাইদানি কিন্তু মূলত আরেক রাজার হারাইয়া যাওয়া মেয়ে; মানে সমাজে সমাজে সমান রাখা। তো কর্ণরেও মনে লয় জোর কইরা এমন সম্ভ্রান্ত বানানো হইছে। কর্ণের চরিত্রও কেমন যেন খাপছাড়া। মাঝে মাঝে সে বহুত ভালো মানুষ আর মাঝে মাঝে চূড়ান্ত ইতর। একই সাথে তার মাঝে আছে যুধিষ্ঠিরের উদারতা; ভীমের ইতরামি আর অর্জুনের হিরোইজম। এই ভজঘটটা বোধ হয় হইছে কর্ণরে অভিজাত বংশজাত ভিলেন বানাইতে গিয়া। কিন্তু মূলত সে ভীষ্মের ঘোড়ার গাড়োয়ান অধিরথেরই পোলা; রাধাগর্ভজাত; যে তার নিজস্ব শিক্ষা শক্তি আর ক্ষমতায় রাজপুত্রগো ছাড়াইয়া উইঠা গেছিল বহুত উঁচায়...

১৮

এইবার নিজের কতা কই। জন্মসূত্রে মুই সিলেটের জৈন্তাপুরি মানু। মানবজাতিরে আমরা কই মানু আর নিজেগো কই জৈন্তাপুরি। অন্যগো লগে মারামারি লাগলে আমরা চিক্কুর দেই- জৈন্তাপুরির লগে মানোর মাইর লাইগসে; আউগগাও। মানে দুনিয়াতে জৈন্তাপুরি এক জাত আর মানবজাতি অন্য জাত। তো এই কারণসহ আরো অনেকগুলা কারণে অন্য সিলটিরা জৈন্তাপুরিদের বলে জৈন্তাপুরি ভূত। কথাটা গালি কিন্তু পুরাণটুরান ঘাঁইটা মুই আবিষ্কার কইরা ফালাইছি যে ভূত মানে ভূমিপুত্র; ভূমিজাত; ভূমিতে বর্তমান; মানে আদিবাসী; মানে স্থানীয় মানুষ। মূলত উটরা মানে যারা অন্য জায়গা থাইকা উইঠা আসছে তারা লোকাল মানুষরে হিংসা কইরা ভূত কইয়া গালি দিতে দিতে কলমের খোঁচায় কাহিনি বানাইয়া এক্কেবারে অশরীরী শয়তান বানাইয়া ফালাইছে এক কালে। একই সাথে কৃষিজীবী আদিবাসী মানুষগুলা দেখতে কালা আছিল দেইখাই তারা কৃষ্ণ কিষান কিংবা কিরান...

তো কথাবার্তা শিখার পর আবিষ্কার করলাম যে মুই তো জৈন্তাপুরি কথা কই; সিলটিরা কয় মুখ থাইকা খাসিয়া পানের গন্ধ বাইরায়। খাসিয়া পান জৈন্তাপুরের প্রতীক। তো সেইটা শুইনা জিব মুখ তেড়াইয়া ব্যাঁকাইয়া শিখলাম সিলটি। এইবার দেখি সিলেটের বাইরের লোকে কয়- তোমার মুখ থাইকা কমলার গন্ধ বাইরায়...

সিলটিগো সম্পর্কে এই কমলার গন্ধ ট্রেডমার্কখান স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের দেওয়া। তার শান্তিনিকেতনে যখন সৈয়দ মুজতবা আলী পড়তে গেছিলেন তখন তার লগে দুই-চারইরখান কথা কইয়াই রবীন্দ্রনাথ নাকি কইছিলেন তোমার মুখে কমলার গন্ধ দেইখা বুঝছি তুমি সিলটি। তো সেই থাইকা কথায় সিলেটি টান আসা মানে হইল কমলার গন্ধ থাকা...

এইবার কিন্তু আমি পড়লাম বিশাল মুশকিলে। চলতি বাংলা থাইকা সিলটি ভাষার শব্দ উচ্চারণ টান সবই আলাদা। শুরু করলাম নাটকের দল কথাকলিতে গিয়া চোখ মুখ নাক জিব খিঁচাইয়া বাংলা উচ্চারণচর্চা আর লেখকগো দলে ভিড়া চর্যাপদ থাইকা এফএম রেডিও পর্যন্ত চোখ-কান খুইলা বাংলা শব্দমালা শিখা। বহুত বছর খাটনির পর এককালে মোর বাংলা টনটনা

হইয়া উঠল; পড়ায় বলায় লেখায় শোনায়। আর তখনই আবিষ্কার করলাম- মুই যে বাংলা কই হেইয়া তো কয় না কোনো বাঙাল; এইয়া খালি পুস্তক রচয়িতারা লেহে আর রেডিও-টিভিতে কিছু মাইনসে গলায় চাপ দিয়া কোনোমতে পড়ে। এই বাংলারে মধ্যপন্থীরা কয় প্রমিত বাংলা; যদিও এই কেডায় এইটারে প্রামাণিক সার্টিফিকেট দিলো তার সাকিন নাই। আর রক্ষণশীলেরা কয় এইটা নাকি শুদ্ধ বাংলা; তার মানে কি বাকি সব বাঙাল অশুদ্ধ কতা কয়?

তোগো বিধান নিয়া তোরা বইসা মুড়ি খা আর সংস্কৃত হিব্রু ল্যাটিনের মতো মরা ভাষার ভাগাড়ে নিয়া তোগো শুদ্ধ ভাষারে ডাম্পিং কর। মুই মোর পথে যাই। বাঙালে যেমনে কতা কয় সেইভাবে বাংলা কইতে চেষ্টাই...

তবে প্রমিত কিংবা তথাকথিত শুদ্ধের বাইরে বাংলাচর্চার আরো বেশ উদাহরণ কিন্তু আছে। সৈয়দ শামসুল হক বোধ হয় এর মইদ্যে সবচে সফল। সৈয়দ হক ভাওয়াইয়া বাংলার মানুষ; এক জাতের মিঠা মিঠা সুর আছে তার রংপুরি বাংলায়। এই বাংলায় তিনি নুরলদীনের সারা জীবন নামে যে মহাকাব্যিক নাটকখান লিখছেন; সংলাপের শক্তিতে সেইটার কাছাকাছি বাংলায় আর কিছু আছে কি না আমার সন্দেহ। সেই নাটকের- 'জাগো বাহে কুনঠে সবায়' এখন বিপ্লবে ডাক দিবার লাইগা সব থিকা কার্যকর আহ্বান। তিনি কবিতাও করছেন সেই বাংলায়; পরানের গহিন ভিতর; প্রেমের কবিতা। এক্কেবারে পরানে রিনরিন কইরা বাজে শব্দগুলান। কিন্তু কেন যেন তিনি কোনো গদ্য লেখেন নাই সেই দারুণ ভাষায়...

নাট্যকার নির্দেশক অভিনেতা এসএম সোলায়মান মঞ্চে ঢাকাইয়া ভাষাটারে কমিউনিকেটিভ করা চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু তার গোলাপজান নাটকটা ছাড়া অন্য কোথাও জিনিসটা যেমন বেশি দানা বাঁধে নাই তেমনি এইটারে নিয়া অন্যগো আর ভালো কোনো উদ্যোগও চোখে পড়ে নাই। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস চলতি বাংলায় লিখলেও তার চরিত্রেরা কথা কইত ঢাকাইয়া বাংলায়; কিন্তু সেই ভাষাগুলা সাহিত্যভাষা হইয়া বাইরাইয়া আসে নাই কন্টিনিউইটির অভাবে। সম্ভবত আহমদ ছফাও একটা ছোট উপন্যাস করছিলেন চাটগাঁইয়া বাংলায়; যেইটা আমার পড়া হয় নাই। এর বাইরে দুয়েকটা কবিতা করছেন

অনেকেই; নাটকেও কিছু খাপছাড়া নাড়াচাড়া হইছে ভাষা নিয়া। পাশাপাশি কিছু পাব্লিক আরবি ফার্সি উর্দু শব্দ বসাইয়া এখনো চেষ্টা করতাছে বাংলা ভাষারে মুসলমানি দিবার। এই চেষ্টা পাকিস্তান আমলেও মিলিটারি সরকার থাইকা হইছিল বহুবার। কিন্তু এই মাল বাঙালি সমাজে আগেও যেমন বিক্রি হয় নাই এখনো বিক্রি হইতাছে না বিশেষ...

নব্বই দশকের অন্তত তিনজন লেখক ভাষার ক্ষেত্রে সেই সব প্রমিত-প্রচলিতের বাইরে নিজস্ব ধরনের ভাষায় লেখার চেষ্টায় আছেন আগাগোড়া। মুজিব ইরম আগাগোড়া কবিতা আর আংশিক গদ্য লেখেন সিলেটি ভাষায়; শামীম রেজা কবিতা লেখেন বরিশালের ভাষায় আর ব্রাত্য রাইসু কবিতা আর গদ্য দুইটাই লিখেন এক মিশ্র ভাষায়। কিন্তু যতক্ষণ না আরো অনুসারী আইসা তাগো পথে হাঁটা শুরু করব ততক্ষণ পর্যন্ত এই বিষয়ে বেশি কিছু কওয়ার সুযোগ নাই। এর বাইরে যত দূর জানা যায় এবাদুর রহমান এক ধরনের নিজস্ব ভাষা তৈরির চেষ্টায় আছেন; যারে তিনি কন পূর্ব বাংলার ভাষা। এই ভাষায় তিনি বইপুস্তকও করেন; গবেষণাও করেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত তার রচনার একটা টুকরাও পড়ার সুযোগ হয় নাই আমার; তাই আমার পক্ষে কিছুই বলা সম্ভব না তার কর্ম নিয়া...

আবু মুস্তাফিজ ইন্টারনেটেরে প্ল্যাটফর্মগুলায় সবুজ বাঘ নামে এক অদ্ভুত স্যাটায়ার ভাষায় লেখেন। গদ্যও লেখেন; পদ্যও লেখেন। মানুষ কাউরে ভেংচাইতে গেলে যেমনে ন্যাকাইয়া শব্দের উচ্চারণ বদলাইয়া কয়; কিন্তু তা শুইনা মূল কথাটার অর্থ ঠিকই বোঝা যায়; তেমনি মধ্যবাংলা অঞ্চলের টানের লগে সুর মিলাইয়া একটা পুরা ভাষা প্রায় খাড়া কইরা ফালাইছেন তিনি...

সত্তর-আশির দশকে বাংলাদেশের টিভিতে রেডিওতে সিনেমায় যারা নাটক রচনা করতেন তারা চাকর-চাকরানি গরিবগুর্বার মুখে একজাতের ছ্যাবলা বাংলা ঢুকাইয়া দিতেন। এই ভাষাটা মূলত আসছিল বাংলা সিনেমার দুর্ধর্ষ এবং দীর্ঘ সময়ের সফল ভিলেন এটিএম শামসুজ্জামানের ভাষা থাইকা। তিনি নিজে আবার একজন উচ্চমানের চিত্রনাট্য আর সংলাপ রচয়িতা। এটিএম জন্মসূত্রে নোয়াখালীর মানুষ হইলেও নিজের অভিনয়ের ভাষাটা তিনি বানাইছিলেন মধ্যবাংলা অঞ্চলের শব্দ আর উচ্চারণ দিয়া। প্রতিটা অভিনয়ের

আগে তিনি নিজেই স্ক্রিপ্টে নিজের সংলাপগুলা সম্পাদনা কইরা নিতেন। দুর্ধর্ষ এই অভিনেতা নিজস্ব শব্দের লগে নিজের অভিনয় যোগ কইরা আলাদা একটা গ্রাম্য ভিলেনি ভাষা তৈরি করছিলেন; যেইটারে ভাইঙ্গা আবার শোষিত শ্রেণির নায়কের ভাষা তৈরি করছিলেন বাংলা সিনেমার অতি সফল দীর্ঘমেয়াদি নায়ক মান্না। মান্না টাঙ্গাইল এলাকার মানুষ; এটিএমি ভাষাটার লগে তিনি যোগ করছিলেন টাঙ্গাইলের শব্দ আর উচ্চারণ...

এটিএম এখন টিভি সিরিয়ালে ভালো মাইনসের অভিনয় করেন; এখন তিনি চেষ্টায় আছেন তার ভিলেনি ভাষাটার একটা ভালোমানুষ ভার্সন তৈরিতে। কিন্তু তার বয়সের মতো তার মুখের শব্দগুলাও এখন বহুত পুরানা; যা নতুনগো লাইগা অনুসরণ করা বেশ কঠিন। তয় এটিএম শামসুজ্জামান আর মান্নার বাইরে এই ভাষাটারে কেউই শোনার উপযুক্ত কইরা তুলতে পারে নাই। টিভি-রেডিওতে এইটা আগাগোড়াই একটা বিচ্ছিরি বাংলা আছিল। টিকে নাই। অন্য দিকে পশ্চিম বাংলার রেডিও-টিভিগুলাতে পূর্ববাংলার চরিত্রগুলার মুখে আরেক ধরনের ছ্যাবলা বাংলা শোনা যায়। মূলত ষাইট-সত্তর বছরের পুরানা যশোর খুলনা বরিশাল অঞ্চলের শব্দগুলা কলকাত্তি উচ্চারণে বলায় এই উৎকট জিনিসটা তৈয়ারি হয়...

সেন্স অব হিউমার ধারণক্ষমতার দিক থাইকা বাংলা যেকোনো উপভাষা থাইকা ঢাকাইয়া ভাষাটা অনেক বেশি অ্যাডভান্স। প্রচ- শার্প আর ছোট ছোট শব্দবাক্যে এই ভাষায় বহুত কথা কইয়া দেওয়া যায়। এই ভাষাটারে ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে অন্যরকম এক শিল্পমাত্রায় নিয়া যান এমআর আখতার মুকুল। তিনি স্বাধীন বাংলা বেতারে ঢাকাইয়া উচ্চারণে ঢাকাইয়া শব্দের লগে অন্য সব শব্দ জুইড়া দিয়া চরমপত্র নামে এক কথিকা প্রচার করতেন। এই চরমপত্রে তিনি মুক্তিযোদ্ধাগো যেমন সংবাদ দিতেন তেমনি দিতেন উৎসাহ। স্বজন-বান্ধব এবং পরস্পর যোগাযোগহীন মুক্তিযোদ্ধাগো কাছে তার এই চরমপত্রখান আছিল একমাত্র উৎসাহ অনুপ্রেরণা আর সাহসের ভাষা...

নব্বই দশকের শেষ দিকে নাট্যকার মাসুম রেজা সেকু সিকান্দার নামে একটা নাটক লেখেন নতুন এক ভাষায়; তিনি কুষ্টিয়া অঞ্চলের শব্দ আর টোন নিয়া একটা অন্যরকম গ্রামীণ বাংলা তৈরি করেন। একই ভাষায় পরে তিনি এক

দীর্ঘ সিরিয়াল করেন রঙের মানুষ নামে। রঙের মানুষ নাটক রচনার শুরুতে সেলিম আল দীন যুক্ত থাকলেও ভাষাটা আগাগোড়া আছিল মাসুম রেজারই ভাষা। তার এই নাটকের ভাষাটারে মুখের ভাষায় পরিণত করার কৃতিত্বের অন্যতম দাবিদার সেকু সিকান্দারের নির্দেশক সাইদুল আনাম টুটুল আর রঙের মানুষের ডিরেক্টার সালাউদ্দিন লাভলু। লাভলু গ্রামীণ নাটক ছাড়া করেন না কিছু; আর তার সবগুলা নাটকেরই ভাষাই সেই মাসুম রেজার ভাষা। একই ভাষায় এরপর নাটক লিখতে থাকেন বৃন্দাবন দাস। নাট্যকার আর নির্দেশকদের সমন্বয়ের কারণে এই ভাষাটার এখন মিডিয়া জগতে ব্যাপক বিস্তার; কিংবা মিডিয়ার প্রধানতম গ্রামীণ বাংলা। অনেকেই এখন এই ভাষাটা ব্যবহার করেন। এইটা বুঝতে যেমন অসুবিধা হয় না তেমনি শুনতেও কানে আটকায় না কোথাও। ধীরে ধীরে মিডিয়ার বাইরেও এখন বিস্তৃত হইতেছে এই ভাষা...

মিডিয়ায় নব্বই দশকের আরেকজন মানুষ মোস্তফা সরয়ার ফারুকী। যিনি নিজে অনেকটা প্রতিষ্ঠানের রূপ নিয়া নাটক আর সিনেমা করেন; লেখেন নির্দেশনা দেন আবার শিল্পীও তৈয়ারি করেন। তিনি বহু দিন থাইকা একখানা ভাষা তৈয়ারির চেষ্টায় আছেন। মিডিয়াতে তার শিষ্যগো মাঝে নাট্যকার ডিরেক্টার আর শিল্পীর সংখ্যা বেশুমার। মূলত তিনি সাধারণ মানুষরে ধইরা আইনা নাট্যকার ডিরেক্টার শিল্পীতে পরিণত করেন। কিন্তু যারাই একটু শিখাপড়ার পর নিজের পায়ে খাড়ায়া যায় তারাই নিজস্বতা তৈরির ইচ্ছায় ফারুকীরে ছাড়ার লগে লগে তার ভাষাটাও ছাইড়া যায়। যার কারণে ধারাবাহিকতা আর সামঞ্জস্যের অভাবে ভাষাটা এখনো খাপছাড়া আর আর্টিফিশিয়াল...

নাগরিক মানুষগো মাঝে এখন এফএম রেডিও যেমন খুব জনপ্রিয় তেমনি এফএম রেডিওগুলা ইংরেজি মিডিয়ামে পড়া শিল্পীতে ভরপুর। এরা এক ধরনের পিছলা বাংলায় কতা কয়। কিন্তু এদের মূল ঝামেলা হইল এদের একেকজন সাকুল্যে দুই-চাইরশোর বেশি বাংলা শব্দ জানে না। এরা বাংলা কথার অর্ধেকটা ইংরেজি দিয়া পূরণ করে আদুলবাদুল কইরা। এই ভাষাটার সবচে ভালো দিক হইল ভাষার গতি আর আন্তরিকতা। এগো মুখের ভাষাটা নাগরিক জীবনের মতো প্রচ- গতিশীল; দৌড়াইতে দৌড়াইতে কিংবা গাড়ির

ঝাঁকি খাইতে খাইতেও এগো কথা বোঝা যায়; শুনতেও খারাপ লাগে না। এগো বাক্যগুলা ছোট ধারালো আর পিচ্ছিল...

এগো নিয়া অনেকেই খাপ্পা আছেন। কিন্তু আমার মনে হয় এই ভাষাটার মারাত্মক বড়ো একটা ভবিষ্যৎ আছে দৌড়ের উপরে থাকা ফিউচার জেনারেশনে। শহরের বহুত ইয়াং এখন এগো ধরন আর গ্রামারে কথা কয়। কারণ পুরানা বাংলাগুলা তাগো জীবনের গতির লগে যেমন তাল মিলাইতে পারে না তেমনি তাগো অগ্রসর অনুভূতি প্রকাশেও সাপোর্ট করে না বিশেষ। এই ভাষাটায় যখন আরেকটু বেশি বাংলা জানা মাইনসে কতা কইতে শুরু করব; আমার মনে হয় এইটাই হবে বাংলাদেশের পরবর্তী মৌখিক ভাষা; গতিশীল আর নাগরিক...

ইন্টারনেটে প্রচলিত বর্তমান বাংলাটা কিন্তু তথাকথিত প্রমিত বাংলার বাইরে; লেখকেরা বাইরাইয়া আসছেন। পুরানা লেখকরা এখনো চেষ্টা করেন তথাকথিত প্রমিত চর্চার কিন্তু নতুনেরা তোয়াক্কা করে না; তারা যেইটা যেইভাবে বলতে ইচ্ছা করে সেইভাবেই বলে। এইটাই বোধহয় একটা গতিশীল ভাষার মূল লক্ষ্মণ। যেইখানে ভাষা ব্যবহারকারী কোনো সময়ই ভাষা ভুল হইবার ডরে কুঁকড়াইয়া থাকে না...

কারণ ভুল হইবার ডরই যদি থাকে; তবে সেইটা আবার মাতৃভাষা কেমনে হয়?

বাংলাদেশের বাইরে পশ্চিম বাংলা ত্রিপুরা আসামে বাংলা সাহিত্যের বহুত লেখালেখি যেমন হয় তেমনি নাটক-পালাও হয়। কিন্তু সেই সব অঞ্চলের ভাষা নিয়া কারবার সম্পর্কে আমার জানাশোনা একেবারেই নাই; নিশ্চয়ই সেইখানেও হয়; কারণ বাঙালি ভাষার মরা লাশ পাহারা না দিয়া ভাষারে নতুন জীবন দিব সেইটাই তো স্বাভাবিক...

কথ্য বাংলার ক্ষেত্রে আমি বরাবরই কই যে ভাষার দিকে সবচে প্রগতিশীল মানুষ হইল বাউলরা। এগো ভাষা ব্যবহার দেখছেন? অতি সহজ তরল আর সর্বগ্রাসী। যেকোনো শিল্পমাধ্যমের আগে যেকোনো নতুন শব্দ আর বিষয়

তরল কইরা বাংলার ভিতরে তারা অবলীলায় ঢুকাইয়া দিতে পারেন। লালন থাইকা শাহ আব্দুল করিম পর্যন্ত সকলের গানের কথাগুলা খেয়াল কইরা দেখবেন। কী এমন বিষয় আছে যে বিষয়ে তারা কতা কন নাই? কোনোটা কি আরোপিত মনে হয় বা ধাক্কা লাগে শুনতে? লাগে না; লাগার কথাও না। কারণ বাউলরা মনের কতা কয় মুখের ভাষায়; বইয়ের ভাষা দিয়া তারা ঠিক করে না বাক্যের ধরন...

ভাষার মূল শক্তিটা তো মুখের ভাষাতেই। একবার খেয়াল কইরা দেখেন তো ৭ই মার্চের শেখ মুজিবের ভাসনখান। অতি স্বতঃস্ফূর্ত আর সাবলীল। কিন্তু তার পুরা বক্তৃতাটাই প্রমিত বাংলার লগে ফরিদপুরি শব্দ আর উচ্চারণ মিশায়ে করা। শেখ মুজিবের এই ভাষণের ভাষাটা হইতে পারে গতিশীল আর আন্তরিক ভাষার একখান আদর্শ উদাহরণ। পণ্ডিতেরা খুঁইজা নিতে পারেন যে কথা কইতে গিয়া বাঙালি কোন সময় আপনি থাইকা আন্তরিক আর ঘনিষ্ঠ হইতে হইতে তুমিতে নাইমা আসে। সেই ভাসনখান শেখ মুজিব শুরু করছিলেন সবাইরে আপনি কইয়া আর শেষ করছেন পুরা জাতিরে তুমি কইয়া; কিন্তু একবারের লাইগাও মনে হয় না কোথাও কোনো তুচ্ছতাচ্ছিল্য আছে; মনে হয় এইটাই ওই মুহূর্তের সব থিকা উপযুক্ত সম্বোধন। শেখ মুজিবরে অন্য কোনো ভাসনে আমি কিন্তু দর্শকগো তুমি কইতে শুনি নাই। ওইটা খালি একটা জাতিরে স্বাধীনতার লাইগা ডাক দিবার সময়ে জাতির অভিভাবকের মুখেই মানায়; সেই ভাষার গ্রামার বাঙালিরা যেমন জানে; বাঙালিরা বোঝেও...

বাংলা ইন্টারনেট জগতে এখন প্রতি দিনই নতুন শব্দ আর ভাষা তৈরি হইতাছে। অনেকগুলা ব্যাপক গ্রহণযোগ্য আর অনেকগুলা যাইতাছে পরীক্ষার মধ্য দিয়া। আবার অনেকগুলাই ঢুইকা গেছে সাম্প্রতিক সাহিত্যের পাতায়। ইন্টারনেট এখন বাংলা ভাষায় পড়াশোনা যোগাযোগ সংবাদ দেওয়া-নেওয়া সাংবাদিকতা এবং সাহিত্যচর্চার যেমন সব থাইকা বড়ো মাধ্যম তেমনি বাংলা শেখা লেখাচর্চা এবং ভাষা তৈয়ারিরও সব থাইকা বড়ো প্ল্যাটফর্ম। এবং এই জিনিসটা সম্ভব হইছে মাত্র কয়েকজন তরুণের স্বেচ্ছাশ্রমের ফসল কিছু অভাবনীয় উদ্ভাবনের কারণে...

মাত্র এক দশক আগেও ইন্টারনেটে বাংলায় লেখা যাইত না বইলা পিডিএফ ছাড়া পাওয়াও যাইত না কিছুই। সেই অবস্থায় বাংলা ভাষারে ইন্টারনেট মাধ্যমে স্বাধীন কইরা দেয় মেহদী হাসান আর তার অভ্র টিমের তৈয়ারি অভ্র সফটওয়ার। ২০০৩ সালের ২৬ মার্চ; বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবসে রিলিজ হওয়া এই অভ্রই এখন ইন্টারনেটে বাংলা পড়া ও লেখার প্রধানতম ভিত্তি। এর পাশাপাশি ২০০৭-এ যুক্ত হয় আরো দুইজন; এস এম মাহবুব মুর্শেদ এবং আহমেদ অরূপ কামালের ইউনিকোড কনভারটার ও ফোনেটিক কিবোর্ড। এই কনভারটার দিয়া পুরানা যেকোনো বাংলা যেমন ইউনিকোডে কনভার্ট করা যায় তেমনি ইউনিকোডরেও রূপান্তর করা যায় পছন্দমতো যেকোনো বাংলার টাইপে। আর ফোনেটিক কিবোর্ডটার বড়ো সুবিধা হইল; কম্পিউটারে কিবোর্ড ইনস্টল করা না থাকলেও এইটা দিয়া ব্রাউজারে টাইপ করা যায়। এবং এই সবগুলা জিনিসই বিনা মূল্যে বিতরণ ও ব্যবহারের জন্য সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাশ্রমে তৈরি...

এই তরুণদের কাছে ঋণ শুধু আমার না; এদের কাছে ঋণ সমস্ত বাংলাভাষী মানুষের...

আরো অনেকের হয়ত অনেক কাজ আছে বাংলা ভাষা নিয়া। থাকাই স্বাভাবিক; কিন্তু আমার হয়ত জানা নাই অথবা খেয়াল করি নাই অথবা মনে নাই অথবা বুঝি নাই। আমারে ধরায়ে দিয়েন; জিবে কামড় দিয়া সব মাইনা নিমু আমি...

বাংলা ভাষার মূল চরিত্রটা হইল কতা কইতে গিয়া যদি কোনো শব্দ মুখে আটকাইয়া যায় কিংবা চেহারা ভচকাইয়া তার উচ্চারণ করা লাগে তবে বাঙালি সেই শব্দটা বদলাইয়া ফালায়। দরকার পড়লে নতুন শব্দ বানায়; সুযোগ থাকলে বাইর থাইকা আইনা বাংলার লগে ফিট কইরা দেয়। এই পুস্তকে আমি সমস্ত বাঙালি জাতির ভাষা থাইকা যখন যে শব্দ পছন্দ হইছে সেইটাই নিছি; খালি খেয়াল রাখছি কোথাও আটকায় কি না। চেষ্টা করছি সহজিয়া বাংলায় গল্পগুলান কইতে; যেমনে মহাভারতের গল্পখান কইতে দিলে কইত বাংলার পালাকার কিচ্ছাকার বয়াতি বাউল...

পয়লা চেষ্টা। গোঁজামিল আছে বহুত জায়গায়। মাঝে মাঝে ইসকুলি বাংলা বাগড়াও দিছে। ধরাইয়া দিয়েন...

১৯

মহাভারত নিয়া আমি শুরু করছিলাম সেই পিচ্চিবেলায় উপেন্দ্রকিশোর রায়ের কিশোর মহাভারত দিয়া। তারপর এক সময় ঢাউস ঢাউস পুস্তক ঘাঁটাঘাঁটি; ইন্টারনেট গুঁতাগুঁতি; বন্ধুবান্ধবগো চাপাচাপি; ফোনে ঠেলাঠেলি আর বৌম্যাডামরে কঠিন কঠিন প্রশ্নের মুখে ফালাইয়া ঘুটু পাকানো বিষয়গুলার গিটঠু খুইলা নিজে তৈরি কইরা নিছি মহাভারতের নিজস্ব পাঠখান। নিজস্ব পাঠ তৈরির ক্ষেত্রে মহাভারতের গিটঠু খোলার লাইগা জিগাইতে কাউরেই ছাড়ি নাই; তা হোক গ্রামীণ লাঠিয়াল আর হউক মিলিটারি অফিসার আর হউক কাঠখোট্টা ইঞ্জিনিয়ার। পাশাপাশি ধুমায়ে দেখছি এই সব বিষয়ের লগে সামান্যতম সম্পর্কযুক্ত সিনেমা নাটক টিভি সিরিয়াল...

তারপরে শুরু করছি লেখা। একটু একটু করে লেখি আর অনলাইন লেখক ফোরাম সচলায়তনে প্রকাশ করি। সচলায়তনে প্রকাশ করি আর শত শত মানুষের মন্তব্যে পরামর্শে রেফারেন্সে ডকুমেন্ট সমালোচনায় যেমন ভইরা উঠতে থাকে আমার পাঠের দুর্বলতা; তেমনি আমিও ধীরে ধীরে পাইতে থাকি নিজস্ব পাঠের স্বচ্ছ উপাখ্যান। এরপর যখন খসড়া দাঁড়ায়ে যায় তখন ভারতীয় পুরাণ বিশেষজ্ঞ থাইকা গল্পকার এমনকি নবীনতম পাঠক পর্যন্ত প্রায় অর্ধশত পাঠক নিজেদের বিশ্লেষণ আর মেরামতির পরামর্শগুলা আমারে জানায়ে দেন। তাদের কারো কথা পুরাটাই রাখতে পারছি কারোটা পারছি আংশিক। কিন্তু তাদের আগ্রহ আমার কাছে যেমন বিস্ময়কর তেমনি তাগো কাছে আমার কৃতজ্ঞতাও অসীম; কারণ এই বইটাতে মন্তব্য করতে গিয়া অনেকেরই অনেক বইপুস্তক ঘাঁটাঘাঁটি করতে হইছে; নেটে গুঁতাইতে হইছে বহুত সময়...

তাগোরে কেমনে কৃতজ্ঞতা জানামু জানি না। তবে অনলাইনভিত্তিক এই পাঠক সমালোচক সহায়ক সমাজ না থাকলে এই বইটা আমার লেখা হইত না সেইটা এক্কেবারে নিশ্চিত...

তবে বইখান গল্প আকারে লেখা শুরু হইছিল চুমকির ধাক্কায় আর শেষ হইছে টুটুলের গুঁতায়। অভিনয় শিল্পী নাজনিন হাসান চুমকিরে একবার কুন্তীরে নিয়া একখান মঞ্চনাটক লেইখা দেওয়ার কথা দিয়া ফালাইছিলাম। লিখতে গিয়া দেখি পারি না। মহাভারত নিয়া নিজস্ব গল্পের লাইনটা লিখিত না থাকায় নাটক লিখতে গিয়া বারবার ধাক্কা খাই। তো ভাবলাম আগে তাইলে কুন্তীর গল্পগুলান গোছাইয়া লই। সেইটা গোছাইতে গিয়া চুমকির কথা ভুইলা কুন্তীরে ছাড়াইয়া পুরা মহাভারতের গল্পগুলাই লিখতে শুরু কইরা দিলাম নিজের মতো কইরা। কিন্তু লেখা কিছু আগায় তো আবার বহু দিন বইসা থাকে। এর মাঝে এক দিন টাল হইয়া টুটুলরে কথা দিয়া ফালাইলাম যে বই কইরা ফালামু এইবার। টুটুল মানে আহমেদুর রশীদ। লেখক। শুদ্ধস্বর প্রকাশনী এবং আমার সবগুলা বইয়ের প্রকাশক। কিন্তু কইয়া তো পড়লাম বিপদে। বই তো গোছানো নাই। কেমনে কী?

আমি যত কই যে টাল সময়ের কোনো কথা আমার মনে থাকে না; সে তত কয় শুধু টাল সময়ের কথাই নাকি তার মনে থাকে; বই তারে দিতেই হবে...

আমার দুর্গতি দেইখা বৌম্যাডাম দিনা ফেরদৌস; আমার কাছ থিকা বাপের ন্যাওটা দেড় বছরের মাইয়াটারে পুরা সরাইয়া নিয়া একখান আলাদা ঘর বাইর কইরা দিলেন- বইসা বইসা লেখো...

মাইয়া আইসা বাপ বাপ কইয়া দরজা থাবড়াইয়া চিল্লায় আর আমি দরজা লাগাইয়া ঘাপটি মাইরা বইসা করি মহাভারত। কিন্তু এত আউলাঝাড়া জিনিস কেউ দেইখা না দিলে কেমনে হয়? পয়লা দুইজন মানুষেরই নাম আসে। রণ দা আর পাণ্ডব দা। রণ দা মানে রণদীপম বসু; লেখক। আর পাণ্ডব দা; জাহাঙ্গীর মোহাম্মদ আরিফ; লেখক। পাণ্ডব বংশের কেউ না; মহাভারত নিয়া লেখালেখিও করেন না কিন্তু নিজেরে পরিচয় দেন ষষ্ঠ পাণ্ডব কইয়া। এই দুইজনই মারাত্মক ব্যস্ত মানুষ কিন্তু তার উপরও খুঁটায়ে খুঁটায়ে মন্তব্য আসলো এই দুইজনের কাছ থিকা। সাহস বাইড়া গেলো আমার। আর লেখা যখন শেষ

তখন আমার মারাত্মক কিছু ঘাটতি ধরাইয়া দিয়া অনেকগুলা তথ্য জোগান দিলো নজরুল; মানে ইন্টারনেটে আর মিডিয়াতে নজরুল ইসলাম আর ছাপা পুস্তকে যার নাম সৈয়দ দেলগীর...

পুলিশ মাইনসেরে বহুবিধ কারণে দৌড়ায়। কিন্তু বই লেখার লাইগা কাউরে গুঁতাইয়া দৌড়ের উপ্রে রাখা পুলিশ বোধহয় একজনই; মাশরুফ হোসেন। কঠিন পাঠক আর ভারতীয় পুরাণের এক ঘোরলাগা গ্রাহক। খণ্ড খণ্ড লেখার উপর শুধু মন্তব্যই না; বরং পুরা বইটা পইড়া অসঙ্গতি ধরার দায়টাও নিছে মাশরুফ প্রকাশের আগে...

কেউ কেউ আমারে কইছেন কই থাইকা কোন জিনিস নিছি আর কোন কথার সাক্ষী কোথায় পাওয়া যাবে তা তালিকাবদ্ধ কইরা দিলে পাঠকের নাকি সুবিধা হবে। কিন্তু এতে আমার আপত্তি আছে। প্রথমতো আমি লেখছি মহাভারতের গল্প; তালিকা-তুলিকা টাঙাইয়া এরে গবেষণাপুস্তক বানাইবার কোনো ইচ্ছা আমার নাই। দ্বিতীয়ত এই যুগে সবই পাওয়া যায় ইন্টারনেটে গুঁতা দিলে। তৃতীয়ত যদি কিছু নাও পাওয়া যায় কিংবা না মিলে আমার কথার লগে তবুও সমস্যা নাই; কারণ মহাভারত নিয়া নিজের মতো কইরা গল্প কইবার অধিকার মহাভারতই আমারে দিছে। সেই যে সৌতি কইছিলেন- শত কবি কইছেন এর কথা আর বহু কবি কইবেন পরে...

তো আমিও কইলাম আরকি আমার মতো কইরা। যেকোনো বিষয়ে যে কাউরে দ্বিমত করার সম্পূর্ণ অধিকার দিয়া...

মাহবুব লীলেন

প্রথম ভণিতা: জানুয়ারি ২০১৫। ঘষামাজা ও সংযোজন: মে ২০১৭

বাড়তি ভণিতা

অভাজনের মহাভারত পয়লা প্রকাশে বইটারে ভারী করতে চাই নাই রেফারেন্স দিয়া ওজন বাড়াইয়া। গল্পে নিজে কোনটা কেমনে ভাবছি আর কেন ভাবছি তারই একখানা খতিয়ান জুইড়া দিছিলাম ভণিতায়। আর গীতা যেহেতু মহাভারতে পরের যুগে জুইড়া দেওয়া অধ্যায়; তাই গল্প বলতে গিয়া গীতা যেমন পুরা বাদ দিয়া গেছিলাম তেমনি ভণিতায়ও এই বিষয়টা ঘোষণা দিয়া বাদ দিয়া গেছি ধর্মটর্মের বিতর্কে যাইতে না চাওয়ার ইচ্ছায়...

কিন্তু বইটা প্রকাশ হইবার পর আবিষ্কার করলাম; আমি গীতায় যাইতে চাই না বলার পরও মাইনসে গীতা নিয়া হাজির হয় বিতার্কিক মুডে। আর গীতা আইলে চইলা আসে অবতার কৃষ্ণের প্রসঙ্গ। আর সেইটার ল্যাঞ্জা ধইরা আসে অবতারবাদ আর অবধারিতভাবে রামের কথা...

আমাগো দেশে কৃষ্ণ আর রামের নাম যেমন পাশাপাশি উচ্চারণ হয়; তেমনি মহাভারত নিয়া কেউ বাক্য শুরু করলে শেষ করে রামায়ণ দিয়া। যদিও হইবার কথা না; কিন্তু এইটা হইয়া গেছে। কৃষ্ণের লগে রামের মিল বা সম্পর্ক যেমন নাই; তেমনি মহাভারতের লগে বাস্তবে রাময়ণের কোনো মিল বা সম্পর্কই নাই। কৃষ্ণ আর রাম যেমন আলাদা সমাজের মানুষ; তেমনি মহাভারত আর রামায়ণও আলাদা সময় আর সমাজের ঘটনা; ধরনও ভিন্ন...

কিন্তু যখন বেদ আর উপনিষদ বাতিল কইরা; শৈব ধর্মের লগে এডজাস্ট কইরা আর বৌদ্ধ ধর্মরে টেক্কা দিয়া গীতা নির্ভর বৈষ্ণব ধর্মটা ধীরে ধীরে দানা পাকাইয়া হিন্দু ধর্মের সৃষ্টি করতে থাকল; তখন কাহিনীর গোষ্ঠি সম্পাদনায় মহাভারত আর আর রামায়ণের ভিতর যেমন বহুত মিল তৈয়ার করা হইল; তেমনি কৃষ্ণ আর রামেরে আইনা খাড়া করা হইল এক লাইনে; অবতার বানাইয়া...

ফলে মহাভারত নিয়া কথা কইতে গিয়া রামায়ণের নাম উচ্চারণ না করলে যেমন মানুষ গোষ্ঠী অভিজ্ঞতা স্মরণ কইরা কাউ কাউ করে। তেমনি কৃষ্ণ বিষয়ে কথা শেষ কইরা দিবার পর কান খাড়া কইরা থাকে রামের বিষয়ে শুনতে...

কৃষ্ণ আর রাম একলগে আলোচনা করার পদ্ধতি আছে মাত্র দুইটা। যার একটা হইল ধর্মভক্তি; যেইটা দিয়া আলাপ করলে কোথাও কোনো খটকা চোখে পড়ে না। আর দ্বিতীয়টা হইল তুলনামূলক আলোচনা; যেইটা মূলত একটা ধান্দা লাগা বিতর্ক। কারণ সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের দুইটা মানুষরে কবিরা কল্পনা দিয়া জোড়া দিছে এক জায়গায়। ফলে এই বিষয়ে তুলনা হয় না; হয় বিতর্ক...

কিন্তু এড়াইবার যেহেতু উপায় নাই; সেহেতু এইখানে দুইটা অধ্যায় জোড়া দিয়া দিলাম। খটমটানি যাগো ভাল্লাগে না; তারা এইটা বাদ দিয়া যাইতে পারেন। আর যাদের খুঁতখুতানি আছে তথ্য মথ্য নিয়া; তারা দেখতে পারেন...

তবে রামায়ণের লগে যারা মহাভারতের তুলনামূলক সাহিত্যিকি আলোচনায় আগ্রহী তাগো লাইগা সুকুমারী ভট্টাচার্যের 'আপেক্ষিক মূল্যায়নে রামায়ণ ও মহাভারত' একখান অসাধারণ পুস্তক। এইটা সম্ভবত সুকুমারীর একমাত্র রচনা যেইটা পড়তে গেলে রামায়ণ মহাভারতের মূল গল্প বিষয়ে সামান্য ধারণা থাকা ছাড়া পাঠকের আর কোনো প্রাক-যোগ্যতার প্রয়োজন নাই...

যেহেতু ভণিতাটা লেখা হইছিল সরল পাঠকের লাইগা আর এই বাগাড়ম্বড়খান যুক্ত করা হইছে পণ্ডিতগো লাইগা; সেহেতু ঘটনা আলাপের সুবিধার লাইগা কিছু কিছু বিষয় দুইখানে রিপিটেশন আছে...

আর মূল গল্পটা; মানে অভাজনের মহাভারত যেমন আছিল ঠিক তেমনই আছে। এক তুলাও ভারী হয় নাই...

বাড়তি ভণিতার তথ্যসমর্থন:

কাহিনিসূত্র: প্রচলিত বাল্মিকী-প্রাদেশিক-আঞ্চলিক এবং উপজাতি রামায়ণ আখ্যান। কালীপ্রসন্ন মহাভারত। রাজশেখর বসুর সংক্ষিপ্ত মহাভারত ও রামায়ণ। প্রচলিত বেদ উপনিষদ এবং পুরাণ সংগ্রহ; *যুক্তিসূত্র:* রামায়ণের সমাজ- কেদারনাথ মজুমদার। ভারতবর্ষের ইতিহাস- রোমিলা থাপার। বাল্মিকীর রাম ও রামায়ণ, মহাভারতের ভারতযুদ্ধ এবং কৃষ্ণ -নৃসিংহ প্রসাদ ভাদুড়ী। বাল্মিকী রামায়ণে রাম আদিবাসী রামায়ণে রাম- বিপ্লব মাজি। ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, মহাভারত ও সিন্ধু সভ্যতা, ভারতের

বিবাহের ইতিহাস- অতুল সুর। প্রবন্ধ সংগ্রহ- সুকুমারী ভট্টাচার্য। ধর্মের উৎস সন্ধানে- ভবানীপ্রসাদ সাহু। কৃষ্ণ চরিত্র, শ্রীমদভগবদগীতা- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। মহাভারতের কথা- বুদ্ধদেব বসু। মহাভারতের মূল কাহিনি ও বিবিধ প্রসঙ্গ- শিশির কুমার সেন। ধর্ম ও প্রগতি- জয়ন্তানুজ বন্দোপাধ্যায়। রামায়ণ: খোলা চোখে, কৃষ্ণ কাহিনী মহাভারত- হরপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ক. মহাভারতের কৃষ্ণায়ণ এবং রামের বৈষ্ণবায়ন

জনপ্রিয় ধারণায় রাম-রামায়ণ-বাল্মিকীরে কৃষ্ণ-মহাভারত-দ্বৈপায়ন থাইকা প্রাচীন ভাবা হইলেও ঘটনা কিন্তু ঠিক উল্টা। এর পক্ষে পয়লা জোরালো যুক্তিটা হইল দক্ষিণ দিকে আর্যগো ভারত-বিস্তারের কালক্রমের লগে দখলি-মানচিত্রের হিসাব। মহাভারতের ঘটনাস্থল থাইকা রামায়ণ ঘটনাস্থল আরো বহুত পূর্ব দিকে। আর্যগো দক্ষিণ দিকে পা বাড়াইবার ঐতিহাসিক সময়কাল মাথায় রাইখা রমিলা থাপারও মন্তব্য করেন যে রামায়ণ তৈরি হইছে ৮০০খিপূর অন্তত পঞ্চাশ থাইকা একশো বছর পরে। মানে সাড়ে সাত থাইকা সাতশো খিপূর দিকে...

রমিলা থাপারের এই যুক্তিটা অতুল সুরও সমর্থন করেন। আর্য-যাত্রার সময়কালের লগে আর্যগো ভূগোল-পরিক্রমা নিয়া যারা কাজ করেন তাগো প্রায় সকলেরই হিসাব নিকাশ প্রায় এক। সকলেই মোটামুটি একমত যে কুরু-পাঞ্চাল এলাকাই হইল পয়লাবারের মতো আর্যগো সাম্রাজ্য স্থাপনের নিদর্শন; যেইখান থাইকা অযোধ্যা কিংবা কোশলের মতো দক্ষিণের ভূমি পর্যন্ত পৌছাইতে আর্যগো সময় লাগছে আরো কয়েক শো থাইকা হাজার বছর...

বাল্মিকীরে রামায়ণের সক্রিয় চরিত্র ধইরা রামায়ণ বিচার করতে গেলে রামায়ণের প্রাচীনত্ব কইমা আসে আরো কয়েকশো বছর। কারণ ঐতিহাসিকভাবে ধরা হয় বাল্মিকী খিপূ পাঁচ থাইকা চাইর শতাব্দির মানুষ। এমন কি বিপ্লব মাজীর মতো কেউ কেউ কন যে সংস্কৃতে রামকথার সব থিকা প্রাচীন নিদর্শন ভট্টিকাব্য এবং বাল্মিকীর রামায়ণ রচনার আগেই কালিদাস তার রঘুবংশ লিখা ফালাইছিলেন। মানে বাল্মিকী কালিদাসেরও পরের মানুষ। রামায়ণে বাল্মিকীর উপস্থিতি সঠিক ধইরা নিতে গেলে তার পোলার বয়েসি রামের বয়সও কইমা আসে আরো বেশ কিছু। আর রামেরে অবতার ধরতে গেলে সেই হিসাবটা চইলা আসে আরো বহু বহু কাছে; বৌদ্ধ বিপ্লবের পরে আর খ্রিস্ট জন্মের সামান্য কিছু আগে। কারণ ধর্মের উৎস সন্ধানে বইয়ে ভবানীপ্রসাদ সাহু কন রামেরে অবতার হিসাবে পরিচিত করানো হইছে আর্যগো দক্ষিণ দিকের যাত্রার সময়; গুপ্ত যুগে...

অন্যদিকে মহাভারতের পাণ্ডবগো সপ্তম পুরুষের রাজত্বকালীন হস্তিনাপুরের কিছু নিদর্শনের বয়স মোটামুটি নির্ধারিত হইছে খিপূ ৮০০'র মতো। এইটারে ধইরা রমিলা থাপার তার ভারতবর্ষের ইতিহাস পুস্তকে কুরুযুদ্ধের সময় নির্ধারণ করেন ৯০০খিপূ। বেশিরভাগের হিসাবে মহাভারত কমবেশি এক হাজার খিপূ সালের ঘটনা। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হিসাবে কুরুযুদ্ধ হইছে ১৪৩০খিপূ সালে। অতুল সুর তার মহাভারত ও সিন্ধু সভ্যতা পুস্তকে বিশ্লেষণ কইরা দেখান যে প্রাচীন দুই গণিতবিদ আর্য ভট্ট আর বরাহ মিহিরের গণনায় যুধিষ্ঠিরের রাজ্য অভিষেকের সময় গিয়া খাড়ায় ২৪৪৮ খিপূ সাল। আর্যভট্ট-বরাহ মিহির কুরুযুদ্ধ নিয়া কিছু কন নাই আর সাক্ষী প্রমাণের অভাবে অতুল সুর কুরুযুদ্ধের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। কুরুযুদ্ধ বিশ্বাসীরা চাইলে এই তারিখ থাইকা তিরিশ বচ্ছর বিয়োগ দিয়া কুরুযুদ্ধের সাল বাইর কইরা নিতে পারেন...

এর বাইরে জনপ্রিয় প্রচলিত ধারণামতে মহাভারতের সময়কাল ৩১০০খিপূর কাছাকাছি। কিন্তু আর্যভট্ট-বরাহ মিহিরদের হিসাব কিংবা মহাভারতের আরো প্রাচীনত্বের দাবি মানতে গেলে আরেকটা বিকট ঝামেলায় পড়তে হয়। সেই ক্ষেত্রে মাইনা নিতে হয় যে মহাভারতের ঘটনা ঘটছে ভারতবর্ষে আর্যগো আগমন এবং ঋগবেদ তৈরির দেড় দুই হাজার বচ্ছর আগেই। সেইটা মানার যুক্তি আছে বইলা মনে হয় না। কারণ মহাভারতের চরিত্রগুলারে অন্তত প্রাক-আর্য হরপ্পা-মহেঞ্জোদারোর মানুষ ভাবা প্রায় অসম্ভব...

ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম দিকে ঢোকা ইরানি মানুষ বা আর্যগো পয়লা দলের যে আগমন ক্যালেন্ডার পাওয়া যায় তা সর্বোচ্চ ১৫০০ খিপূ সাল। ঘোড়ায় চইড়া প্রথমে আফগানিস্তানে ঢোকা এই ইরানিরাই নিজেগো আদিভূমি থাইকা স্মৃতিতে নিয়া আসছিল ঋগবেদের কিছু শ্লোক। পরে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে পাঞ্জাবে থিতু হইয়া আদিভূমির স্মৃতির লগে পাঞ্জাববাসের অভিজ্ঞতা মিলাইয়া মোটামুটি ঋগবেদরে একটা সাইজে নিয়া আসে; যদিও ঋগবেদ রচনা চলতে থাকে আরো প্রায় হাজারখানেক বছর। মোটামুটি আর্যগো সারা ভারত জয়কালীন পর্যন্ত চলতে থাকে ঋগবেদের সংযোজন পরিবর্ধন। এবং এর লগে লগেই তৈয়ারি হয় আরো দুইখানা কিংবা মতান্তরে তিনখান বেদ...

ভারতে আর্যগো আগমনকালের দিকে তাকাইয়া একটা জিনিস অন্তত নিশ্চিত কইরা বলা যায় যে খিপূ ১৫০০ সালের আগে ভারতবর্ষে বৈদিক কিংবা ইরানি-আর্যভাষাগোষ্ঠী সম্পৃক্ত কোনো ঘটনার কোনো অস্তিত্ব নাই; শাস্ত্রও না; ভগবানও না; রাজা-বাদশা-ঋষি-কবি-যুদ্ধ এইগুলা তো বহুত বহুত দূর। এর আগের বইলা যা কিছু দাবি করা হয় তা সবই মূলত সময় গুণতে না পারা ধর্মবিশ্বাস কিংবা লোকায়ত সাহিত্য...

এই হিসাবে মহাভারত ঘটনার বয়স সংক্রান্ত বঙ্কিমচন্দ্রের হিসাবটাও বাতিল না কইরা উপায় থাকে না। কারণ আর্যগো আগমন কাল থাইকা বঙ্কিমচন্দ্রের হিসাবে কুরুযুদ্ধকালের ব্যবধান সত্তুর বছর। আর হিসাবমতে কুরুযুদ্ধকালে যুধিষ্ঠিরসহ প্রায় সকলের বয়স আছিল কমপক্ষে ষাইটের কাছাকাছি কিংবা বেশি। এই ক্ষেত্রে বঙ্কিমের হিসাব মাইনা নিতে গেলে ধইরা নিতে হইব যে বিদুর পাণ্ডু- ধৃতরাষ্ট্র এদের সকলেরই জন্ম হইছে ভারতে আর্যগো আগমনের আগেই; অন্য কোথাও। তাছাড়া ঋগ্বেদরে যারা অনেক প্রাচীন কইতে চান তারা কন এইটা তৈরি হইছে খিপূ ১৩০০-তে আর যারা এরে আরো নবীন বলেন তারা কন ১২০০ খিপূ; মানে বঙ্কিমচন্দ্রের হিসাবে কুরুযুদ্ধের কমপক্ষে ১৩০ কিংবা ২৩০ বছর পরে...

মহাভারতরে ঋগবেদের আগের ঘটনা ভাবা কঠিন। কারণ ঋগবেদ যেখানে বেশ ভালো কইরাই আর্যগো ছোটখাটো ঘটনাবলীর ডায়েরি কইরা গেছে সেইখানে কিন্তু মহাভারত ঘটনার কিছুই নাই। আবার এইটাও সইত্য যে মহাভারত কাহিনিতে কিন্তু কিছু বৈদিক দেবতার অগোছালো উপস্থিতি ছাড়া বৈদিক সিস্টেমের প্রভাব প্রায় কিছুই নাই। আবার মহাভারতে বৈদিক দেবতাগো যে উপস্থিতি; তাতে এইটারে বৈদিক দেবতাগো দাপটের কাল না কইয়া পতনকালের সাক্ষী হিসাবেই ধরবার যুক্তি বেশি মনে হয়। সেইখানে সূর্য আইসা কিশোরী কুন্তীর খেলায় সঙ্গ দেন; অগ্নী আইসা ভিক্ষা করেন কৃষ্ণ-অর্জুনের কাছে। দেবরাজ ইন্দ্র অর্জুনের কাছে মাইর খাইয়া পরে কুরুযুদ্ধে অর্জুনের ফুটফরমাস খাটেন। অথচ অন্যদিকে পাণ্ডবপক্ষের অর্জুন কিংবা কুরুপক্ষের অশ্বত্থামা কারোপক্ষেই কার্যকর বীরত্ব দেখানো সম্ভব হয় না বৈদিক সমাজে আত্মীকৃত নতুন অনার্য দেবতা শিবের আশীর্বাদ ছাড়া...

অবশ্য হিসাব মতে মহাভারতে বৈদিক দেবতার উপস্থিতি; মানে কুন্তীরে গর্ভবতী করা থাইকা কর্ণের অক্ষয় কবচ চুরি আর অবৈদিক দেবতা শিবের ভূমিকা; মানে দ্রৌপদীরে পাঁচ স্বামী দান করা থাইকা পাঁচ পোলা হত্যায় ইন্ধন দেয়া; দুইটার কোনোটাই আদি মহাভারতের অংশ না। দুই ধরনের দেবতার উপস্থিতিই পরবর্তীকালের ইনজেকশন। কিন্তু ইনজেকশনের ধরন দেইখাই সেইখানে বৈদিক দেবতাগো পতনকাল আর শিবের উত্থানকালের নিদর্শন কিন্তু অনুমান করা যায়...

আবার অন্যদিকে দ্বৈপায়নের মতো অনার্যগর্ভজাত এক ঋষি ছাড়া পুরা মহাভারত কিন্তু সম্পূর্ণভাবে সাধারণ ব্রাহ্মণগো দাপটমুক্ত আখ্যান। তবে দ্বৈপায়নের সম্মান সেইখানে ঋষি হিসাবে নাকি কুরু-পাণ্ডবের পিতামহ হিসাবে সম্মানিত সেইটা কিন্তু বিতর্কের বিষয়...

সাধারণভাবে ব্রাহ্মণসেবা বা বামুন বন্দনা বলতে যা বোঝায় তার অস্তিত্ব মহাভারতে নাই। মহাভারতে পুরোহিত বামুনগো এক্কেবারে নীচু স্তরের রাজকর্মচারী ছাড়া অন্যকিছু ভাবা কঠিন। সম্রাট ধৃতরাষ্ট্রের পুরোহিত কৃপাচার্য শান্তনু পরিবারে পালিত এক না খাওয়া ঘরের সন্তান। ধৃতরাষ্ট্রের দূত সূতপুত্র সঞ্জয়রে আমরা সম্রাটের লগে যতটা বড়ো গলায় কথা কইতে দেখি কৃপাচার্যরে তার কণামাত্র দেখি না। তিনি আগাগোড়া তলুয়া হিসাবেই আচরণ করেন। যুধিষ্ঠিরের পুরোহিত ধৌম্যরে পাণ্ডবগো পিছে পিছে ঘটিধরা মানুষ ছাড়া অন্য কিছু ভাবার সুযোগ নাই...

মহাভারতে আরেকজন রাজকীয় পুরোহিতের দেখা পাই; পাঞ্চাল রাজ দ্রুপদের পুরোহিত; যে পয়লাবার শান্তি প্রস্তাব নিয়া হস্তিনাপুর যায়। কিন্তু দ্রুপদ যেইভাবে তারে কাজ বুঝাইয়া দিছেন আর রাজসভায় তারে যেইভাবে ভীষ্ম এমনকি কর্ণ পর্যন্ত ঝাড়ি দেয়; তাতে তার সামাজিক অবস্থান যে কোনোভাবেই উপরের দিকে না তা কিন্তু এক্কেবারে পরিষ্কার হইয়া যায়। উল্টাদিকে রামায়ণে বিশ্বামিত্র-বশিষ্ঠগো দাপট ছাড়াও গৌতমপুত্র তরুণ শতানন্দ যেই রকম ব্যক্তিত্ব নিয়া রাজার লগে কথা কয়; তাতে নিশ্চিত ধইরা নিতে হয় যে রামায়ণ সমাজে পুরোত বামুনের স্থান যেকোনো মন্ত্রী থাইকাও উপরে...

অন্যদিকে বুদ্ধদেব বসু আমাগো মনে করাইয়া দেন যে মহাভারতে একবারের লাইগাও কিন্তু কৃষ্ণের মুখে বামুন বন্দনা কিংবা শূদ্র নিন্দার কথা শোনা যায় না। মানে মহাভারত যুগ পর্যন্ত এই দুইটার কোনোটাই আছিল না। তার আরেকটা প্রমাণ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে কুন্তীর আয়োজনে নয় পুত্রবধূর এক্কেবারে মাঝখানের আসনে শূদ্রেতর অনার্য নারী হিড়িম্বারে বসানোর আয়োজন থাইকাও আমরা অনুমান করতে পারি...

কৃষ্ণভক্ত বামুন বঙ্কিমচন্দ্র যেইখানে খালি শূদ্রঘরে জন্মাইবার কারণে শূদ্রগো ছ্যা ছ্যা কইয়া তার ভগবদগীতায় ঘিন্না করেন; সেইখানে বঙ্কিমের ভগবান কৃষ্ণ কোনো শূদ্রনিন্দাই করেন নাই; কারণ চতুর্বর্ণ জিনিসটা মহাভারতের আরো প্রায় পাঁচশো বছর পরে বঙ্কিমচন্দ্রের মতো ধুরন্দর বামুনগো হাতে আবিষ্কৃত জিনিস। মহাভারতে যা আছে তা কিন্তু ব্যক্তির বন্দনা কিংবা নিন্দা; সেইটা তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের লাইগাই। তার জাতের লাইগা না। সেইখানে পরের ঘরের বৌ টানাটানি করার লাইগা ভরদ্বাজের মতো ঋষি বামুনের পোলারে আমরা পাব্লিকের হাতে পিটানি খাইয়া মরতে কিংবা অস্ত্র চুরির লাইগা সন্ন্যাসী বামুনরে ভীমের হাতে কিল খাইয়া মরতে যেমন দেখি; তেমনি বিনাবাক্যে সকলরেই দেখি মাইমল কন্যা সত্যবতীর পোলা দ্বৈপায়নের কথা মাথা পাইতা নিতে...

বামুনরা ধীরে ধীরেই তাগো পরখাউকি পদ সুরক্ষিত করছে রাজতন্ত্রের ভিতর। বহুত বহুত সময় লাগছে এতে। বেদ প্রচার- যজ্ঞ- উপনিষদ- পুরাণ- গীতা এমনকি পূজা পদ্ধতি প্রচলন হওয়া পর্যন্ত চলছে বামুনগো অবস্থান নিশ্চিতকরণের প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ারে মাথায় রাইখা মহাভারতের দিকে তাকাইলে এইটা অন্তত নিশ্চিত মনে হয় যে মহাভারতকালে অগোছালোভাবে ঋগবেদ এবং হয়ত অন্য বেদগুলার কিছু কিছু বিধান বা শ্লোক প্রচলিত থাকলেও বৈদিক সিস্টেমের লাঠিটারে বামুনরা তখনো ঠিকমতো জুইত কইরা ধরতে পারে নাই। যেইটা রামায়ণ সময়ে আইসা মোটামুটি পোক্ত কইরা ধরছে তারা...

মহাভারত সময়ে বেদের শ্লোকগুলা অগোছালো অবস্থায় থাকার একটা ইংগিত মহাভারতের রচয়িতার জীবনীতেই আছে। সেইখানেই কওয়া হইছে

যে অগোছালো বেদগুলারে দ্বৈপায়নই পয়লা গুছায়া সংকলন করেন; যদিও সুকুমারী ভট্টাচার্যের ভাষায় কইতে হয় যে ‘শাস্ত্রে ব্যাসের মৃত্যুর কথা লেখে না’ তবুও সত্য হইল যে দ্বৈপায়নের জীবনী রচনা করা হইছে তিনি মইরা যাবার অন্তত ছয়-সাতশো বছর পরে...

রামায়ণরে মহাভারতের পরের আখ্যান কইতে গেলে সব থিকা বড়ো বাধাটা আসে অবতারবাদী বৈষ্ণবগো কাছ থিকা। তাগো হিসাব মতে রাম বিষ্ণুর সপ্তম আর কৃষ্ণ হইলেন অষ্টম অবতার...

অবতারবাদী ধারণামতে বিষ্ণুর দশজন অবতারের মইদ্যে নয়জন আইসা গেছেন আর ভবিষ্যতে কল্কি অবতার নামে আরো একজন আসবেন। তবে আইসা পড়া নয় অবতারের তালিকায় কিন্তু ভিন্নতা আছে...

তালিকায় বিষ্ণুর অবতারগো মইদ্যে পয়লা তিন অবতার মাছ-কচ্ছপ-শূওর। চতুর্থ অবতার আধা মানুষ আধা সিংহ। পঞ্চম অবতার এক অপূর্ণ মানুষ বা বাইট্টা মানুষ। বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার হইলেন ভার্গব বংশের পরশুরাম; পয়লাবারের মতো এক পূর্ণ মানুষ। এই তালিকার সাত নম্বরে রাম আট নম্বরে কৃষ্ণ। যদিও ছয় নম্বর পরশুরামরে আমরা সাত আর আট নম্বরের সময়ও কুড়াল হাতে নিয়া ঘুরাঘুরি করতে দেখি...

অবতার তালিকার নয় নম্বরে দক্ষিণ ভারতীয় তালিকায় আছে কৃষ্ণের ভাই বলরামের নাম। অন্যসব তালিকায় বলরামের জায়গায় গৌতম বুদ্ধ। আবার গৌড়ীয় আর নিম্বার্ক এর মতো মধ্যযুগীয় বৈষ্ণবগো তালিকায় অবতার হিসাবে কৃষ্ণর নাম নাই। এইসব মতে কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান; কৃষ্ণ শুধু অন্যান্য অবতারগো উৎসই না; স্বয়ং বিষ্ণুরও উৎস তিনি...

কৃষ্ণ বিষ্ণুর উৎস কথাটারে সোজা বাংলায় অনুবাদ করলে কিন্তু খাড়ায় যে বিষ্ণু বা নারায়ণের সৃষ্টিকর্তা হইলেন কৃষ্ণ। বেদে বিষ্ণু বা নারায়ণের কোনো অস্তিত্বই নাই। যদিও বেদের কয়েকজন বসু কিংবা সূর্যর লগে বিষ্ণু বা নারায়ণের সম্পর্ক দেখানোর একটা চেষ্টা করা হয়; কিন্তু বেদে বসুরা যেমন নগণ্য দেবতা তেমনি সূর্যও তাই। মূলত ব্রহ্মা এবং শিবের মতো নারায়ণ বা বিষ্ণুও অবৈদিক লৌকিক দেবতা....

ঠিক এই জায়গাটায় সুকুমারী ভট্টাচার্য আর নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ীর রচনা সামারি করলে কিন্তু সরাসরি বইলা দেয়া যায় যে- আইজকার ভগবান নারায়ণ বা বিষ্ণুর সৃষ্টি হইছে স্বয়ং বাসুদেবপুত্র কৃষ্ণ এবং তার ভার্গব বংশজাত আত্মীয় স্বজনের হাতে। কৃষ্ণ দ্বারা নারায়ণী বা ভাগবতী বা পাঞ্চজন্য ধর্মের প্রচার আর তার সংকলন হিসাবে ভগবৎগীতা রচনা; সব কিছুই ঘটছে তথাকথিত কুরুযুদ্ধের পরে...

কৃষ্ণের বুদ্ধিতে কুরুযুদ্ধ জয় কইরা সম্রাট হইবার পর যুধিষ্ঠির কিন্তু কৃষ্ণরে ফালায়া দেয়। বলতে গেলে হস্তিনাপুর থাইকা খেদাইয়াই দেয়। রাজসূয় যজ্ঞে যেই কৃষ্ণরে যুধিষ্ঠির দেবতার অর্ঘ্য দেয়; সম্রাট হইবার পর তার অশ্বমেধ যজ্ঞে সেই কৃষ্ণরে নিমন্ত্রণখান পর্যন্ত করে না যুধিষ্ঠির। এই পর্বে যুধিষ্ঠির পুরাই চইলা যায় কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের কব্জায়। এই নিয়া ভাইয়েগো মাঝে গ্যাঞ্জামও হয়। যুধিষ্ঠিরের লগে গ্যাঞ্জামে অর্জুন ভিন্নভাতে বাস করতে থাকে ইন্দ্রপ্রস্থ গিয়া। আর বাকি তিন ভাই থাকে সম্রাটের লগে হস্তিনাপুর। এই পর্বে পাণ্ডবগো মাঝে কৃষ্ণের যোগাযোগ থাকে একমাত্র তার বন্ধু আর বইনের জামাই অর্জুনের লগে। যুধিষ্ঠিরের সাথে এক্কেবারেই না। এর পিছনে কিন্তু মূল কাঠি নাড়েন বেদজ্ঞ কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন....

কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন কৃষ্ণরে বেদবিরোধী মানুষ বইলাই প্রচার করতেন। এই পর্বটারে অনেকেই কৃষ্ণের পতন কইলেও সেইটাই কিন্তু কৃষ্ণ-জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অধ্যায়। কারণ হস্তিনপুর থাইকা বহিস্কৃত হইবার পরেই অন্য এক পরিচয়ে আত্মপ্রকাশ করেন কৃষ্ণ। যুদ্ধমুদ্ধ বাদ্দিয়া কৃষ্ণ শুরু করেন ধর্মের প্রচার। ভক্তিবাদী ধর্ম। নারায়ণী অথবা ভাগবতী অথবা পঞ্চরাত্র। বহুত সম্পাদনা আর সংযোজন বিয়োজনের পর সেইটারই আজকের পুস্তক ভার্সন হইল গীতা আর প্রায়োগিক ভার্সন হইল বৈষ্ণব ধর্ম...

গীতারে বর্তমানে বেদ উত্তীর্ণ দর্শন হিসাবে সাফাই দিয়া বেদের লগে লাইনআপ করা হইলেও গীতা মূলত বেদবিরুদ্ধ দর্শন। যার লাইগা ঘাটে ঘাটে কৃষ্ণের এইটা বাধাপ্রাপ্ত হয় দ্বৈপায়নের কাছে। কৃষ্ণের ধর্মপ্রচার থামাইতে না পাইরা পুরা যাদব বংশটারেই নির্বংশ কইরা দেন বেদব্যাস কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন। মহাভারতে নারদ টারদের যেইসব অভিশাপে যাদবকূল ধ্বংস হইবার কথা

পাওয়া যায় সেইগুলা ভূয়া। মূলত দ্বৈপায়ন আর তার বেদব্যাস ঘরাণাই যাদব বংশরে নাশ কইরা দেয়...

বড়ো বেঘোরে ধ্বংস হয় কৃষ্ণের বংশ। বড়োই করুণ মৃত্যু ঘটে কৃষ্ণের। বুদ্ধদেব বসুর ভাষায়- মানবেতিহাসের হীনতম মৃত্যু। কিন্তু বংশনাশ হইয়া গেলেও কোনোভাবে টিকা থাকে কয়েকটা জিনিস; ভাগবতী বা নারায়ণী ধর্ম; বেদ বিরুদ্ধ ভগবতগীতা; দেবতা হিসাবে নারায়ণের প্রতিষ্ঠা; আর নারায়ণ বা বিষ্ণুর প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে যাদব কৃষ্ণ স্বয়ং...

ভাগবতী ভক্তিবাদী দর্শন এক্কেবারে কিন্তু একলা কৃষ্ণের আবিষ্কার না; এর কিছু কিছু উপাদান আগেও আছিল। বিশেষ কইরা এর উপর উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্বের প্রভাব বহুত। তবে ব্রহ্মতত্ত্ব আর বৈষ্ণব ধর্মে বর্তমানে ফারাকের পরিমাণই বরং বেশি। কৃষ্ণ বৈদিক যজ্ঞ-মজ্ঞর স্থলে নিয়া আসেন ভক্তিরে; ধীরে ধীরে তৈরি হইতে থাকে গীতার দর্শন। অবতার জিনিসটা মূলত ভগবানরে নিজের ঘরে নিয়া আইসা ঘনিষ্ঠ হিসাবে অনুভব করানোর কৌশল। এই ভগবান বৈদিক লুজ কারেক্টার দেবতা না; যারে চাইলেই মাইর দেয়া যায়। আবার উপনিষদের নিরাকার ব্রহ্মাও না; যারে দেখাও যায় না ছোঁয়াও যায় না; অনুভব তো দূরের কথা...

উপনিষদের নিরাকার ব্রহ্ম কিন্তু কোনো বামুনের উদ্ভাবন না; একজন রাজার উদ্ভাবন। ক্ষত্রিয় প্রবাহণ তার নিরাকার ব্রহ্মারে পরিচয় করানোর লাইগা শিষ্য হিসাবে গ্রহণ করেন ঋষি উদ্দালক আরুণীরে। প্রবাহণের ব্রহ্মতত্ত্বরে প্রচার করার লাইগাই ঋষি উদ্দালক তার পোলা শ্বেতকেতুরে নিয়া শুরু করেন উপনিষদ রচনার সূচনা। উপনিষদ রচনা কিন্তু চলতে থাকে মোটামুটি খিপূ তৃতীয় শতক পর্যন্ত। মানে বৌদ্ধ ধর্ম আর বৈষ্ণব ধর্মের সমান্তরালে বহু বছর। কিন্তু এর মইদ্যেই বৈষ্ণব ধর্ম ছাপাইয়া উঠে বৈদিক-উপনিষেদিক কিংবা শৈবধর্মসহ বর্তমান হিন্দুবাদী অন্য সকল ধর্মের উপরে। আত্মা কর্মফল ভক্তি এই উপাদানগুলারে মিলায়া মিশায়া গেরস্থ কিংবা সন্ন্যাসী সকল ভক্তের কাছে ফলাফলহীন ভক্তি প্রত্যাশা কইরা কৃষ্ণ নিজেরে স্থাপন কইরা দেন স্বয়ং ভগবানের স্থানে; নারায়ণ; বিষ্ণু...

কৃষ্ণর ধর্মপ্রতিষ্ঠায় কৃষ্ণউত্তরকালে মূল কামটা করেন ভার্গববংশজাত তার আত্মীয়েরা। যে দ্বৈপায়ন গীতার বিরোধীতা করছেন; ভার্গবরা সেই গীতারেই নিয়া ঢুকাইয়া দেয় দ্বৈপায়নের মহাভারতের ভিতর। রচনা করে কুরুযুদ্ধের আখ্যান। আগাগোড়া বদলাইয়া দেয় মহাভারতের অধ্যায় কাহিনি এবং পুরা মহাভারতটারেই পরিণত করে কৃষ্ণ কাহিনিতে...

বেদ ছাইড়া কৃষ্ণরে স্বয়ং ভগবানের আসন দিয়া বৈষ্ণব ধর্ম ছড়াইয়া পড়ে বেদোত্তর কালে। অবতারবাদীরা অবশ্য কৃষ্ণরে ভগবান না বইলা সিরিয়ালি অবতারগো মাঝে সব শেষের সিরিয়ালে রাইখা বৈষ্ণব ধর্মরে পোক্ত করেন। কৃষ্ণরে আইসা পড়া নয় অবতারের সিরিয়ালের শেষে রাখার উদ্দেশ্য হইল এর পরে যাতে আর কেউ কৃষ্ণকথার উপর খবরদারি করতে না পারে। অনেকটা নবী মোহাম্মদের পুরানা সকল নবীরে একটা কইরা সালাম দিয়া নিজেরে শেষ নবী ঘোষণা কইরা নতুন নবী আসার দরজায় পেরেক মাইরা দিবার মতো। তবে মোহাম্মদ যেমন ভবিষ্যতে একজন ইমাম মেহদি আসার একটা চিপা রাস্তা খোলা রাখছেন; তেমনি অবতারবাদীরাও একটা চিপা রাস্তা খুইলা রাখছে ভবিষ্যতে একজন কল্কি অবতার আসার লাইগা। কিন্তু এইটাও নিশ্চিত যে এখন কল্কি অবতার কইয়া কারো আর খাড়াইবার প্রায় কোনো চান্স নাই এই জটিল মনস্তাত্ত্বিক যুগে...

প্রশ্ন হইল অবতার হিসাবে কৃষ্ণের পরে রামের দরকার হইল ক্যান? অবতারের তালিকার দিকে তাকাইলে একটা জিনিস পরিষ্কার হইয়া যায় যে সেই তালিকায় কৃষ্ণের আগে যাগো নাম পাওয়া যায় তাগো মাঝে কৃষ্ণ ছাড়া কেউই কীর্তিমান না। সিরিয়ালি পয়লা চাইর জন এমনকি মানুষও না; বরং তারা মাছ কচ্ছপ শুওর আর সিংহ। অবতারের তালিকায় পয়লা যে মানুষের দেখা মিলে সে আবার বামন কিংবা অপূর্ণ মানুষ। তালিকার ছয় নম্বরে একজন পূর্ণ মানুষের নাম পাইলেও সেই পরশুরামের আদৌ কী বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে তা খুইজা বাইর করা মুশকিল। পরশুরামের যা গল্প পাওয়া যায় তার মইদ্যে আছে বাপের মরার প্রতিশোধ নিতে একুশখান বেহুদা হত্যাযজ্ঞের কাহিনি। আর আছে অস্ত্র শিক্ষার ইস্কুল চালানো। আর তার লগে আছে নিজের মায়েরে খুন করার মতো মাতৃঘাতী অপবাদ। বৌ নাই; পোলাপান নাই; সমাজ নাই; মানবজাতির উপকারের কোনো রেকর্ডও নাই...

সুকুমারী ভট্টাচার্যের ভাষায় অবতারগো মাঝে কৃষ্ণই একমাত্র ত্রাতা। তার সকল কাজই অন্যের লাইগা। শিশুপালের বাগদত্তা রুক্মিণীরে জোর কইরা বিবাহ করা ছাড়া নিজের শক্তি দিয়া নিজের লাইগা আর কিচ্ছু করেন নাই তিনি। বাকি সব কাজ অন্যের লাইগা। রাজা বানাইছেন কিন্তু রাজা হন নাই...

কিন্তু কৃষ্ণ এক নিম্নবর্গের চাষী পরিবারের কালা রংয়ের মানুষ। কোনোভাবেই কোনো রাজবংশের মানুষ না। একজন যোদ্ধা আর বড়োজোর দার্শনিক মাত্র। সবচে বড়ো বিষয় হইল কৃষ্ণের যুদ্ধটা পুরাপুরি বৈদিক সমাজেরই বিপক্ষে; বামুনগো সম্মান টম্মান দেখানোর তেমন কোনো উদাহরণ নাই তার। তার উপরে বড়ো বেঘোরে নির্বংশ হইতে হইছে মানুষটারে। তার উপরে তার প্রকাশিত যোদ্ধা আর কূটনীতিবিদের জীবন; যেইখানে ভালো কাম করার থাইকা ভালো কইরা কাম করা বেশি গুরুত্বপূর্ণ আছিল; যার লাইগা সততা ফততারে কূটনৈতিকের মতো হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করলেও কৃষ্ণের পক্ষে সেইগুলারে মাইনা চলা সম্ভব আছিল না...

কৃষ্ণ সততার কথা কইতেন; সততারে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতেন; কিন্তু কোনোভাবেই বলা যাবে না যে তিনি আগাগোড়া আছিলেন একজন সৎ মানুষ। এর সাথে আছে তার বেহদ্দ মাতাল বংশের বদনাম; পরের বাগদত্তা টাইনা আনার দুর্নাম; নিজের মামারে খুন করার দুর্নাম; আছে ঘাটে ঘাটে বিবাহের ইতিহাস; পরিবারে নিজের পোলার লগে সৎমায়ের পরকীয়ার কেলেংকারি...

এইসব ঘটনার লগে গোয়ালা আয়ন ঘোষের ভাইগ্নার মামীরে লইয়া টানাটানি আর কদম ডালের বানরামিও যখন এই কৃষ্ণের ঘাড়েই মূর্খ বৈষ্ণব কবিরা চাপায়া দিলো তখন বৈষ্ণব ভার্গবগো দরকার পড়ল নারায়ণের বিতর্কহীন একজন রাজবংশীয় অবতার...

বিষয় হইল ততদিনে ললিত বিস্তারের কল্যাণে গৌতম বুদ্ধের ক্লিন ইমেজ কিন্তু বিশাল ফ্যাক্টর হইয়া উঠছে। বৌদ্ধ বিপ্লবে হিন্দুধর্মের অবস্থা পুরাই নাজুক। কোথাও কোথাও হিন্দু পণ্ডিতেরা ঘর সামলাইতে গিয়া স্বয়ং বুদ্ধরেই অবতার হিসাবে গ্রহণ কইরা ফালাইছেন। যদিও তখন পর্যন্ত ‘হিন্দু ধর্ম’ কথাটা চালু হয় নাই...

সমস্যা হইল বুদ্ধরে অবতার স্বীকার কইরা হিন্দুধর্ম প্রচার আর প্রচলিত হিন্দু ধর্মের বিপক্ষে বৌদ্ধ ধর্মের অবস্থান দুইটা সম্পূর্ণ দুই মেরুর জিনিস। বৌদ্ধরে হিন্দু অবতার কইলেও বৌদ্ধ ধর্মরে হিন্দু ধর্ম কওয়া সম্ভব না। বরং বৌদ্ধ ধর্ম হিন্দু ধর্মের বিপরীতেই অবস্থান করে। বিশেষত চতুবর্ণ কিংবা জাতপাত কিংবা মাইনসের ঘাড়ে বামুনদের ভূত হইয়া চইড়া বসা; যেইগুলা তখন মাইনসের জীবনরে নরক বানায়া রাখছে। তো এই অবস্থায় বুদ্ধরে পকেটে ঢুকানোর পরেও একজন সম্ভান্ত্র খাঁটি হিন্দু বা বৈষ্ণব অবতার খুব বেশি জরুরি হইয়া পড়ল; যারে গৌতম বুদ্ধের মতো যেমন সম্ভ্রান্ত বংশের পোলা হইতে হবে; তেমনি তার থাকতে হবে বুদ্ধের কাছাকাছি রাজ্য ত্যাগের ইতিহাস; থাকতে হবে সহজ সরল জীবন যাপন; থাকতে হবে নির্লোভ জীবনী। তবে তারে শেষকালে রাজাও হইতে হবে একটা উপযুক্ত হিন্দুরাষ্ট্রের উদাহরণ প্রতিষ্ঠার লাইগা...

অবতারবাদীরা সম্ভ্রান্ত সেই সম্ভাব্য অবতারের সন্ধান পাইয়া যান বাল্মিকীর পুলস্ত্যবধ কাব্যে। রাজা দশরথের পুত্র রাম। বাপের কথা রাখতে গিয়া রাজ্য ত্যাগ কইরা বনে বনে ত্যাগি চেহারা নিয়া ঘোরে। পাশাপাশি পুলস্ত্য বা রাবণরে হত্যা কইরা পুলস্ত্যবধ কাব্যের বিজেতা নায়ক। চরিত্রখানও বহুত নিষ্কলুষ। বাপের সাড়ে তিনশোটা বৌ থাকার পরেও তার মাত্র এক বৌ। পরবর্তীকালে একজন রাজা। বামুনগো তাবেদার; আদিবাসী মাইরা বামুনের যজ্ঞ করার ব্যবস্থা কইরা দেয়। বামুনগো গ্রামের শত্রু নিধন কইরা দেয়। শূদ্র বেদ পইড়া যাতে বামুনগো ফাঁকি ধরতে না পারে তার লাইগা বিনা প্রশ্নে শূদ্রের মাথা নামায়া ফেলে কোপ দিয়া...

বাল্মিকীর পুলস্ত্যবধ কাব্যের বিজেতারে ধইরা বামুনগো লাইগা দরকারি এই সকল গুণই চাপানো হয় রামের উপর; অথবা কিছু কিছু আগে থাইকাই থাকে। পয়লা ধাক্কাতেই বাল্মিকীর পুস্তকখানের নাম পুলস্ত্যবধ কাব্য থাইকা বদলাইয়া করা হয় রামায়ণ। মানে পরাজিতের নামে লেখা কাব্যখান এইবার লেখা হইতে থাকে বিজেতা নায়কের নামে। আর নায়কের উপর ক্রমাগত চাপানো হইতে থাকে বৈষ্ণবগো লাইগা দরকারি সকল উপাদান; এমন কি বৌদ্ধ বিরোধিতাও...

অবতার তালিকায় রাম আর কৃষ্ণের সিরিয়ালের বিষয়ে পৌরাণিক কালচক্রের আরেকটা যুক্তি হাজির করা হয়। বলা হয় রাম ত্রেতা আর কৃষ্ণ দ্বাপর যুগের অবতার। এই যুগ হিসাবটা বড়োই গোলমেলে; এইটা রৈখিক ক্যালেন্ডার না; কালের চক্র। এইসব দ্বাপর ত্রেতা কলি দিয়া কোনো সময়কাল বোঝানো হয় না। কবে থাইকা শুরু আর কবে কোন কালের শেষ তার হিসাব পুরাই ঝাপসা। এই যেমন কোনো এক অতীত কাল থাইকা এখনো চলতে আছে কলিকাল; কিন্তু তার কোনো হিসাব নাই। এইটা নিয়া বেশি ব্যাখ্যায় না যাইয়া খালি কই যে কৃষ্ণভক্ত বঙ্কিমচন্দ্রও এই কালচক্রের হিসাব উড়াইয়া দিছেন; কারো আগ্রহ থাকলে তিনার কৃষ্ণচরিত্র পুস্তকখান দেইখা নিতে পারেন...

রাম আর কৃষ্ণরে যে কালেই অবতার তালিকায় ঢোকানো হউক না ক্যান; মূল বিষয়টা হইল রাম আর কৃষ্ণের সিরিয়াল ঠিক করা হইছে তাগো সময়ের কমপক্ষে হাজার বছর পরে। অবতারের তালিকায় যেই আগে আর যেই পরে থাকুক না ক্যান; ঐতিহাসিক হিসাবে দেখা যায় যে অবতারবাদ জিনিসটাই আবিষ্কার হইছে খ্রিষ্টিয় তৃতীয়-চতুর্থ শতকের দিকে। গুপ্ত সাম্রাজ্যের সময়। এই অবতারবাদ কনসেপ্টটা মূলত বৌদ্ধ ধর্মের জাতক কাহিনির একটা এডাপটেশন। বৌদ্ধগোরে গাইল্লাইতে গাইল্লাইতে পৌরাণিকেরা কিন্তু ক্রমাগতভাবে নিজেগো ধর্মরে বৌদ্ধ ধর্মের উপাদানের লগে এডজাস্ট কইরা গেছে। বুদ্ধদেব বসুর ভাষায়- মহাভারত বা রামায়ণে নাস্তিক বলতে সর্বদাই চার্বাকপন্থী বা বৌদ্ধ বোঝানো হয়েছে। মহাভারতে চার্বাক আছে। কন্ব মুনী কিন্তু চার্বাক পন্থী। আর রামায়ণে আছে বৌদ্ধ; রাজা দশরথের উপদেষ্টা জাবালি বৌদ্ধপন্থী মানুষ...

রামায়ণের সমাজ পুস্তকের লেখক কেদারনাথ মজুমদার পরিষ্কার কইরা কন যে; অবতার তালিকায় রামের অন্তর্ভুক্তি হইছে অবতার হিসাবে গৌতম বুদ্ধের অন্তর্ভুক্তির পরে। গুপ্ত যুগে অবতারের যা ইতিহাস পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় যে সেইখানে অবতার হিসাবে শুধুই বরাহ বা শূকর আর কৃষ্ণের পূজার নিদর্শন আছে; অন্য কেউ না...

উপনিষদের মতো ব্রহ্মবাদী বা গীতার মতো ভক্তিবাদী দর্শনের মিশ্রণে যে বৈষ্ণব ধর্ম বা পরবর্তীকালে হিন্দুধর্ম তৈয়ারি হইছে; সেইটাতে চার্বাকপন্থা

কিন্তু কট্টর নাস্তিক্যবাদ হিসাবে বাদই পইড়া গেছে। ভৃগু মুনীর শালা কপিলের বেদবিরোধী দর্শন ত্যাজ্য হইছে। হীনযান যুগের নাস্তিক্যবাদী বৌদ্ধধর্মও পুরা সাংঘর্ষিক আছিল উপনিষদ আর গীতার উত্তরাধিকারীগো কাছে। কিন্তু কালে কালে বৌদ্ধ ধর্মও সইরা আসে হিন্দুধর্মের কাছাকাছি। বুদ্ধের নাস্তিক্যবাদরে চাপাইয়া থুইয়া স্বয়ং বুদ্ধরে বানায়া ফালানো হয় ভগবান...

এই পুরা প্রক্রিয়াটা; মানে নারায়ণরে ভগবান হিসাবে প্রতিষ্ঠা- কৃষ্ণর প্রতিষ্ঠা- গীতা- অবতারবাদ- চতুবর্ণ- বর্ণাশ্রম- মনু সংহিতা এবং মহাভারত -রামায়ণ সম্পাদনা দিয়া আধুনিক হিন্দু ধর্মের সূচনাটা ঘটে মূলত ভার্গব বংশ এবং তাগো আত্মীয় স্বজনের হাতে। মহাভারতকাল পর্যন্ত জাতে ব্রাহ্মণ নামে কিছুর অস্তিত্ব আছিল না। জন্মসূত্রে কেউ বামুন হইত না। কামে হইত। জন্মসূত্রে বামুন হইবার সিস্টেমটাও চালু করে এই ভার্গবেরা; যারা আবার নিজেরাই বামুন আছিল না সকলে...

আমরা যে মহাভারত এখন পড়ি; সেইটা এমন এক অজ্ঞাত ব্যক্তির মুখ থাইকা শুনি যিনি সৌতির মুখে শুইনা শুইনা আমাদের বর্ণনা করতে আছেন ঘটনাখান- সৌতি আইলেন; পান তামুক খাইলেন তারপর কইলেন যে জন্মেজয়ের যজ্ঞে এই কাহিনি তিনি শুইনা আসছেন তারপর তিনি কইতে শুরু করলেন সেই কাহিনি...

এই সৌতি একজন ভার্গব বংশজাত মানুষ। সৌতিরে বলা হয় সূত; যাগো পেশা আছিল পুরাণ কথন অথবা রথ নির্মাণ; ভার্গবেরা প্রায় সকলেই কিন্তু আছিলেন সূত। ভার্গব বংশের প্রতিষ্ঠাতা ভৃগু মুনি স্বয়ং আছিলেন একইসাথে ঋষি-ধনুর্ধর-আর রথের মিস্ত্রি; মানে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় আর শূদ্র তিনটাই। মজার জিনিস হইল মহাভারত পড়লে মনে হয় ভৃগুমুনি বোধহয় ভারতে আসা আর্যগো এক্কেবারে পয়লা প্রজন্মের ঋষি। কিন্তু ঋগবেদ রচয়িতাগো মাঝে ভৃগু হইলেন এক্কেবারে শেষের দিকের ঋষি। আদি বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রগো থাইকা বহুত প্রজন্ম পরের মানুষ...

বৈদিক আর ভারতীয় পুরাণ এবং সাহিত্য বিষয়ে সুকুমারী ভট্টাচার্যের অতিমানবিক বিশাল গবেষণার মইদ্যে একটা ছোট্ট প্রবন্ধ হইল 'ভার্গব প্রক্ষেপণের প্রেক্ষাপট'। যাগো বেশি আগ্রহ আছে তারা পইড়া নিতে পারেন;

ভৃগুর বংশধররা কেমনে মহাভারতরে কাটাছিড়া করছে। এমনকি কেউ কেউ বলেন আদতে দশ বিশজন মানুষের মাঝে লাঠালাঠি কিলাকিলির যে কুরু-পাঞ্চাল যুদ্ধ হইছিল সেইটাতে জয়ী হইছিল কুরুরাই। পরে সেইটারেই ভার্গবরা কুরু-পাণ্ডব যুদ্ধর আকার দিয়া পাণ্ডবগো জিতায়া দিয়া আজকের কুরুযুদ্ধের আখ্যান তৈয়ারি করছে কৃষ্ণরে স্থাপন করার লাইগা। সুকুমারী ভট্টাচার্যের হিসাবে এই ভার্গব বামুনরাই হইলেন আজকের হিন্দু ধর্মের উদ্ভাবক; শুধু মহাভারত দিয়া না; রামায়ণ এবং মনু সংহিতা দিয়াও। কারণ রামায়ণের বাল্মিকী যেমন ভার্গব; তেমনি মনু সংহিতার রচয়িতাও ভার্গব ঘরানার মানুষ...

সুকুমারী ভট্টাচার্য যে বংশটারে দুর্বল হাতে; নিম্নমানের সাহিত্য দক্ষতা আর উচ্চমানের মূর্খতা নিয়া শত শত বছর ধইরা মহাভারত-রামায়ণ সম্পদনা পরিবর্তন আর পরিবর্ধনের লাইগা দায়ি গোষ্ঠী হিসাবে চিহ্নিত করেন। সেই ভার্গব বংশের কিছু কাহিনি আলাপ না করলে ভারতীয় পৌরাণিক আখ্যান তৈরির পিছনের একটা বড়ো ফ্যাক্টর যেমন বাদ থাইকা যাবে; তেমনি বাদ পইড়া যাবে আধুনিক হিন্দুধর্মের উৎপত্তির বহুত ইতিহাস...

খিপূ ২০০০ সালের দিকের ঘটনা। তখনো ইরানিরা বা আর্যরা ভারতে ঢোকে নাই। তাগো একটা দল তখন বাস করত বর্তমান তাজাকিস্তানের পশুরজন আর নিম্ন মাদ্রজন অঞ্চলে। এই গোষ্ঠীটারে আরেকটা যাযাবর আর্যগোষ্ঠী ইন্দ্র নামে এক সেনাপতির নেতৃত্বে পিটায়া ভিটামাটি থাইকা খেদাইয়া ভূমি-সম্পত্তি আর নারীগো দখল কইরা নেয়। ইন্দ্র কিন্তু তখনো সেনাপতির পদ কিংবা নাম। মাইর খাইয়া পশুরজন থাইকা পলানো মানুষগুলা পরবর্তীকালে পরিচিত হয় পারস্য পারসিক বা পার্সিয়ান নামে...

খুব সম্ভবত সেনাপতি ইন্দ্রের নেতৃত্বে পশুরজনবাসীগো মাইর দেওয়া আর্যগো দলের বংশধররাই পরবর্তীতে ধীরে ধীরে ভারতের মূল দখলটা নেয় আর ধীরে ধীরে এককালের সেনাপতি ইন্দ্রর নামটা কালে কালে পরিণত হয় দেবতাগো রাজার নাম হিসাবে। অন্যদিকে মাইর খাওয়া পশুরজনের লোকজন বা পার্সিয়ানরা দুইদিকে ছড়ায়; একদল আফগানের ব্যকট্রা বা

বহ্লীক থাইকা ইরাণের মূল ভূখণ্ড। আরেকদল ব্যকট্রা থাইকা ভারতের মূল ভূখণ্ড...

ভারতে কিংবা ইরানে; কোথাও এই মানুষগুলা কিন্তু ইন্দ্র বাহিনির হাতে নিজেগো ভিটা হারানোর ইতিহাস ভুলতে পারে নাই। ভূমি থাইকা উচ্ছেদ হওয়া এই পশুরজন বা পার্সিয়ানগো স্পিতামা গোত্রের মানুষ হইলেন মুনি ভৃগু; যিনি ভারতভূমিতে ভার্গব বংশের প্রতিষ্ঠাতা। এক হিসাবে বেদের অবহেলিত দেবতা বরুণের পুত্র হইলেন এই ভৃগু মুনি; অন্য দিকে এই বরুণই হইলেন জেন্দাবেস্তার প্রধান দেবতা আহুর মাজদা...

ভৃগুমুনীর বড়ো মাইয়া লক্ষ্মী; আখ্যানমতে নারায়ণের স্ত্রী; আইজ পর্যন্ত তিনি দেবী হিসাবে পূজিত হন। তার বড়োপোলা পুলমাগর্ভজাত চ্যাবন মুনি; যিনি ভেষজ-বিদ্যার বিশেষজ্ঞ আছিলেন। আখ্যান বিশ্লেষণ করলে এই চ্যাবনরেই ধইরা নিতে হয় ফুল-ফল-ফসল গ্যাঁজাইয়া চোয়ানি মদের আবিষ্কারক বা ঋষি সুরা হিসাবে। যিনি মদ বানায়া দুই শিষ্য অশ্বিনীকুমারগো দিয়া ঘোড়ায় দূর দুরান্ত পর্যন্ত মদ সাপ্লাই দিতেন। আরেক হিসাব মতে এই চ্যাবনই আদি বাল্মিকী; রামায়ণের আদি রচনাকার...

অশ্বঘোষের মতে রামায়ণের বাল্মিকী এই চ্যাবনমুনিরই পুত্র। ভৃগুমুনীর দ্বিতীয় পোলা ঋচীক; নিজে তেমন বিখ্যাত ঋষি না; বিবাহসূত্রে তিনি বিশ্বামিত্রের বড়ো বইন সাবিত্রীর স্বামী। তবে ঋচীকের পোলা আর নাতি কিন্তু আবার বিখ্যাত মানুষ। তার পোলা জমদগ্নি আর নাতি পরশুরাম। পরশুরাম অস্ত্রবিদ্যার একটা স্কুলিং এর যেমন প্রতিষ্ঠাতা তেমনি বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার হিসাবেও গণ্য...

ভৃগুমুনীর ছোটপোলা উশনা গর্ভজাত শুক্রাচার্য; ভারতীয় পুরাণে সব থিকা বড়ো যুদ্ধ বিশারদ আর শল্য-বিদ্যার বিশেষজ্ঞ। শুক্রাচার্যের আরেক উপাধী কিন্তু কবি! অঙ্গিরা বংশ সর্বদাই ইন্দ্রের দলে থাকত বইলা ভৃগুপুত্র শুক্রাচার্য সব সময় থাকতেন অপজিশন; মানে অসুর রাক্ষস আর দানবগো লগে। বেদের কোনো তোয়াক্কা করতেন না তিনি। একলার বুদ্ধি আর কৌশলেই তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীগুলারে টিকাইয়া রাখতেন দেবতাগো আক্রমণের মুখে। তিনি নিজে ব্রাক্ষ্মণ হইয়া; সংহিতামতে নিষিদ্ধ হইবার পরেও নিজের মাইয়া

দেবযানীর বিবাহ দেন ক্ষত্রিয় রাজা যযাতির লগে। আর সেই ঘটনার ফল হিসাবেই শুক্রেচার্যের মাইয়া দেবযানীর বংশধারায় জন্ম নেন বাসুদেব কৃষ্ণ...

চতুবর্ণের স্রষ্ঠা মনুও জন্ম নেন এই একই ভার্গব বংশের শাখায়। আবার এই শুক্রাচার্যই নিজের জামাই যযাতিরে ধামকি দিয়া বাধ্য করেন রাক্ষসবংশজাত দাসী শর্মিষ্ঠারে রানির মর্যদা দিতে; যার ধারাবাহিকতায় জন্ম নেয় মহাভারতের শান্তনু পরিবার...

ভৃগু বংশের আত্মীয়গো মাঝে ভৃগুমুনীর শালা কপিল মুনি কঠিন বেদ বিরোধী হিসাবে পরিচিত। ঋচীকের শালা বিশ্বামিত্র বংশ আগাগোড়াই বশিষ্ঠ এবং সেই সূত্রে দ্বৈপায়ন গোত্রের বিরোধী মানুষ...

ভারতের বাইরে এই স্পিতামা গোত্রের আরেকজন মানুষ হইলেন পার্সিয়ান ধর্মের প্রবর্তক জরথ্রুস্ট। যিনি তার জেন্দাবেস্তায় ভালো পন্থাগুলারে কন স্পেন্ত মৈনু মানে স্পিতামা গোত্রের পথ আর খারাপ পথগুলারে বলেন অঙরা মৈনু; মানে ঋষি অঙ্গিরার পথ...

জেন্দাবেস্তা আর ঋগবেদ শুধু সমসাময়িক গ্রন্থই না বহুত ভাষা আর শ্লোকও এক। মূলত দুইটারই আদিসূত্র বা আদিবাস একই অঞ্চলে হইবার কারণেই এইটা ঘটছে। কিন্তু জেন্দাবেস্তা বর্ধিত হইছে ইন্দ্র এবং ইন্দ্রসহচরগো নেতিবাচকভাবে চিহ্নিত কইরা। পার্সিয়ানরা আগুনরে খুব পবিত্র মনে করত আর মরা লাশেরে অপবিত্র; কিন্তু ঋষি অঙ্গিরা লাশ পোড়াইবার বিধান দিবার কারণেই ইন্দ্রের লগে লগে তাগো রাগ গিয়া পড়ে অঙ্গিরার উপর। আর মোটামুটি আগাগোড়াই অঙ্গিরার বংশধররা আছিলেন দেবরাজের রাজকীয় পুরোহিত। আর ভৃগুবংশ অপজিশন। অঙ্গিরা আর ভৃগু এক্কেবারে সমবয়েসি মানুষ...

মাইর খাওয়া একটা গোষ্ঠি যে হাজার বছর ধইরা মাইরের প্রতিশোধ নিয়া বেড়ায় সেইটা এই ভার্গব বংশটার ইতিহাস না পড়লে বোঝা অসম্ভব। বংশটায় এক পাশে যেমন যুদ্ধাস্ত্র আবিষ্কার আর যুদ্ধের ইস্কুল চালাইছেন ভৃগু-শুক্রাচার্য-পরশুরামেরা এবং তাগো আত্মীয় বিশ্বামিত্র কিংবা কপিলেরা; তেমনি অন্যদিকে বিদ্যালয় খুইলা বুদ্ধির যুদ্ধ চালইছেন জরথ্রুস্ট- চ্যাবন- সৌতি- বাল্মিকী- মনু আর হাজারে হাজার নাম না জানা ভার্গব সন্তান...

ভার্গবগো কোনো অস্ত্রের নিদর্শন আইজ আর নাই। ভার্গব বংশের একটা শাখা; ভিল উপজাতি ছাড়া ভার্গবগো অস্ত্রের কথা আইজ আর স্মরণও করে না কেউ। কিন্তু তাগো বিদ্যার প্রভাবে দুনিয়াতে দুই দুইটা ধর্ম তৈরি হইয়া টিকা আছে আইজ; হিন্দু আর পার্সিয়ান। এই দুইটা ধর্মই সেই ভূমিহারা স্পিতামা গোত্রের ভার্গব মানুষগো অবদান কিংবা আকামের ফল। এরাই লিখছে জেন্দাবেস্তা। লিখছে মনু সংহিতা। লিখছে রামায়ণ আর পুরাই বদলাইয়া দিছে বশিষ্ঠ বংশের হাতে রচিত মহাভারতের ঘটনা এবং কাহিনি। কাকের বাসায় কোকিলের ছানা পয়দা করার আদর্শ উদাহারণ বোধহয় মহাভারতের থাইকা বড়ো কিছু নাই। বশিষ্ঠগোত্রজাত দ্বৈপায়ন পুস্তকখান লিখছিলেন বেদের শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে আর ভার্গবেরা সেইটা এডিট কইরা বানাইয়া থুইছে বেদ বিরোধী ভগবদগীতার আতুড়ঘর...

তবে একটা কথা মাথায় রাখা দরকার। তা হইল ভারতীয় পুরাণে ফেমিলি ট্রি নিশ্চিত কইরা বলা বোধহয় সম্ভব না। 'ফেমিলি নেট' হইতে পারে। কারণ এইখানে যে বংশের পরিচয় দেয়া হইছে তাতে একশোটা চ্যালেঞ্জ করা যাইতে পারে। চ্যাবন আদি ভৃগুর পোলা না হইয়া অন্য ভৃগুর পোলাও হইতে পারেন। আবার ঋচীক হইতে পারেন আরেক ভৃগুর পুত।। শুক্রাচার্য চ্যাবন বা ঋচীকের ভাই না হইয়া ভাতিজাও হইতে পারেন। ভৃগুরে কবিও বলা হইত। সেই হিসাবে শুক্রাচার্য কবিপুত্র। আবার ভৃগুরে কবিপিতাও বলা হয়; সেই হিসাবে শুক্রাচার্য ভৃগুর নাতি। আবার শুক্রাচার্য নিজেই কবি। সেই হিসাবে...

আবার পরশুরাম ঋচীকের নাতি না হইয়া অন্য কোনো জমদগ্নির পোলাও হইতে পারেন। একইভাবে কপিল মুনি এক হিসাবে যেমন শুক্রাচার্যের মামা; মানে তার সৎভাই চ্যাবনের মামা; ভৃগুর শালা; আরেক হিসাবে কিন্তু শুক্রাচার্যের এক শিষ্যও চ্যাবন মুনি। এখন কোনজন আসলে কে?

একইভাবে কোন বিশ্বামিত্র কোন ঋচীকের শালা; সেইটা কিন্তু বাইর করা অসম্ভব। কারণ ঋগবেদের আদি রচয়িতাগো মইধ্যে আছেন আদি বিশ্বামিত্র; যিনি ঋচীকের বাপ ভৃগুরও বহুত পূর্ব প্রজন্মের মানুষ; সুতরাং আদি বিশ্বামিত্র ভৃগুপুত্র ঋচীকের শালা হইবার কথা না। আবার আদি বিশ্বামিত্রের

সমসাময়কি বশিষ্ঠ কিন্তু দ্বৈপায়নের বাপের ঠাকুরদা না; দ্বৈপায়নের বাবা পরাশর যেমন অন্য বশিষ্ঠের নাতি তেমনি রামায়ণের বশিষ্ঠ আরেকজন...

হইলে হইতে পারে দ্রোণাচার্যের বাপ ভরদ্বাজ বৃহস্পতি-মমতার সন্তানই না। না হইবারই সম্ভাবনা বেশি। হইলে হইতে পারে দ্রোণপিতা মূলত কোনো ভরদ্বাজী টোলে পড়া বামুন মাত্র; বৃহস্পতির লগে যার কোনো সম্পর্কই নাই। অবশ্য বৃহস্পতি বলতে কোন বৃহস্পতি সেইটাও একটা প্রশ্ন। হাজারো বৃহস্পতির মাঝে ঠিক কোনজন যে অঙ্গিরার মাইজা পোলা সেইটা কিন্তু বাহির করা মুশকিল...

মূলত যারা নিজের নামে ঘরনা তৈরি করতে পারে নাই তারা সকলে আগের বিখ্যাত ফ্যামিলি নেম বা ঘরানার নামে পরিচিত আছিল। বহুত লোক আছিল বৃহস্পতি ভৃগু বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র বাল্মিকী দ্বৈপায়ন জমদগ্নি ভরদ্বাজ নামে পরিচিত। বহুত লোক শুক্রাচার্য চ্যাবন পরশুরাম কপিল নামে পরিচিত। আর ব্যাস নামে পরিচিত লোকজন তো দিব্যি এখনো আছে...

খ. বেদবিরোধী গীতার বৈদিকায়ন এবং রামায়ণের অতীতযাত্রা

ভারতীয় পুরাণ ঘাঁইটা ইতিহাস খুঁজতে যাওয়ার সব থিকা বড়ো ঝামেলাটা হইল এইসব পুরাণের রচয়িতা ঋষি কিংবা কবিদের অন্য কোন বিষয়ে কোন জ্ঞান আছিল আর কোন বিষয়ে আছিল না সেইটা নিশ্চিত না হইলেও একটা বিষয় পরিষ্কার যে তাগো মধ্যে বিন্দুমাত্র সময়-সংখ্যা কিংবা ইতিহাস জ্ঞানের কোনো অস্তিত্ব আছিল না; অথবা অদরকারি মনে কইরা তারা এই তিনটা জিনিসের লগে বাচ্চাপোলাপানের মতো খেলানেলা কইরা গেছেন। সময় মাপতে গিয়া তারা ষাইট বচ্ছর আর ষাইট হাজার বচ্ছরে যেমন কোনো ফারাক করেন নাই; তেমনি সৈন্যসংখ্যা একশোরে একশো কোটি কইতেও আপত্তির কিছু দেখেন নাই। একইভাবে নতুন কবিরা যখন সাহিত্য রচনা করছেন কিংবা পুরানা সাহিত্য সম্পাদনা করছেন তখনো কিন্তু আশপাশের ঐতিহাসিক উপাদানগুলারে বাদ দিয়া কোন কালের সেই কল্পিত ঐতিহ্যর লোকস্মৃতি ঢাইলা সাজাইছেন নিজের পুস্তকের সমাজ বাস্তবতা। যার লাইগা দুই হাজার বছর আগের আর পরের সাহিত্যে সমাজ বাস্তবতা মূলত কপিপেস্ট ছাড়া কিছু না...

ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইতিহাস চর্চার মূল কনসেপ্টাই হইল কাল্পনিক এক সমৃদ্ধ অতীতের কাবিক্য চিত্রকল্প নির্মাণ। অনেকটা শাহ আবদুল করিমের গানের মতো- আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম-এর নস্টালজিয়া অথবা জীবনানন্দের মতো কোনো এক শ্রাবস্তির কারুকার্য কল্পনা কইরা তাব্দা খাইয়া বইসা থাকা। সকলেই মনে করে আগের দিনগুলা আছিল বড়োই দারুণ। মূলত এইটা একটা নতুনত্বভীতি আর বুড়ামির প্রতীক। এর লাইগা সকলেই খালি কল্পিত এক আগিলা দিনের সাধনা করে; আর কবিরা সেইটা নতুন কইরা রচনা কইরা আবার প্রচারও করেন নতুনের মতো। কল্পিত রঙিন অতীত নির্মাণের এই বাজে অভ্যাসটা এখনো আছে আমাগো সংস্কৃতির মাঝে। বর্তমান সময়ে রচিত আমাগো গানগুলায় এখনো নদীর পাড়ে বইসা রাখাল বাঁশি বাজায় আর মেয়েরা কলসি নিয়া পানি তুলতে নদীঘাটে যায়। অথচ গত তিন দশক ধইরা যেমন রাখাল পেশাটাই বাংলাদেশ থাইকা নাই হইয়া গেছে

আর চল্লিশ বছর ধইরা বাংলাদেশের মানুষ নদীর পানি খাওয়া বন্ধ কইরা দিছে সেইটার কোনো সংবাদ নাই এইসব লোক সাহিত্যের পাতায়....

পুরাণগুলার মইদ্যে যে টুকটাক ইতিহাসের উপাদান পাওয়া যায় সেইগুলা পাওয়া যায় মূলত সাহিত্যে ছড়ানো ঘিন্নার বাক্য কিংবা লেখকের মূর্খতার ফাক ধইরা। রামায়ণে যখন রামের মুখ থাইকা জাবালিরে বৌদ্ধ কইয়া গালি শুনি তখন আমাদের বুইঝা নিতে হয় যে যেই সমাজে বইসা রামায়ণ লেখা হইছে সেই সমাজে তখন বৌদ্ধ বিপ্লবের ঠেলায় বামুনধর্ম বিপন্ন। আবার বিশ্বামিত্রের লগে যুদ্ধ করতে গিয়া যখন বশিষ্ঠের কামধেনুরে যবন সৈন্য উৎপাদন করতে দেখি তখন আমাদের ধইরা নিতে হয় যে মহাভারতের এই বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র যুদ্ধটা হয় হইছে ভারতে গ্রিকদের আগমণের পর না হয় যারা এই গপ্পটা মহাভারত-রামায়ণে ঢুকাইছেন তারা ভারতে গ্রিক অভিবাসনের পরের মানুষ। অথচ ঘটনার বর্ণনাগুলা কিন্তু সেই আদি কাল্পনিক। বশিষ্ঠ সেইখানে যেমন তার আদি কাল্পনিক অলৌকিকত্ব নিয়া বইসা আছেন তেমনি তার কামধেনুও কাল্পনিক; তার অস্ত্রপাতিও কাল্পনিকতার কপি পেস্ট...

মহাভারতে কুরুযুদ্ধ হউক বা না হউক; যুদ্ধ শেষে পাণ্ডবপক্ষ জিতুক বা কুরুপক্ষ জিতুক; যুধিষ্ঠিরের কিন্তু ঐতিহাসিকতা আছে। আর সেই ঐতিহাসিকতার হিসাবে যুধিষ্ঠির ভারতে লোহার ব্যবহার শুরু হইবার আগের যুগের মানুষ। অথচ যুধিষ্ঠিররে ঘিরা কবিরা যে কুরুযুদ্ধ রচনা করছেন তাতে পুরা লোহার খনি ঢাইলা দিছেন। পুরা কুরুযুদ্ধখানই লোহার অস্ত্রে ঝনঝন। অথচ যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক মানুষ মইরা গেছে লোহা আবিষ্কাররে বহুত বহুত যুগ আগে; কিন্তু সেই হিসাবটা আছিল না কবিগো মাথায়...

ভারত অঞ্চলে পয়লা শকাব্দ ক্যালেন্ডারট বহিরাগত কুশানদের দান। আর্যগো কোনো ক্যালেন্ডার জ্ঞান আছিল না। বছর মাস এবং সপ্তা গণনার কোনো ধারণা আছিল না তাগো। সপ্তার সাত দিনের নাম জানত না তারা। কিন্তু সংখ্যা আর গণিতের ধারণা ভারতে বহুত প্রাচীন। তাইলে আর্যগো সাহিত্যে সংখ্যায়ও অত ঘাপলা কেন?

এইটার একটা কারণ হইতে পারে যে; আর্যভট্ট সংখ্যা এবং গণিতের যে হিসাব দিয়া বিজ্ঞান চর্চা করতেন কিংবা বরাহমিহির অপবিজ্ঞান চর্চা করতেন;

সেইগুলা মূলত সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে আছিল। মানে শতকিয়া সাধারণ লোকজন জানত না। সাধারণ লোকজনের হিসাবের মাধ্যম আছিল গণ্ডাকিয়া; যেইটা মূলত হাত পায়ের আঙুলের সর্বোচ্চ চাইর কি পাঁচ গুণিতকের হিসাব; দশক বা শতকের না; হালি-কুড়ি-গণ্ডা-পণ...

সুকুমারী ভট্টাচার্যের কথা যদি মানি তবে স্বীকার কইরা নিতে হয় যে পুরাণ লেখক বা সম্পাদক কেউই উচ্চ শিক্ষিত মানুষ আছিলেন না; এরা বরং মূর্খ শ্রেণির দুর্বল পেশাদার লেখকই আছিলেন। বিভিন্ন স্থানীয় সামন্তগো পৃষ্ঠপোষকতায় সেই সামন্তের পূর্ব পুরুষের ইতিহাস রচনা করতে গিয়া কিংবা সেই সামন্তের বিধি বিধানরে ধর্মশাস্ত্রর চেহারা দিতে গিয়া নিজস্ব মূর্খতা আর দুবর্লতা নিয়াই তারা পেশাজীবী হিসাবে এইসব পুরাণ রচনা কইরা গেছেন। এবং তারা নিজেরাও নিজেদের অতই নগণ্য আর ক্ষুদ্র মনে করতেন যে কোনো রচনাতেই নিজের নাম পর্যন্ত দিতেন না; নিজের রচনাগুলারে আগের কোনো বিখ্যাত লেখকের নামে চালায়া দিতেন। পুরাণগুলারে ভজঘট করার লাইগা মূলত দায়ী এইসব দায়িত্বহীন আর অস্তিত্বহীন পেশাদার লেখকের দল। এদের না আছিল ভূগোল জ্ঞান; না সংখ্যা; না ইতিহাস। এগোর থাকার মধ্যে আছিল শুধুই দুর্বলভাবে কিছু একটা কল্পনা করা আর স্থানীয় সামন্তরে খুশি করার ক্ষমতা...

রামায়ণের ঘটনা ঘটছে মহাভারতের পরে; এই কথাটা প্রচলিত যুক্তি আর পৌরাণিক বিশ্বাসের সরাসরি বিরুদ্ধে যায়। প্রচলিত যুক্তি আর বিশ্বাসরে এক্কেবারে উড়ায়া না দিয়া রমিলা থাপার একটা শর্ত জুইড়া দিছেন। তিনি কন- যদি রামায়ণের ঘটনারে মহাভারতের আগে বইলা মাইনা নিতে হয় হয় তবে কিন্তু ধইরা নিতে হবে যে রাম-রাবণের যুদ্ধ আছিল গাঙ্গেয় উপত্যকার কৃষিজীবী আর বিন্ধ্য অঞ্চলের আদিবাসী শিকারী মানুষের যুদ্ধ। পরে কেউ এইটারে আরো দক্ষিণে সরায়া লঙ্কা জুইড়া দিছে। মানে রমিলা থাপারের এই শর্ত মাইনা রামায়ণরে মহাভারতের আগে কইতে গেলে পয়লাই রামায়ণ থাইকা অত ঘটনার লঙ্কাখানই বাদ দিয়া দিতে হয়। আর পণ্ডিতগো কথামতো রামায়ণের আদি রচনাকাল খিপূ ৪র্থ শতক ধইরা নিলে লেখক বাল্মিকী আর তার পোলার বয়েসি রামরে কোনোভাবেই গৌতম বুদ্ধের পরের যুগের মানুষ ছাড়া অন্য কিছু ভাবা অসম্ভব...

বাল্মিকীরে চতুর্থ শতাব্দির মানুষ ধইরা নিবার পক্ষে আরো বহুত যুক্তি আছে। এর পয়লাটা হইল রামায়ণের ভাষা। রামায়ণের ভাষা যে আধুনিক সেইটার বিষয়ে বহুত আলোচনা আছে। কারো কারো মতে খিপূ ৪র্থ শতকে পাণিনি যে সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ সংগঠিত করছিলেন; রামায়ণ রচিত হইছে সেই ব্যাকরণ মাইনা। মানে বাল্মিকী পাণিনির পরের মানুষ; যেইটার লগে আবার মিলা যায় বিপ্লব মাজীর দাবি- বাল্মিকী কালিদাসেরও পরের কবি...

অন্য অনেকের মতো কেদারনাথ মজুমদারও কন- রামায়ণের ভাষা মহাভারতের থাইকা অনেক আধুনিক। ছন্দগুলাও আধুনিক। রামায়ণের অনুষ্টুপ ছন্দ বয়সে প্রাচীন হইলেও রামায়ণে ব্যবহৃত অনুষ্টুপ আধুনিক ফর্মে গাথা। এই কথা বলার লগে লগে কেদারনাথ মজুমদার বাল্মিকীর আদি কবিত্বের দাবি এক টোকায় উড়ায়া দেন। এক্কেবারে সোজা বাংলায় কইয়া দেন যে বাল্মিকী আদি কবি নহেন। শিকারিতে পক্ষি মাইরা ফালানোয় যে শ্লোকটা তিনার মুখ থাইকা বইর হইছিল; যেইটারে কওয়া হয় আদি কবিতা। সেইটার ছন্দ বিশ্লেষণ কইরা কেদারনাথ সোজা কন- যে ধরনের অনুষ্টুপ ছন্দে ওই শ্লোকটা লেখা; সেই ছন্দে ঋগবেদ ভরপুর। অনুষ্টুপ ছন্দটা বাল্মিকীর আবিষ্কার; এইটাও ফালতু কথা। তাছাড়া বিষ্ণু পুরাণ রামায়ণের পরে হইলেও সেইখানে কিন্তু কেউ বাল্মিকীরে আদি কবি না কইয়া ব্রহ্মারে কইতেছে আদি কবি। সুতরাং বাল্মিকীর আদি কবিত্ব সার্বিকভাবে গ্রহণযোগ্য না...

এই কয়েকটা যুক্তি দিয়া কিন্তু রামায়ণরে মহাভারতের আগে দাবি করার সবগুলা দাবি উড়ায়া দেয়া সম্ভব না। বিষয়গুলা ডিম আগে না মুরগি আগের মতো জট পাকায়া আছে দুইটা পুস্তকে। খোদ রামায়ণের ভিতরেই এমন কিছু উপাদান আছে যেইগুলারে যুক্তিতে গেলে অবশ্যই প্রাচীন উপাদান কইতে হয়...

প্রায় একশো বছর আগে ১৯২৭ সালে অমানবিক পরিশ্রমের গবেষণা কইরা কেদারনাথ মজুমদার রামায়ণের সমাজ নামে একটা বই প্রকাশ করেন ময়মনসিংহ থাইকা। রামায়ণ সোসাইটিরে ধইরা ধইরা সহজ ভাষায় এত ভালো বিশ্লেষণ খুব কমই পাইছি আমি। কেদারনাথ রামায়ণরে মহাভারতের পরের ঘটনা কইতে রাজি না। তিনি বরং মহাভারতরেই রামায়ণের পরের

ঘটনা বলেন। তিনি বৈদিক ঘটনার উত্তরাধিকারগুলারে আলোচনা করার লাইগা ঋষি যুগ আর লৌকিক যুগ নামে ক্যালেন্ডাররে দুইটা ভাগে ভাগ করেন...

কেদারনাথের ভাগ অনুযায়ী খিপূ ১০০০ সালের আগের সময় ঋষি যুগ আর খিপূ ১০০০ সালের পরের ঘটনা; তার মতে ভারতে গ্রিকদের আগমনের পরের সময়কালরে তিনি বলেন লৌকিক যুগ। তো রামায়ণের সময়কাল আলোচনা করতে গিয়া তিনি রামায়ণের মইদ্যে ঋষি আর লৌকিক দুই যুগের উপাদান নিয়াই আলোচনা করেন। তিনি যদিও রামায়ণের নতুন ঘটনা চিহ্নিত কইরা বলেন যে সেইগুলা পরে প্রক্ষিপ্ত; মানে আদি কাণ্ড আর উত্তরকাণ্ড যখন যোগ হয় তখনকার সংযোজন। তবুও তার তালিকা দুইটা নিরপেক্ষভাবেই খুব সমৃদ্ধ...

তিনি রামায়ণরে মহাভারতের আগে কইতে গিয়া যেইসব যুক্তি দেখান তার মধ্যে তিনি কন যে রাম হইলেন ভারতে লিপি বা লেখা প্রচলিত হইবার যুগের আগের মানুষ। রামায়ণে রামের লেখাপড়া শিক্ষার কোনো বিবরণ নাই। অথচ বুদ্ধদেবের শিশুকালে তার পড়ালেখা শিখার বিবরণ আমরা পাই। অবশ্য মহাভারতেও কারো লেখাপড়া শিখার কোনো উদাহরণ নাই। তিনি বলেন যে রামায়ণে লৌকিক দেবতা; মানে বাল্মিকী রামায়ণে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব কিংবা আরো পরের নারী দেবীরা নাই; রামায়ণে আছে খালি বেদের ৩৩ দেবতার কথা। রামায়ণে লিঙ্গপুজা মূর্তিপুজা নাই। রাময়ণে ৪ বেদের কথা নাই; আছে ৩টা বেদের কথা। মানে রামায়ণের পরে লৌকিক যুগে তৈরি হওয়া অথর্ববেদের কথা রামায়ণে নাই। তিনার আরেকটা যুক্তি হইল রামায়ণকালে সপ্তা এবং বারের নাম এবং মাসের গণনা পদ্ধতি চালু হয় নাই। ধাতুর রাসায়নিক বা যৌগ ব্যবহার শুরু হয় নাই তখনো...

রামায়ণের লঙ্কায় গাদা গাদা স্বর্ণের বিষয়ে তিনি সন্দেহ করেন। তিনি কন যে সেইকালে কবিরা স্বর্ণ বস্তুটাই চিনত না। কারণ তারা যদি স্বর্ণ চিনত তাইলে হনুমান পুরা লঙ্কা পুড়াইয়া দিবার পরে আবার অক্ষত স্বর্ণ লঙ্কার বর্ণনা দিত না। স্বর্ণ চিনলে তারা নিশ্চয়ই জানত যে আগুনে পুড়লে স্বর্ণের কী অবস্থা হয়। এর থাইকা তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে হয় সেইযুগে অন্যকিছুরে কবিরা স্বর্ণ

কইত; যেইটা আগুনে পুড়লেও গলে না বা বদলায় না; অথবা খাপছাড়াভাবে এইগুলা পরে কেউ ঢুকাইয়া দিছে লঙ্কায়। অবশ্য এর লগে তিনি এইটাও বলেন যে বর্তমান রামায়ণে রাবণের যে দানবীয় চেহারা আমরা দেখি; সেইটা আদৌ বাল্মিকী রামায়ণের রাবণ না। বাল্মিকী রামায়ণের রাবণ এক সাধারণ রাজা...

কেদারনাথ বলেন রামায়ণ সমাজে মেয়েরা সিঁন্দুর পরত না। সকলেই বেদ পড়তে পারত। তখন পর্যন্ত কাচ আর পারদের সংমিশ্রণে আয়না প্রস্তুতি শুরু হয় নাই। কোনো ধরনের মুদ্রা আবিষ্কার হয় নাই এবং সমাজে গোত্রপ্রথা চালু হয় নাই...

রামায়ণ সমাজে গোত্র প্রথা চালু হয় নাই এই কথাটার লগে কিন্তু আমার ব্যক্তিগত দ্বিমত যেমন আছে তেমনি সুকুমারী ভট্টাচার্যের গবেষণাও এই বিষয়ে দ্বিমত করে। রামায়ণের সময়কালে বরং ব্রাহ্মণ শূদ্র ক্ষত্রিয় এইগুলা বড়োই প্রকট আছিল...

রামায়ণের প্রাচীনত্বের পক্ষে তিনার আরো যেইসব যুক্তি আছে তার মইদ্যে আছে- কৈকেয়ীরে রাজা দশরথ বর দিতে চাইলে তিনি সব দেবতারে ডাইকা সাক্ষী মানলেন কিন্তু ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের মতো কোনো দেবতারে ডাকেন না। তেমনি পোলার বিদায়ের সময় মা কৌশল্যা যে দেবতাগো নাম ধইরা পোলারে রক্ষা করার লাইগা প্রার্থনা করেন সেইখানেও তিনি বহু দেবতা এমনকি বনের পশু পাখির পর্যন্ত শরণাপন্ন হইলেও কিন্তু ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের মতো পৌরাণিক দেবতার নাম নিবার ধারে কাছেও যান না...

রামের বিদায়ের সময় কৌশল্যার বিষ্ণু পূজার একটা বিবরণ বর্তমান রামায়ণগুলায় আছে; কেদারনাথ সরাসরি এইটারে প্রক্ষিপ্ত কইয়া ফালায়া দেন। কেদারনাথ পরিস্কার বইলা দেন যে বুদ্ধদেব যখন হিন্দুর চিন্তায় অবতার তালিকার মইদ্যে ঢোকেন; সেই সময়েই মূলত রামও অবতারের মর্যাদা পান। বৌদ্ধ যুগের পূর্বে রাম বা বৌদ্ধ কেউই হিন্দু সাহিত্যে অবতার বইলা গৃহীত হন নাই; মানে কেদারনাথের হিসাব আর ভবানীপ্রসাদ সাহুর হিসাব প্রায় একই; আর্যগো দাক্ষিণাত্য বিজয়ের কাছাকাছি সময়...

রামায়ণের প্রাচীনত্বের পক্ষে যুক্তি দিতে গিয়া কেদারনাথ কন যে রামায়ণ সমাজে কোনো ঈশ্বর কনসেপ্টএর অস্তিত্ব নাই। যেইটা বেদেও আছিল না। হিন্দু ধর্মে ঈশ্বর কনসেপ্টটা মূলত রাজা প্রবাহণের উপনিষদভিত্তিক ব্রহ্মতত্ত্বরে ধইরা গীতায় দানা পাকাইছে। এইটা তুলনামূলক নতুন জিনিস। তাছাড়া রামায়ণে আমরা দেখি রাজা জনক নিজে মন্ত্র পইড়া নিজের মাইয়ার বিবাহ সম্পন্ন করতেছেন। এইটা আগের যুগের নিদর্শন; পরবর্তী যুগে এইসব কাম চইলা গেছিল বামুনগো হাতে...

চতুরাশ্রম কনসেপ্টের একটা অংশ হইল বাণপ্রস্থ। যেইটা বৌদ্ধ বিপ্লব পরবর্তী একটা সংযোজন। মহাভারতে আমরা এই বাণপ্রস্থের দেখা পাই; যা কোনোভাবেই কিন্তু রামায়ণে নাই। তবে এইটাও ঠিক যে সব নিয়ম একই লগে সব অঞ্চলে চালু হয় নাই বা মানা হয় নাই; হইতও না। মহাভারত আর রাময়ণের রচনাকাল খালি আলাদা না; বরং মানুষগুলার ঐহিত্যও আর ব্যাকগ্রাউন্ডও আলাদা। কোনোভাবেই বলা যাবে না যে মহাভারতের সামাজিক নীতি আর রামায়ণের সামাজিক রীতি এক...

কেদারনাথ নিজে রামায়ণরে মহাভারতের আগের ঘটনা হিসাবে সমর্থন করলেও যেইসকল উপাদানের কারণে রামায়ণরে মহাভারতের পরের ঘটনা বইলা সন্দেহ হয় সেইগুলারও একটা বিশাল তালিকা করেন। যেইগুলার মইদ্যে তিনি এইটাও উল্লেখ করেন যে রামায়ণের বিবাহ পদ্ধতি অনেক আধুনিক। মহাভারতে উত্তরার বিবাহের লগে রাম সীতার বিবাহের কিছু মিল আছে। এর বাইরে মহাভারতে বেদ নির্দিষ্ট প্রাচীন পদ্ধতির দেবর-ভাসুর দ্বারা ভাইবৌর গর্ভে সন্তান উৎপাদন এবং এক নারীর একাধিক স্বামী দুইটাই আছে; যা কি না রামায়ণ সমাজে নাই...

বাল্মিকীরে আদি কবি হিসাবে চিহ্নিত করারটা বেশ ঝাপসা বিষয়। কোনোভাবেই মিলে না যে বাল্মিকী আদি কবি। হইলে হইতে পারে রামায়ণের উত্তর কবি; যিনি রামায়ণ এডিট করছেন তিনি রামায়ণ বা পৌলস্তবধ কাব্যের প্রথম রচনাকার বুঝাইতে গিয়া বাল্মিকীরে রামায়ণের আদি কবি কইছেন। যেইটা পরে সংক্ষিপ্ত হইয়া খালি আদি কবি হিসাবে টিকা আছে এখন....

রামায়ণ বহুত এডিট হইছে। হইতে হইতে রামায়ণে অবতারবাদ ঢুকছে। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ঢুকছে। নারায়ণ পূজার কথা ঢুকছে। লক্ষ্মী মূর্তির বর্ণনা আছে। মনুস্মৃতি আর গৌতম বুদ্ধের কথা ঢুকছে। রাশিচক্র এমনকি মাসের নামও ঢুকছে রামায়ণে। নাম খোদাই করা আংটির কথাও আছে। সমুদ্র বিদ্যার বর্ণনা আছে। বৌদ্ধ যুগের শ্রমণী বা ভিক্ষুণিগো কথাও আছে...

আরো অনেকের মতো এইগুলাও কেদারনাথ তালিকাবদ্ধ করেন। তবে এইগুলা যে আরোপিত আর বহুত পরে ঢোকানো জিনিস সেই বিষয়ে তর্ক করার কোনো যুক্তি নাই। রামায়ণ আর মহাভারত যত আধুনিকই হউক না কেন এইগুলা যে লৌকিক ধর্ম শুরু হইবার পরে কিংবা সংস্কৃত লিপি আবিষ্কর হইবার পরে রচিত হয় নাই সেইটা নিশ্চিত। তবে রামায়ণে বৌদ্ধ বিরোধীতার ঢং দেইখা একটা কথা ফালায়া দেয়া যায় না যে; হইলে হইতে পারে বৌদ্ধ বিপ্লবে হিন্দু ধর্মরে দুরবস্থা থাইকা উদ্ধারের যে সকল প্রচেষ্টা নেয়া হইছিল; তারই একটা ধাপ হইল রামরে অবতার বানানোর লগে লগে এই রামায়ণ রচনা...

রামায়ণের ভাষা মহাভারতের ভাষা থাইকা বহুত আধুনিক। এই একটা বিশ্লেষণ থাইকাই মহাভারতরে রামায়ণ থাইকা পুরানা বইলা ধইরা নেয়া যাইতে পারে; যদি না আরো কিছু ফ্যাক্টর এইখানে হিসাবে আনা হয়...

কথা হইল সংস্কৃত ভাষার কোনো লিখিত রূপ আছিল না বহুত শতাব্দি। মাত্র খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে পাওয়া যায় প্রাচীনতম ভারতীয় লিখিত ভাষার ইতিহাস। তবে সেইটা সংস্কৃত না; পালি ভাষার লিখিত ফর্ম ব্রাহ্মী লিপি; যেইটা দিয়া বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার হইছে; মৌখিকভাবে আবার লিখিতভাবেও। তামিল ব্রাহুই ভাষার লিখিত ইতিহাসও প্রায় সমান। কিন্তু সংস্কৃত ভাষার দেব নাগরী আসে আরো পরে। মূলত বৌদ্ধ ধর্মের লিখিত রূপ দেইখাই সংস্কৃত সাহিত্য কিংবা যোগাযোগে লিখিত ফর্ম ব্যবহার করার লাইগা শুরু হয় দেব নাগরী বা সংস্কৃতের লিখিত ফর্মের যাত্রা। যার মূল কিন্তু গুপ্তযুগের গুপ্ত লিপি। মানে গুপ্ত লিপি থাইকাই উৎপত্তি হইছে সংস্কৃতের লিখিত ফর্ম দেব নাগরির। আর সেইটা পয়লা দিকে আবোল তাবোল চলার পর সংস্কৃতের ব্যবহারিক

ব্যকরণ সংগঠিত করেন পাণিনি। এর পর থাইকাই মূলত সংস্কৃত একটা সংগঠিত ভাষা...

কথা হইল সংস্কৃত লিপি আবিষ্কার এবং পাণিতি দ্বারা সংগঠিত হইবার পরেই এই গুপ্ত যুগে লিখিত হইতে থাকে প্রাচীন সব পুস্তকবাবলী; ঋকবেদ থাইকা শুরু কইরা সর্ব সাম্প্রতিক পুরাণ উপখ্যান পর্যন্ত...

এই যুক্তিটারে স্বীকার কইরা রামায়ণের প্রাচীনত্বের পক্ষের লোকজন বলেন- যে রামায়ণ লিখিত হইবার সময় লেখকরা ভাষা বদলাইয়া নতুন নতুন সাম্প্রতিক শব্দবন্ধ ব্যবহার করায় রামায়ণ প্রাচীন হইবার পরেও এর ভাষা নবীন হইয়া গেছে। কিন্তু কথা হইল এই একই সময়ের লেখকরা তো একই সময়ে বইসা স্মৃতি থাইকা ঋকবেদসহ সকল বেদ এবং মহাভারতেরও লিখিত রূপ দিছেন। সেইখানে তো তারা সাম্প্রতিক নতুন শব্দ দিয়া ঋকবেদের ভাষাও পাণিনির ব্যাকারণ অনুযায়ী কইরা দেন নাই। তাইলে শুধু রামায়ণের ক্ষেত্রে এইটা ঘটল কেমনে?

রামায়ণও তো তারা লিখছেন স্মৃতি থাইকা। অবশ্যই কিছু কিছু বাক্য শব্দ তারা বদলাইছেন; কিন্তু এক্কেবারে পুরা কাহিনিটা তারা নতুন ভাষায় অনুবাদ করছেন তা কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য না। সবচে বড়ো কথা রামায়ণ তো একজন কবির একটা কাব্য; মহাভারতের মতো জনজাতির আখ্যানও না; বেশিরভাগ গদ্যও না; যেইখানে যার ইচ্ছা সে কাহিনি ঢুকাইতে পারে। একটা সম্পূর্ণ কাহিনি কাব্যে নতুন শব্দ ঢোকানো অত সহজ না। পুরা নতুন অনুবাদ তো দূরের কথা। আমার হিসাবে লিখিত রূপ পাইবার সময় রামায়ণ নতুন ভাষায় লিখিত হইছে এইটা একটা ল্যাংড়া যুক্তি। মূলত এইটা রচিতই হইছে বহুত পরের সংস্কৃত ভাষায়...

দ্বিতীয় আরেকটা বিষয়; মহাভারতের মূল কাহিনিতেই একটা বিষয় পরিস্কার যে মহাভারতকার দ্বৈপায়ন লিখতে পারতেন না। তার কোনো শিষ্যর লেখার ইতিহাসও নাই। বহুদিন মুখে মুখে চলার পর মহাভারতের লিখিত রূপ দিবার লাইগা তাগোরে গিয়া আদিবাসী গণেশরে তেলাইতে হইছে। শেষ পর্যন্ত যে গণেশরে আগে সিদ্ধি-নাশক কওয়া হইত তারে দেবতার স্থান দিয়া; সিদ্ধিদাতা উপাধি দিয়া; সকলের আগে তার পূজা করার নিশ্চয়তা দিয়া মহাভারত

লেখানো হইছে। কিন্তু রামায়ণে দেখেন; শিকারি পক্ষী মারায় বাল্মিকী দুঃখু পাইয়া কাব্য করলেন আর লগে লগে তার শিষ্য ভরদ্বাজ তা লেইখা ফালাইলেন। তার মানে রামায়ণ রচনার যুগে বাল্মিকী এবং তার শিষ্যগো মাঝে লেখার চর্চা আছিল; সময় হিসাবে যেইটা কোনোভাবেই খ্রিস্টিয় তৃতীয় শতকের আগে না। গুপ্ত যুগেই। এবং মহাভারতে লিপিকার গণেশ দেবতা হইছেন এই গুপ্তযুগেই; এই সময়েই মহাভারতে ঢুকছে গণেশ আখ্যান। শিবপুত্র টুত্রের কাহিনি এই সময়কারই। অবশ্য শিবও মহাদেব বেশি আগে হন নাই...

কেদারনাথ একটা কঠিন প্রশ্ন করেন- রাবণ কি বৌদ্ধ আছিল? রামের অভিযানটা কি মূলত আছিল বৌদ্ধ খেদানোর উদ্যোগ?

এই প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দেয়া না গেলেও এইটা ভোলা সম্ভব না যে বৌদ্ধ রামায়ণ কাহিনি অনুযায়ী রাবণ কিন্তু বৌদ্ধ। আবার বিশ্বামিত্রের লগে গিয়া তাড়কা তাড়ানো থাইকা রাবণ হত্যা; রামের সব কামের লগেই কিন্তু আদিবাসী আর স্থানীয় মানুষ তাড়ানো-খেদানোর পাশাপাশি সাম্রাজ্য বিস্তার কিংবা শাসন পোক্ত করার একটা বিষয় রামায়ণের আগাগোড়া জুইড়াই অতিশয় প্রকট...

কেদারনাথের বইটা অসাধারণ। তিনি উপাদানগুলা তুইলা ধইরা তিনার মতামত দিছেন। একমাত্র রামায়ণে গরু খাওয়ার ইসু ছাড়া কোথাও কোনো কিছুরে তিনি টুইস্ট করেন নাই তার পুস্তকে...

কেদারনাথের অসাধারণ বিশ্লেষণের বাইরেও আরো কিছু উপাদান শেষ পর্যন্ত মহাভারতরেই প্রাচীনত্বের দিকে নিয়া যায়। মহাভারতে বৈদিক দেবতারা তাগো বৈদিক চরিত্র নিয়াই প্রায় সবাই উপস্থিত; মানে মাইনসের লগে মারামারি করা- এর তার বৌর ঘরে ঢুইকা যাওয়া কিংবা মাইর খাইয়া নতি স্বীকার করা; বৈদিক দেবতাগো এইসব চরিত্রই কিন্তু মাহভারতে উপস্থিত। রামায়ণে কিন্তু তিনাগো তেত্রিশজনের কথা শোনা গেলেও বড়োই নিস্ক্রিয় তারা। মেঘনাদের হাতে কোনো এক কালে ইন্দ্রের মাইর খাওয়া ছাড়া বৈদিক দেবতাগো সক্রিয় সংশ্লিষ্টতার কোনো সংবাদ নাই রামায়ণে। মানে তিনারা তখন রিটায়ার বা পরিত্যক্ত হইয়া গেছেন প্রায়। মহাভারতে কিন্তু বৈদিক

দেবতাগো থাইকা শৈব ঘরানায় ট্রানকিজশনের একটা ট্র্যাক পাওয়া যায়। মহাভারতে শেষ পর্যন্ত বড়ো দেবতা হইলেন শিব। বৈষ্ণব সেইখানে শুরু হইছে মাত্র। অন্যদিকে রামায়ণ প্রায় পুরা বৈষ্ণব...

মহাভারতের যুগে মানুষের গুহাতে বাস করার প্রচলনও আছিল। যেইটা অনেক প্রাচীনতার সন্ধান দেয়। বিদুর বারণাবতে একটা মিস্ত্রি পাঠায় পাণ্ডবগো লাইগা গুহা খুইড়া ঘর বানাইবার লাইগা। গুহা খুইড়া ঘর বানাইবার এক্সপার্ট মিস্ত্রির অস্তিত্ব যেই যুগে আছিল সেই যুগে নিশ্চয়ই গুহার মইদ্যে বসবাসের প্রচলনও আছিল। পোশাক আশাকের দিকেও মহাভারত অনেক প্রাচীন। পাণ্ডবরা যখন বনে যায় তখন ছাল বাকলা পইরাই গেছিল। এবং বনবাসের সময় ছাল বাকলাই পরছিল। কিন্তু রাম বনে যাইবার সময় সীতার অতি রাজকীয় পোশাক ছাড়াও রাম লক্ষ্মণ যে দরিদ্র পোশাক পইরা গেছে; সেইটাও কিন্তু তাঁতে বোনা সুতার কাপড়। আরো সোজা কইরা কইলে কইতে হয় রাম লক্ষ্মণের পরনের পোশাকটা আছিল বৌদ্ধ চির অজীন। মহাভারতের সময় কাপড়ের প্রচলন নিঃসন্দেহে আছিল; কিন্তু একই সাথে পশুর চামড়া বা গাছের ছাল পরার অভ্যাস বা প্রচলনও আছিল নিশ্চিত। একটা জায়গায় এমনো দেখা যায় যে গাছের ছাল তুইলা অর্জুন পোশাক বুনতাছে। মানে জীবনের পয়লা চৌদ্দ পনেরো বছর বনে কাটানো পাণ্ডবরা গাছের ছাল পরাও জানতো ঠিকমতো। আশপাশে এইটার প্রচলন না থাকলে কিন্তু অত সহজে তা বানাইয়া পরতে পারার কথা না...

মহাভারতে রাজপুত্ররা প্রাচীন গদাযুদ্ধ মল্লযুদ্ধই শিখত; রামায়ণে গদার উল্লেখ নাই। তীর ধনুকের ব্যবহারই বেশি। মহাভারতে চতুবর্ণ আছিল না। কিন্তু রামায়ণে পরিষ্কার। ভীম রাক্ষস বিবাহ করে। কুন্তীসহ পাণ্ডবেরা সকলের ঘরে খায়। কুমারের বাড়ি থাকে। নিজেগোরে ব্রাক্ষণও পরিচয় দেয়; কিন্তু রামায়ণ সমাজে বর্ণ বিভাজনটা পরিষ্কার। রাম কিন্তু বালি কিংবা বিভীষণের ঘরে কিছুই মুখে দেয় না। শূদ্র রাজা গুহকের দেওয়া খাবার নিজে মুখে না দিয়া ঘোড়ারে খাওয়ায়। আবার বেদ পড়ার অপরাধে শূদ্র শম্ভুকরে মাইরা ফালায়। মানে রাম পুরাই চতুবর্ণী রাজা...

হরপ্পায় পাথরের দালান ছিল; খ্রিপূ ২৫০০ সালে। আর্য প্রভাবিত ভারতীয়রা যখন আবার স্থাপনা বানাইতে শুরু করে তখন সেটা অলরেডি খ্রিপূ ২৫০। তবে সেইটা শুরু হয় কাঠের দালান দিয়া। পাথর না। ভারতে আর্যগো হাতে পয়লাবারের মতো পাথরের দালান বানানো শুরু হয় গুপ্ত যুগে; ৩৫০ খ্রিস্টাব্দের দিকে। তাইলে রাবণের বাড়িতে অত দালান আসে কেমনে?

মহাভারতে কোনো স্থাপনার কথা কিন্তু আছিল না। রামায়ণে ইটের দালানের কথা আছে কিন্তু পুরা মহাভারতে কোনো বাস্তুশিল্পের উদাহারণ নাই। পুরোচন বারণাবতে সম্রাজ্ঞী আর যুবরাজের লাইগা যে ঘরটা বানায় সেইটা কিন্তু কিন্তু বাঁশ-বেত শনের ঘর। অন্যদিকে রামায়ণে স্থপতিরা বেশ উপস্থিত। ইটের ব্যবহারও আছে। দালানও আছে। তবে লঙ্কায় ইটের দালান আছিল বইলা মনে হয় না। লঙ্কার সবগুলা বাড়িঘর প্রাচীরই আছিল সাধারণভাবে দাহ্য; মানে কাঠ বাঁশের স্থাপনা। যদিও রাবণের দশটা গুণ বা দক্ষতার মইদ্যে একটা আছিল বাস্তুশিল্প বা আজকের যুগের স্থাপত্যশিল্প...

ময় দানব নামে মাত্র একজন স্থপতির কথা মহাভারতে শোনা যায়; কাব্যিক বর্ণনায় ময় দানবের তৈরি ইন্দ্রপ্রস্থের প্রাসাদ অনেক বিশাল আর উজ্জ্বল বইলা মনে হইলেও আসলে কিন্তু তা না। কারণ যুধিষ্ঠির সম্রাট হইবার পরে কিন্তু এই প্রসাদে থাকে নাই। আবার বলা হয় দুর্যোধন এই প্রাসদ দেইখা হিংসায় জইলা গেছিল; অথচ পাশা খেইলা জিতার পর কিন্তু প্রাসাদটা দিয়া দিছে দ্রোণাচার্যরে। ইন্দ্রপ্রস্থের দালান যদি অতই আকর্ষণীয় হইত তবে কিন্তু তা দুর্যোধন রাখত; না হইলে যুধিষ্ঠির নিজেই রাখত। কিন্তু তা হইল না...

এক নারীর একাধিক স্বামী- আনুষ্ঠানিকতা বর্জিত বিবাহ- বরের বাড়ি পাত্রী আইনা বিবাহ; এইগুলা যেমন পুরানা প্রথা তেমনি সন্তানের মায়ের নামে পরিচিতি বহুত প্রাচীন প্রথা। এইগুলা সবই মহাভারত সোসাইটির উপাদান। মহাভারত সোসাইটিতে লোকজনরে আমরা মাত্র বাপের নামে পরিচিত হইতে শুরু হওয়া দেখি। এবং সেইখানে বলতে গেলে মাত্র একজন মানুষই মোটামুটি বাপের নামে পরিচিত। তিনি কৃষ্ণ। কৃষ্ণরে মহাভারতে খুব অল্প ক্ষেত্রে তার মায়ের নামে ডাকা হইছে। পাণ্ডবগো বাপের নামে ডাকা হইলেও

বহুবার আমরা কৌন্তেয়- মাদ্রেয় কথাগুলা শুনি। মানে দুইটাই প্রচলিত আছিল। অন্যদিকে ভীষ্ম পুরাই গাঙ্গেয়...

রামায়ণ কিন্তু পুরাই বাপকেন্দ্রিক। বাপের নামে সন্তানের পরিচয় তুলনামূলক বহুত আধুনিক বিষয়। মূলত নারীর সারা জীবন এক স্বামীর লগে থাকার বিধান প্রচলিত হইবার পরেই বাপের নামে পরিচিতিটা প্রতিষ্ঠিত হয়। বলা হয় ঋষি উদ্দালক আরুণি; যিনি পাঞ্চাল রাজা প্রবাহণের শিষ্য হইয়া ব্রহ্মের তত্ত্ব প্রচার করছিলেন; তার ক্ষেত্রজ পুত্র শ্বেতকেতুই হইলেন নারীদের এক স্বামীর অধীন করার পয়লা প্রচেষ্টাকারী। পরে সেইটারে মোটামুটি পাকাপোক্ত করেন অঙ্গিরা বংশের আন্ধা ঋষি দীর্ঘতমা...

রামায়ণে নারীর এক স্বামী- আড়ম্বরপূর্ণ বিবাহ অনুষ্ঠান- পাত্রীর বাড়িতে বিবাহ এই সকলই আছে সন্তানের পিতার নামে পরিচিত হইবার লগে লগে। পাশাপাশি মরার লগে শবানুগমন জিনিসটা আর্য সমাজে আছিলই না; মহাভারতেও নাই। শবানুগমনের মতো এই নতুন সিস্টেমটাও কিন্তু রামায়ণ সমাজে আছে...

বলা হয় বেদ আগে বামুন ছাড়া শূদ্র আর নারীগো লাইগা নিষিদ্ধ আছিল। নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী তার মহাভারতের ছয় প্রবীণ গ্রন্থে কন যে দ্বৈপায়নই পয়লা ব্যক্তি যিনি নারী আর শূদ্রগো লাইগা বেদ উন্মুক্ত কইরা দেন। রামায়ণে আমরা অনার্য বংশজাত বালির স্ত্রী তারারে বেদ পড়তে দেখি। এই হিসাবে তো অবশ্যই এগোরে দ্বৈপায়ন পরবর্তী মানুষ বইলা ধইরা নিতে হয়। আবার রামায়ণের শেষ দিকে খালি বেদ পড়ার অপরাধে রাজা রামরে আমরা দেখি এক শূদ্রবংশজাত শম্বুকের মাথা কাইট্টা ফালইতে। তবে কি বেদ শূদ্রগো লাইগা আবার নিষিদ্ধ হইছিল রামের হাত ধইরা?

চতুর্বেদ কথাটা দ্বৈপায়ন থাইকা শুরু। বলা হয় অগোছালো বেদের মন্ত্রগুলারে তিনি চাইর ভাগে ভাগ করেন বিষয় অনুযায়ী। যদিও বেদগুলার মইদ্যে প্রচুর রিপিটেশন আছে আর অথর্ব বেদরে ঠিক অন্য তিনটা বেদের সম পর্যায়ে ধরা হয় না। তবুও আমরা রামায়ণে কিন্তু বিভাজিত বেদের রেফারেন্সই শুনি। অন্তত তিন বেদ সেইখানে পরিষ্কারভাবে উল্লিখিত। আখ্যানমতে দ্বৈপায়নের পুত্র শুকদেবই হইলেন দুনিয়ার পয়লা চতুর্বেদী মানুষ। বাকি যারা ত্রিবেদী বা

চতুর্বেদী তারা সকলেই হয় শুকদেবের শিষ্য না হয় তস্য শিষ্য। কিন্তু রামায়ণে আমরা দেখি সুগ্রীবের মাইয়ার জামাই আর মন্ত্রী হনুমান একজন ত্রিবেদী বা চতুর্বেদী পর্যায়ের মানুষ। যদিও হনুমানের শিক্ষা বিষয় রামায়ণে পরিষ্কার নাই; তবু এই অনার্য মানুষটার মুখে নির্ভুল সংস্কৃত আর বৈদিক বিষয়ের উল্লেখ শুইনা রাম পর্যন্ত লক্ষ্মণের কাছে বিস্ময়ে হনুমানের বিদ্যার প্রশংসা করেন। সারা রামায়ণে আমরা রামরে কি অন্য কারো গুণের প্রশংসা করতে শুনি? মনে হয় না...

কেউ কেউ মহাভারতে কুরুপক্ষে যুদ্ধ করা বৃহদ্বলরে রামের উত্তর পুরুষ কইয়া যুক্তি দেখান যে মহাভারত রামায়ণের পরে। কারো যুক্তিতে রামপুত্র কুশের ধারায় বৃহদ্বল রামের ১৫তম আর কারো তালিকায় ২৮তম উত্তর পুরুষ। কিন্তু রামায়ণের সমাজ বইয়ের লেখক কেদারনাথ মজুমদার পরিষ্কার কইয়া দেন যে লব কিংবা কুশ আদৌ রামের কেউ না; পুত্র তো দূরের কথা। মূলত উত্তরকাণ্ড যারা লেখছে; তারাই রামায়ণ গানের কথক লব আর কুশেরে রামের পুত্র বানায়া দিছে। মানে লব আর কুশ সম্পর্কে সেই ছোটবেলার গ্রামের ধাঁধা আরকি- ছেলের যখন জন্ম হলো মা ছিল না ঘরে/ জন্মদাতা জন্ম দিলো না জন্ম দিলো পরে...

মানে লব আর কুশের জন্ম বাপেও দেয় নাই; মায়েও না; জন্ম দিছে কবিরা। মূলত রাম আর সীতা নিঃসন্তানই ছিলেন। বৃহদ্বল কাশির রাজা আছিল ঠিক। বৃহদ্বলরে বোধহয় বংশ গৌরব বাড়াইবার লাইগা কেউ মহাভারতে ঢুকাইছে পরে। কারণ তখনকার দিনে রাজা বাদশাগো নিজের বংশ গৌরব বাড়াইবার লাইগা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পূর্ব পুরুষরে ঢোকাইয়া মাইরা ফালানো থাইকা সহজ কোনো পদ্ধতি আছিল না। বৃহদ্বলের লগে আসলে রামায়ণ মহাভারতের আগে-পরের কোনো সম্পর্ক নাই...

একইভাবে বিশ্বামিত্র-মেনকার মাইয়া শকুন্তলার স্বামী রাজা দুষ্মন্তর পোলা ভরত হইল মহাভারতের শান্তনু কিংবা কুরু বংশের পূর্ব পুরুষ; এইটা দিয়া রামায়ণরে আগের ঘটনা কইতে যাওয়া একটা ফালতু বিষয়। কারণ বেদে রাজা সুদাসের পুরোহিতের চাকরি হারায়া সুদাসের রাজ্য দখল করার লাইগা যে বিশ্বামিত্র আক্রমণ কইরা বসছিলেন তিনি যেমন বিশ্বামিত্র; তেমনি

ঋগবেদের গায়ত্রী বা সাবিত্রী মন্ত্রসহ বহুত শ্লোক; বিশেষত তৃতীয় মণ্ডল এর রচয়িতাও বিশ্বামিত্র; আবার গৌতম বুদ্ধের জীবনী ললিত বিস্তারেও কিন্তু দেখা যায় যে তিনি যার কাছে লেখাপড়া শিখছেন তার নামও বিশ্বামিত্র...

ঋগবেদে বিশ্বামিত্রের চাকরি খাইয়া রাজা সুদাসের পুরোহিতের চাকরি যে বশিষ্ঠ নিছিলেন তিনি হইলেন মিত্রবরুণের ঔরসে উর্বসীর পোলা বশিষ্ঠ। আর রামায়ণের বশিষ্ঠের বাপের নাম ব্রহ্মা। অন্যদিকে মহাভারতের বশিষ্ঠ কিন্তু বিশ্বামিত্রের লগে যুদ্ধে নির্বংশ হইয়া যান; তার পোলার গর্ভবতী স্ত্রীর গর্ভে একমাত্র বংশ টিকা থাকে পরাশর; যে কি না দ্বৈপায়নের পিতা। অন্যদিকে রামায়ণের বশিষ্ঠের পোলা রীতিমতো এক চ্যাংড়া পুরোহিত; যে রাম বনবাসে যাইবার আগে তার সমস্ত দান খয়রাতের তদারকি করে...

বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ এইগুলা মূলত গোষ্ঠী নাম; আইজকার যুগের চৌধুরী কিংবা ব্যানার্জিগো মতো। ঋগবেদে যত জায়গায় এইসব ঋষির নাম আছে তার বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কিন্তু তা বহু বচনে আছে; মানে বশিষ্ঠগণ বিশ্বামিত্রগণ আর যজুর্বেদে ভৃগুগণ অঙ্গিরাগণ এই রকম। মানে ঋগবেদের কালেই এরা বংশ বা গোষ্ঠী হিসাবে পরিচিত আছিলেন। সুতরাং এইসব ঋষি পুরোহিতগো নাম দিয়া ইতিহাস বাইর করার কোনোই সুযোগ নাই। এবং তা অর্থহীনও...

একইভাবে রামায়ণে জন্মেজয় আর পরীক্ষিতের উল্লেখ আছে; পরীক্ষিৎ হইল অর্জুনের নাতি; এইরকম রেফারেন্স দিয়া আসলে রামায়ণ মহাভারত আলোচনা করার সুযোগ নাই। কারণ একই নামের ব্যক্তি হাজারে হাজার থাকে। বর্তমানে খুজলেও কয়েক লক্ষ রাম আর কৃষ্ণ পাওয়া যাবে দুনিয়ায়...

গীতায় কিন্তু বেশ কয়েকটা শ্লোকে বেদ বিরোধীতা বা বেদনিন্দা আছে। মহাভারতেও আছে বেদবিরোধীতা এবং বেদনিন্দা। তো বঙ্কিমচন্দ্র তার ভগবৎগীতায় গীতার সেই বেদবিরোধী শ্লোকগুলার মইদ্যে ৪২-৪৬ তিনটা বেদ বিরোধী শ্লোকরে বহুত ঘুরাইয়া প্যাচাইয়া মুচড়াইয়াও বেদের পক্ষে আনতে না পাইরা বেশ চমৎকার একটা কথা কইছেন অপারগ হইয়া। সেইটা হইল-

“ভারতবর্ষ এই উনবিংশ শতাব্দিতে বেদ শাসিত। আজিও বেদের যে প্রতাপ, ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের তাহার সহস্রাংশের এক অংশ নাই। সেই প্রাচীনকালে

বেদের আবার ইহার সহস্রগুণ প্রতাপ ছিল। সাংখ্যপ্রবচনকার ঈশ্বর মানেন না- ঈশ্বর নাই, এ কথা তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিতে সাহস করিয়াছেন, তিনিও বেদ অমান্য করিতে শাহস করেন না- পুনঃ পুনঃ বেদের দোহাই দিতে বাধ্য হইয়াছেন। "শ্রীকৃষ্ণ মুক্তকণ্ঠে বলিতেছেন, এই বেদবাদীরা মূঢ়, বিলাসী; ইহারা ঈশ্বর আরাধনার অযোগ্য"...

এর পরেও তিনি বহুত পৃষ্ঠা খর্চার করছেন জোর কইরা এই শ্লোগুলারে বেদের লগে লাইনআপ করতে। কিন্তু তিনি একটা কথা পরিষ্কার কইরা কইয়া দিছেন যে গীতায় যে বেদ বিরোধীতা আছে সেইটা পণ্ডিতেরা কিন্তু চাইপা গেছেন জানের ডরে; কিলের ভয়ে। হিন্দু ধর্মে ঈশ্বর না মানলে সমস্যা নাই কিন্তু বেদ না মানলে বহুত ঝামেলা...

তিনটা শ্লোকরে বেদের পক্ষে আনার বহু চেষ্টা করার পর আবার ৫৩ শ্লোকে গিয়া বঙ্কিম পড়েন আবার বিপদে। আবারো বহুত প্যাচাল পাড়েন এইগুলারে বেদের পক্ষে আনতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আবার অপারগ হইয়া ফট কইরা বইলা দেন-

"এখন বেদে কিছু প্রয়োজন নাই, এমন কথা, আমরা ঊনবিংশ শতাব্দির ইংরেজ শিষ্য, আমরা না হয় সাহস করিয়া বলিতে পারি, কিন্তু শঙ্করাচার্য্য কি শ্রীধর স্বামী এমন কথা কি বলিতে পারিতেন?... প্রাচীন ভারতবর্ষীয়েরা বেদকেই একটা ঈশ্বররূপে খাড়া করিয়া তুলিয়াছেন। কপিল ঈশ্বর পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু বেদ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। বৃহস্পতি বা শাক্যসিংহ প্রভৃতি যাঁহারা বেদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহারা হিন্দু-সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন। অতএব শঙ্করাচার্য্য, কি শ্রীধর স্বামী হইতে এমন উক্তি কখন সম্ভব না যে, ব্রহ্মজ্ঞানী হউক বা যেই হউক, কাহারো পক্ষে বেদ নিষ্প্রয়োজনীয়। কাজেই তাঁহাদিগকে এমন একটা অর্থ করিতে হইয়াছে যে, তাহাতে বুঝায় যে, ব্রহ্মজ্ঞানেও যা, বেদেও তা, একই ফল। তাহা হইলে বেদের মর্যাদা বহাল রহিল।"...

এক্কেবারে পরিষ্কার। শঙ্কাচার্য কিংবা শ্রীধরের মতো মানুষেরা সাহস কইরা কইতে পারেন নাই যে গীতায় বেদনিন্দা বা বেদ বিরোধিতা আছে। তাগো

ডর আছিল; সমাজচ্যুত হইয়া একঘরে হইবার। ডর আছিল মাইর খাইবার। যেমন ঘটছিল বৃহস্পতি বা শাক্যসিংহের বেলায়...

তো কেদারনাথ মজুমদার পুরা রামায়ণখান দুর্ধর্ষভাবে বিশ্লেষণ কইরা সাইরা একটু মিন মিন কইরা যুক্তি দেখান যে রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে রামের গোসব যজ্ঞের কথা আছে কিন্তু গরু খাওয়ার কথা তো পাই নাই। মনে হয় এইটা বঙ্কিমের সেই বিশ্লেষণের ধাচেই পড়ে। আমরা বুঝতে পারি কেদারনাথ কেন সেইটা পাশ কাইটা যান বা কমজোর গলায় কন- না তো। নাই তো। গোসব যজ্ঞের কথা আছে কিন্তু গরুর মাংস দিয়া মাখাইয়া ভাত খাইবার কথা তো নাই। যাউকগা। রামায়ণ সমাজে গরু খাওয়ার প্রচলন তো আছিলই উল্টা গরুর মাংসটাই আছিল শ্রেষ্ঠ মাংস বইলা গণ্য। গরু খাওয়া বন্ধ হয় মূলত বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবে...

রামায়ণ সমাজে গরু খাওয়া হইত না; গোসব যজ্ঞ কইরা মূলত মধু দিয়া রান্না করা গরুর মাংস গাঙে ফালায় দেয়া হইত দেবতাগো খাইবার লাইগা; এইসব কথা কেউ কইলে অন্যদিকে ধইরা নিতে হইব যে তিনি বা তিনারা রামের বয়স বুদ্ধদেবের থাইকা কমাইয়া নিয়া আসছেন। আর রামায়ণরেও কইরা দিতে চাইছেন বৌদ্ধ উত্তর সাহিত্য...

সেপ্টেম্বর ২০১৬

অভাজনের মহাভারত

০১

বাপে মরলে পোলায় রাজ্য পায়। বড়ো পোলা আঁতুড় ল্যাংড়া আন্ধা লুলা হইলে পায় ছোট পোলায়। কিংবা বাপের ইচ্ছা হইলে অন্য পোলা কিংবা অন্য কারো পোলারে রাজ্য দিয়া যায়। তারপর সেই রাজায় লাঠি দাবড়াইয়া- মাইনসের চামড়া ছিলা- খাজনাটাজনা নিয়া- মুকুট-সিংহাসন বানাইয়া রাজত্ব করে। কারো হেডম থাকলে নিজের পোলা শালা ভাই ভাতিজা নিয়া আশপাশের রাজ্য দখল কইরা মহারাজা হয়; না হইলে অন্যের ঠেলায় নিজের ঘটিবাটি হারাইয়া জীবিত থাকলে বনে গিয়া হয় জটাজুটধারী সন্ন্যাসী...

রাজা শান্তনু পর্যন্ত মহাভারতে রাজাদের ইতিহাস এমনই। হাজারে হাজার রাজা। কাঠুরের দলনেতাও সেইখানে যেমন রাজা; গোষ্ঠীর বুড়াও তেমন রাজা; শিকারি দলের প্রধানও রাজা; আবার বহু বলবান ইন্দ্রও সেইখানে একজন রাজা। মহাভারতে রাজার কোনো সংজ্ঞাও নাই; মাপজোকও নাই; সীমাপরিসীমাও নাই। এক্কেবারে বাংলাদেশের গ্রামের মতো। গ্রামেরও কোনো মাপজোক নাই; সীমা-সংজ্ঞাও নাই। দুই ঘর মানুষ নিয়া যেমন বাংলাদেশে গ্রাম আছে; তেমনি লাখের উপর মানুষ নিয়া বাইন্যাচঙ্গও বাংলাদেশে একটা গ্রাম...

মাঝে মাঝে মনে হয় সেই কালে গ্রামবুড়াদেরই অন্য নাম আছিল রাজা। তো জোয়ান পোলার বাপ বুইড়া রাজা শান্তনু পর্যন্ত মহাভারতের রাজনীতিবিহীন রাজারা ওইরকমই ছোটতে-বড়োতে মিলামিশা ছিল। তারপরেও ওইরকমই থাকার কথা ছিল; কেননা সকলেই জানত শান্তনু মইরা গেলে জোয়ান একমাত্র পোলা দেবব্রতই পাইব হস্তিনাপুরের গদি। শান্তনু নিজেও তা জানত; তাই পোলার হাতে রাজ্য দেখাশোনা দিয়া সে এদিক-সেদিক চক্কর দিয়া কাটাইত

সময়। আর এই ঘুর-চক্করের ভিতরেই সে মহাভারতীয় রাজাগো মইদ্যে পয়লাবারের মতো পইড়া গেলো রাজনীতির খপ্পরে...

সেই বুড়া রাজা শান্তনুর ঘরে তখন আর বৌ নাই। তার পোলা দেবব্রতের মায়ের নাম গঙ্গা। যারা তারে দেবী মানে তারা বলে দেবী গঙ্গা শান্তনুরে পোলা দিয়া আবার ফিরা গেছে গাঙ্গে; মানে সে থাকলেও শান্তনুর সংসারে নাই। সাদা চোখে মনে হয় শান্তনুর বৌ গাঙপাড়ের মাইয়া গঙ্গা তখন মইরা গেছে অথবা হইলেও হইতে পারে গঙ্গা তখনো জীবিত; কিন্তু শান্তনুর বাড়িতে না থাইকা দূরে কোথাও গাঙপাড়ে নিজের বাপের বাড়িতে থাকে। কারণ মহাভারতে পোলা দেবব্রতের লগে মাঝে মাঝে তার মায়ের সাক্ষাতের সংবাদ পাওয়া যায়। যদিও শান্তনুর লগে তারে আর কোনোকালে কোনো কথাবার্তা কইতে দেখে নাই কেউ...

তো সেই বুড়িগঙ্গা কিংবা মরাগঙ্গার পোলার বাপ রাজা শান্তনু এক দিন হাঁটতে হাঁটতে যমুনার তীরে গিয়া আছড়াইয়া পড়ে তরতাজা মাইমলকন্যা সত্যবতীর সামনে। ওরে বাপরে বাপ; কী মাইয়াখান দেখল রে রাজা। যেমন তার তেজ তেমন তার ধার। বয়স আর রূপের কথা তো বলারই উপায় নাই কারণ সেই যে চিত হইয়া পড়ছিল রাজা; মণিমুক্তা মাখানো পোশাক কাদায় ছ্যারাবেরা তবু সে ভুইলা গেছে হামাগুড়ি দিয়া উঠবার কথা...

বুইড়া হাবড়া আর চিতপটাং হইলেও সে একজন রাজা আর কইন্যা যেহেতু তারই রাজ্যে বৈঠা ধরে মাইনসেরে নদী পারাপার করে সেহেতু এই মাইয়া নিশ্চিত তার কোনো মাইমল প্রজার মেয়ে। মানে কাদাকুদা মাইখাও রাজা তারে যেকোনো কিছু কইতেই পারে। তো রাজা শান্তনু কয়- আমি তোমারে বিয়া করবার চাই...

এক রাজার পক্ষে মাইমল কইন্যারে এর থিকা ভালো কইরা কওয়ার কিছু নাই। রাজায় তারে বিয়া করতে চায় এইটা শুনলে তার গুষ্টিসুদ্ধা খুশিতে বগবগা হইবার কথা। কিন্তু এই পাটনি সত্যবতী কিছুটা ভিন্ন রকম। ন্যাড়া হইয়া সে একবার বেলতলায় গিয়া বহুত হ্যাপা ঘাঁটাইছে। তার যখন বয়স আরো কম; বুদ্ধিশুদ্ধিও অতটা পাক্কা হয় নাই। তখন এরকমই আরেকজন তার ঘাটে আইসা কইছিল- শোনো কইন্যা মুই বশিষ্ঠ পরাশর। মুই তুমার লগে শুইবার চাই...

জটাজুটধারী সেই লোক জাতে ব্রাহ্মণ। এক হাতে লোটা অন্য হাতে ত্রিশূল; মুনি বশিষ্ঠের নাতি; এইরকম একখান আব্দার করছে যা নমশূদ্র মাইমল গোষ্ঠীর উপর তার জাত আর ধর্মের অধিকার। নৌকার লোক আর আশপাশে তার জাতের মানুষ মুনির কথা শুনে থ মাইরা যায়। মাইয়া তাগোর দিকে চায় কিন্তু নিরুপায় সকলেই যেন কিছু শোনে নাই ভান কইরা এদিকে-সেদিকে হাঁটে আর নদী পার হইতে সত্যবতীর নৌকায় যারা উঠছিল তারা ভ্যাবাচেকা খাইয়া নৌকাতেই থাকে। কারণ নৌকার এক দিকে তখন নদী অন্য দিকে ব্রাহ্মণ পরাশর...

আশেপাশে তাকাইয়া পরাশর বুঝে বাতাস তার অনুকূলে আছে। নৌকার যাত্রীগো সে নাইমা যাইতে আদেশ করে গম্ভীর গলায়- আমি একলাই যাত্রী হমু আজ এই নৌকায়...

হুড়মুড় কইরা সত্যবতীর নৌকা থাইকা পাব্লিক নাইমা গেলে পরাশর উইঠা নৌকা ছাড়তে কয়। আর হতভম্ব সত্যবতীর নৌকা যখন মাঝ নদী বরাবর তখন পরাশর কয়- কাছে আসো কইন্যা। নৌকা ভাসুক গাঙ্গে...

পাটনিবিহীন নৌকা ভাসে জলে আর পাটনির গাঙ্গে সাঁতরায় পরাশর। তারপর দুইখান বাণী আর ভংচং আশীর্বাদ দিয়া পরাশর চইলা যায় কিন্তু সেই দিন মাঝ নদীতে গর্ভবতী হওয়া সত্যবতীরে লোকলজ্জার ভয়ে কিছু দিন পর দূরের চরে গিয়া জন্ম দিয়া আসতে হয় নিজের মতো এক কাইল্যা রঙ্গের পোলা...

পরাশর তো গেছে। কিন্তু বিয়ার বাজারে সত্যবতীর দামও সে নামাইয়া দিয়া গেছে এক্কেবারে তলায়। এক পোলার মায়েরে বুড়াধুড়া ছাড়া কেউ বিয়া করতে নারাজ। তাও যে দুয়েকজন রাজি তারা রাজি না কন্যাপণ দিতে। কারণ তারে বিয়া করলে তার পোলারেও খাওন পরন দেওয়া লাগব সেই স্বামীটার...

বুইড়াদের কামচক্ষু পড়া সে শিখেছে পরাশর দেইখা। শান্তনুর চোখ ঘোরে তার শরীরের ভাঁজে। পার্থক্য শুধু এই; ব্রাহ্মণেরা কাম ছাড়ে হাটে-মাঠে-ঘাটে আর ক্ষত্রিয়েরা কাম ফলায় ঘরে নিয়া গিয়া। খারাপ না। এক পোলার মায়েরে যেখানে কোনো জোয়ান মরদ বিয়াই করতে চায় না সেইখানে শান্তনু বুইড়া হইলেও তো রাজা। কিন্তু তবুও এক বাক্যে রাজি হওয়া ঠিক না মোটেও...

শরীরে হুমড়ি খাওয়া শান্তনুর চোখে চোখ রাখে সত্যবতী- রাজার বিয়ার প্রস্তাব কি নদীঘাটে দেওয়া মানায়? বাড়িতে আমার বাপে আছে। কইন্যার বিয়ার প্রস্তাব তার কাছে দেওয়া যেমন রাজার উপযুক্ত তেমনি কন্যাদানের অধিকারও তার...

ঠিক কথা। ঠিক কথা। মাইমলের মাইয়া হইলেও বুদ্ধিশুদ্ধি যেমন আছে তেমনি রাজার সম্মানও সে বোঝে ষোলো আনা। বাপের কাছেই গিয়া তবে কন্যাপ্রার্থনা উপযুক্ত কাজ...

শান্তনু সত্যবতীর বাপের কাছে যাবার আগেই নিজের বাপেরে সে সকল বিত্তান্ত বুঝায়ে ফালায়। কিছুক্ষণ পরে মাইমল পাড়ায় আইসা রাজা যখন সত্যবতীর বাপের কাছে বিয়ার প্রস্তাব রাখেন তখন জোড়হাত কইরা মাইমল হাসে- মহারাজ। আপনার তো একখান জোয়ান পোলা আছে ঘরে। হ্যায় যুদি ঝামেলা করে?

ধুর্বাল বইলা এইখান থেকে যেমন চইলা আসা যায়; তেমনি চুলের মুঠা ধইরা সত্যবতীরেও নিয়া আসা যায়। কিন্তু সত্যবতীর রূপে শইল যেমন উচাটন তেমনি মান-সম্মানের কথাখানও ফালান দেওয়া যায় না। মাইমল বেটারে পাত্তা না দিলেও নিজের জোয়ান পোলার ভাবসাব একবার যাচাই করা দরকার। পোলায় যদি সৎমা মাইনা না লয় তবে তো সত্যিই ঝামেলার কথা...

বাড়ি গিয়া শান্তনু নিজের পোলার সামনে আনচান করে। পোলায় জিগায়- কী হইল বাপ? আবার কেউ তোমার জমি লুটের ধামকি দিছে নাকি?

বাপে কয়- তুই যে দেশের যুবরাজ সেই দেশেরে হুমকি দিবার সাহস আছে কার?

পোলায় জিগায়- তবে ক্যান মন বেচইন বাজান?

বাপে কয়- মনটা বেচইন কারণ তুই আমার একটামাত্র পোলা। শাস্ত্রে কয় এক পোলা থাকা আর পোলা না থাকা পিরায় সমান। বড়োই চিন্তিত আছি রে বাপ; যদি তোর কিছু হইয়া যায় তো আমার পি-ি দিবারও যে থাকব না কেউ...

বুদ্ধিমান পোলায় বোঝে বাপের গতর টাডাইছে তাই পোলা বাড়াইবার নামে বিয়া করতে চায়। পোলায় ভাবে অসুবিধা কী? করুক না বিয়া। বুইড়া মানুষ মরার আগে একটু রং-তামাশা করলে সমস্যা তো নাই। তাই সে গিয়া বাপের ইয়ারদোস্তগো জিগায়- কারে দেইখা আমার বাপে উতলা কন তো চাচা-জ্যাঠা মুরব্বিগণ?

সত্যবতীর নামধাম জাইনা পোলায় নিজেই মিত্র-অমাত্য নিয়া গিয়া মাইমলের উঠানে খাড়ায়- শোনো মাইমল। আমার পিতা হস্তিনাপুরের রাজা শান্তনু তোমার মাইয়ারে বিবাহ করতে চান। আমি তার প্রস্তাব নিয়া আসছি তোমার নিকট...

দেবব্রতের এই প্রস্তাবেও মাইমল হাসে- শোনো যুবরাজ। সন্দেহ নাই যে রাজরানি হইবার এই প্রস্তাব আমার মাইয়ার লাইগা সৌভাগ্যের বিষয়। কিন্তু তোমার বাপের লগে আমার মাইয়ার শাদি হইলেও যে মোর নাতিপুতিরা কেউ রাজা হইতে পারব না তোমার মতো বড়ো ভাইজান থুইয়া। এখন তুমিই বলো; বাপ হইয়া কেমনে আমি নিজের কইন্যার এমন অধস্তন ভবিষ্যৎ মাইনা নিতে পারি?

দেবব্রত পড়ে ফাঁপরে। বাপেরে বইলা আসছে সত্যবতীর লগে তার বিয়া সে করাইয়া দিবে। পাত্র-অমাত্যদেরও ভড়ং দেখাইয়া কইছে- বুইড়া বাপের লাইগা আমার এইটুকু তো অবশ্যই করা উচিত। কিন্তু এখন যদি তার কারণেই বাপের বিয়া ভাইঙ্গা যায় তয় কেমনে সে মুখ দেখায় সকলের কাছে?

আশপাশ তাকাইয়া সে মাইমলের হাত ধরে- আমি তোমারে কথা দিলাম ভবিষ্যৎ নানা। যদিও আমি বাপের পরে রাজা হইবার দাবিদার। তবু আমি সকলরে সাক্ষী রাইখা সেই রাজত্বের দাবি ছাইড়া দিলাম। তোমার মাইয়ার গর্ভে আমার যে ভাইয়েরা হবে; তারাই পিতার পরে হবে রাজা। এইবার তুমি রাজি হও...

মাছেরে নিয়া কারবার যার; সে ঠিকই বোঝে মাছে টোপ গিললেই সুতায় টান দিতে নাই; তারে নিয়া কিছুটা খেইলা বঁড়শিখান বিঁধাইতে হয় মাংসের ভিতর। সে কয়- অতীব খুশির কথা যুবরাজ। নিজের পিতার একটা খায়েশ পূরণের লাইগা রাজত্ব ছাইড়া দিবার মতো তোমার যে ত্যাগ তা ইতিহাস স্মরণ রাখব আমি লেইখা দিতে পারি। কিন্তু তুমি তো একটা জোয়ান মানুষ। সামনে বিয়াশাদি করবা। তোমারও পোলাপান হইব বিস্তর; কিন্তু কে কইতে পারে যে সকল পোলাই বাপের মতো ত্যাগ আর উদারতা পায়? তো তুমি রাজত্বের দাবি ছাইড়া দিলেও তোমার পোলাপান তা মানব তার গ্যারান্টি কই? তারা যদি আমার ভবিষ্যৎ নাতিগো লগে রাজ্য নিয়া কাইজা বাঁধায়? সেইটাও তো একখান চিন্তার বিষয়; নাকি কও?

কী কুক্ষণে যে বাপের বিয়ার ঘটকালি করতে আসছিল দেবব্রত এইবার মনে মনে ভাবে। বাপের দোস্তবন্ধুরা তার দিকে তাকাইয়া আছে। হিরা মণি মাণিক্য কিংবা কইন্যাপণ নিয়া কথা হইলে তারা কিছু কইবার পারে। কিন্তু হালার মাইমল যা কয় সবকিছু যুবরাজরে প্যাঁচ দিয়া কয়। এই সব কথার উত্তর তো যুবরাজ ছাড়া তার বাপেরও দিবার সাধ্যি নাই...

যুবরাজ দেবব্রত পড়ে মাইনকার চিপায়। সক্কলের চোখে সে দেখে একটাই ভাষা- বাপধন। বাপের বিয়াটা যদি হয়; তবে একমাত্র তুমিই তা করায়া

দিবার পারো। আর যদি ভাঙ্গে তবে সেইটাও একমাত্র তোমার লাইগা ভাইঙ্গা যাইতে পারে। এইবার দেখো বাপধন। কী করবা না করবা তুমি বুইঝা লও...

দায়িত্ব নিয়া পিছানোর থাইকা মইরা যাওন ভালো। সব দিক ভাইবা-চিন্তা দেবব্রত আগায় মাইমলের দিকে- আমি গঙ্গার পোলা দেবব্রত। তোমার গুষ্টিগাড়া এবং আমার বাপের এই সঙ্গীসাথিগো সামনে প্রতিজ্ঞা করতাছি যে; বাপের খায়েশ পূরণ আর তোমার ডর ছাড়াইবার লাইগা আমি সারা জীবন ব্রহ্মচারী হইয়া থাকব। জীবনে বিয়াশাদি যেমন করব না তেমনি বিবাহের বাইরেও জন্ম দিব না পোলাপান। আর আমার পোলাপান না হওয়া মানে তোমার ভবিষ্যৎ নাতিপুতিগো কাইজাবিহীন সিংহাসনের উত্তরাধিকার। এইবার তুমি রাজি?

- হ রাজি...

বাপের লাইগা ভীষণ কঠিন প্রতিজ্ঞা করায় দেবব্রতরে সক্কলে ভীষ্ম খেতাব দিয়া ধন্যধন্য করে আর নিজের পোলাপানের রাজত্ব আর শান্তনুর বড়ো পোলারে নির্বংশ রাখার সিস্টেম কইরা সত্যবতী রাজনীতি নিয়া আসে শান্তনুর ঘরে কিংবা মহাভারতের পাতায়...

ব্যাপারখানা বিশাল দারুণ। ঔরসধারী পরাশরের আশ্রমে বিদ্যাশিক্ষা কইরা সত্যবতীর বিবাহপূর্ব পোলায় হইছে ব্রাহ্মণ। এই ছুডুকালেই জ্ঞানগম্যির লাইগা কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন কইয়া তার বেশ নামডাক। পরের ঘরে আরেক পোলা যদি রাজা হয় তবে তা দারুণই হয় বটে...

সত্যবতীর গর্ভে দুইখান পোলা জন্ম দিয়া রাজা শান্তনু মইরা গেলে দেবব্রত সত্যবতীর বড়ো পোলা চিত্রাঙ্গদরে বসায় ক্ষমতায়। কিন্তু কী সব যুদ্ধমুদ্ধ করতে গিয়া বিয়াশাদির আগেই চিত্রাঙ্গদ মইরা গেলে সত্যবতীর ছোট পোলা নাবালক বিচিত্রবীর্যই হয় রাজা আর সতিনের পোলা ভীষ্ম থাকে উপদেষ্টা। তো সেই ভাই বড়ো হইলে ভীষ্ম ছোট ভাইরে একসাথে করাইয়া দেয় দুইখান বিয়া। কিন্তু সত্যবতীর কপালটা খারাপ। দুই পোলাই রাজা হইল কিন্তু রাজত্ব করতে পারল না কেউ। বড়োটা মরল বিয়াশাদির আগে আর ছোটটা বিয়াশাদি করলেও দুইটা বৌ রাইখা কী জানি কী অসুখে মইরা গেলো পোলাপান জন্ম দিবার আগে...

সত্যবতী পড়ল ঝামেলায়। নিজে রানি হইল; তার বুদ্ধিতে বড়ো ভাইরে বাদ দিয়া ছোট ভাইরা রাজাও হইল; কিন্তু এখন তো শান্তনুর ঘরে তার আর কোনো পোলাও নাই; নাতিপুতিও নাই। সিস্টেমমতো চললে তার বিবাহপূর্ব পোলা দ্বৈপায়ন কিন্তু মায়ের বিবাহসূত্রে শান্তনুর পোলা আর উত্তরাধিকার গণ্য হইবার কথা। কিন্তু সেই পোলা তো আবার ঋষিমানুষ। সিস্টেম মানে না; সিস্টেম ভাঙ্গে আর বানায়। রাজবাড়িতে মায়ের বিয়া হইলেও সে যেমন রাজবাড়িতে আসে নাই তেমনি রাজা তার মায়ের স্বামী হইলেও সে বদলায় নাই নিজের পিতৃপরিচয়। তো এখন তো সেই ভীষ্মই আবার শান্তনুর একমাত্র বংশধর। নিয়মমতো ভাইয়ের বিধবাদের গর্ভে সন্তান জন্ম দিয়া বংশরক্ষার দায়িত্ব আর অধিকার তারই...

নিরুপায় সত্যবতী যাইয়া ভীষ্মরে তেলায় কিন্তু ভীষ্ম নিজের ব্রহ্মচারিত্বের প্রতিজ্ঞা মনে কইরা ভাইয়ের বিধবাদের গর্ভে সন্তান উৎপাদনের লাইগা শাস্ত্রমতে কোনো ব্রাহ্মণ ভাড়া করার কথা কয়। আর তখনই সত্যবতীর মনে হয় নিজের ঋষিপুত্র রাইখা বাড়তি ব্রাহ্মণ ভাড়া করতে সে কোন দুঃখে যাবে? তার ঋষিপোলার রাজপুত্র হইতে আপত্তি থাকলেও রাজ বংশ উৎপাদন করায়

তো কোনো অসুবিধা নাই। তাই সত্যবতী তার বিবাহপূর্ব কানীন সন্তান দ্বৈপায়নরেই ডাকে...

দ্বৈপায়নের ঔরসে ছোট ভাইর দুই বিধবার গর্ভে জন্ম নেয় দুইটা পোলা। ছোট ভাইয়ের দাসীর গর্ভেও তিনি জন্ম দেন আরেক সন্তান। বড়ো নাতি ধৃতরাষ্ট্র আন্ধা বইলা গদিতে বসতে পারব না; মাইজা নাতি পাণ্ডুই হইব রাজা আর দাসীর গর্ভে জন্মাইছে বইলা ছোট নাতি বিদুর সর্বদাই থাকব উত্তরাধিকার লিস্টির বাইরে...

সত্যবতী শান্তি পায়। শান্তনুর রাজত্ব নিজের পোলাদের পরে আবারও নিশ্চিত হয় তার নাতিদের হাতে...

০২

বাচ্চা পয়দার ক্ষেমতা যার নাই সেই ব্যাডায় আবার করছে দুইখান বিয়া। রাজরানি হইবার লোভে নামর্দ স্বামীরে মাইনা নিলেও আঁটকুড়া ব্যাডার ঘরে সতিনের সংসার কেমনে মানা যায়?

কিন্তু সতিন হজম না কইরাও কোনো উপায় নাই কুন্তীর। পাণ্ডুরে দ্বিতীয় বৌ আনছেন ভীষ্মদেব নিজে। নিজে তিনি বিয়াশাদি না করলেও শান্তনু বংশে গত তিন প্রজন্মের বিবাহকর্তা তিনি। তার উপরই নির্ভর করছিল তার নিজের বাপের দ্বিতীয় সংসার। এর পরে তো ছোট ভাই কিংবা বড়ো ভাতিজার বিয়ার সিদ্ধান্তে কাউরে জিগানও নাই তিনি। পাত্রী ধইরা আইনা জানাইয়া দিছেন- আইজ তোর বিয়া। কিন্তু ঝামেলা বান্ধাইল তার মাইজা ভাতিজায়। কথা নাই

বার্তা নাই হঠাৎ এক দিন স্বয়ংবর সভায় গিয়া কুন্তীরে নিয়া আইসা খাড়াইল তার সামনে- আমি বিয়া কইরা ফালাইছি জ্যাঠা...

ভাতিজাবধূরে ঠিকঠাক আশীর্বাদ করলেও তিন জেনারেশন ধইরা তার ঘটকালির অধিকার নষ্ট করায় মনে মনে ভীষ্ম ভালোই খ্যাপেন। কিন্তু তার খ্যাপাটা যে অত বেশি তা অনুমান করতে পারে নাই কুন্তী। হঠাৎ এক দিন তিনি মাদ্রীরে আইনা খাড়া করেন পাণ্ডুর সামনে- তোর বৌটা আঁটকুড়া। তাই তোর লাইগা আরেকটা বিয়ার আয়োজন করছি আমি...

তিন প্রজন্মের ঘটকালিতে সংসারহীন ভীষ্মের ঘটকালিচক্র পুরা হয় এইবার। বাপের ঘটকালি তিনি করছেন পাত্রীর বাপের শর্ত মাইনা; ভাইয়ের ঘটকালি করছেন পাত্রী ছিনাইয়া; বড়ো ভাতিজার ঘটকালি করছেন পাত্রীর বাপরে ধামকি দিয়া আর ছোট ভাতিজার লাইগা পাত্রী আনলেন নগদ পয়সায় কিনে...

কিন্তু এক পোলার মা কুন্তীরে আঁটকুড়া কইল নির্বংশ বেটায়। কথাখান মনে মনে কইলেও বাইরে কুন্তী স্বাভাবিক থাকে। কুন্তীর বহু আগে থাইকা সংসার করা নিঃসন্তান ভাসুরবধূ গান্ধারীরে তিনি কিছু কন না ক্যান; এই প্রশ্নও সে ভীষ্মরে করে না। রাজ্যের সমস্ত সৈনিক যার অধীন; সেই ভীষ্মরে খ্যাপাইয়া পাণ্ডুর জীবনটা কঠিন কইরা তোলার কোনো ইচ্ছা তার নাই। তবে পাণ্ডুরে দিয়া কিছু হইব কি হইব না মাদ্রী সেইটা বুঝবার আগেই যেন কুন্তীর পোলাপান হস্তিনাপুর দাবড়াইতে পারে সেইটা নিশ্চিত করতে হইব এখন...

কিন্তু কোনোকিছু ফাইনাল করার আগে সত্যবতীরে একটু বাজানো দরকার। তাই কুন্তী গিয়া বুড়িরে খোঁচায়- আমারে আঁটকুড়া বইলা নাতিরে তো

আরেকখান সংসার করাইলেন দাদি। কই? আপনের নতুন নাতবৌয়ের শইলেও তো গর্ভের কোনো লক্ষণ নাই...

সত্যবতী বুদ্ধিমান আর নির্বোধের পার্থক্য বোঝেন দিন আর রাইতের মতো পরিষ্কার। বড়ো নাতিবৌ গান্ধারী বহুত আদব-কায়দা জানে; ধর্মকর্ম করে; সত্য কথা বলে; স্বামী কিংবা গুরুজনে ভক্তির অভাব নাই তার। কিন্তু খালি ধর্ম আর সত্য কইয়া সংসার চলে না। সব যোগ্যতাই আছিল ভীষ্মের; শুধু জানা ছিল না সময়ে সময়ে সত্যরে কেমনে নিজের পক্ষে ব্যবহার করতে হয় কিংবা দরকার মতো সত্য বানাইতে হয়। এই কারণেই সে রাজা বানায় তবু রাজা হইতে পারে না নিজে। কিন্তু যাদব বংশের মাইয়া কুন্তীর তো এই সমস্যা থাকার কথা না...

দাদি সত্যবতী সরাসরি কুন্তীর চোখে তাকান- নাতির আমার সমস্যা আছে জানি। কিন্তু আমি তার ঘরে পোলাপান দেখতে চাই। কথাটা বুঝতে পারছ তুমি?

কুন্তীর না বোঝার কারণ নাই। কিন্তু বুড়িরে আরেকটু নাড়ানো দরকার- দাদিজান। আপনি যা কইলেন তা মানলাম। কিন্তু ভীষ্মদেবেরে কথাটা কে বুঝাইব কন? অবস্থা দেইখা তো মনে হয় বছর না ঘুরতেই তিনি আরো দুই-চাইরটা সতিন আইনা আমার ঘাড়ে তুলবেন...

সত্যবতী এইবার কুন্তীরে নিশ্চিন্ত করেন- এই বিষয়ে ভীষ্ম আর কিছু করব না সেইটা তোমারে কইয়া দিতে পারি। কিন্তু আমার কথাটা মনে রাখবা তুমি। নাতি আমার অক্ষম হইলেও তার ঘরে আমি পুতাদের মুখ দেখতে চাই। শাস্ত্রে বহুত বিকল্প আছে; খালি সমাজের চোখে কিছু ধুলা দিতে হয়; আমার মনে হয় সেই বুদ্ধি তোমার ভালোমতেই আছে...

সবকিছু জাইনাও কুন্তীরে সতিনের ভাত খাওয়াইছে বুড়ি। বুড়ির কইলজায় একটা খোঁচা মারতে না পারলে কুন্তীর জান ঠান্ডা হইব না। কুন্তী এইবার বেক্কলের মতো চেহারা নিয়া জিগায়- হ দাদিজান। শাস্ত্রে তো মুনিঋষি ব্রাহ্মণ ডাইকা বৌয়ের গর্ভে পোলাপান জন্ম দিবার বিধান আছে। আপনে তো ছোট পোলার বিধবাগো গর্ভে সন্তান জন্ম দিবার লাইগা আপনের বড়ো পোলা ঋষি দ্বৈপায়নরে পাঠাইছিলেন ছোট ভাইয়ের বৌদের ঘরে। এখন কি আপনি তিনারেই আবার পাঠাইতে চান পুতের বৌয়ের বিছানায়?

খিটখিট কইরা উঠেন সত্যবতী- বেশরমের মতো কথা কবা না কলাম। দ্বৈপায়ন তোমার স্বামীর সাক্ষাৎ পিতা। আর কোনো বিকল্প দেখো না তুমি? তুমি ভালো কইরাই জানো যে এই বাড়িতে দ্বৈপায়ন খালি ধৃতরাষ্ট্র আর পাণ্ডুরে জন্ম দেয় নাই। তোমার দেবর বিদুরও দ্বৈপায়নের পোলা। দাসীর গর্ভে জন্মাইছে বইলা রাজবাড়িতে সে একটু তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যে আছে। হ রাজবাড়ি। বোঝোই তো; পাটনি মায়ের পোলা দ্বৈপায়নের ঘরে জন্ম নিয়া দুইজন হয় রাজপুত্তুর আর একজন অচ্ছুত। এইটাই সিস্টেম শান্তনু বংশের। তা যাই হোক; বিদুর বুদ্ধিমান পোলা। শান্তনু রাজ্যের নিয়ম যেমন সে জানে; ধর্মটর্মের নিয়মকানুনও তার ভালোমতো জানা। কথাটা কি বুঝতে পারছ তুমি?

প্রকাশ্যে লজ্জা দেখাইলেও কুন্তী মনে মনে হাসে- তুমি কি মনে করো তোমার বুদ্ধির লাইগা আমি বইসা আছি? আমি বিদুরের শরণাপন্ন হইছি কি না সেইটা তোমার ছানিপড়া চোখে ধরা পড়ার কথা না। বিয়ার আগের পোলারে লুকাইতে পারো নাই বইলা বুইড়া বিয়া করতে হইছে তোমার। কিন্তু এক পোলা জন্ম দিবার পরেও কুমারী সাইজা স্বয়ংবরা পর্যন্ত করছি আমি। আমার ঘরে পোলাপান হইলে মাইনসের চোখ টাটানি তুমি সামলাইবা কি না তা

আমার জানা দরকার ছিল। আর তুমি যেখানে আছ সেইখানে ভীষ্মদেব যে ভেড়া সেইটা সক্কলেই জানে...

বুড়া শান্তনুর জোয়ান পোলার সমবয়সী তরুণী বিমাতা সত্যবতী। কে জানে তাগো মধ্যে অন্য কিছু আছিল কি না। কুন্তীর মাঝে মাঝে মনে হয় বুড়িরে গিয়া জিগায়- ও দাদি। দাদারে তো মজাইছিলা রূপরস দিয়া। কিন্তু সতিনের জোয়ান পোলারে ব্রহ্মচারী কইরাও ঘরে বাইন্ধা থুইছ কোন মন্ত্র দিয়া কও তো শুনি?

গঙ্গার নন্দন ভীষ্ম। নিজে সংসারী না হইলেও সংসার তিনি বোঝেন সকলের থিকা বেশি। নির্বংশ পাণ্ডুরাজা যদি হস্তিনাপুরেই মারা যায় তবে বড়োই কলঙ্ক হবে বংশের মুখে। ভীষ্ম তাই বিধান দিছেন পশু শিকারের নামে পাণ্ডু বনবাসে যাবে দুই বৌ নিয়া। সেইখানে গিয়া সে শিকারের লগে ধম্মকম্ম করে মুনিঋষি দেবতার দয়ায় চেষ্টা করব সন্তান পাবার...

কুন্তী জানে জীবন্ত পাণ্ডু আর হস্তিনাপুরে ফিরতে পারব না কোনো দিন। ভীষ্ম তারে নির্বাসনে মৃত্যুর বিধানই দিছেন। পাণ্ডু মরার পর যদি কোলে পোলাপান নিয়া আসতে পারে তবে পাণ্ডুর বৌরা ফিরতে পারব হস্তিনাপুর। না হইলে এইটা তাদেরও শেষ যাত্রা...

ভীষ্মের বিধানে এখন আন্ধা বড়ো ভাই ধৃতরাষ্ট্র ভারপ্রাপ্ত রাজা। এর অর্থ পাণ্ডু বোঝে। ভারপ্রাপ্ত না; ভীষ্ম তার গদিটা বড়ো ভাইরে দান কইরা দিছেন। কিন্তু ভীষ্মের কথা অমান্য করার সাহস তার নাই। আন্ধা হইবার কারণে বড়ো ভাই হইয়াও যে রাজ্য ধৃতরাষ্ট্র হারাইছেন; এখন সুযোগে সেই রাজ্য পাইয়া ধৃতরাষ্ট্রও চান পাণ্ডু দূরে গিয়া মরুক। যত দিন পর্যন্ত না পাণ্ডুর পোলাপান

রাজা হইবার যোগ্য হয় তত দিন পর্যন্ত ধৃতরাষ্ট্র অনির্দিষ্টকালের লাইগা হস্তিনাপুরের রাজা...

বনে ঢুইকাই কুন্তী পাণ্ডুরে ডর দেখায়- পুত্রহীনের স্বর্গে যাওয়ার নিয়ম নাই এইটা তো আপনি জানেন মহারাজ?

পাণ্ডু কয়- হ তা তো জানি বৌ কিন্তু কেমনে কী করি?

কুন্তী এইবার তারে শাস্ত্রের কাহিনি শোনায়- বৌয়ের গর্ভে অন্য কেউ সন্তান দিলেও সেইটা তার পোলা বইলাই সকলে জানে। এই যেমন; আপনে তো আসোলে পাটনিপুত্র দ্বৈপায়নের পোলা। কিন্তু রাজার বৌয়ের গর্ভে জন্মাইছেন বইলা রাজপুত্র হইছেন। তো আপনেরে আমি একখান ঘটনা কই মহারাজ; আমি কিন্তুক কুমারী আছিলাম না বিয়ার সময়। এর আগেই আমার একটা পোলা আছিল। সেই পোলা কিন্তু কোনো মাইনসের পোলা না। দেবতা সূর্যের পোলা। তো কেমনে সেই পোলা পাইলাম সেই কাহিনি কই; পোলা পাওনের আগে আমি আছিলাম মুনি দুর্বাসার সেবিকা। মুনি দুর্বাসারে সেবা কইরা কেউ খুশি করতে না পারলেও আমি কিন্তু পারছিলাম। সেই খুশিতে তিনি আমারে একটা মন্ত্র দিয়া যান। মন্ত্রটার জোরে নিজের গর্ভে সন্তান জন্ম দিবার লাইগা আমি যেকোনো দেবতারে ডাকতে পারি। তো মন্ত্রের ক্ষমতা পরীক্ষার লাইগা আমি এক দিন হঠাৎ সূর্যরে ডাইকা বসলাম। তারপর দেখি আমার ডাক শুইনা সত্যি সত্যি সূর্যদেব চইলা আসলেন আর আমারেও একটা পোলা দিয়া গেলেন। পরে অবশ্য তারে আমি গাঙ্গে ভাসাইয়া দিছিলাম রাজকন্যার এমন পোলা থাকা উচিত না দেইখা। তো সেই মন্ত্র কিন্তু এখনো আমার আছে। আমি কিন্তু দেবতাগোরে ডাইকা আইনা আপনারে পোলাপান দিতে পারি মহারাজ...

দুর্বাসা থাইকা দ্বৈপায়ন কোনো অংশে ছোট ঋষি না। মন্ত্র দিয়া দেবতা ডাইকা মানুষের গর্ভে সন্তান পয়দা করা গেলে নিজে গিয়া দ্বৈপায়ন উঠতেন না ছোট ভাইয়ের বৌদের বিছানায়। কুমারী সেবিকা কুন্তীরে দুর্বাসা মন্ত্র দিছে না পোলা দিছে সেইটা পাণ্ডু ঠিকই বোঝে। কিন্তু রাজি না হইয়াই বা তার কী উপায়? কারণ সমাজে বিবাহিত আঁটকুড়ার কোনো স্থান নাই...

আগের কালে বৌয়ের কুমারীকালের পোলাপানরেও তার স্বামীর সন্তান বইলা ধরা হইত; সেই হিসাবে কুন্তীর গাঙ্গে ভাসান পোলাটা হইতে পারত নিঃসন্তান পাণ্ডুর পোলা। কিন্তু দ্বৈপায়ন থাইকা সেই সিস্টেমও বন্ধ। পুরানা সিস্টেমে দ্বৈপায়ন তার মায়ের স্বামী রাজা শান্তনুর পোলা হিসাবে গণ্য হইবার কথা; কিন্তু তিনি নিজেই প্রতিষ্ঠা কইরা দিছেন যে তিনি মুনি পরাশরের সন্তান। অবশ্য অন্য সিস্টেমটা তিনি নিজেই চালু রাখছেন মৃত ভাইয়ের বৌদের গর্ভে পোলাদের জন্ম দিয়া। বংশরক্ষার লাইগা সেইটাই এখন পাণ্ডুর একমাত্র উপায়; অন্যরে দিয়া নিজের বৌয়ের গর্ভে সন্তান জন্মদান। সেই ক্ষেত্রে যদি দেবতার নামে পোলা পাওয়া যায় তবে সম্মানটা অবশ্য কিছু বাড়েই বলা যায়...

পাণ্ডুরে সিস্টেম কইরা কুন্তী তার কোলে একটা পোলা তুইলা দেয়- দেখেন দেখেন রাজা। দুর্বাসার দেওয়া মন্ত্রের ক্ষমতায় ধর্ম দেবতার ঔরসে এই সন্তান জন্মাইছে আমার গর্ভে। এই পোলা কিন্তু আপনার প্রথম সন্তান। আপনের পরে এই পোলাই হইব হস্তিনাপুরের রাজা। এর নাম রাখছি যুধিষ্ঠির...

দেবতার নাম কইরা কুন্তী আরো দুইটা পোলা দেয় পাণ্ডুর কোলে; পবন দেবতার নামে আসে ভীম; দেবরাজ ইন্দ্রের নামে অর্জুন। পাণ্ডু খুবই খুশি। এখন আর তারে নিঃসন্তান কইতে পারব না কেউ। কিন্তু মাদ্রী খেইপা উঠে

কুন্তীর উপর- দেবতারে ডাক দিলা আর তারা আইসা তোমারে পোলা দিয়া গেলো। সাদা সাদা দেবতারা আইসা তোমারে দিয়া গেলো ভীম আর অর্জুনের মতো কালা কালা পোলা? আমারে অত নাদান ভাইব না তুমি। বনবাসে আইসা পোলা জন্মানোর নর্মাল সময়কাল পূরণ হইবার আগেই প্রথম পোলা হইছে তোমার। তুমি যদি মনে করো যে হস্তিনাপুরে বিদুরের লগে তোমার ঢলাঢলি আমার চোখে পড়ে নাই তবে তুমি ভুলের মইদ্যে আছ। তুমি যে পয়লা পোলার বীজ বিদুরের ঘর থাইকা নিয়া আসছিলা সেইটা তোমার পোলার চেহারাতেই পরমান। আর তোমার দ্বিতীয় পোলা ভীমের চেহারা এইখানকার যেকোনো পাহাড়ি মানুষের লগে খাপে খাপে মিল; সেইটা কি অস্বীকার করবা তুমি? আর এইখানকার নিষাদ পোলাপানের লগে তোমার তিন নম্বর পোলা অর্জুনরে ছাইড়া দিলে তো তুমি নিজেই তারে আলাদা করতে পারবা না। আমারে ওইসব মন্ত্রফন্ত্র বুঝাইও না। আমি কিন্তু সবাইরে কইয়া দিমু তুমি কেমনে কী করছ এইখানে...

কুন্তী হাসে- বেক্কল নারী। বুদ্ধি থাকলে কি নিজের মায়ের পেটের ভাই তোরে নামর্দের কাছে বিক্রি কইরা দেয়? তুই বুদ্ধিমান হইলে তো ভাইয়ে তোর লাইগা স্বয়ংবরা করত...

মাদ্রীও ঝটকানি দেয়- ভাইয়ে বিক্রি করুক আর দান করুক। এখন আমি পাণ্ডুর রানি। চোখের সামনে তুমি ভংচং কইরা পোলা বিয়াইবা আর আমি আঁটকুড়া হইয়া বইসা থাকুম?

- তোরে পোলা বিয়াইতে নিষেধ করছে কেডায়? সবকিছুই যখন বুঝস তখন যা না; দুই-চারটা পোলাপান তুইও পয়দা কর...

মাদ্রী দইমা যায়- বাচ্চা পয়দা করার সিস্টেম তো জানি। কিন্তু তুমি যেমনে দেবতা-টেবতার নাম দিয়া সেইগুলা জায়েজ করতে পারো সেইটা তো পারি না আমি...

কুন্তী হিসাব করে; এখন মাদ্রীর পোলাপান হইলে তারা সকলেই হইব কুন্তীর তিন পোলার বয়সে ছোট। সিংহাসন দাবি করার দিকে তারা থাকব পিছনে। তাছাড়া তার তিন পোলার আরো দুয়েকটা ভাই থাকলে হাতের শক্তি বাড়ে। হউক তাইলে। মাদ্রীরও তাইলে পোলাপান হউক। তাতে নিজের ছিদ্র ঢাকার লাইগা সে কুন্তীর ছিদ্রও ঢাইকা রাখব আজীবন। কুন্তী আস্তে গিয়া মাদ্রীরে কয়- তুই গর্ভধারণের সিস্টেম কর। মন্ত্র দিয়া তোর গর্ভ জায়েজ করার দায়িত্ব আমার। তুই খালি গিয়া পাণ্ডুরাজারে কবি যে- আমিও পোলার মা হইতে চাই। দিদিরে কও তার দেবতা ডাকার মন্ত্রটা আমারে ধার দিতে। তাতে সকলেই জানব যে একই সিস্টেমে দেবতাগো ডাইকা পাণ্ডুরাজার বংশ বাড়াইছস তুই...

মাদ্রী গিয়া পাণ্ডুর কাছে কয় কুন্তীরে কইতে মন্ত্রখান তারে ধার দিতে। পাণ্ডু কুন্তীরে অনুরোধ করলে অনুরোধ রাইখা সে মাদ্রীর পোলাপানের সীমাসংখ্যা একটু বাঁইধা দিতে চায়- তারে আমি মন্ত্র দিমু। কিন্তু একবারের বেশি কইলাম দিমু না। এতে আমার অসুবিধা আছে...

কিন্তু একবারেই মাদ্রী জন্ম দিয়া ফালায় যমজ সন্তান। সে যাতে আর পোলা জন্ম দিবার চেষ্টা না করতে পারে সেই জন্য কুন্তী গিয়া স্বামীরে বোঝায়- কইছিলাম না আপনের ছুডু বৌ একটা হারামজাদি? দেখছেন কী করছে সে? সে একবারে যমজ দেবতা অশ্বিনীকুমারগো ডাইকা দুইটা পোলা জন্মাইছে।

এইটা কিন্তু মন্ত্রের শর্তের পরিষ্কার লঙ্ঘন। আপনে আমারে আর কইয়েন না মাদ্রীরে মন্ত্র ধার দিতে...

মাদ্রী আর মন্ত্রও পায় না; ছেলেও নিতে পারে না আর। তার থাকে দুইটাই ছেলে; নকুল আর সহদেব; কুন্তীর তিন; আর সব মিলে পাণ্ডুরাজা পায় পাঁচখান পাণ্ডব...

এর মাঝে ধৃতরাষ্ট্রের বৌ গান্ধারী জননী হইছে একশো পোলার। কুন্তী হাসে। গাঞ্জাগপ্পের আর জায়গা পায় না। বিয়ার অত বছর পার হইলেও যে একটা পোলার জন্ম দিতে পারে নাই; কুন্তী বনে আসার পর এক লগে সেই গান্ধারী জন্ম দিয়া ফালাইল একশোটা পোলা আর একখান মাইয়া। পোলা-মাইয়া জন্মানো যেন নদীতে জাল ফেইলা ছোট মাছ ধরা। জাল ফেললাম আর গুইনা কইলাম একশো একখান হইছে। আসোলে রাজ্যের সেনাবাহিনী ভীষ্মের হাতে; তাই ধৃতরাষ্ট্র ধান্দা কইরা একশো পোলার গপ্প বানাইছে। সকল সৈনিক ভীষ্মের কথা শুনলেও বড়ো হইয়া এই একশোটা পোলা চলব ধৃতরাষ্ট্রের ইচ্ছায়। কী একখান গল্প বানাইছে তারা; গান্ধারী নাকি কুমড়া বিয়াইছে পয়লা। তারপর সেই কুমড়ারে কাইটা টুকরা কইরা ঘিয়ে ভিজাইয়া থুইছেন শ্বশুর দ্বৈপায়ন। সেই ঘিয়ে ভিজানো কুমড়ার টুকরা থাইকা একশো একটা পোলা-মাইয়ার মা হইছে গান্ধারী...

কিন্তু কাহিনিটা না মাইনাও কুন্তীর উপায় নাই। কারণ কাহিনির সাথে গান্ধারী শ্বশুর দ্বৈপায়নের নামখানও জড়াইয়া নিছে। দ্বৈপায়নের অতই কেরামতি; তিনি কুমড়া কাইট্টা ঘিয়ে ভিজাইয়া থুইলে সেইখান থাইকা মানুষ পয়দা হয়। তার যদি এতই ক্ষমতা তবে ছোট ভাইয়ের বৌগুলার বিছানায় না গিয়া ঘিয়ের মধ্যে কুমড়া ভিজাইয়াই তো তিনি ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু আর বিদুরের জন্ম দিতে পারতেন। কিন্তু উপায় নাই; দ্বৈপায়ন নিজেও এই কাহিনির বিরোধিতা করেন নাই। মুনিঋষিগো নামের লগে এইরকম কিছু অলৌকিক ক্ষমতার কাহিনি

থাকতে হয়। ঋষিরা বহুত কষ্ট কইরা এই সব কাহিনি বানায়। দ্বৈপায়ন যদি এইরকম একটা ফাও কাহিনি পাইয়া যান তো ছাড়বেন ক্যান? এইটা একটা সুবিধাও। ঋষিরা নিজের নামে ফাও কাহিনি চালায় বইলাই অন্যের ফাও কাহিনিগুলা তারা মাইনাও নেয়। এই যেমন কুন্তীর দেবতাকাহিনি। এই কাহিনিটাও তো দ্বৈপায়ন মাইনা নিছেন; স্বীকৃতিও দিছেন; এমনকি কুন্তীর পয়লা পোলা যুধিষ্ঠির যে ধৃতরাষ্ট্র-পাণ্ডু দুই ভাইর পোলাপানগো মইদ্যে সবার বড়ো এবং রাজ্যের পরবর্তী উত্তরাধিকার সেইটাও তিনি নিজের মুখে প্রচার কইরা দিছেন সর্বখানে...

থাউক। নিজের কাহিনির খাতিরে গান্ধারীর চালকুমড়া কাহিনিটাও কুন্তীরে মাইনা নিতে হবে। যদিও কুন্তীর সন্দেহ হয়; বোধ হয় দ্বৈপায়নই নিজেই এক বয়সের একশো একটা পোলাপান আইনা গান্ধারীরে দিছেন। হইতেও পারে; আন্ধা ধৃতরাষ্ট্র তার বড়ো পোলা। তার লাইগা তার সব সময়ই আলাদা একটা মায়া; পোলাটা সব সময় ভীষ্মের ডরে কুঁকড়াইয়া থাকে। যদি একশোটা পোলা পাইয়া তার বুকে একটু বল বাড়ে তাতে অসুবিধা কী?

কিন্তু ভীষ্মদেব কি মাইনা নিছেন গান্ধারীর একশো পোলার কাহিনি? ভিতর থাইকা না মানলেও অবশ্য বাইরে না মাইনা তার উপায় নাই। কারণ দ্বৈপায়ন এই কাহিনির সাথে সরাসরি যুক্ত আর দ্বৈপায়নরে ঘাঁটাইবার শক্তি তার নাই...

গান্ধারীর এখন একশোটা পোলা। তাই নিজের পোলাদের আরেকটু শক্তপোক্ত না কইরা হস্তিনাপুর না যাওয়াই ভালো। নিজের পোলাদের সুবিধার লাইগাই পাঁচ ভাইরে একমুঠায় কইরা বড়ো করা দরকার। পাঁচ ভাই এক থাকলে হিসাব মতো বড়ো ভাই হিসাবে কুন্তীর পোলারা মাদ্রীর পোলাগো সেবাযত্ন পাইব। তাই কুন্তী একলাই পাঁচটা পোলার দেখাশোনা করে আর

মাদ্রী সেবা করে পাণ্ডুরাজার। এর মধ্যে এক দিন পাণ্ডুরাজা যায় মইরা। মরা স্বামীর লাশ সামনে রাইখা কুন্তী আগুন হইয়া উঠে মাদ্রীর উপর- হারামজাদি। নিজের গতর ঠান্ডা করার লোভে স্বামীরে মাইরা ফালাইলি তুই?

এমন অভিযোগ মাদ্রী কল্পনাও করে নাই। বনের ভিতরে স্বামীরে নিয়া ঘোরাঘুরি করার সময় তার প্রতি স্বামীর হঠাৎ খায়েশ জাগে। না না কইরাও আর শেষ পর্যন্ত সে না করতে পারে না। কিন্তু স্বামী তার দুব্বল হার্টের মানুষ। উত্তেজনায় শরীর টানটান হইয়া উঠলে ধুম কইরা তার হৃৎপি-খান বন্ধ হইয়া যায়। মাদ্রী অতটা বোঝে নাই। তয় কামোত্তেজনার সময় যে পাণ্ডুরাজা মরছে সেইটা তো আর অস্বীকার করতে পারে না। সে মুখ নত কইরা রাখে। কিন্তু কুন্তী আগে বাড়ে আরো- বেশরম বেহায়া নারী। পোলাপানগো কী বলবি তুই তাদের বাপের মৃত্যুর কারণ? তুই কি তাগো বলতে পারবি যে তোর লগে যৌনখেলা খেলাইতে নিয়া তাগো বাপেরে খাইছস তুই? কোন মুখে তুই এখন হস্তিনাপুর যাবি? নগদ পয়সা দিয়া কিনা ভীষ্মের দাসী তুই। এখন হস্তিনাপুর গেলে সন্তান দুইটারে কাইড়া নিয়া তোরে আবার কারো কাছে বিক্রি করবেন না ভীষ্ম; তার কি গ্যারান্টি? আর তোর দোষে আমারেও মানতে হইব নির্বাসনের বিধান; কারণ অসুস্থ রাজা পাণ্ডুরে দেইখা রাখার ভার আমার উপরেই দিছিলেন গঙ্গার নন্দন আর পাটনি সত্যবতী। থাক তুই। তুই থাক তোর কামবাসনা নিয়া। এখন স্বামীও নাই। এদিক সেদিক যেদিক ইচ্ছা গিয়া তুই তোর কাম বাসনা কর। নিজের পেটের পোলাগো সামনে যৌনখেলায় পিতার মৃত্যু বর্ণনা দিবার থাইকা আমার মইরা যাওয়াই ভালো। পোলাগোর সামনে তাগো অসুস্থ পিতার লগে যৌনকর্মের কাহিনি বলার লাইগা বাঁইচা থাক তুই। আমি বরং আত্মঘাতী হয়ে সহযাত্রী হই নিহত স্বামীর। কারণ আমার কাছে অসম্মানে বাঁইচা থাকনের চেয়ে মৃত্যুই ভালো; বিশেষ কইরা যারে শতশত পাত্রের সামনে স্বামী হিসাবে মালা দিয়া বরণ করছি আমি। তোর তো ওই সব কিছু না। সম্মান তোর কোনো কালেই ছিল না; বাকি জীবনও তুই কাটায়ে দিতে পারবি দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা কিংবা দাসীগিরি কইরা। নিজের

পোলাদের ভবিষ্যৎ নিয়া আমার চিন্তা নাই। বংশের বাত্তি পাণ্ডবগো বুকে তুইলা রাখবেন ভীষ্ম আর সত্যবতী। ...স্বামীর মৃত্যুর সংবাদটা শুইনাই আমি স্বামীর লগে সহমরণ করার লাইগা সাথে কইরা নিয়া আসছি বিষ...

বিষপাত্র তোলে কিন্তু মুখে দেয় না কুন্তী। আড়চোখে দেখে মাদ্রী কী করে। মাদ্রী ভাইঙ্গা পড়ে। কুন্তী অপেক্ষা করে। আঘাতখান জায়গা মতোই লাগছে মাদ্রীর। মাদ্রী দৌড়াইয়া আইসা কুন্তীর বিষের পাত্র কাইড়া নেয়- দিদি গো। জীবনে আমার কোনো দিনও সম্মান আছিল না সত্য। কিন্তু নিজের পোলাগো কাছে এই কাহিনি আমারে কইতে কইও না তুমি। দোষ আমারই। যিনি এই দোষ থাইকা আমারে খণ্ডাইতে পারতেন তিনি এখন মৃত। আমি আর নিজের পোলাগো সামনে যাইতে চাই না। তুমি যা হয় একটা কিছু তাগোরে বুঝাইয়া কইও আর নিজের পোলাগো লগে আমার দুইটা পোলারেও একটু জায়গা দিও দিদি...

বিষ খাইয়া মাদ্রী পাণ্ডুর সহগামী হয় আর প্রায় সতেরো বছর পরে পাণ্ডু আর মাদ্রীর লাশ নিয়া হস্তিনাপুরে পা দেয় কুন্তী। সাথে তার পাঁচ-পাঁচটা তরুণ পাণ্ডব। যুধিষ্ঠির ষোলো- ভীম পনরো- অর্জুন চৌদ্দ- নকুল সহদেব তেরো। কুন্তী জানে এখন রাজা পাণ্ডুর সৎকার আর শোকেই ব্যস্ত থাকব সবাই। এই শোকসময়েই দাদি সত্যবতীরে ম্যানেজ কইরা রাজবাড়িতে জায়গা নিতে হবে। পাঁচ নাতির দায়িত্ব সঁইপা দিতে হবে কুরুবুড়া ভীষ্মের হাতে। আর বিদুরের লগে বুইঝা নিতে হইব রাজ্যের বাতাস...

সৎকারের শেষ দিনই দ্বৈপায়ন আইসা সত্যবতীর হাত ধরেন- চলো মা। এইবার রাজবাড়ি ছাইড়া তুমি আমার লগে আশ্রমে চলো। বহুত করছ তুমি এই বংশের লাইগা। এইবার তাগোর ভবিষ্যৎ তাগোরে দেখতে দেও...

বনবাসের পথে নিজের কানীন পুত্র দ্বৈপায়নের হাত ধরেন সত্যবতী। নিজেগো পোলার ঔরসদাতা দ্বৈপায়নের লগে চলেন রাজমাতা অম্বিকা-অম্বালিকা। পেছনে পইড়া থাকে গান্ধারী-কুন্তীর সংসার আর সংসারে আটকা পড়া নিঃসঙ্গ গঙ্গার নন্দন ভীষ্ম...

০৩

ভাসুরের ভাত খাইতে হস্তিনাপুর আসে নাই কুন্তী; যদিও আগে যিনি ছিলেন পাণ্ডুর পোষ্য তার পোষ্য এখন পাণ্ডুর বৌ-পোলাপান। বনবাসের আগে যিনি আছিলেন নিঃসন্তান মানুষ; তিনি এখন শত পোলার অহংকারী বাপ ধৃতরাষ্ট্র মহারাজ...

কুন্তীর পোলারা এখনো বেশ জংলি; যাদের রাজ্যশিক্ষা অস্ত্রশিক্ষা কিংবা বুদ্ধি কোনোটাই নাই। অন্য দিকে রাজনীতির ঘনিষ্ঠ থাইকা ধৃতের পোলা দুর্যোধন প্রায় প্রস্তুত বাপের পরে সিংহাসনে বসার; যদিও কুরুবুড়া ভীষ্ম দেখতে পারেন না তারে। কিন্তু ধৃতের পোলারা বড়ো হইবার পরে ভীষ্ম এখন শুধুই বংশের এক বৃদ্ধ মানুষ। এখনো তিনি সেনাবাহিনী প্রধান; কিন্তু তরতর করে বাড়া ধৃতের পোলারা যেখানে সারা দেশ দাবড়াইয়া বেড়ায় সেইখানে বাড়িতে বইসা তিনি জানেনও না তার সৈন্যসংখ্যা কত আর হাতিঘোড়াই বা আস্তাবলে আছে কি নাই...

ভীষ্মের সেই দিন আর নাই। যারে তিনি ছোট ভাইয়ের রাজ্যের ভার দিছিলেন; পোলারা বড়ো হইবার পর এখন সে সার্বভৌম রাজা। বাড়ির মুরব্বি আর সাক্ষাৎ জ্যাঠা বইলা এখনো ভীষ্মরে সে উপদেষ্টা আর সেনাপতির পদ থাইকা বরখাস্ত করে নাই; কোনোকিছু কইলে প্রকাশ্যে বিরোধিতাও করে না সত্য;

কিন্তু আড়ালে গিয়া সে সকল সিদ্ধান্তই নেয় বড়ো পোলা দুর্যোধনের লগে। ধৃতের এই পোলাটা বড়োই বেয়াদব। প্রকাশ্যেই সে কয় শান্তনু থাইকা শুরু কইরা কুরু বংশের সব রাজাই নাকি আছিল মেরুদণ্ডহীন; তাই ইচ্ছামতো রাজাগোরে ভীষ্ম কান ধইরা উঠাইছেন বসাইছেন। কিন্তু দুর্যোধনের উপরে সেইটা চলব না। কারণ দুর্যোধন তার বাপের মতো আন্ধাও না; পাণ্ডু কাকার মতো অথর্বও না...

দুর্যোধনটা বড়ো তরতর কইরা বাড়তাছে। মাত্র পনেরো বছর বয়সেই এই পোলা বুদ্ধিতে-রাজকাজে আর জনপ্রিয়তায় শান্তনু বংশের যেকোনো রাজার থাইকা বহু গুণ উপ্রে উইঠা গেছে। তার উপরে কাটা কাটা সত্য চোখের দিকে তাকাইয়া কইয়া দিতে পারে বইলা সত্যবাক নামেও তার বহুত সুখ্যাতি। ভীষ্মের লাইগা এইটা মাইনা নেওয়া কঠিন হইলেও তার বেশি কিছু বলবার নাই। ব্রহ্মচারী হইয়াও সারা জীবন রাজপুত্তুরের মতো মাখন-ঘি খাইছেন তিনি; এখন ভাতিজার চাকরি ছাইড়া দিয়া শেষ জীবনে তার পক্ষে জঙ্গলে তপস্যা করাও কঠিন। তাই কুন্তী তার পোলাগো নিয়া ফিরা আসায় ভীষ্মের ছানিপড়া চোখে একটু ঝিলিক লাগে। দুর্যোধনরে এইবার একটু টাইট দেওয়া যাবে...

ভীম মারে পাইকারি হারে। অর্জুন মারে বাইছা। নকুল সহদেব বড়ো দুই ভাইরে লাঠিসোঁটা আগাইয়া দেয় আর যুধিষ্ঠির আড়ালে খাড়াইয়া ভান করে গাছ পাতা লতা ফুল আকাশ প্রকৃতি দেখার। যদি দেখে ভীম ধৃতের পোলাগোরে শোয়াইয়া ফালাইছে তাইলে আড়ালে থাইকা মুচকি হাসে। আর যদি দেখে ধৃতের পোলারা ভীমেরে চাইপা ধরছে তয় দৌড়াইয়া গিয়া মারামারি ভাঙ্গায়- আরে করো কী করো কী? আমরা সবাই ভাই ভাই। ভাইয়ে ভাইয়ে মারামারি করলে বাইরের শত্তুরে সুযোগ পায়...

কুন্তীর পোলাগো এই কৌশল ভীষ্মের খুব পছন্দ হয়। ভীমের লাইগা ধৃতের পোলার বেশ চাপের মইদ্যে থাকে। কিন্তু খালি ভীমের কিলাকিলি দিয়া তো পুরাটা হইব না। তাই তিনি কৌশলে কুন্তীর বড়ো পোলা যুধিষ্ঠিরের উপর গুরুত্ব বাড়াইয়া দেন। পাণ্ডুর এই পোলা ধৃত-পাণ্ডু দুইজনের পোলাগো মইদ্যে বড়ো; সুতরাং আইনত সেই হইব পরবর্তী রাজা। অবশ্য ধৃতরাষ্ট্রের আপাতত এই সব নিয়া মাথাব্যথা নাই। রাজাগোজা হইবার বয়সে যাইতে পোলাপানের এখনো অনেক দেরি। বুড়া জ্যাঠার আপাতত যা ভাল্লাগে তাই সে করুক; সে আর বাঁচবেই বা কত দিন?

কুন্তী এই বিষয়ে এক্কেবারে চুপচাপ থাকে। যত দিন তার পোলাগো উপর ভীষ্মের নেকনজর আছে আর যত দিন না তারা আরেকটু শক্তপোক্ত হইয়া উঠছে তত দিন প্রকাশ্যে তার কিছু বলা ঠিক না। পোলাদের খালি সে বলে মুরব্বিদের একটু বেশি দাম দিতে। দাম কইমা যাওয়া বুড়ারা কারো কাছে দাম পাইলে তার লাইগা জান দিয়া দেন। তয় ভীমের লাইগা সে কিছুটা চিন্তায়ও থাকে। পোলাটার মাথা মোটা; মাইর খাইব না দিতে পারব সেই হিসাব না কইরাই সে কিলাকিলি শুরু কইরা দেয়। বহুবার ধৃতের পোলারা তারে মাইরা চ্যাপটা বানাইছে। এর উপরে আছে তার খানাপিনার লোভ। যার লগে অত মারামারি সেই দুর্যোধনই যখন তারে কইল- আয় ভাই খাবি? তোর লাইগা বহুত খানাদানা রেডি করছি আমি...

আগামাথা না ভাইবাই ভীম গিয়া শুরু করল খাওয়া। বিষ মিশানো খাবার খাইয়া সে বেহুঁশ হইয়া পড়লে দুর্যোধন তারে গঙ্গায় ভাসাইয়া দিছিল। পরে কুন্তী বিদুরের লগে গিয়া বেহুঁশ ভীমেরে তুইলা আনে ঘরে। ওষুধপত্র দিবার পরেও বিষের ঘোরে টানা আট দিন কোনো হুঁশবুদ্ধি আছিল না তার...

মুরব্বি হিসাবে মারামারি করার লাইগা মাঝে মাঝে ধৃতরাষ্ট্র অবশ্য তার পোলাগো বকাঝকা করেন। কিন্তু কুন্তী জানে ধৃত চান তার পরে দুর্যোধনই হউক রাজা। বড়ো ভাই হইয়াও তিনি আন্ধা বইলা রাজা হইতে পারেন নাই; বড়োই সম্মানহীন তার রাজত্ব জীবন। তিনি রাজা না; ছোট ভাইর আসনে ভীষ্ম তারে বসাইছেন ভারপ্রাপ্ত কইরা। সকলে মহারাজ কইলেও এইটা কেউ ভোলে না যে পাণ্ডুর পোলারা বড়ো হইলে রাজ্যটা তাগো ফিরাইয়া দিতে বাধ্য থাকবেন তিনি। তাই কুন্তীর পোলাগো বড়ো হওয়া দেখলে বড়ো ডর লাগে তার; কোন দিন না তারা বাপের গদিটা দাবি কইরা বসে...

রাজপুত্রদের শিক্ষাদীক্ষার মতো নিরীহ বিষয়গুলাতে এখনো ভীষ্ম একলাই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। কুরু-পাণ্ডবগো অস্ত্র শিক্ষার দায়িত্ব আছিল কুলগুরু কৃপাচার্যের। বড়োই শান্তশিষ্ট এই মানুষটা বেদবিদ্যার গুরু হিসাবে ঠিকাছেন। কিন্তু অস্ত্রবিদ্যার গুরু হিসাবে একটু হিংসুটে অহংকারী আর লোভী মানুষ বেশি উপযোগী। কারণ ভিতরে হিংসা অহংকার আর লোভই যদি না থাকে তয় অস্ত্র দিয়া মানুষ মাইনসেরে মারবই বা কেন?

দ্রোণ। জাতে ব্রাহ্মণ কিন্তু ধর্ম না কইরা করেন অস্ত্রের চর্চা। ছোটকালের বন্ধু পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের কাছে ব্রাহ্মণ দক্ষিণা না চাইয়া চাইছিলেন তার রাজ্যের অর্ধেক। ক্ষত্রিয়রা ব্রাহ্মণরে খানাপিনা দিতে পারে; কিন্তু চাইলেই রাজ্য দিয়া দিব এইটা কি হয়? কিন্তু রাজ্য দিলো না বইলা পাঞ্চাল রাজারে দেখাইয়া দিবার প্রতিজ্ঞা কইরা দ্রোণ এখন আইসা উঠছেন তার বৌয়ের ভাই কৃপাচার্যের ঘরে। কুন্তীর পোলাগো লাইগা লোভী আর হিংসুটে এই দ্রোণই হইতে পারে উপযুক্ত শিক্ষক। সে গান্ধারীর পোলাদেরও অস্ত্র শিক্ষা দিব কারণ তার বেতনটা তো যাইব আবার ধৃতরাষ্ট্রের কোষাগার থাইকা...

কুন্তীর সময় এখনো আসে নাই। সে মাঝে মাঝে খালি ভীষ্মরে গিয়া কয়- আপনের নাতিগো কেমনে ভালো হইব সেইটা আপনেই ভালো বুঝেন জ্যাঠা। আমি এক বিধবা নারী; স্বামীও নাই যে তার লগে পরামর্শ করতে পারি পোলাগো ভবিষ্যৎ নিয়া। তাই আপনেই আমার এতিম পোলাগো একমাত্র ভরসা...

কুন্তী ধৃতরাষ্ট্রের কাছেও যায়- মরহুম ছোট ভাইয়ের পোলাগো অভিভাবক তো আপনেই মহারাজ। বাপের অবর্তমানে আপনিই তাগোর বাপ। ওদের ভুলত্রুটি হইলে ক্ষমা কইরা সংশোধন কইরা দিয়েন...

সিংহাসন বিষয়ে টু শব্দ না কইরা হস্তিনাপুরে আট বচ্ছর পার কইরা দেয় কুন্তী। এখন তার পোলারা বেশ শক্তপোক্ত হইছে। অস্ত্রশিক্ষা যুদ্ধশিক্ষার লগে রাজনীতির হালচালও ভীম ছাড়া বাকিরা ভালোই বোঝে। যত দূর পারা যায় কৌরবগো লগে ভীমের কিলাকিলিরে কিলাকিলি হিসাবেই রাখতে পারছে সে; যুদ্ধ পর্যন্ত গড়াইতে দেয় নাই। তবে কিছু কিলাকিলিও দরকার আছিল; না হইলে নরম পাইয়া অত্যাচার বাড়াইয়া দিত ধৃতের পোলারা। কিন্তু বিদুর কিছুটা হতাশ যুধিষ্ঠিররে নিয়া- আমাগো পোলাটা যে রাজা হইবার তুলনায় একটু বেশিই বেকুব...

বিদুরের কথায় কুন্তী হাসে- ভীষ্মের আশীর্বাদ পাওয়ার লাইগা বেকুবই তো সবথিকা উপযুক্ত বিদুর। যার উপ্রে তিনি লাঠি ঘুরাইতে পারবেন না তারে সমর্থন দিবেন ক্যান?

এইবার কুন্তী আরেকটু আগায়। ভীষ্মের সামনে গিয়া পেন্নাম কইরা খাড়ায়- জ্যাঠা। আপনের বড়ো নাতির চব্বিশ বচ্ছর বয়স হইব অতি শিগ্গির। এখন

তো আস্তে আস্তে তার রাজকার্যও বুইঝা নিবার সময়। খালি কি অস্ত্র আর ধর্মশিক্ষা কইরা দিন যাইব তার?

ভীষ্মও অঙ্ক করেন। একধাপে কিছু করতে গেলে সামলানো নাও যাইতে পারে। বিদুরেরও সেই মত। সকল কিছু ভাবনা-চিন্তিয়া তিনি প্রকাশ্য রাজসভায় প্রস্তাব তোলেন যুধিষ্ঠিররে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করার...

সামনে যার আইনত রাজা হইবার কথা তারে যুবরাজ করার লাইগা কুরুবুড়ার যুক্তিসংগত প্রস্তাব; প্রধানমন্ত্রী বিদুরও যা সমর্থন করেন; ধৃতরাষ্ট্রের পক্ষে তা অস্বীকার করা মানে পাত্র-অমাত্য-প্রজাগো কাছে নিজেরে লোভী হিসাবে চিহ্নিত করা। হউক তাইলে সে যুবরাজ। যদিও যুবরাজ পদটা রাজা হইবার প্রস্তুতিমূলক পদ; তবু যুবরাজ হইলেই যে সবাই রাজা হইতে পারে না তার উদাহরণ তো ভীষ্মদেব নিজে...

যুধিষ্ঠিরের লাইগা আপাতত যুবরাজ পদই ভালো। এক লাফে রাজা হইলে সব বিপদ-আপদ সামাল দিতে হইব তার; যার লাইগা এখনো সে উপযুক্ত না। তার চেয়ে ধৃতরাষ্ট্রের ছাতার তলে থাইকা সব ঝামেলা তার ঘাড়ে ফালাইয়া নির্ঝঞ্ঝাট সময়ে পরে রাজা হওয়া যাবে। কিন্তু তার পাঁচ পোলার মধ্যে কারোই একসাথে সৈন্য আর রাজ্য চালানোর বুদ্ধিটা নাই; যেইটা আছে দুর্যোধনের। তাই কুন্তী যা ভাবছিল তাই ঘটে; দুর্যোধন খেইপা উঠে যুধিষ্ঠিরের যুবরাজ হওয়ার কথা শুনে...

ধৃতরাষ্ট্র প্রকাশ্যে দুর্যোধনরে কিছু বকাঝকা করলেও কুন্তী জানে আড়ালে গিয়া আন্ধা রাজা তার এই পোলার বুদ্ধিতেই চলেন। এই ক্ষেত্রেও তাই হয়। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই ধৃতরাষ্ট্র বিধান পাঠাইলেন- শান্তনু বংশের সকলেই জীবনে

একবারের লাইগা হইলেও বারণাবতে গিয়া পশুপতি শিবের উৎসব দর্শন করা নিয়ম। যেহেতু পঞ্চপাণ্ডব ছাড়া বংশের সকলেই বারণাবতে শিবের উৎসবে গেছে; আর যেহেতু যুবরাজ যুধিষ্ঠির রাজকার্যে ব্যস্ত হইয়া পড়লে তার পক্ষে আর অত দূর গিয়া তীর্থদর্শন সম্ভব না; তাই এখনই তার উপযুক্ত সময় ভাইগোরে নিয়া বারণাবতে যাইয়া পশুপতির উৎসব দেইখা আসা...

তিনি শুধু বিধানই দেন নাই; বারণাবতে যুবরাজের থাকার ব্যবস্থা করতে রাজকর্মচারী পুরোচনরে আদেশ দিয়া বিদুররে দিছেন তীর্থযাত্রা আয়োজনের ভার...

কুন্তীর মনে হয় ভাইদের লগে যুধিষ্ঠিররে সরানোর লাইগা ধৃতরাষ্ট্র কোনো একটা চিরস্থায়ী উপায় ভাবতাছেন তীর্থযাত্রার নামে। কিন্তু তীর্থযাত্রার কথা বইলা ধৃত যে যুক্তি বাইর করছেন তাতে যুবরাজের না করার সুযোগ নাই। বারণাবতে যাইতেই হইব তাদের। কুন্তী সিদ্ধান্ত নেয়- চল আমিও যামু তোগো লগে...

বিদুরের লগে দ্রুত কিছু কথাবার্তা বইলা নেয় কুন্তী। তারপর রাস্তায় নাইমা যুধিষ্ঠিররে ডাকে- শোনো পোলা। তিন দিনের যুবরাজ হইয়া নিজেরে বুদ্ধিমান আর অভিভাবক ভাইব না তুমি। আমি যা বলি তা মনোযোগ দিয়া শুনবা। হইলে এমনও হইতে পারে যে হস্তিনাপুরে আর কোনো দিনও ফিরা আসা হইব না তোমার...

যুধিষ্ঠিরের একটা বড়ো গুণ হইল ডর দেখাইলে সে ডরায়। এই একই কথা যদি কুন্তী ভীমরে কইত তবে সে এখনই গদা নিয়া হস্তিনাপুর ফিরা যাইত ধৃতরাষ্ট্র আর তার পোলাগো মাইরা ভর্তা বানাইতে। তাতে কী ফল হইত সে

ভাবত না। অর্জুনরে কইলে জায়গায় খাড়াইয়া কারে কোন অস্ত্র দিয়া মারব সেইটা বর্ণনা করতে করতে ফেনা তুইলা ফালাইত মুখে...

যুধিষ্ঠিরের বুদ্ধি আছে কি নাই বোঝা না গেলেও তার কোনো ভড়ং নাই এইটা পরিষ্কার। সে হাত-পা গুটাইয়া মায়ের কাছে আইসা খাড়ায়- তুমি যা কও তাই হবে মা...

আর কোনো কথা হয় না। সকলে আগায়। ভীম সর্বদাই কুন্তীর পাশে। ভীমটা তার সংসারী পোলা। ধর্মকর্ম রাজনীতি কোনোটাই বোঝে না বা বুঝতে চায় না। কিন্তু কুন্তীর সংসারে তার একমাত্র সহকারী হাত এই মাইজা পোলা ভীম। মায়েরে যেমন সে আগলাইয়া রাখে তেমনি ভাইদের লাইগাও সর্বদা ভীমের বুকটা খোলা...

যুবরাজ আর তার ভাইগো লাইগা পুরোচন শিব নামে যে ঘরটা বানাইতাছে তা বড়োই মনোহর শণের চাল দেয়া কাঠের চারচালা ঘর। কিন্তু ঘরটার কাজ এখনো পুরাপুরি শেষ হয় নাই তাই পয়লা দশ দিন যুবরাজরে মা-ভাইদের নিয়া অন্য একটা ঘরে থাকতে হয়। দশ দিন পর যুবরাজের বাড়ি নির্মাণ শেষ হইলে কুন্তী তার পোলাগো নিয়া সেই ঘরে গিয়া পুরোচনরে জানায়ে দেয়- মহারাজ পাণ্ডুর রানি যেই ঘরে থাকেন সেই ঘরে আত্মীয়-স্বজন ছাড়া অন্য কোনো রাজকর্মচারীর প্রবেশ নিষেধ। কিছু দরকার পড়লে তুমি বাইরে খাড়াইয়া আওয়াজ দিবা...

বিদুরের পাঠানো লোকটা ঠিক সময়েই আইসা পৌঁছায়। নতুন ঘরে উইঠা কুন্তী পুরোচনরে কিছু কাজ দিয়া বাড়ির বাইরে পাঠাইয়া লোকটারে ভিতরে নিয়া আসে। এই লোকটা মাটির গুহার ভিতরে ঘরবাড়ি বানানোর কাজে

ওস্তাদ। কুন্তীর পোলারা তারে জোগালি দেয় আর লোকটা দ্রুত ঘরের মেঝে খুঁইড়া একটা গুপ্ত গুহাঘর বানাইয়া তার সুড়ঙ্গমুখ বাইর কইরা দেয় বাড়ির পিছনে জঙ্গলের ভিতর। দুর্যোধন যদি এই বাড়ি আক্রমণ করে কিংবা শণ-কাঠের ঘরে আগুন ধরাইয়া দেয় তবে কুন্তী তার পাঁচ পোলাসহ নিশ্চিন্তে সুড়ঙ্গ দিয়া পলাইতে পারব জঙ্গলের দিকে...

কুন্তীর পোলারা দিনে শিকার-টিকার করে আর রাইতে মাটির নীচে গুহার মধ্যে ঘুমায়। এর মধ্যে কুন্তীর কাছে পাঠানো বিদুরের সংবাদ সুবিধার না। হস্তিনাপুরে ধৃতরাষ্ট্র তার পোলারেই যুবরাজ করার আয়োজন করতাছেন। তার মানে যুবরাজ হইবার আগেই কুন্তীর পোলাগো সরাইয়া দিব দুর্যোধন। বারণাবত থাইকা পোলাগো নিয়া এখন সইরা যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু এমনি পলাইয়া গেলে তাদের খুঁইজা বাইর করতে দুর্যোধনের বিন্দুমাত্র কষ্ট হওয়ার কথা না। তাই পলাইতে হইব অন্য উপায়ে...

কুন্তী গিয়া পুরোচনরে কয়- জানো তো বাপ। আমাগো লগে আছেন হস্তিনাপুরের যুবরাজ যুধিষ্ঠির। রাজপদে থাকা মানুষের দায়িত্ব হইল মাঝেমধ্যে লোকজনরে খাইদাই করানো। আমরা এক বচ্ছর ধইরা এইখানে আছি কিন্তু প্রজাদের এক দিনও নিমন্ত্রণ করি নাই; এতে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের বদনাম। তো বাপ তুমি আশপাশের সবাইরে মহারাজ পাণ্ডুর মহিষী কুন্তী আর হস্তিনাপুরের যুবরাজ যুধিষ্ঠিরের পক্ষে আগামীকাইল ভোজনের নিমন্ত্রণ কইরা আসো। আর শোনো; সবাই যেন তৃপ্তি ভইরা পান করতে পারে সেই জন্য বেশি বেশি মদও সংগ্রহ করতে যেন ভুল না হয়...

পাণ্ডবেরা হরিণ মাইরা আনে। ভীম রান্না করে কুন্তীর লগে। খানাপিনা শুরুর আগে কুন্তী যুধিষ্ঠিররে ডাকে- আমার বয়সী এক নারী আর তোগো পাঁচ

ভাইয়ের মতো দেখতে পাঁচটা জোয়ান পোলারে আলাদা কইরা চিনা রাখ। এই ছয়জনরে বেশি বেশি খাতির-যত্ন কইরা মাতাল বানাইবি যাতে বেশি নড়তে-চড়তে না পারে। আর পুরোচনরেও মদ গিলাইবি গলা পর্যন্ত...

বনের আশপাশের বহু মানুষ আসে। কিছু ব্রাহ্মণ বাদে বাকিরা কাঠুরে চাষি আর গোয়ালা পরিবার। সকলেই পেট পুরে মাংস খায় আর গলা পর্যন্ত টানে মদ। কুন্তী নির্বাচিত পাঁচ তরুণ আর এক নারীর কাছে গিয়া বারে বারে মদ আর মাংস তুলে দেয়- খাও খাও। তুমি দেখতে আমার বড়ো পোলা যুধিষ্ঠিরের মতো। তুমি আরেক ঘড়া খাও। তোমার শইলডা তো এক্কেবারে ভীমের মতো। তুমি অত কম খাও ক্যান? আরে বেটা বড়ো শইলে দানাপানি দুইটাই যদি বেশি বেশি না দেও তবে তা টিকব কেমনে? আরে খাও; তুমি তো আমার বইনের মতো। তোমার বইনপুতেরা নিমন্ত্রণ করছে তোমারে। ...বাড়িতে যাইতে হইব এমন কী কথা? পাণ্ডুরাজার বৌ-পোলাপান যেইখানে থাকে; সেইখানে থাকার অধিকার তোমারও আছে। তুমি থাকো আইজ আমাগো লগে। সকালেই না হয় ধীরেসুস্থে যাবা...

পুরোচনরেও গলা পর্যন্ত খাওয়ায় কুন্তী আর যুধিষ্ঠির। খাওয়া-দাওয়া শেষে বাকিরা বিদায় হইলে মাতাল হইয়া ঝিমায় কুন্তীর বয়সী এক চাষি বৌ আর পাঁচটা জোয়ান মানুষ। দরজার সামনে পুরোচনও ঝিমায়। আশপাশ ভালো করে দেইখা কুন্তী ভীমেরে ইশারা করে। ভীম একজন একজন কইরা তুইলা আইনা ঘরের মধ্যে শোয়ায়- ঘুমাও ভাই। ঘরের ভিতরে ঘুমাও; বাইরে মশায় কামড়াইতে পারে...

তারপর তারা নিশ্চিন্তে ঘুমাইলে একেকটা হেঁচকা টানে ভীম তাগো ঘাড়ের ঘেটি ভাইঙ্গা উপরে কাঁথা টাইনা দেয়। কেউ কোনো শব্দ করে না। শুধু ভীমের

হাতে মট মট শব্দ হয় একটার পর একটা। মায়ের বয়সী সেই নারীরেও ভীম নিয়া আসে ঘরে- আইস মাসি। নিশ্চিন্তে ঘুমাও...

পঞ্চপাণ্ডব ঘুমাইত সারি হইয়া। কুন্তী ঘুমাইত তাদের শিয়রের কাছে। ঠিক সেই মতো পাঁচ মাতাল তরুণ আর চাষি নারীর লাশ সাজাইয়া থুইয়া ভীম গিয়া মট কইরা ভাইঙ্গা দেয় টাল পুরোচনের ঘাড়। তারপর বাকি পাণ্ডবগো মালপত্র গোছানো শেষ হইলে ভীম বড়ির চাইরপাশে লাগাইয়া দেয় মশালের আগুন...

অমাবস্যার রাইতে কুন্তীরে কাঁধে নিয়া গঙ্গার দিকে দৌড়ায় ভীম। তার লগে দৌড়াইতে গিয়া নকুল সহদেব হুমড়ি খাইয়া পড়লে দৌড়াইতে দৌড়াইতেই তাগোরে সে টান দিয়া তোলে। আরো কিছুদূর গিয়া যুধিষ্ঠির আর অর্জুন উস্টা খাইয়া পড়লে থাবা দিয়া ভীম তাদেরও তুইলা নিয়া দৌড়ায় নৌকার দিকে। বিদুরের পাঠানো নৌকা নিয়া একজন মাঝি লুকাইয়া আছে গঙ্গার তীরে...

অন্ধকারে পাল তোলা নৌকায় পোলাগো নিয়া কুন্তী ভাসে পুবদিক বরাবর। পরের সন্ধ্যায় গঙ্গার দক্ষিণ তীরে এক জঙ্গলের কাছে তাদের নামাইয়া দিয়া ফিরা যায় বিদুরের মাঝি। ওই দিকে বারণাবতের লোকজন সকালে আইসা দেখে যেই ঘরে কুন্তী আর তার পাঁচ পোলা ছিল সেইখানে পাঁচটা পুরুষ মাইনসের পোড়া লাশ আর তার পাশে একজন মাইয়া মানুষ। পুরোচনের পোড়া লাশও পইড়া আছে ঘরের দাওয়ায়...

হস্তিনাপুরে সংবাদ যায়। ভাতিজাগো মৃত্যুর সংবাদ শুইনা কান্দেন ধৃতরাষ্ট্র মহারাজ। বুক বাইন্ধা করেন শেষকৃত্যের অনুষ্ঠান- তোগোরে ক্ষমতা দিবার চাই নাই ঠিক; কিন্তু এমন মরণ তো চাই নাই কারো...

শুধু কুন্তীর বাপের বাড়ি দ্বারকায় কোনো শেষকৃত্য করে না কেউ। কুন্তীর ভাই বসুদেবের মাইজা পোলা কৃষ্ণ তার শিষ্য সাত্যকিরে নিয়া আইসা বারণাবতের পোড়া ঘরবাড়ি দেখে। আশপাশের মানুষের লগে কথা কয় আর দ্বারকায় ফিরা গিয়া বাপেরে কয়- শেষকৃত্য করার মতো কিছু ঘটে নাই সেইখানে...

গঙ্গাপারের জঙ্গলের ভিতর দিয়া দক্ষিণ দিকে আউগায় কুন্তী আর তার পোলাপান। কিছু কিছু যায়; তারপর কিছু দিন থামে। তারপর আবার সামনে আগায়। রাস্তাঘাটে ভীম বরাবরের মতো কিছু মারামারিও করে। কিন্তু হঠাৎই এক দিন সে অন্যরকম একটা ঘটনা ঘটায়; নিজের পঁচিশ বছর বয়সে কাউরে কিছু না কইয়া সাঁওতাল দুহিতা হিড়িম্বারে সে সাঙ্গা কইরা ফালায়...

ভীম তো ঘটাইয়া ফালাইছে ঘটনা। কুন্তী যখন ঘটনা জানল তখন হিড়িম্বা রীতিমতো গর্ভবতী। এখন কেমনে কী করে? তার পোলা পাঁচটা ঠিক; কিন্তু অবলম্বন একলাই ভীম। বিপদের বিষয় হইল; মায়ের ভক্ত পোলারা বৌরেও আন্ধাভাবে আগলাইয়া রাখে। এরা মা আর বৌ দুইজনরে একলগে সামলাইতে গিয়া একবার এই দিক আরেকবার ওই দিকে যায় কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনোদিকই আর পারে না সামলাইতে। শেষকালে হয় তারে মা ছাড়তে হয়; না হইলে বৌ তারে ছাইড়া পলায়...

কিন্তু এইটা হইতে দেওয়া যাবে না। ভীম ছাড়া পাণ্ডবেরা অচল। বাকি চাইরজনরে ধৃতরাষ্ট্রের পোলারা পাছা দিয়াও পুছব না যদি ভীম না থাকে লগে। কুন্তীর সংসারও অচল হইয়া পড়ব ভীম যদি ছাইড়া চইলা যায়। কিন্তু পাঁচটা জোয়ান পোলার মইদ্যে একজন বৌ নিয়া মাস্তি করব আর বাকি চাইরজন থাকব ব্রহ্মচারী; এইটাও একটা অস্বাভাবিক বিষয়। দুই মায়ের পাঁচ পোলারে কুন্তী অত দিন এক হাতের পাঁচ আঙ্গুলের মতো একলগে বড়ো

করছে; কাউরে বেশি সুবিধা দেয় নাই যাতে না অন্য কেউ কম সুবিধার লাইগা মন খারাপ করে। এখন এক মাইয়ার লাইগা কোনোভাবেই পোলাগো সে আলদা হইতে দিতে পারে না...

কুন্তী ভীমের সংসার মাইনা লয়। কিন্তু তারে জানাইয়া দেয়- মনে রাখিস তোগোরে গেরস্ত করার লাইগা আমি বনে আসি নাই। আমি বনবাসী হইছি তোগোরে তোগোর পিতার রাজ্য ফিরাইয়া দিবার প্রতিজ্ঞায়। বিয়া করছ ঠিকাছে। কিন্তু আপাতত তোমার বৌরে নিজের লগে রাখতে পারবা না তুমি। আমরা রাজ্য ফিরা পাইলে তোমার লগে সে সংসার করব হস্তিনাপুর গিয়া। তবে যেহেতু তোমার বৌ এখন গর্ভবতী। সেহেতু বাচ্চা জন্মানো পর্যন্ত আমরা এইখানে থাকব; যাতে বাচ্চার মুখ তুমি দেইখা যাইতে পারো...

ভীমের মতোই দেখতে ভীমের একটা পোলা জন্মায়। হিড়িম্বা তার নাম রাখে ঘটোৎকচ। ভীম পোলারে কোলে নিয়া কুন্তীর সামনে খাড়ায়- মা। তোমার পয়লা নাতি...

ভীমের হাত থাইকা নাতিরে কোলে নিয়া কুন্তী হিড়িম্বার দিকে তাকায়- ভীমের বড়ো ভাই এখনো আবিয়াইত্যা। কিন্তু তার পরেও আমি ভীমের বিবাহ মাইনা নিছি খালি এই নাতির কথা ভাইবা। পাণ্ডব বংশের বড়ো পোলা হিসাবে বাপ-চাচার পরে এই ঘটোৎকচই হইব হস্তিনাপুরের রাজা। কিন্তু পোলাগো যদি এখনই আমি বনে-জঙ্গলে নিজেগো মতো সংসার পাইতা বসতে দেই তবে আর হস্তিনাপুরে রাজা হইবার স্বপ্ন দেখতে হইব না কারো। সেই সাথে তোমার পোলারেও সারা জীবন থাকতে হইব কোনো কাঠুরের পোলা হইয়া। তাই আমার সিদ্ধান্ত শোনো; যদি রাজ্য উদ্ধার হয় তবে যুবরানি হইয়া তুমি

হস্তিনাপুর যাইবা পাণ্ডব বংশের জ্যেষ্ঠ পোলারে নিয়া। আপাতত তুমি তোমার বাপের ঘরে থাইকা ঘটারে মানুষ করো...

কুন্তী ঘটোৎকচের কপালে চুমু খায়- বড়ো হইলে হতভাগী দাদির বিপদে তুই সহায় হইস দাদুভাই। এখন মায়ের পোলা মায়ের কাছে থাক...

হিড়িম্বার কোলে ঘটোৎকচরে ফিরাইয়া দিয়া কুন্তী ভীমের দিকে তাকায়- চল বাপ। সামনে আগাই...

০৪

তার পোলা যদি তার নিজের পোলার মায়ায় আটকাইয়া যায় তবে সবকিছু ভাইসা যাবে তার। তাই ভীমেরে সংসারছাড়া কইরা কুন্তী পলায়। কই যাবে কোথায় যাবে কিছু ভাবে নাই। বিদুরের লগেও যোগাযোগ নাই বহু দিন। কিন্তু কোনো একজন মানুষের পরামর্শ এখন দরকার তার। আর এই জঙ্গলে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ছাড়া কোনো বান্ধবও নাই কুন্তীর...

বন বদলাইয়া কুন্তী গিয়া হাজির হয় শ্বশুর দ্বৈপায়নের ডেরায়- পিতা। বড়ো বেশি বেচইন আছি সবকিছু নিয়া...

সবকিছু শুইনা দ্বৈপায়ন চোখ পিটপিট করেন- বনে-বাদাড়ে ঘুইরা কেমনে রাজ্য পাইবা তুমি? রাজ্য পাইবার লাইগা কোনো না কোনো রাজ্যের লগেই থাকতে হইব তোমার। আহো আমার লগে...

কুন্তী আর তার পোলাদের ব্রাহ্মণের বেশ দিয়া কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন নিজে নিয়া রাইখা আসেন একচক্রা নগরে তার এক শিষ্য ব্রাহ্মণের ঘরে- তোরা এইখানে থাইকা চেষ্টা কর পাশের দেশ পাঞ্চালের লগে মিত্রতা করার...

জটাজুটধারী ব্রাহ্মণ সাইজা একচক্রায় কুন্তীর পোলারা পাঞ্চালের সংবাদ দুঃসংবাদে কান খাড়া কইরা দশগ্রামে ভিক্ষা মাইগা খায় আর একটা উপযুক্ত দিনে সংবাদ পায় যে পাঞ্চাল রাজা দ্রুপদ ঘোষণা দিছেন তার মাইয়া দ্রৌপদীর বিয়া হইব স্বয়ংবরা দিয়া...

নিজের পোলার লগে দ্রুপদের মাইয়ার বিবাহ; দ্রুপদের লগে খাতির জমানোর লাইগা এর থিকা সহজ পন্থা আর কী হইতে পারে? এর মইদ্যে আরোও সুখের সংবাদ হইল; দ্রুপদকন্যার স্বয়ংবরা হইব তির-ধনুকের কম্পিটিশন দিয়া। তাও আবার গাণ্ডিব ধনু; যা গন্ডারের পঞ্জরের হাড় দিয়া তৈয়ার হয় বইলা এই নাম। এই ধনু দিয়া তির মারা তো দূরের কথা; গন্ডারের হাড্ডি নুয়াইয়া এই ধনুতে গুন পরাইতেই বেশির ভাগ পাব্লিকের নাকের বাতাস শইলের তল দিয়া নির্গত হয় কিন্তু দ্রোণের শিষ্য অর্জুন আবার এই গাণ্ডিবে মহাধনুর্ধর। ধইরা নেওয়া যায় তার জিতার সম্ভাবনা পুরাটাই আছে...

কিন্তু কুন্তীর সংকট তো সেইখানে না। হিড়িম্বার বেলায় সে যা করছে তা যদি দ্রুপদের মাইয়ার লগেও করে; মানে বিয়ার পরে মাইয়ারে যদি বাপের বাড়িতেই থুইয়া আসা লাগে তাইলে তো আর সম্পর্কের উন্নতি হইল না দ্রুপদের লগে। আবার যদি মাইয়ারে ঘরে আইনা অর্জুনের লগে সংসার করতে দেয় তাইলে তো আবারও এক পোলা সংসারী; বাকিরা বিরান। তাছাড়া অর্জুনরে সংসার করতে দিলে ভীম যদি খেইপা গিয়া আবার নিজের বৌ-পোলারে নিজের কাছে নিয়া আসে তখন? তখন তো বাকি পোলাগো বিয়াশাদি করাইয়া কুন্তীর নাতিপুতি নিয়া বনবাসে সংসার করা ছাড়া আর বিকল্প থাকে না কিছু। কিন্তু তা হইতে দেওয়া যাবে না। কুন্তী এইখানে পোলাগো সংসার করাইতে নিয়া আসে নাই। কুন্তীর অন্য কোনো বুদ্ধিমান সমাধান চাই যা একমাত্র শ্বশুর দ্বৈপায়নই পারেন দিতে...

বিস্তারিত সংকট বুইঝা দ্বৈপায়ন কুন্তীরে অভয় দেন- তুমি খালি মাইয়াডারে ঘরে আনার ব্যবস্থা করো; বাকিটা দেখব নে আমি। আমি তোমার পাঁচ পোলারেই এই মাইয়ার লগে বিবাহ দিমু। তখন কাউরে যেমন ব্রহ্মচারী হইতে হইব না তেমনি কেউই সুযোগ পাইব না বৌ নিয়া মইজা থাকার। দুই মায়ের পাঁচ পোলা এক বৌয়ের পাঁচ স্বামী হইলে আরো ঘনিষ্ঠ হইব নিজেদের...

শ্বশুরের বিধান কুন্তীর পছন্দ হইলেও সে ছটফট করে- আব্বাজান। বোঝেনই তো; আপাতত জঙ্গলে থাকলেও পোলাবৌ আর পোলাগো নিয়া আমার সমাজে ফিরতে হবে। পাঁচ পোলার ঘরে এক বৌ তোলার লাইগা সমাজে একটা কঠিন ধর্মব্যাখ্যা লাগব আমার। আপনি যা কইলেন; তার পক্ষে যদি আমারে একটা ধর্মকাহিনি রচনা কইরা শোনান তাইলে বুকে বল পাই...

কুন্তীর মুখে দুশ্চিন্তা দেইখা কালা মুখে হলুদ দাঁত খুইলা হাসেন দ্বৈপায়ন- ধর্মকাহিনি কোনো বিষয় হইল? মাইয়ার জন্মকাহিনি আমি পাল্টাইয়া দিমু। কইয়া দিমু পূর্বজন্মে শিব তারে বর দিছেন পঞ্চস্বামীর। আর শিব একবার যে বর দিছেন সেইখানে সমাজ তো নস্যি; স্বয়ং শিবেরও শক্তি নাই সেই বর ফিরাইয়া নেন...

কথাখান ঠিক। শিব কারে কী বর দিছেন না দিছেন সেইটা তো দ্বৈপায়ন থাইকা বেশি জানার কথা নয় কারো। কারণ শিব পুরাণখান তো লেখছেন তিনিই। যদিও দ্বৈপায়নের মুখে শিবের বন্দনা শুনলে কুন্তীর হাসি পায়। একসময় বিষ্ণুভক্ত এই দ্বৈপায়নের কামই আছিল নেংটুভেংটু জংলি বইলা শিবেরে গালাগাল দেওয়া। তার কথায় বহু শিবভক্ত হর ছাইড়া হরির ভক্ত হইছে। কিন্তু এক দিন এক পুঁচকা ঋষি শৌনিক তারে কয়- আপনি যদি বারাণসী যাইয়া শিবের নিন্দা করতে পারেন তয় আমিও আপনের লগে হরিভক্ত হমু...

- বারাণসী আবার কোন ছার? লও যাই। তোমার কাশীতীর্থে গিয়াই তবে শিবেরে এক হাত লই...

চুল-দাড়ি ঝাঁকাইয়া দলবল আর পুঁথিপুস্তক নিয়া বারাণসীর কাশীতীর্থে আইসা হুংকার দেন দ্বৈপায়ন- আসো আসো। নেংটুভেংটু তাড়িখোর জংলি শিবেরে ছাইড়া আসো সুশীল বিষ্ণুর পদতলে...

বারাণসী হইল শিবভক্ত নন্দী বংশের বাস। দ্বৈপায়ন ভাবছিলেন বোধ হয় শৌনিকের মতো কোনো চ্যাংড়া ঋষি আইসা তার লগে শিবের গুণ গাইয়া তক্কমক্ক করব। কিন্তু নন্দীরা কোনো তর্কেমর্কে নাই। শিবনিন্দা শুইনা হর হর মহাদেব কইয়া কিলাইতে কিলাইতে তারা দ্বৈপায়নরে শুয়াইয়া ফালায়। তারপর তুইল্লা নিয়া একটা গাছের লগে পিছমোড়া কইরা থুয় বাইন্ধা...

এত বড়ো ঋষি; যার অলৌকিক ক্ষমতা-কাহিনিরও অভাব নাই; সেই দ্বৈপায়নরে এমন প্যাঁদানি খাইতে দেইখা চ্যালা চামুণ্ডারা যে যেদিকে পারে পালায় আর খানিক দুরে খাড়াইয়া শৌনিক কয়- হর হর মহাদেব...

দ্বৈপায়ন কান্দেন। নারায়ণ নারায়ণ বিষ্ণু ডাইকা দাড়ি ভিজাইয়া কান্দে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন- এমন বিপদের দিনে তুমি ছাড়া হরি মোর কেউ নাই...

দ্বৈপায়নের কান্দন শুইনা নাকি স্বয়ং বিষ্ণু হাজির হইছিলেন সেদিন। কিন্তু আইসা তিনি কইয়া গেছেন নন্দীর বান্ধন খুইলা দিবার ক্ষমতা তার নাই। তার মুক্তির একমাত্র উপায় হইল শিবের বন্দনা করা...

কী আর করেন দ্বৈপায়ন। যে শিবেরে তিনি অত গালাগালি দিছেন; এখন চিপায় পইড়া চোখ বন্ধ কইরা সেই দ্বৈপায়নই শুরু করেন শিব পুরাণের

শোলোক রচনা- সকল দেবতার যে দেব; তারে কয় মহাদেব; বুড়াশিব আদি অধীশ্বর; পশুপতি নটরাজ ভোলানাথ নীলকণ্ঠ ডট ডট ডট...

সেই থাইকা দ্বৈপায়নের কাম হইল শিবের গীত গাওয়া আর শিবেরে নিয়া কাব্য করা। যদিও নন্দীর উপরে ঝাল মিটাইতে গিয়া শিব পুরাণে তিনি লেইখা থুইছেন- নন্দী কোনো মাইনসের জাত না; ওইটা একটা ষাঁড়। ...ষাঁড় হউক আর বলদাই হউক। কিলাইয়া গুঁতাইয়া তো হরিভক্ত দ্বৈপায়নরে হরভক্ত বানাইছিল তারা। আর এই দ্বৈপায়নের কৃপায় শিবের ভক্ত এখন বেশির ভাগ মানুষ। তিনি যদি শিবের নাম ধইরা একখান কাহিনি রচেন তো দ্রৌপদীর বাপেরও সাধ্য নাই কুন্তীরে ঠেকায়। কিন্তু তার কথার মইদ্যে একখান যদি রাইখা দিছেন তিনি- যদি তুমি মাইয়াটারে নিজের ঘরে আনবার পারো...

দ্রুপদের মাইয়ারে আনতে হইলে তার দেশের আরো কাছাকাছি যাওয়া লাগে তাই ব্রাহ্মণবেশী পাঁচ পোলারে নিয়া এক দিন এক রাত্রি হাইটা কুন্তী আইসা পৌঁছায় দ্রোণাচার্যের দখল কইরা নেওয়া দক্ষিণ পাঞ্চালের অহিচ্ছত্র দেশে। কুরু-পাণ্ডবের শিক্ষা শেষে দ্রোণাচার্য গুরুদক্ষিণা হিসাবে শিষ্যদের কাছে আব্দার করছিলেন দ্রুপদরে ধইরা আনার। গুরুদক্ষিণা মিটাইবার লাইগা কুরু-পাণ্ডব মিলা হঠাৎ আক্রমণ কইরা সেদিন জেন্দা দ্রুপদরে ধইরা নিয়া দ্রোণের কাছে দেয়। আর তিনি দ্রুপদরে ছাইড়া দেওয়ার বিনিময়ে সেদিন মুক্তিপণ হিসাবে রাইখা দেন দ্রুপদের রাজ্যের অর্ধেক। সেই থাইকা চর্মন্বতী নদী পর্যন্ত উত্তর পাঞ্চাল অংশটা মাত্র আছে দ্রুপদের অধীন...

স্বয়ংবরার ষোলো দিন আগে দক্ষিণ পাঞ্চালে আইসা যাদব বংশজাত কুন্তী ব্যবহার করে তার বংশের পূর্বপরিচয়। নিজেরে ভার্গব বংশজাত ব্রাহ্মণ পরিচয় দিয়া আশ্রয় নেয় আরেক ভার্গব বংশজাত কুমারের ঘরে। এইখানে তারা থাকে; ভিক্ষাটিক্কা করে আর সংবাদ সংগ্রহ করে- প্রতিযোগিতায় কারা কারা আছে আর আসার সম্ভাবনা আছে কার...

ধৃতের পোলা দুর্যোধন আসব ভাইবেরাদর নিয়া। অসুবিধা নাই। গদার লড়াই হইলে তারে ভয় পাওয়া লাগে কিন্তু তির-ধনুকে তারে পাত্তা দিবার কিছু নাই। আর ধৃতের বাকি পোলারা স্বয়ংবরা সভায় দর্শকের সংখ্যা বাড়ান ছাড়া করতে পারব না কিছুই; সুতরাং ওইগুলাও বাদ। দ্রোণের পোলা অশ্বত্থামাও আসছে। খড়গ চালানোয় সে কঠিন মানুষ হইলেও তির-ধনুকে সে অর্জুন থাইকা কম। আর দ্রুপদের মাইয়া নিশ্চয়ই মালা ঝুলাইতে যাইবা না শত্রু-পোলার গলায়। সুতরাং এইটাও বাদ। কিছু বুড়াধুড়া আর বিয়াইত্তা রাজা আছে। তাগো পয়সাপাতি আর বাহাদুরি দুইটাই বেশি কিন্তু মনে হয় না বুইড়া রাজার আঠারো নম্বর বিবি হইতে রাজি হইব দ্রুপদের মেয়ে; যদিও এর মাঝে দুয়েকজন তির-ধনুকে অর্জুনরেও কাবু কইরা ফালাইতে পারে...

রাজপুত্র না হইলেও তার দুই ভাতিজা কৃষ্ণ আর বলরামও নাম লেখাইছে রাজকন্যার স্বয়ংবরায়। বলরামরে নিয়া চিন্তার কিছু নাই। কৃষ্ণরে নিয়া তির-ধনুকে চিন্তার বেশি কিছু না থাকলেও প্রতিযোগিতায় যখন আইসাই পড়ছে তখন খালি হাতে যাইবার মানুষ না সে। দ্রুপদের মাইয়ারে সে তুইলাও নিয়া যাইতে পারে...

রাজকার্যে দূতিয়ালির লাইগা একজন ব্রাহ্মণ পুরোহিত লাগে। নিজেরা ফকির সাইজা থাকলেও পাঞ্চালে আসার পথে পাণ্ডবেরা উৎকোচক তীর্থ থাইকা ধৌম্যরে নিজেগো পুরোহিত বানাইয়া আনছে। কুন্তী গিয়া ধৌম্যরে কয়- তোমারে এইখানে কেউ চিনে না। এইখানে তোমার পয়লা কাম হইল কৃষ্ণ আর বলাইরে গিয়া কওয়া যে তাগো বাপের বইন কুন্তীপিসি পোলাগো নিয়া পলাইয়া আছে পাঞ্চাল দেশে। আর এইটাও জানাইয়া দিবা যে তাগোর ছোট ভাই অর্জুন দ্রৌপদীরে পাইতে চায়। আর যেহেতু ওরা দুইজন আগেই বহুত বিয়াশাদি করছে আর ছুডু ভাই এখনো আবিয়াইত্যা; তাই পিসি তাদের কোনো ঝামেলা করতে নিষেধ করছে স্বয়ংবর সভায়। ওগোরে ভালো কইরা

বুঝাইয়া আসবা দ্রুপদের সভায় পাণ্ডবগো দেখলে যেন তারা কোনো সাড়াশব্দ না করে। কারণ ছদ্মবেশ ধইরাই অর্জুন তার ভাইগো লগে স্বয়ংবরায় যাবে। আর দুই ভাতিজারে কইবা যেন কাজকর্ম শেষে তারা অবশ্যই পিসির লগে দেখা কইরা যায়; তাগো লগে বহুত কথা আছে কুন্তীপিসির...

ধৌম্যরে কৃষ্ণের কাছে পাঠাইয়া মোটামুটি নিশ্চিন্ত হইলেও একজনের বিষয়ে দুশ্চিন্তায় কুন্তী ছটফট করে। কুন্তীর সংবাদ পাইলে কৃষ্ণ ঝামেলা করব না। বাকিদের বেশির ভাগই প্রতিযোগিতায় টিকব না। কাউরে কাউরে দ্রুপদই খেদাইয়া দিব। বুড়াধুড়াগুলারে দ্রৌপদী মালা দিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু তার পরেও বাকি থাইকা যায় একজন; যারে দ্রুপদের না আছে খেদানোর কোনো কারণ; না আছে দ্রৌপদীর অপছন্দ করার কোনো কারণ; না আছে তার প্রতিযোগিতায় হাইরা যাওয়ার কোনো কারণ। সে কর্ণ। কুন্তীর প্রথম সন্তান...

কুন্তীর কষ্টের জায়গাটা এখানেই। ধৃতের পোলাগো মুখামুখি হইতে গিয়া বারবারই তার নিজের পোলাদের মুখামুখি হইতে হয় নিজের অন্য এক পোলার। এখন কী করে কুন্তী? হস্তিনাপুরে কুরু-পাণ্ডবগো অস্ত্রশিক্ষা প্রদর্শনীর দিন কৃপাচার্যের সাহায্যে সে আটকাইতে পারছিল অর্জুন কর্ণের যুদ্ধ; কোনো ছোটলোকের পোলার লগে লড়াই করে না রাজপুত্র অর্জুন...। কৃপের এই কথায় লড়াই থাইকা ঠিকই বাদ পড়ছিল কর্ণ। কিন্তু সকলে যেখানে ভাবছিল ছোটলোকের পোলা হইবার লজ্জায় মাটির সাথে মিশা যাইব সে; সেইখানে ঘটল তার উল্টা ঘটনা। কম্পিটিশন থাইকা বাদ পড়ার পর সবার সামনে কর্ণ তার পালকপিতা অধিরথের পায়ে পেন্নাম কইরা উইঠা খাড়াইল মাথা উঁচা কইরা। যেন কইতে চায়- রাজকুলনারী কুন্তী নয়; নমশূদ্র অধিরথ আর রাধার সন্তান হিসাবেই গর্বিত আমি। এমন অহংকার শুধু দুর্বাসার রক্ত আর পরশুরামের শিক্ষাতেই মানায়...

তবে কি কুন্তী কর্ণের কাছেও ধৌম্যরে পাঠাবে? নাকি নিজেই যাবে? ভিক্ষা চাইলে কর্ণ দেয় সকলেই জানে। নাকি গিয়া তারে মায়ের পরিচয় দিয়া বলবে আয় বাপ ঘরে আয়?

কিন্তু কর্ণ বড়ো ভাই হইয়া খাড়াইলে তো রাজা হইতে পারব না যুধিষ্ঠির। তাইলে কর্ণের সিংহাসনের লাইগা যুধিষ্ঠির ক্যান কষ্ট করব? আর কর্ণ যদি আইসা যোগ হয় কুন্তীর ঘরে তবে যুধিষ্ঠিরের ধর্মের গর্ব্ব; ভীমের গদার বড়াই আর অর্জুনের ধনুকের খ্যাতি তিনটাই বড়ো বেশি ম্লান হইয়া পড়ব এক কর্ণের কাছে। দুর্যোধন ঠিকই কইছিল অস্ত্রশিক্ষা প্রদর্শনীর দিন- সমস্ত দুনিয়ারই রাজা হইবার যোগ্য এই কর্ণ

- নাহ। যারে ফালাইয়া দিছি তারে আর না কুড়ানোই ভালো। সইরা থাক বাপ...

কুন্তী আবার ধৌম্যরে ডাকে- এইবার তুমি রাজা দ্রুপদের কাছে যাবা ব্রাহ্মণ হিসাবে তার মাইয়ারে কিছু উপদেশ দিতে। তুমি দ্রুপদরে বলবা যে পুরাকালের মহান নারীগণের স্বয়ংবরার ইতিহাস তুমি তার কইন্যারে শুনাইতে চাও তার স্বয়ংবরার আগে। এইটা স্বয়ংবরা করতে যাওয়া নারীর লাইগা পুণ্যের কাম। তারপর কাহিনি শুনাইবার ফাঁকে তুমি তারে সব প্রতিযোগী সম্পর্কে ভালো কইরা বুঝাবা। কইবা তার মতো রাজকইন্যা যদি বিয়াইত্যা রাজাগো বিয়া করে তবে সারা জীবন তারে অন্য রানিদের দাসীবান্দি হইয়া কাটাইতে হবে। তার পোলাপানও রাজা হওয়ার সিরিয়াল পাইব না কোনো দিন। যাদব বংশের পোলারে বিশ্বাস নাই; তাই কৃষ্ণের বিষয়েও তারে একটু ধারণা দিবা। কইবা এর শতে শতে বৌ আর পুরা বংশটাই মাতাল আর গোঁয়ার। এরা রাজা না; এরা বিভিন্ন জাগায় ভাড়াটিয়া

সৈনিক হিসাবে খাটে। এদের কোনো আদব-কায়দা মায়াদয়া নাই। এই কৃষ্ণ বড়ো হইছে যে মামার ভাত খাইয়া; সেই মামারেই সে খুন করছে তুচ্ছ একটা কারণে। এমন পোলারে বর হিসাবে চিন্তা করার আগে যেন ভালো কইরা সে ভাবে। আর অশ্বত্থামা যে তার বাপের শত্রুর পোলা সেইটা বোধ হয় এক কথাতেই বুঝব সে...

ফাঁকেফুকে একটু অর্জুনের কথাও কইবা। কইবা সকলে যদিও জানে যে অর্জুন মা-ভাইয়ের লগে আগুনে পুইড়া মরছে। কিন্তু তোমার মনে হয় সে বাঁইচা আছে আর স্বয়ংবরায়ও আসতে পারে ব্রাহ্মণ কিংবা ফকিরের সাজে। তবে সবচে বড়ো কথা। অন্য কিছু কও না কও। তুমি পরিষ্কার কইরা কর্ণের পরিচয় দিয়া আসবা তারে। কইবা সে বীর তাতে সন্দেহ নাই। প্রতিযোগিতাও সে হয়ত টপকাইয়া যাবে। কিন্তু সে এক নমশূদ্র গাড়োয়ানের পোলা। এখন সে যদি দ্রৌপদীরে জয় কইরা নেয় তবে পাঞ্চাল রাজকইন্যার বাকি জীবন কাটাইতে হবে গাড়োয়ান পাড়ায়। কথাটা যেন সে ভাইবা দেখে। কইবা কর্ণরে যদি বাদ দিতে হয় তবে প্রতিযোগিতার আগেই বাদ দেওয়া ভালো। প্রতিযোগিতার পরে উল্টাসিধা কিছু করতে গেলে ভয়ানক হাঙ্গামা হইতে পারে। আর সেই ক্ষেত্রে হয়ত সভা থাইকা ছিনাইয়া নিয়া তারে বুড়া রাজা জরাসন্ধই বিবাহ কইরা ফালাইতে পারে...

- কোনো গাড়োয়ানের পোলারে বিবাহ করব না আমি...

দ্রৌপদীর এক কথায় তির মারতে গিয়াও কম্পিটিশন থাইকা বাদ পড়ে কর্ণ। কৃষ্ণ সইরা যায় বলরামরে নিয়া। অন্যরা গা-িবে গুন পরাইতে গিয়া হুড়িমুড়ি খাইয়া পড়ে। আর সবাইরে বেক্কল বানাইয়া এক ব্রাহ্মণ জিতা নেয় দ্রৌপদীর মালা...

নকুল আর সহদেবরে নিয়া যুধিষ্ঠির দৌড় লাগায় মায়েরে সংবাদ দিতে। অর্জুনের লগে থাকে ভীম। রাজা বাদ দিয়া ফকির ব্রাহ্মণরে মালা দিবার কারণে কিছু রাজা কিছু ঝামেলা করে; কিন্তু ভীম গদা আর অর্জুন তির দিয়া ঠিকই পাঞ্চালীরে নিয়া কুমারের বাড়ি যাইবার পথ তৈয়ার কইরা নেয়...

ভীম আর অর্জুন আসতাছে পাঞ্চালী নিয়া। এইবার কুন্তীর পালা কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের বিধান বাস্তবায়ন। যুধিষ্ঠির আগেই রেডি। নকুল সহদেবও জানে। ভীম অর্জুনেরও জানা আছে তাগো ভূমিকা। এখন খালি দরকার দ্রৌপদীরে সিস্টেমে ফেলা...

কুন্তী ঘরের ভিতরে চইলা যায়। নিত্য দিন পোলারা ভিক্ষা শেষে ফিরা আসার সময় সে যেমন টুকটাক কাজে থাকে তেমনি সে ঘটমটো কিছু কাজ শুরু করে। যুধিষ্ঠির নকুল সহদেবও ঘরে গিয়া ঘাপটি দিয়া বসে। এমন সময় প্রতি দিন বাড়ির উঠানে আইসা ভীম যেমন চিক্কুর দেয়- তোমার পোলারা ফিরা আসছে মা...; আইজও ঠিক সেরকমই চিক্কুর দেয়। কিন্তু আইজ কুন্তী একটা ব্যতিক্রম ঘটায় নিত্য দিনের। আইজ সে ভিতর থাইকাই চিক্কুর দিয়া কয়- যা কিছু নিয়া আসছ বাপধন তা সুমান ভাগে ভাগ কইরা নেও পঞ্চ ভ্রাতায়...

এইটা কুন্তীর কওয়ার কথা না। কারণ ভিক্ষা কইরা পোলারা যা পায় বরাবর তা দুই ভাগ কইরা একলাই এক ভাগ খায় ভীম। বাকি অর্ধেক খায় কুন্তী আর বাকি চাইর পাণ্ডব। কিন্তু ভাগাভাগির সেই হিসাব আইজ করতে গেলে তো দ্রৌপদীর অর্ধেক পাবে ভীম আর অর্ধেক বাকি চাইর ভাই। তাই আইজ ভাগাভাগির এই সাম্যবাদী নিয়ম...

ভিতরে আওয়াজ দিয়া বরাবরের মতো আইজকেও পোলারা কী আনছে তা দেখতে বাইরে আসে কুন্তী। যদিও অন্য দিন পাঁচ পোলাই একলগে বাড়ি আসে। আইজ তিন পোলায় আগেই বাড়িতে বইসা আছে। মায়ের লগে লগে তারাও আইসা উঠানে খাড়ায়। কিন্তু বাইরে আইসাই কুন্তী ভীম আর অর্জুনের লগে দ্রৌপদীরে দেইখা জিবে একটা কইসা কামড় দেয়। যুধিষ্ঠির নকুল সহদেবও কামড়াইয়া জিব লাল কইরা ফালায়- হায় হায়...

ভীম আর অর্জুন খাড়াইয়া থাকে বটগাছের মতো। কুন্তী অস্থির হইয়া দ্রৌপদীর হাত টাইনা লয়- আমারে তুই মাপ কইরা দে মা। আমি একটা ভুল কইরা ফালাইছি। আমি মনে করছি ওরা ভিক্ষা নিয়া ফিরছে কিন্তু... কিন্তু আমার পোলারা তো আবার আমার সকল কথাই সত্য বইলা মানে। এখন কী করি? এক মাইয়ারে পাঁচ ভাই ভাগ কইরা নেওয়া তো অধর্মের কাজ। আবার মায়ের কথা না রাখলেও পোলাগো অধর্ম হয়। ...তুমি চলো আমার বড়ো পোলার কাছে। সে ধর্মকর্ম খুব বেশি কইরা বুঝে। সে কইতে পারব কী করলে ধর্মও থাকে আবার মায়েরও না কোনো অসম্মান হয়...

দ্রৌপদীরে নিয়া কুন্তী যুধিষ্ঠিরের কাছে গিয়া কাইন্দা পড়ে- বাজান রে...। তোর দুই ছুডু ভাই এই মাইয়ারে আমার কাছে নিয়া আসছে আইজ। কিন্তু আমি ভুল কইরা কইয়া দিছি- তোমরা পাঁচ ভাইয়ে এরে ভাগ কইরা লও। এখন বাজান ধর্মের বিধান তুমিই ভালো জানো। তুমিই কও এখন কী করলে তোমার মায়েরও মিথ্যা কওয়ার পাপে না পড়তে হয়; আবার মায়ের কথা না শোনার পাপে তোমার ভাইয়েগো না কোনো অধর্ম হয়...

যুধিষ্ঠির স্বয়ংবর সভাতেই দ্রৌপদীরে দেখছিল। এইবার আগাগোড়া আরেকবার ভালো কইরা দেইখা ধর্মের উপযুক্ত বিধান সন্ধান করে। মনে মনে হিসাব করে পাঁচ ভাইয়ে বিয়া করলে বড়ো ভাই হিসাবে দ্রৌপদী সর্বাগ্রে তার নিজের ভাগেই যাবে। বহুক্ষণ এইভাবে দ্রৌপদীসন্ধান কইরা যুধিষ্ঠির উচ্চারণ

করে ধর্মের বিধান- মায়ের বাণীর স্থান হইল হগগল ধর্মের উপরে। মায়ে যেহেতু কইছে সবাইরে ভাগ কইরা নিতে সেহেতু এই নারী আমাগের সবারই বৌ হবেন। ধর্মেও এর কোনো বিরোধ নাই; ইতিহাসেও এমন উদাহরণ কিছু কিছু আছে...

দ্রৌপদী অর্জুনের দিকে তাকাইয়া দেখে সে তাকাইয়া আছে আকাশে। কুন্তী পাইয়া গেছে ধর্মের ব্যাখ্যা। এবার সে দ্রৌপদীরে ঘরের ভিতরে টাইনা নিয়া সরাসরি জিগায়- তুমি কার গলায় মালা দিছো জানো? মালা দিছো এক ফকিন্নির পোলারে। ধনুক চালাইতে পারে ঠিক; কিন্তু কোনো চালচুলা নাই; দেশে দেশে ভিক্ষা কইরা খায়। এখন তুমি যদি খালি অর্জুনরে চাও তবে তারে নিয়া সংসার পাইতা তোমারে সারা জীবন ফকিরার বৌ হইয়া কাটাইতে হবে। আর যদি আমার পাঁচ পোলার বৌ হইয়া তাগোরে একলগে রাখবার পারো। তা হইলে হস্তিনাপুরের মহারানি হইতেও পারো তুমি...

একটু পরেই আইসা হাজির কুন্তীর দুই ভাতিজা কৃষ্ণ আর বলাই। ঘরে নতুন বৌ বেক্কল হইয়া আছে পাঁচ স্বামী নিয়া। কুন্তী বেশি কিছু কয় না। সংক্ষেপে বিত্তান্ত বয়ান কইরা কয়- ধৃতরাষ্ট্রেরে জানান দেওয়া দরকার যে পাঁচ পোলা নিয়া কুন্তী খালি বাঁইচাই নাই; পাঞ্চাল রাজা দ্রুপদ এখন তার পাঁচ পোলার শ্বশুর আর যাদব গোষ্ঠীও এখন আছে কুন্তীর লগে...

কৃষ্ণও কথা বাড়ায় না। কয়- তোমাগো পরিচয় প্রকাশ এখনো সুবিধার হইব না পিসি। এক মাইয়ার পাঁচ স্বামী কেমনে হয় সেইটা দ্রুপদরে আগে না বুঝাইয়া আউগানো যাবে না। দ্রুপদ রাজা আমারে খাতির করেন কিন্তু এই বিষয়ে যুক্তি দিয়া আমি তারে পটাইতে পারব না। যুধিষ্ঠিরের বিধান ছোট

ভাইগো লাইগা ঠিকাছে। কিন্তু পাঁচ পোলার এক বৌ জায়েজ করার লাইগা দ্বৈপায়নের মতো একজন শক্ত ঋষির সাপোর্ট লাগব তোমার...

কুন্তী হাসে- কী মনে করছ তুই তোর পিসিরে? কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন আমার সাক্ষাৎ শ্বশুর আর আমার পোলারা তার নাতি। মাইনসে যত দেবতার কাহিনি জানে তার সকলই জানে তার কলমের কৃপায়; তোর কি মনে হয় নাতিগো বিয়া জায়েজ করার লাইগা তারে দিয়া কোনো কাহিনি না করাইয়াই অত বড়ো কাম করছি আমি? ওইটা নিয়া তুই ভাবিস না। তিনি নিজে খাড়াইয়াই নাতিগো বিবাহ দিবেন। আমি তরে ডাকছি অন্য কারণে। সেইটা হইল তোর ভাইয়েরা একটু নাদান কিসিমের; তুই তাগো লগে থাকলে তারা একটু বুকে বল পায়...

কর্ণরে যেমন পাঞ্চালী সরাইয়া দিছে সূতপুত্র কইয়া। তেমনি পাঁচ ভূতের ভাগে পড়ব জানলে হয়ত অর্জুনরেও সরাইয়া দিত ভিক্ষুক বিয়া করব না কইয়া। কিন্তু এখন বহু দেরি হইয়া গেছে। এখন সে অর্জুনের সম্পত্তি। অর্জুন তারে এখন যার কাছে ইচ্ছা দান কইরা দিতে পারে। দেখা যাক...

প্রতিযোগিতার নামে কি মাইয়াডারে কোনো ছোটলোকের হাতে তুইলা দিলাম? এই চিন্তায় বেক্কল বইনা গেছিল দ্রুপদ আর তার পোলা ধৃষ্টদ্যুম্ন। তাই পাঞ্চালপুত্র আড়ালে তার যমজ বোন পাঞ্চালীর পিছনে ধাওয়া দিছিল অর্জুনের সাকিন-সাবুদ জাইনা নিতে। কিন্তু সংবাদ নিয়া বাপের কাছে গিয়া মাথায় হাত দিয়া বইসা পড়ে পাঞ্চাল যুবরাজ- এইটা কী দেখলাম বাজান। পাঞ্চালীরে একলগেই বিয়া করছে সেই পোলা আর তার বাকি চাইর ভাই। কৃষ্ণ বলাইরেও দেখলাম তাগো মায়ের লগে কী যেন ফুসুর ফুসুর করে। আমার কেমন যেন সন্দেহ হয়...

এক মায়ের পাঁচ পোলা। তার মাঝে একটা তিরন্দাজ আরেকটা গদাধর; তার উপরে যাদবগো লগে কানেকশন...। দ্রুপদেরও সন্দেহ হয় এরাই মনে লয় নিখোঁজ পাঁচ পাণ্ডব। সেইটা হইলে তো ভালোই। কিন্তু কথা হইল এক মাইয়ারে পাঁচ ভাইয়ে বিবাহের বিধানটা কী?

পরের দিনই দ্রুপদ নিজের পুরোহিতরে পাণ্ডবগো কাছে পাঠায় খাওনের নিমন্ত্রণ দিয়া। তার সাথে কইয়া দেয়- আমি চাই আমার মাইয়ারে যে পোলায় জয় করছে ধর্মের বিধান মতে সে একলাই আমার জামাতা হউক...

যুধিষ্ঠির নিমন্ত্রণ রাইখা বাকি বিষয়ে কিছু না কইয়া কয়- আইচ্ছা তাই হবে...

দ্রুপদ নিশ্চিত হইছেন এরাই পাণ্ডুরাজার পাঁচ পোলা। কিন্তু তিনি এদের বেশি বিশ্বাস করতে পারেন নাই। তাই নিমন্ত্রণের দিন কন্যার আনুষ্ঠানিক বিয়ারও আয়োজন কইরা রাখছেন তিনি। কিন্তু যখন তিনি যুধিষ্ঠিররে কইলেন- আসেন আপনের যে ভাই আমার মাইয়ারে জিতা নিছে তার লগে তার আনুষ্ঠানিক বিবাহটা সাইরা ফালাই। তখন যুধিষ্ঠির কয়- মহারাজ আপনের মাইয়ার লগে তো আমাগো পাঁচ ভাইয়েরই বিবাহ হইয়া গেছে। এখন অনুষ্ঠান করতে হইলে সিরিয়াল মতো পয়লা আমার লগে তারপর ভীমের লগে তারপর অর্জুন আর তারপর নকুল সহদেবের লগে করা লাগে...

পাঞ্চাল রাজা খেইপা উঠে যুধিষ্ঠিরের কথায়- ফাইজলামি করো মিয়া? পরিচয় দিতাছ তুমি পাণ্ডুর পোলা ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির আর কথা কইতাছ অধর্মের? এক মাইয়ার লগে পাঁচ ভাইয়ের বিবাহ?

যুধিষ্ঠির যতই বোঝাইতে চায় যে দ্রৌপদীরে বিয়া করার কোনো ইচ্ছাই তার নাই কিন্তু সেইটা সে করতে বাধ্য মায়ের সম্মান রাখতে গিয়া। আর এই সম্পর্কে ধর্মের ব্যাখ্যা আর উদাহরণ দুইটাই ইতিহাসে আছে। কিন্তু কে শোনে কার কথা। সারা রাজবাড়ি পুরা হাউকাউ। এক দিকে পাঁচ পাণ্ডব আর অন্য দিকে দুনিয়ার সব পাব্লিক। একজন ব্যাখ্যা চায় তো আরেকজন যায় থাপড় বাগাইয়া। এই দিকে দ্বৈপায়নের আসার কথা থাকলেও তিনি এখনো আইসা পৌঁছান নাই। কুন্তীর ভয় লাগে দ্রুপদ না তার মাইয়ারে ঘরে আটকাইয়া কয়- যা বেটা ভাগ তোরা ফকিন্নির পুত। আমার মাইয়ার বিয়া দিমু না আমি...

কুন্তী একবার মাইনসের হাউকাউ শোনে; আরেকবার তাকায় রাস্তায়। কুন্তীর সন্দেহ হয় একবার নন্দীর হাতে মাইর খাওয়া দ্বৈপায়ন ঋষি আইজ না আবার পাব্লিকের অবস্থা বুইঝা কাট মাইরা দিলেন। কিন্তু না। তিনি আসতাছেন...

হেইলা-দুইলা দাড়ি নাচাইয়া চুল ঝাঁকাইয়া দ্রুপদের আঙিনায় আইসা খাড়ান ঋষি দ্বৈপায়ন। কুন্তী দৌড়াইয়া গিয়া পড়ে তার পায়- আব্বাজান অবস্থা তো খুবই খারাপ। এক মাইয়ার পাঁচ স্বামী কেউ মানে না। এখন পাঞ্চালী যদি এক পোলারে বিবাহ করে তবে তো আমার কথা মিথ্যা হইয়া যায়। আমারে কি তবে মিথ্যা বলার পাপে পাপী হইতে হবে পিতা?

দ্বৈপায়ন একটু বিরক্ত হন- তোমারে পাপপুণ্য বিচারের দায়িত্ব দিছে কেডা?

ঋষি দ্বৈপায়নরে দেইখা দ্রুপদ পেন্নাম দিয়া তার সামনে খাড়ায়- দেখেন তো ঋষি। এইডা কোন ধরনের কথা? পাঁচ ভাইয়ে একটা মাইয়ারে বিবাহ করতে চায়?

- তুমি কেডা?

উত্তর না দিয়া দ্বৈপায়নের উল্টা প্রশ্নে দ্রুপদ হাত জোড় কইরা কয়- আমি মাইয়ার বাপ। পাঞ্চাল দেশের রাজা...

দ্বৈপায়ন হাত তুইলা তারে থামান- রাজপরিচয় লাগব না। মাইয়ার বাপ কইছ সেইটাই যথেষ্ট। তুমি আমার নিকটে খাড়াও; আমি দেখতাছি...

দ্বৈপায়নরে দেইখা অন্যরাও আইসা তারে ঘিরা ধরে। ধৃষ্টদ্যুম্ন নমস্কার কইরা কয়- আমি পাত্রীর যমজ ভাই কবি...

- আইচ্ছা ঠিকাছে। তা কোনো বক্তব্য আছে তোমার?

ধৃষ্টদ্যুম্ন হাত কচলায়। তারপর যুধিষ্ঠিররে দেখাইয়া কয়- কবিবর। আমার বইনের বিবাহ ঠিক হইছে এই বেডার ছোড ভাইয়ের লগে। এই বেডা নিজেরে ধার্মিক হিসাবে পরিচয় দেয়; অথচ নিজের ছোট ভাইয়ের বৌয়েরে সে নিজেই বিবাহ করতে চায়। এইডা কেমন কথা বলেন তো?

দ্বৈপায়ন তারেও থামাইয়া দেন- বাপবেটা দুইজন দুইভাবে কইলা; কিন্তু কথা তো সেই একই হইল। তা এর বাইরে আর কোনো কথা আছে কারো?

ধৃষ্টদ্যুম্ন চুপসাইয়া গেলে যুধিষ্ঠির পেন্নাম কইরা খাড়ায়- দাদাজান। আমি কতভাবে এগোরে বুঝাইতে চাইলাম যে পুরাণে জটিলা নামে একজন নারীর সাতজন পতি আছিল। মুনিকইন্যা বার্ক্ষীর আছিল একলগে দশজন পতি; আর আমরা তো সাতও না; দশও না; মাত্র পাঁচখান ভাই পাঞ্চালীরে বিবাহ করতে চাই...

- তোমারে অত বকবক করতে কইছে কেডায়? কথা কম কইয়া চুপচাপ খাড়াইয়া থাকো। আর মাইয়ার ভাই তোমার লোকজনরে কও চিল্লাচিল্লি বন্ধ করতে। আমি মাইয়ার বাপের লগে একটু নিরালায় কথা বলতে চাই। মাইয়ার বাপ এই দিকে আসো। কী যেন নাম তোমার?

- আইজ্ঞা দ্রুপদ। পৃষতের পোলা

- ঠিকাছে। পৃষৎরে আমি ভালো কইরা চিনতাম

- আইজ্ঞা হ। তিনি আপনের ভক্ত আছিলেন। এই দিকে আসেন

হাতে ধইরা দ্রুপদের নিয়া অন্য দিকে চইলা যান দ্বৈপায়ন। আড়ালে নিয়া কন- আমি এইখানে কেন আসছি তুমি জানো?

- না গুরুদেব

- আমি আসছি তোমার মাইয়ার বিবাহে পুরোহিত হইতে

দ্রুপদ এইবার আভূমি প্রণাম কইরা কয়- এইটা খালি আমার মাইয়ার সৌভাগ্য না গুরুদেব। আমার বংশেরও সাত জন্মের সৌভাগ্য যে মহাঋষি দ্বৈপায়ন আমার মাইয়ার বিবাহে পুরোহিত হইবেন...

দ্বৈপায়ন দাঁত বাইর কইরা হাসেন- তোমারে সৌভাগ্য দিবার লাইগা আমি আসি নাই। আমি আসছি শিবের নির্দেশে নিজের দায়িত্ব পালন করতে

- শিবের নির্দেশ?

- হ শিবের নির্দেশ। কারণ তুমি যে মাইয়ারে নিজের মাইয়া বইলা জানো; সে আসোলে তোমার মাইয়া না। পূর্বজন্মে সে আছিল এক ঋষির মাইয়া যারে একলগে পাঁচ স্বামী পাওয়ার বর দিছিলেন শিব। সেই কারণেই তিনি আমারে দর্শন দিয়া কইলেন- তুই যা; পাঞ্চালীর বিবাহে পুরোহিত হ। অন্য কোনো ঘটি বামুন তার বিবাহ পড়াইলে আমার বর মিথ্যা হইয়া যাইতে পারে। আর সেই কারণেই আমি এইখানে আসলাম বুঝলা? আর আরেকখান কথা। তুমি যদি মনে করো যে স্বয়ংবরায় তোমার মাইয়াই তার স্বামী নির্বাচন করছে; তাইলে সেইটাও কিন্তু ভুল। তোমার মাইয়ার বিবাহের ঘটক স্বয়ং মহাদেব

শিব। তিনিই পূর্বজন্মে তোমার মাইয়ার লাইগা তার স্বামীগো ঠিক কইরা রাখছিলেন। ওরাও আছিল দেবতা; খালি তোমার মাইয়ারে একলগে বিবাহ করার লাইগা শিবের নির্দেশে তারা মর্তে মানুষ হইয়া জন্মাইছে। এক নারীর একাধিক স্বামীর বিধান প্রচলিত না থাকলেও বিশেষ ক্ষেত্রে কিন্তু তা হইতেই পারে। বিশেষত শিব আগেই যে বিবাহ ঠিক কইরা রাখছেন। এখন শিবের কথার উপ্রে আর কোনো কথা আছে তোমার?

- আইজ্ঞা না। ঋষি দ্বৈপায়নের কথার উপ্রে আবার কীসের কথা?

বেদ ভাইঙ্গা যিনি চাইর টুকরা করছেন; তিনিই কইতাছেন এই বিধান বৈদিক। শিবের জীবনী যিনি লিখছেন; তিনিই কইতাছেন এই বিবাহ শৈব। সুতরাং দ্বৈপায়নের কথার পরে আর কোনো টু শব্দ করে না কেউ। দ্রুপদও বাঁইচা যায় নিজের ঘাড় থাইকা এমন ঝামেলা নামায়। তারপর দ্বৈপায়ন নিজে পুরোহিত হইয়া পাঁচ নাতির লগে পরপর পাঁচ দিন ধইরা বিবাহ পড়াইয়া দেন পাঞ্চালকন্যা দ্রৌপদীর...

সংবাদ পৌঁছাইয়া যায় ধৃতরাষ্ট্রের কানে। এখন কী করা যায়?

ধৃতরাষ্ট্রের এমন বেচইন প্রশ্নে ভীষ্ম নইড়াচইড়া আবার তার তামাদি হিসাব খোলেন- করার তো কিছু নাই। বংশের নিখোঁজ পোলাগো আবার খোঁজ পাওয়া গেছে। তাগোরে বাড়ি আসতে কও...

দ্রোণের অঙ্কটা একটু বেশি জটিল। ধৃতরাষ্ট্রের লগে যদি পঞ্চ পাণ্ডবের গিয়াঞ্জাম হয় তবে দুর্যোধন আর কর্ণ ব্যস্ত থাকব পাণ্ডবগো আক্রমণ থাইকা হস্তিনাপুর বাঁচাইবার ধান্দায়। ধৃতের চাকুরিজীবী হিসাবে দ্রোণেরেও তখন থাকতে হইব হস্তিনাপুর। আর সেই সুযোগে এক ধাক্কাতেই দ্রুপদ উদ্ধার কইরা নিব দ্রোণের হাতে বেদখল হইয়া যাওয়া তার দক্ষিণ পাঞ্চাল। তাই

সবচে বুদ্ধিমানের কাম হইল যুদ্ধমুদ্ধ এড়াইয়া যাওয়া। ধৃতের ভাতিজারা হস্তিনাপুর আইসা তার পোলাগো লগে কিলাকিলি করুক তাতে তার কী? কিন্তু কোনোভাবেই দ্রুপদরে যুদ্ধের সুযোগ দিয়া নিজের রাজ্য হারানোর ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হইব না। তাই সবকিছু ভাইবা-চিন্তা দ্রোণও সিদ্ধান্ত জানায়- মুরব্বি ভীষ্মের কথাই আমার কথা মহারাজ। বিদুরও ভীষ্মরে সমর্থন জানায়- জ্যাঠায় যা কইছে সেইটাই আমার মত। ওগোরে ফিরা আসতে কন...

তিনজনের কথাই এক লাইনে যাওয়ায় ধৃতরাষ্ট্র কর্ণের দিকে তাকান। কর্ণের সোজাসাপ্টা কথা- অত দিন যারা মরার ভান কইরা লুকাইয়া আছিল; এইবার আদেশ করেন ওগোরে সত্যি সত্যি মাইরা ফালাই...

ধৃতরাষ্ট্র কর্ণের টোপ গিলা ফালাইতে পারেন দেইখা বিদুর রাজারে ভয় দেখাইতে শুরু করে- ওগোর লগে কিন্তুক এখন জাউরা যাদব বংশের প্যাক্ট হইছে মহারাজ। বলরাম আর সাত্যকির শক্তির কথা তো আপনি জানেন। আর যুদ্ধ জিতার বিষয়ে কৃষ্ণের বুদ্ধির কাহিনিও তো আপনি বহুত শুনছেন মহারাজ। আর পাণ্ডবগো শ্বশুর রাজা দ্রুপদরে আপনি কোন যুক্তি দিয়া দুব্বল কইবেন; যেইখানে ধৃষ্টদ্যুম্ন আর শিখণ্ডীর মতো দুইটা পোলা আছে তার? বুইঝা দেখেন মহারাজ একলা কর্ণরে দিয়া অত কিছু সামলান যাইব কি না? তার চেয়ে আমার পরামর্শ হইল অভিভাবক হিসাবে নিজের পজিশন ঠিক রাখার লাইগা বৌসহ পিতৃহীন ভাতিজাগোরে আপনি সাদরে গ্রহণ কইরা লন। তাতে আপনার সম্মান বৃদ্ধি হবে...

বিদুরের কথায় ধৃতরাষ্ট্ররে ভয় খাইতে দেইখা ভীষ্ম গলা খাঁকারি দেন- আমি কই কি; যুবরাজ-টুবরাজ পদ দিয়া এখন আর তুমি ঝামেলা মিটাইতে পারবা

না। তুমি বরং তাগোরে অর্ধেক রাজ্য দিয়া দেও। তাতে তোমার পোলাগো লগে তাগো দেখা-সাক্ষাৎও হইব না; রেষারেষিও থাকব না...

যারা মইরা যাওয়ার পরে কাইন্দা ধৃতরাষ্ট্র শেষকৃত্য কইরা ফালাইছেন বহু দিন আগে; এইবার তাগোর কাছেই তিনি সংবাদ পাঠান- ভাতিজাগণ। ছোট ভাইয়ের পোলা হিসাবে তোমরা আমারও পোলাপান। অত দিন কই ছিলি বাপ? আয় বাপ আয়। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরা আয় বৌ আর মায়েরে নিয়া...

দ্রুপদ আর কৃষ্ণের লগে শলা কইরা পাঁচ বছর পর কুন্তী আবার আইসা পাণ্ডুর প্রাসাদে ঢোকে তার পোলা আর পোলাবৌ নিয়া...

কয়েক দিনের মধ্যেই ভীষ্মের সালিশে রাজ্য ভাগাভাগি হইলে পাণ্ডবরা পায় রাজ্যের আকাটা জঙ্গলের অংশ খাণ্ডবপ্রস্থ। তাতেই সই। তারা কৃষ্ণরে নিয়া সেই বনে গিয়া লোকাল পাব্লিকরে মাইরা ধইরা আগুন দিয়া খেদাইয়া বানায় ইন্দ্রপ্রস্থ নগর। তারপর হাইলা জাইলা প্রজাগোর সম্পদে-ফসলে ছয় ভাগের এক ভাগ খাজনা বসাইয়া যুধিষ্ঠির হয় সেই রাজ্যের রাজা; যুবরাজ ভীমের দায়িত্বে থাকে রাজ্যের কল্যাণ আর অর্থকড়ির হিসাব; যুদ্ধ আর বিদেশ বিষয় থাকে অর্জুনের হাতে আর বড়ো তিন ভাইর সার্বক্ষণিক অ্যাসিস্ট্যান্ট হয় নকুল সহদেব এবং সবার উপরে থাকে মামাতো ভাই কৃষ্ণের উপদেষ্টা পদ...

এর মাঝে দ্রৌপদীর গর্ভে পাঁচ পোলার ঘরে পাঁচটা নাতিও পাইছে কুন্তী; প্রতিবিন্ধ্য- সুতসোম- শ্রুতকর্মা-শতানীক আর শ্রুতসেন। পাঁচ পাণ্ডবের চাইরজন আরো একটা কইরা বিয়াশাদিও করছে এর মাঝে। অর্জুন কৃষ্ণের বইন সুভদ্রাসহ বিয়া করছে আরো তিনখান; সেই সব ঘরে পোলাপানও আছে; উলুপীর ঘরে ইরাবান; চিত্রাঙ্গদার ঘরে বভ্রুবাহন; সুভদ্রার ঘরে

অভিমন্যু। সতিনের লগে ঘর করব না বইলা বংশের বড়ো বৌ হিড়িম্বা তার পোলারে নিয়া সেই জঙ্গলেই থাকে। উলুপী আর চিত্রাঙ্গদারে অর্জুন ঘরে উঠায় নাই বইলা তারাও তাগো পোলাদের সাথে নিজের বাপের ঘরে থাকে। আর পোলাদের সংসারে না থাইকা কুন্তী থাকে তার স্বামীর ঘরে; হস্তিনাপুর...

বড়ো নাতি ঘটোৎকচও বিয়াশাদি কইরা এখন দুই পোলার বাপ। ছোট পোলারে ঘাড়ে কইরা এক হাতে বড়ো পোলার হাত ধইরা বৌরে নিয়া কুন্তীর কাছে আসছিল ঘটা- দেখো দাদি। পয়লা নাতির ঘরে তোমার পয়লা নাতিবৌ অহিলাবতী। আর এই অঞ্জনপর্বা হইল তোমার পয়লা পোতা; পাণ্ডবগো পরথম নাতি আর এই ল্যাদা পোলাটা হইল তোমার দুই নম্বর পোতা বর্বরীক...

ঘটোৎকচের বৌটা খুবই চটপটা আর বুদ্ধিমান। পয়লা দিন আইসাই সে কুন্তীরে কয়- রাজনীতির লাইগা শ্বশুররে যেমন তার সংসার থাইকা তুমি কাইড়া নিছিলা; আমার স্বামীরে নিয়া সেই রকম ঘিরিঙ্গি করলে আমি কিন্তু তোমারে খাইয়া ফালামু বুড়ি। মনে রাইখ আমি নাগ বংশের মাইয়া...

ঘটার পোলাগো কোলে নিয়া কুন্তী হাসে- আমার যখন করার সময় আছিল তখন ভালোমন্দ নিজের বুদ্ধিতে যা কুলায় পোলাপানগো লাইগা তা করছি। এখন নাতিপুতিগো লগে সময় কাটান ছাড়া আমার তো আর কিছু করার দরকার দেখি না বইন। এখন তোগো সময়; ভালোমন্দ যা করার করবি তোরাই...

অহিলা কয়- আমিও আমার পোলাগো ভালোমন্দ ঠিক কইরা ফালাইছি দাদি। বড়ো পোলাটা দিয়া দিছি ওর বাপেরে। বাপ দাদার মতো সে মাইর দাঙ্গা করব। আর ওই ল্যাদা পোলাটা আমার। ওরে আমি পড়ালেখা করাইয়া ঋষি

বানামু। বংশের হগলে খালি মারামারি করলেই হবে? দুই একজনের তো বিদ্যা শিক্ষা কইরা মগজের কারবারও করা লাগে; নাকি কও দাদি?

কুন্তী কয়- তা তো লাগবই। আমার শ্বশুর হইলেন ঋষি দ্বৈপায়ন; নাতিপুতিগো মাঝে একজনও ঋষি হইব না তা কি হয়? তয় আমার নাতি ঘটারেও কিন্তু তুমি খালি দাঙ্গাবাজ কইতে পারো না। সে কিন্তু অস্ত্র কম্পিটিশন দিয়া স্বয়ংবরায় তোমারে বিয়া করে নাই; বুদ্ধির কম্পিটিশন কইরাই তোমারে বিয়া করছে...

অহিলা কয়- হ। বুদ্ধি তো আছিল ভালোই; কিন্তু সব বুদ্ধি তো খর্চা কইরা ফালায় মায়াযুদ্ধের কৌশল খাটাইতে গিয়া...

কুন্তী একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে- কী আর করব কও। একলা একলা বড়ো হইছে; মায়ের সংসার সামলাইতে হইছে। লাঠিসোঁটা ধরতে না জানলে তো মাইনসে তারে পায়ে পিস্সা যাইত...

অহিলা কয়- হ দাদি। এর লাইগাই তো বড়োটারে বানামু যোদ্ধা। বাপে আর ভাইয়ে সামলাইব সংসার আর ছোটটায় করব বিদ্যাশিক্ষা...

নাগ বংশজাত মুরুর মাইয়া এই মৌরবি অহিলাবতী। বিদ্যাশিক্ষার লাইগা তার টানের কথা কুন্তী জানে। দুনিয়ার সকলে যেখানে স্বয়ংবরায় নিজের বর বাইছা নিতে যায় যোদ্ধা কিংবা কোনো বীরেরে; সেইখানে অহিলাবতী ঠিক করছিল তার স্বয়ংবরা হইব বুদ্ধির কম্পিটিশন দিয়া। সেই কম্পিটিশনে সে নিজেই জটিল কতগুলা প্রশ্ন করব আর যে সবগুলা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারব; সেই হইব তার স্বামী...

কুন্তী মনে মনে ভাবে; এমন কম্পিটিশনে যাইবার মতো একটাও পোলা তার নাই। কিন্তু হিড়িম্বার পোলা ঘটোৎকচ ঠিকই গিয়া হাজির হইছিল এমন স্বয়ংবরায় আর বুদ্ধি দিয়া সবাইরে হারাইয়া বিবাহ করছিল এই অহিলাবতীরে। কুন্তীর মনে বহুত খেদ আছিল নাতিটার শিক্ষাদীক্ষার কোনো ব্যবস্থা করতে না পাইরা। কিন্তু যেদিন শুনল ভীমের পোলা বুদ্ধির দৌড়েও সবাইরে পিছনে ফালাইয়া দিছে; সেই দিন মনে মনে একখান ধন্যবাদ দিছিল হিড়িম্বারে...

পাণ্ডুর গলায় মালা পরাইয়া যে কুন্তী একলা আসছিল হস্তিনাপুর; সেই কুন্তীর এখন নাতিপুতি নিয়া বিশাল বাজার। আশপাশের ছোটখাটো সব রাজারে কায়দা-কানুন কইরা ভীম আর অর্জুনে মিলা এই কয় দিনে বিশাল এক অর্থের ভাণ্ডারও গইড়া তুলছে ইন্দ্রপ্রস্থ দেশে। বিপদে আপদে কৃষ্ণ ছায়ার মতো আছে পাণ্ডবগো লগে। এখন ধনে জনে বুদ্ধিতে কুন্তীরে হুমকি দিবার মতো সত্যিই আর কেউ নাই...

কথাটা সবার আগে যুধিষ্ঠিরের মাথাতেই খেলে- কই? কাউরে তো দেখি না আমার সমান। তাইলে আমি কেন খালি রাজা হইয়া বইসা থাকুম? সম্রাট হইতে অসুবিধা কই আমার?

- অসুবিধা নাই। কিন্তু মনে রাইখেন আপনি যা দেখেন না সেইখানেও দেখার মতো বহুকিছু আছে। আশেপাশের বহুত ছোট রাজারে ভীম অর্জুনে মিলা বশ করছে সত্য; কিন্তু জরাসন্ধ বাঁইচা থাকতে আপনি সম্রাট হইবেন কেমনে? সে যেমন আপনের বশ মানব না তেমনি টানা তিন শো বছর যুদ্ধ করাইও তারে হারাইতে পারব না কেউ...

কৃষ্ণ জরাসন্ধের কথা কওয়ায় নিজের খায়েশ বিসর্জন দিয়া যুধিষ্ঠির চুপসাইয়া যায়- আইচ্ছা তাইলে থাক। সম্রাট হইয়া কাম নাই আমার...

জরাসন্ধ সত্যিই কঠিন সম্রাট। আশপাশের ছিয়াশিজন রাজারে সে বন্দি কইরা রাখছে নিজের কারাগারে। ভোজ বংশের সকল রাজাই জরাসন্ধের অনুগত। তার উপরে কৃষ্ণের উপর যারা যরা নাখোশ তারা সবাই আইসা যোগ দিছে জরাসন্ধের দলে। এই দলে সবার আগে আছে জরাসন্ধের প্রধান সেনাপতি শিশুপাল; যে কৃষ্ণের আরেক পিসি শ্রুতস্রবার পোলা; যার প্রেমিকা রুক্মিণীরে তুইলা আইনা বিয়া করায় কৃষ্ণের উপর মহান খ্যাপা সর্বদাই। মাইয়ারে তুইলা নিয়া আসায় রুক্মিণীর বাপ ভীষ্মক কৃষ্ণের উপর খ্যাপার কারণে স্বাভাবিকভাবেই জরাসন্ধের পক্ষে। কৃষ্ণের প্রতিদ্বন্দ্বী বঙ্গ পৌণ্ড্র কিরাতের রাজা পৌণ্ড্রিক বাসুদেবও জরাসন্ধের দোস্ত। নাগরাজ মুর; যে ঘটোৎকচের শ্বশুর হইলেও খাণ্ডবপ্রস্থ থাইকা কৃষ্ণ অর্জুনে তাগোরে উচ্ছেদ করায় যাদব-পাণ্ডব বিদ্বেষী আর জরাসন্ধের বন্ধু; জরাসন্ধের বন্ধুর দলে আছে দুর্যোধনের শ্বশুর নরকরাজ ভগদত্ত; যার বাপেরে কৃষ্ণ হত্যা করায় কৃষ্ণবিদ্বেষী সে; আর সবচে বড়ো কথা কৃষ্ণের মামা কংস আছিলেন জরাসন্ধের দুই মাইয়ার জামাই। মাইয়ার জামাই হত্যার প্রতিশোধ নিতে জরাসন্ধ যাদব আর বৃষ্ণিগো বহুত তাড়াইছেন। জরাসন্ধের ভয়েই কৃষ্ণের গোষ্ঠী এখন পর্বতের নিকট দুর্গ বানাইয়া বসবাস করে। জরাসন্ধরে যদি দমন করা যাইত তবে কি আর কৃষ্ণের বংশ তার ডরে পলাইয়া বেড়ায়?

কিন্তু যুধিষ্ঠিরের সম্রাট হইবার খায়েশ শুইনা হঠাৎ কৃষ্ণের মনে হয়- যার লগে যুদ্ধে পারা যাইব না তার লগে যুদ্ধ করারইবা কী দরকার? তারে অন্যভাবেও তো সরানো যায়। একবার দেখি না একটা টেরাই দিয়া...

ব্রাহ্মণভক্ত বৃদ্ধ জরাসন্ধের বাড়িতে ভীমরে নিয়া ব্রাহ্মণ সাইজা হাজির হয় কৃষ্ণ। তারপর জরাসন্ধ করে ব্রাহ্মণ সেবা আর কৃষ্ণ ভীমেরে বুঝায় কীভাবে মারতে হবে তারে। ভীম তারে মাথায় তুইলা মাটিতে আছড়াইয়া ফালায় আর এক পায়ে পা চাইপা ধইরা আরেক পায়ে হ্যাঁচকা টান দিয়া জরাসন্ধের দেহখান আলগা কইরা ফালায়...

জরাসন্ধরে মাইরা ফালানের পর পয়লা যে জিনিসটা ঘটে তা হইল কৃষ্ণের বিষয়ে সকলে সতর্ক হইয়া উঠে। এই যাদব পোলা রাজাও না সম্রাটও না; রাজা বাদশা হইবার কোনো ইচ্ছা তার আছে বলে মনেও হয় না কারো। যুদ্ধে তার অস্ত্র চালানোর সুখ্যাতি আছে; নিজের মামারে মাইরা ফালানোয় তার চোখের পর্দা না থাকার বদনামও আছে। কিন্তু একইসাথে শত্রুদমনে তার পিছনদুয়ারি বুদ্ধিটা সকলের চোখে পড়ে সকলের চেয়ে আলাদাভাবে। যেইখানে জরাসন্ধের সামনে খাড়ানোর সাহস করত না কেউ; সেই জরাসন্ধরে মাত্র এক ভীমরে নিয়া কেমনে সে সরাইয়া দিলো। আর এর সাথে সাথে কৃষ্ণের আশীর্বাদ পাওয়া যুধিষ্ঠিরের সামনেও আর তেমন কেউ থাকে না যে তারে সম্রাট হইতে বাধা দিতে পারে। ভাইঙ্গা পড়ে জরাসন্ধের শক্তির ভীত আর অল্প দিনেই খুচরা-খাচরা বাকিদের বশ কইরা সম্রাট হইবার লাইগা রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন করে যুধিষ্ঠির...

এইখানে অবশ্য একটু ঝামেলা হয়। কৃষ্ণের দাবি আছিল যজ্ঞের অর্ঘ্যটা তারেই দিতে হবে; যদিও যজ্ঞের অর্ঘ্য পাইবার জন্য যোগ্য হইল ছয় দল মানুষ; গুরু পুরোহিত সম্বন্ধী স্নাতক সুহৃদ এবং রাজা। গুরু পুরোহিত স্নাতক এবং রাজা; এই চাইর দলের কোনো দলেই কৃষ্ণ নাই। তারে পাণ্ডবগো সম্বন্ধী এবং সুহৃদ কওয়া গেলেও এই দলে এখনো তার থাইকা বেশি অগ্রাধিকারী মাইনসের অভাব নাই...

কিন্তু যুধিষ্ঠিরের তাতে কোনো অসুবিধা নাই। নিয়মে পড়ুক না পড়ুক কৃষ্ণ যখন চাইছে তখন সেইটা তারে দিতে হবে। ভীষ্মও তা মাইনা লন কারণ কৃষ্ণের বিরোধিতা কইরা শেষ বয়সে অপমান হইতে চান না তিনি। শুধু তাই না; আরেক ধাপ আগাইয়া যুধিষ্ঠিরের পক্ষে কুরুবুড়া ভীষ্ম নিজেই যজ্ঞের অর্ঘ্য নিবেদন করেন কৃষ্ণের পায়। কিন্তু অনেকেই খেইপা উঠে এই আচরণে। কৃষ্ণরে কেন দেয়া হবে যজ্ঞের পূজা? সব থিকা বেশি খেইপা উঠে জরাসন্ধের সেনাপতি এবং কৃষ্ণের আরেক পিসি শ্রুতস্রবার পোলা শিশুপাল; যার প্রেমিকা রুক্মিণীরে ছিনতাই কইরা বিবাহ করছিল কৃষ্ণ। কিন্তু এইরকম পতঙ্গের আস্ফালন পছন্দ হইবার কথা না যজ্ঞের পূজা পাইয়া দেবতার মর্যাদায় উইঠা যাওয়া কৃষ্ণের; হোক তার ভাই কিন্তু চক্র ছুঁইড়া ভরা সভায় তার মাথা নামাইয়া দিতে এক মুহূর্তও বিলম্ব করে না সে...

কৃষ্ণের আরেকটা চেহারা দেইখা আরো বেশি সতর্ক হয় আর্যাবর্তের মানুষ। আর কেউ কোনো শব্দ করে না। শুধু কুন্তীর মনে হয়; যে কৃষ্ণ এক পিসির পোলারে মারতে পারে সে অন্য পিসির পোলাগোরে মারতেও দেরি করব না; যদি তারা তার কথার অন্যথা করে। আপাতত অবশ্য সেই আশঙ্কা নাই; কারণ শক্তিমান মাইনসেরে কেমনে চালাইতে হয় তা যুধিষ্ঠির খুব ভালো কইরাই জানে...

রাজসূয় যজ্ঞ কইরা কুন্তীর পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সী পোলা যুধিষ্ঠির এখন সম্রাট। কুন্তীর সত্যই এখন নাতিপুতি নিয়া খেলা করা ছাড়া আর কিছুই করার দরকার নাই। কিন্তু ঝামেলাটা আসে যুধিষ্ঠিরের সম্রাট হইবার সূত্র থেকেই। যুধিষ্ঠিররে সম্রাট হইতে দেখে গায়ে জ্বলা দুর্যোধন গিয়া তার মামা শকুনির লগে শলা কইরা যুধিষ্ঠিররে শকুনির লগে পাশা খেলার আমন্ত্রণ পাঠায়। পাশা খেলায় গান্ধারীর ভাই শকুনির দ্বিতীয় কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। যুদ্ধটুদ্ধের থাইকা বুদ্ধি দিয়া রাজনীতি করতে পছন্দ করে সে। যুধিষ্ঠিরের রমরমা রাজ্য দেইখা

ভাগিনা দুর্যোধনরে সে বুদ্ধি দিছে যে যুদ্ধ ছাড়াও যুধিষ্ঠিরের রাজ্য নিজের দখলে নিয়া আসা সম্ভব পাশার দানে তুইলা; বিশেষত যেখানে যুধিষ্ঠিরও পাশার নেশায় আক্রান্ত...

পাশা খেলায় বাজি রাখা হইল রাজ্য। যুধিষ্ঠির জিতলে সে পাইব দুর্যোধনের রাজ্য আর হাইরা গেলে তার রাজ্য পাইব দুর্যোধন...

যুধিষ্ঠির খালি জুয়াড়িই না; মারাত্মক লোভীও বটে। পাশা খেইলা দুর্যোধনের রাজ্য পাইবার লোভে সে নিজের রাজ্য তো হারাইলই; তার সাথে পাশায় হাইরা তার সব ভাই; সে নিজে এবং দ্রৌপদীরেও বানাইয়া ফেলল দুর্যোধনের দাস। রাজসভায় দ্রৌপদীর মতো মাইয়ার নগ্ন হইবার মতো অপমানও সহ্য করতে হইল এই এক মূর্খের কারণে...

বিপদটা অবশ্য তখনো অত বেশি বড়ো হয় নাই। খেলায় হাইরা যাবার পরেও কুরুবুড়াদের কথায় ধৃতরাষ্ট্র নিজের ক্ষমতা খাটাইয়া সবকিছুই তাদের ফিরাইয়া দিছিলেন। কিন্তু মূর্খটা আবারও পরের দিন শকুনির লগে পাশা খেলতে গেলো নতুন এক বাজি নিয়া- খেলায় হাইরা গেলে চার ভাই আর দ্রৌপদীরে নিয়া তারে যাইতে হইব বারো বচ্ছর বনবাস আর এক বচ্ছরের অজ্ঞাতবাসে...

যা হওয়ার তাই হইল। যারে নিজের আঁচলে আগলাইয়া উনত্রিশ বছর বয়সে রাজা বানাইছিল কুন্তী। তারপর ষোলো বছর ধইরা তিল তিল করে চাইর ভাই আর কৃষ্ণ যারে পৌঁছাইয়া দিছিল সম্রাটের সিংহাসন পর্যন্ত। সেই সম্রাট যুধিষ্ঠির নিজের লোভ আর বেকুবির লাইগা হাইরা বসল শকুনির কাছে। এখন? এখন এই পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সের পোলা আর তার পোষ্যদের আরো তেরো বছর বনে-জঙ্গলে আগলাইয়া রাখার শক্তি কি কুন্তীর অবশিষ্ট আছে?

ক্ষতি যা হইবার তা হইয়া গেছে। এখন বাকিটা সামলানো দরকার। বহু বছর পর আবার নিজের মেরুদণ্ড সোজা কইরা খাড়ায় কুন্তী- পাঁচ পাণ্ডবের লগে শুধু দ্রৌপদীই যাইব বনে। বাকি বৌবিনিরা নিজেগো পোলা-মাইয়া নিয়া নিজের বাপের বাড়ি গিয়া থাকো। দ্রৌপদীর পাঁচ পোলারেও পাঠাইয়া দাও নানাবাড়ি পাঞ্চাল দেশে...

এই প্রথমবার কুন্তীর নিজেরে এক ভাইঙ্গা পড়া বৃদ্ধ মানুষ মনে হয়। সে অতি ধীরে দ্রৌপদীরে ধইরা নিজেরে খাড়া রাখে- বনে-জঙ্গলে থাইকা; পথে পথে ভিক্ষা কইরা যে পোলারে রাজা বানাইছিলাম আমি। নিজের কর্মদোষে সেই পোলা এখন সবাইরে নিয়া পথের ফকির। তোরে আমার কিচ্ছু কওয়ার নাই রে মা। শুধু কই; যদি পারিস পাঁচটা পোলারে এক মুঠায় রাইখা দেখ কিছু করতে পারস কি না...

০৫

তোমার অর্জুন একটা বেশ্যা মাগির পুত। নিজের মায়ে তার শুইছে বারো মাইনসের লগে তাই আমারেও সে বিলাইয়া দিছে পাঁচ ভাইয়ের বিছানায়। কর্ণ কি মিথ্যা কয় আমি একটা বেশ্যা? একটা বেশ্যারে জুয়ার দানে তুইলা দিতে যুধিষ্ঠিরের যেমন যায় আসে না তেমনি একটা বেশ্যারে কেউ বিবস্ত্র করলে অর্জুনেরও আসে যায় না কিছু...

কাম্যকবনে কৃষ্ণা দ্রৌপদী হামলাইয়া পড়ে কৃষ্ণের উপর। কৃষ্ণ কিছু কইতে গিয়া গুছাইতে না পাইরা তোতলায়। হাত তুইলা দ্রৌপদী তারে থামাইয়া দিয়া নিজে স্থির খাড়াইয়া থাকে। কৃষ্ণের মনে হয় যা বলার তা বইলা দিয়া দ্রৌপদীর বলা শেষ তাই থামানো কথা সে আর বাড়ায় না। কিন্তু দ্রৌপদী আবার মুখ খোলে। এক্কেবারে ধীর। অতি ধীর লয়ে কৃষ্ণের চোখে চোখ রাইখা সে জিগায়- দোস্ত। কও তো দেখি তোমরা সকলেই ক্যান কর্ণরে মারতে চাও? কর্ণ কী এমন করছে যা তোমরা কেউ করো নাই? তোমরা তারে অর্জুনের লগে লড়াই করতে দেও নাই; নমশূদ্র গালাগাল দিয়া সরাইয়া দিছ। সকলের লাইগা সমান সুযোগের স্বয়ংবরা থাইকা আমিও তারে গাড়োয়ানের পোলা কইয়া বিনা দোষে খেদান দিছি। সেই অপমানে সে যদি আমারে একবার বেশ্যা কইয়া ডাকে; তয় কি তা খুব বড়ো অপরাধ? কৃষ্ণ। তুমি কও তো সখা; তোমার সখী কৃষ্ণা পাঞ্চালী একটা বেশ্যা না?

একটা দম নিয়া পাঞ্চালী ফাইটা পড়ে আবার- হা কৃষ্ণ। আমি জানি এইখানে আমারে সান্ত্বনা দিতে আসো নাই তুমি। তুমি আসছ আমারে বুঝাইয়া আবার পাণ্ডবগো বনবাসের বিছানায় পাঠানোর ধান্দায়। পাঁচ পাণ্ডবের নয়টা বৌ থাকতে একলা আমারেই বনবাসে পাঠাইছে তোমার পিসি যাতে পাঁচ পোলার একলা যৌনসঙ্গী হইয়া তাগোরে হাতের এক মুঠায় ধইরা রাখি আমি। তুমি যাও কৃষ্ণ। ভীষ্ম তোমার অর্জুনের ঠাকুরদা; দ্রোণ তার গুরু। তাগোর দিকে

হাত তুলতে ভীমেরও গদা কাঁপতে পারে। কিন্তু পাঞ্চাল রাজারে তুমি চিনো। তুমি ভালো কইরা জানো তার দুই পোলা ধৃষ্টদ্যুম্ন আর শিখণ্ডীরে। দ্রোণ আর ভীষ্মর লাইগা তাদের অস্ত্র শাণ দেওয়া কেউ ঠেকাইতে পারব না জাইনা রাখো তুমি। আর ধৃতরাষ্ট্রের পোলাগো লাইগা একলা ভীমই যথেষ্ট আমার। ভীম যদি বাঁইচা থাকে; যদি বাঁইচা থাকে আমার দ্ইু ভাই। যদি বুড়া বাপের শরীরে প্রাণ থাকে; তয় দ্রৌপদী তার হিসাব বুইঝা নিব এক দিন। তুমি যাও। তোমারেও এখন আর বিশ্বাস করি না আমি...

অপমান থাইকা বড়ো কোনো অস্ত্র নাই যা মানুষ ভোলে না ফিরাইয়া দিবার কথা। ঘৃণার থাইকা বড়ো কোনো যুক্তি নাই যাতে মানুষ যে কাউরে ছোবল দিতে না পারে। ধীর কৃষ্ণ ধীর। জয় পরাজয় ক্ষত্রিয়দের নিত্য অভ্যাস। পাণ্ডবরা ভুইলা যাইতে পারে পরাজয়ের কথা; কিন্তু পাঞ্চালীর অপমানই তাগোরে আবার ফিরাইয়া আনব হস্তিনাপুর...

অতি দ্রুত হিসাব মিলাইয়া কৃষ্ণ চুপ থাকে। কৃষ্ণ যায়ও না; খাড়ায়ও না; খালি ডানে বামে পায়চারি করে। পাণ্ডবরা বনবাসে আসার তিন দিন পরেই দেখতে আসছিল বিদুর। ফিরা গিয়া যে সংবাদ দিছে তা শুইনা কুন্তী নিজেই রওনা দিছিল বনবাসে আসার। ধৃতরাষ্ট্রের সভাতেই যুধিষ্ঠিরের হাত পুড়াইতে গেছিল ভীম; অর্জুন তারে কোনোমতে আটকাইছে। ভীম বনবাসের শর্তও মানে নাই। এর মধ্যেই সে কয়েকবার হাতে গদা নিছে হস্তিনাপুর ফিরা যাবার লাইগা। ভীমেরে সামলাইতে পারে এমন কেউ এখন এইখানে নাই। অন্য সময় হইলে কুন্তীর পরে ভীমেরে সামলাইতে পারত দ্রৌপদী। কিন্তু দ্রৌপদী এখন অপমানে রাগে অর্ধ উন্মাদ হইয়া আছে। হইবারই কথা। পাঞ্চাল রাজের মাইয়া সে; সম্রাটের মহিষী। পাঁচ-পাঁচটা তরুণ পোলাও আছে তার। কিন্তু মূর্খ যুধিষ্ঠির কি না সেই দ্রৌপদীরে পাশা খেলায় বাজি ধইরা বসল। হালা ফকিন্নির পুত; কপাল জোরে কুন্তীপিসির লাইগা দ্রৌপদীর মতো মেয়েরে নিজের বৌ

হিসাবে পাইছে; সেই কি না দ্রৌপদীরে নিজের সম্পত্তি ভাইবা তুইলা দিলো জুয়ায়...

কৃষ্ণের অস্থির লাগে। দ্রৌপদীরে সামলাইতে না পারলে ভাইসা যাবে সব। আসার সময় কৃষ্ণ সাথে কইরা দ্রৌপদীর দুই ভাই আর পাঁচ পোলারেও নিয়া আসছে এইখানে। কিন্তু দ্রৌপদী কারো লগেই কথা কইতে চায় না। স্বামীগো লগে তো তার কথা পুরাটাই বন্ধ। সে তাগো লগে বনবাসে আসছে ঠিকই কিন্তু সে থাকতাছে পুরোহিত ধৌম্যের আশ্রমে...

বহুক্ষণ চুপ থাইকা আবার মুখ খোলে দ্রৌপদী- কৃষ্ণ তুমি আমারে কইতা সখী। আমার আছিল পাঁচ-পাঁচটা স্বামী। কিন্তু আইজ আমি বুঝতাছি আমার স্বামী নাই; ভাই নাই; পিতা নাই; পুত্র নাই; তুমিও নাই কৃষ্ণ। আমার যদি কেউ থাকত তাইলে দুঃশাসন আমার চুলের মুঠা ধইরা রাজসভায় টানতে পারত না। আমার যদি কেউ থাকত তাইলে কর্ণ আমারে বেশ্যা কইয়া গালি দিতে পারত না। আমার যদি কেউ থাকত তাইলে রাজসভায় কেউ আমার পোশাক খুলতে পারত না। আমার কেউ থাকলে আমারে নগ্ন হইতে দেইখা যুধিষ্ঠির মুখ ঘুরাইতে পারত না। আমার কেউ থাকলে ভীমরে আটকাইতে পারত না অর্জুন। কেউ নাই আমার। কেউ নাই। আমার লাইগা ধর্মও নাই সখা। রাজদরবারে উলঙ্গ হইয়া আমি ভীষ্মের কাছে আশ্রয় চাই- পিতামহ আমারে বাঁচান। গঙ্গাবেশ্যার পোলা ভীষ্ম তখন ধর্ম ভুইলা যায়। আমি চিল্লাইয়া কান্দি- পিতামহ ধর্মের দোহাই অন্তত আমারে বিবস্ত্র হওনের থাইকা বাঁচান। বেজন্মা ভীষ্ম আমারে কয়- ধর্মের ব্যাখ্যা বড়োই কঠিন। ধর্ম এতই কঠিন রে কৃষ্ণ; বিবস্ত্রা নারীর পোশাক ফিরাইয়া দেওয়া যাইব কি যাইব না; সেই ধর্মব্যাখ্যা আবিষ্কার করতে পারে না কুরুসভার কেউ। দ্রোণ আমারে দেইখা হাসে; পাঞ্চাল রাজের মাইয়ারে হাটে ন্যাংটা হইতে দেখলে ফকিন্নির পুত দ্রোণের হাসবারই কথা। কিন্তু সৎমায়ের শরীর চাইটা খাওয়া নির্বংশ

ভীষ্মও তখন ফ্যালফ্যাল কইরা চোখ দিয়া চাটে নাতিবৌর নগ্ন শরীর। আমি একটা বেশ্যারে কৃষ্ণ। আমার নগ্ন শরীর দেখে দেবর শ্বশুর দাদাশ্বশুর আর নিজের পাঁচ-পাঁচটা পোলা। ঘেন্না। কৃষ্ণ ঘেন্না। আমারে আবারও বেশ্যা প্রমাণ করার লাইগা কি সাথে কইরা আমার পাঁচটা পোলারে এইখানে নিয়া আসছ তুমি? দোহাই। তোমারে আমি নিজের বন্ধু বইলা জানি। আমার সেই নগ্ন নরকের সময় আমি কারো নাম ধইরা ডাকি নাই। শুধু তোরেই আমি ডাকছিরে কৃষ্ণ। আমার মনে হইছে তুই থাকলে আমি তোর পায়ে ধইরা বলতাম- কৃষ্ণ; দোস্ত আমার; আমারে দয়া কর তুই। তোর হাতের চক্রখান দিয়া আমারে মরণ দে ভাই...

থাইমা থাইমা ফুঁইসা উঠে পাঞ্চালী। ফুঁসতে থাকা এই দ্রৌপদীই পাণ্ডবগো ভবিষ্যৎ। কৃষ্ণ তারে ফুঁসতে দেয়। কথা বলুক পাঞ্চালী। কথা বলা দরকার তার। পাঞ্চালী বলতেই থাকে- আমারে তুই একটা মরণ দে কৃষ্ণ। হতভাগী অনাথ; যার কেউ নাই অন্তত তুই তারে দয়া কর। যাবার আগে তোর চক্রখান দিয়া আমার মাথাটা নিয়া যা বন্ধু। যে শরীর নিজের পোলাগো সামনে উন্মুক্ত হয় সেই শরীর আর টানতে পারি না আমি। আমারে দয়া কর তুই। আমি রাজ্য চাই না; প্রতিশোধ চাই না। ঘেন্নার এই জীবন থাইকা আমি শুধু মুক্তি চাই। আমারে তুই হত্যা কর...

দ্রৌপদীর দরকার কান্নার অবাধ সুযোগ। হস্তিনাপুর ছাড়ার পর কারো লগে একটাও কথা কয় নাই সে। তবে দ্রৌপদী যে এই কয় দিন কারো লগে কথা কয় নাই তাতে কৃষ্ণের শান্তি লাগে। কথা কইলে সে সকলের আগে ভীমের লগেই কইত। কিন্তু যে কথাগুলান সে কৃষ্ণরে কইল সেই কথাগুলান যদি ভীমেরে কইত তবে যুধিষ্ঠিররে খুন কইরা হয়ত অতক্ষণে ভীম গিয়া খাড়াইত হস্তিনাপুর...

চিল্লাইতে চিল্লাইতে গলা ভাইঙ্গা দ্রৌপদী টায়ার্ড হইয়া পড়ে। জীবনে কিছুই যারে এক চুল নড়াইতে পারে না সেই কৃষ্ণেরও দম বন্ধ হইয়া আসে। এই সেই পাঞ্চালী; যার স্বয়ংবরায় নিজেও একজন প্রার্থী আছিল কৃষ্ণ। সেই পাঞ্চালী যার শিক্ষা সৌন্দর্য বংশ গৌরব আর আত্মসম্মান দেইখা জরাসন্ধের মতো রাজাও তারে করতে চাইছিল মহারানি। সেই পাঞ্চালী নিজের উপর ঘৃণায় ধিক্কারে আইজ কাতর হইয়া কৃষ্ণের কাছে মৃত্যু প্রার্থনা করে- জীবনে বহুত মানুষ মারছ তুমি বন্ধু যুদ্ধ হিংসা কিংবা রাগের কারণে; আইজ তুমি দয়া কইরা অন্তত একজন মানুষ মারো। আমি তোমারে মিনতি করি কৃষ্ণ; আমারে হত্যা করো তুমি...

কৃষ্ণ তার চক্রখান নাড়াচাড়া করে- সখী। যদি আসমানও ভাইঙ্গা পড়ে; যদি হিমালয়ও সাগরে ডোবে; তবু যারা তোমার অপমানের লাইগা দায়ী; হিসাব তাগোরে ফিরত পাইতেই হবে। কসম। এই কসম তোমার সখা কৃষ্ণের...

০৬

তোমার লাইগাই ভীমের আইজ না খাইয়া থাকতে হয়; এইটা তুমি বোঝো? তোমার মায় যেমন ফকিন্নি আছিল তেমনি তুমিও তো আছিলা ফকির। কিন্তু আমারে তো নিয়া আসছ রাজবাড়ি থাইকা। সেই তোমার লাইগা পাঞ্চাল রাজের মাইয়া আজ বনবাসী; এইটা তুমি বোঝো? তুমি নাকি ধর্ম বোঝো খুব? তয় জুয়া খেলার সময় তোমার ধর্মবুদ্ধি আছিল কই?

কৃষ্ণ চইলা যাওয়ার পর পাণ্ডবেরা চইলা আসে দ্বৈতবনে সরস্বতী নদীর কাছে। এর মাঝে দ্রৌপদী কিছুটা সামলাইয়াও নিছে। কিন্তু অন্যদের লগে স্বাভাবিক হইলেও যুধিষ্ঠিররে এখনো সহ্য হয় না তার- তুমি কোন মুখে নিজেরে ক্ষত্রিয় পরিচয় দেও? নকল ব্রাহ্মণের পোশাক পইরা দুয়ারে দুয়ারে গিয়া তোমার ভিক্ষা করাই ভালো। তাতে বাকিরা মুক্তিও যেমন পায় তেমনি ভীম গিয়া রাজ্যটাও উদ্ধার করতে পারে...

যুধিষ্ঠির যুক্তি বাদ দিয়া কয়- সকলই কপাল বিবি...

ভীম দ্রৌপদীরে থামাইতে আইসা উল্টা নিজেই খেইপা উঠে যুধিষ্ঠিরের উপর- বালছাল বুঝাইতে আসবা না তুমি। কপাল আর ধর্ম কপচাইয়া তুমি একটা হিজড়ায় পরিণত হইছ। তোমার ধর্মব্যাখ্যায় খালি শত্রুগোই লাভ। ওইটা ধর্ম না; ওইটা হইল নপুংসকের কুযুক্তি। তোমার তেরো বছর-টছর আমি বুঝি না। তেরো বছর পরে বাঁচব কি মরব তার কী গ্যারান্টি? আর বাঁচলেও বাঁচতে হইব বুড়া হাবড়া হইয়া লাঠি ভর দিয়া। এই কয় দিনেই যথেষ্ট হইছে। যা করা লাগে আমি একলাই করব। তোমার কিছু করা লাগব না। এখন চলো হস্তিনাপুর...

যুধিষ্ঠির ভীমরে বুঝাইতে চায় যে রাজসূয় যজ্ঞের সময় জোর কইরা যাগো কাছ থাইকা কর আনছিলাম তারা সবাই এখন দুর্যোধনের পক্ষে। জরাসন্ধের পক্ষের মানুষরাও এখন দুর্যোধনের লগে। বিষয়টা ভীম যত সোজা মনে করে তত সোজা না। কিন্তু ভীম তা মানতে নারাজ- সোজা হউক আর ব্যাঁকা হউক। যা করা লাগে আমিই কৃষ্ণের লগে মিলা করমু...

যুধিষ্ঠির এইবার গম্ভীর হইয়া যায়- হস্তিনাপুরের রাজসভায় তুমি যখন আমারে মারতে গেছিলা; তখন মাইরা ফালাইলেই ভালো করতা। তা হইলে এখন বড়ো ভাই হিসাবে পাণ্ডবগো সিদ্ধান্ত তুমিই নিতে পারতা। কিন্তু যখন তা করো নাই তখন আমারে না মাইরা তুমি সিদ্ধান্ত নিতে পারো না...

ভীম শান্ত হয় না। মাটিতে একটা লাত্থি দিয়া আবার গিয়া যুধিষ্ঠিররে জিগায়- আইচ্ছা। ধইরা নিলাম বারো বছর বনবাস আর এক বছর অজ্ঞাতবাসের পর তোমার ধর্মসম্মত উপায়ে আমরা রাজ্য ফিরা পামু। কিন্তু এমন কী নিশ্চয়তা আছে যে তুমি আবার জুয়ার দানে সব ভাসাইয়া দিবা না? পাশা খেলার কথা শুনলে তো তোমার আবার হুঁশবুদ্ধি থাকে না; কিন্তু খেলতে বসলে খেলো আমার ধোনটা...

ভীম পারলে আইজই হস্তিনাপুর গিয়া দুর্যোধনের লগে মারামারি করে। যুধিষ্ঠির যতই বোঝায় যে এই সব আলোচনা ঠিক না। বনবাসেও দুর্যোধনের চর আছে। কিন্তু ভীম রাগে গাছের ডালডুল ভাইঙ্গা রাগ সামলাইয়া আবার ফিরা আসে যুধিষ্ঠিরের কাছে- আইচ্ছা; পণ্ডিতরা তো কয় পুঁইশাকের বীজ হইল পুঁইশাকের প্রতীক। সেই হিসাবে মাসও তো বচ্ছরের প্রতীক। আমরা বনে আছি তেরো মাস হইল; তো একটা যুক্তি দিয়া তেরো মাসরে তেরো বছরের প্রতীক বানাইয়া এখন আমরা ফিরা যাইতে পারি না?

যুধিষ্ঠির কয়- না; তাতে পাপ হয়

- ধুত্তুরি তোমার বালের পাপ। পাপ ধুইয়া ফেলার লাইগা না কত কী ভংচং আছে? পাপ করার পরে সেই রকম একটা কিছু করলেই তো হয়। এইরকম ছোটখাটো পাপের প্রায়শ্চিত্তের লাইগা একটা বলদরে ঘাস খাওয়াইয়া খুশি করলেই তো যথেষ্ট। চলো যাই। গিয়া কই তেরো মাসেই আমাগো তেরো বচ্ছর পূর্ণ হইছে...

যুধিষ্ঠির এইবার খেইপা উঠে- ছাগিবাচ্চার লাহান ফালাফালি বন্ধ করো। গেলে তো যাওয়াই যায়। কিন্তু দুর্যোধন পর্যন্ত পৌঁছাইতে হইলে যে তোমার কর্ণের সামনে পড়া লাগব সেইটা খেয়াল আছে? তোমারে নাকি কেউ মাকুন্দা কইয়া গালি দিলে তুমি তারে মাইরা ফালাও? কর্ণ তো তোমারে ট্যারা পেটুক মাকুন্দা ছাড়া আর কোনো নামে কোনো দিনও ডাকে নাই? কই এক দিনও তো কর্ণের একটা বাল ছিঁড়তেও দেখলাম না তোমারে...

ভীম ধুম ধুম কইরা মাটিতে লাথি মারতে থাকে। এইটা তার সবচে দুর্বল জায়গা; তার ট্যারা চোখ আর দাড়িগোঁফবিহীন মুখ। সবাই জানে যে ভীমরে কেউ মাকুন্দা কইলে তার আর জীবিত থাকার কোনো অধিকার নাই। কিন্তু কর্ণ সব সময় প্রকাশ্যে তারে মাকুন্দা কইয়া ডাকলেও কর্ণরে কিছু করার সাহস তার কোনো দিনও হয় নাই। কথাটা সে আগে ভাবে নাই যে দুর্যোধনরে মারতে হইলে তারে কর্ণের সামনে পড়তে হবে; যে কর্ণরে কৃষ্ণও ডরায়...

আশপাশের গাছপালার উপর ভীম রাগ ঝাড়ে। অবস্থা খারাপের দিকে যাইতাছে দেইখা দ্রৌপদী ভীমেরে সরাইয়া নেয়। অর্জুন এই বিষয়ে নাক গলায় না। কিন্তু একটু পরেই গিয়া যুধিষ্ঠিরের সামনে খাড়ায়- খালি তো

বনবাস করলেই হবে না। আমাগো তো কিছু অস্ত্রশস্ত্রও জোগাড় করতে হবে। না হইলে যুদ্ধ করব কেমনে?

বাকিদের বনে রাইখা অস্ত্র সংগ্রহের নামে অর্জুন বাইর হইয়া যায়। দ্রৌপদী বোঝে তেরো মাসেই অর্জুন বনের জীবনে হাঁপাইয়া উঠছে; তাই একটা অজুহাত দিয়া বন থাইকা বাইরে যাবার উপায় বাইর করছে সে। দ্রৌপদী বেশি কিছু বলে না। খালি কয়- ভালো থাইকো আর দয়া কইরা শক্তিমান কারো লগে বাহাদুরি করতে যাইও না...

অর্জুন পিছলাইয়া যাবার পর ভীমেরে দৌড়ের উপরে রাখতে যুধিষ্ঠির আবার জায়গা বদলাইয়া কাম্যকবনে ফিরা আসে। এইখানে জঙ্গল টঙ্গল পরিষ্কার কইরা থাকার জায়গা করতে গিয়া ভীম কয় দিন চুপচাপ থাকে। কিন্তু তারপরে আবার সে অস্থির হইয়া উঠে। তবে এইবার চিল্লাচিল্লি লাফালাফি বাদ দিয়া বহুত মাথা খাটাইয়া এমন যুক্তি বাইর করছে যাতে যুধিষ্ঠিরের প্রতিজ্ঞাও থাকে আবার পাণ্ডবদেরও থাকতে হয় না বনে। সে ঠান্ডা মাথায় বিনীতভাবে যুধিষ্ঠিরের কাছে গিয়া কয়- ভাইজান। ক্ষত্রিয়ের কামই তো হইল রাজ্য শাসন; বনবাস না; কথাটা ঠিক কি না? তো এক কাম করি; আমরা অর্জুনরে ফিরাইয়া আইনা কৃষ্ণের লগে মিলা তেরো বছর হইবার আগেই হস্তিনাপুর আক্রমণ কইরা দুর্যোধনরে বিনাশ কইরা ফালাই। কিন্তু তাতে প্রতিজ্ঞাভঙ্গের লাইগা তোমার পাপ হইব; কথাটা আমি মানি। তো তেরো বছরের প্রতিজ্ঞা কইরা সময়ের আগেই হস্তিনাপুর যাওয়ার লাইগা যে পাপ হইব; সেইটা খণ্ডানের লাইগা রাজ্য জয়ের পর না হয় আবার আইসা তুমি একলা একলা বনবাস করবা। এতে রাজ্যও জয় হবে আবার তোমার পাপও খণ্ডাইব। বুদ্ধিটা ঠিক আছে না ভাইজান? আর এতেও যদি পাপ খণ্ডন না হয় তাইলে আমরা সকলে মিলাই না হয় পাপ খণ্ডনের লাইগা বামুন খাওয়াইয়া যজ্ঞ করব। ক্ষমতা থাকলে পাপমুক্ত হওয়া তো কঠিন কিছু না; তাই না ভাইজান?

যুধিষ্ঠির ভীমেরে বোঝায়- তোমার কথা শুনতে ধর্মের মতো শুনাইলেও এইটা কিন্তু চালাকি...

ভীম আইজ ধর্মের যুক্তি নিয়াই ধম্মপুত্তুরের লগে তর্ক করতে আসছে। একটায় যখন যুধিষ্ঠিররে পটানো গেলো না তখন সে আরেকটা বাইর করে। সে কয়- আইচ্ছা ভাইজান। ঠিকাছে। তুমি যখন কইছ যে এইটা চালাকি তখন আমি মাইনা নিতাছি। এইবার তাইলে তোমারে বেদ থাইকা একটা খাটি নিখুঁত ধর্মের ব্যাখ্যা দেই; তুমি তো জানোই যে বেদে কইছে দুঃখকষ্টের এক রাত্রিই সাধারণ এক বৎসরের সুমান হয়? সেই হিসাবে বনে-জঙ্গলে তো আমরা তো দুঃখকষ্টেই আছি। আর বেদের এই যুক্তিতে তেরো দিনেই তো আমাগো তেরো বছর পার হইয়া গেছে। তাই না? তাইলে আর দেরি কীসের? আমরা তো বেদ আর ধর্ম মাইনাই এখন ফিরা যাইতে পারি?

ভীমের কাছে যুধিষ্ঠিরের বেদ বুঝতে হবে এইটা ভাইবা তার দম আটকাইয়া যায়। যুধিষ্ঠির কিছু না কইয়া ছটফট করে। ভীম মনে করে যুধিষ্ঠিররে সে যথেষ্ট পরিমাণ বেদ বুঝাইতে পারছে। এইবার তার যুক্তিগুলারে আরো পাকাপোক্ত করার লাইগা কিছু রেফারেন্স দেওয়া দরকার। ভীম আরো স্থির হইয়া ঋত্বিক বামুনের মতো যুধিষ্ঠিরের সামনে আসন পাইতা বসে- আমি যা কইলাম তাতে যুদি তোমার কোনো সংশয় থাকে তবে তুমি ঠাকুরদা দ্বৈপায়ন কিংবা ভীষ্ম কিংবা জ্যাঠা শুকদেব কিংবা বিদুর কাকারে জিগাইয়া দেখতে পারো যে আমি বেদবিরুদ্ধ কিছু কইছি কি না...

যুধিষ্ঠির পুরা তাব্দা খাইয়া বইসা থাকে। একটাও কথা কয় না। ভীমের মনে হয় চাইর-চাইরজন বেদবিজ্ঞের রেফারেন্সসহ বেদের ব্যাখ্যা শুইনা যুধিষ্ঠিরের যেহেতু আর কিছু কওয়ার নাই তাই ধইরা নিতে হবে যে ভীমের

যুক্তিটা সে মাইনা নিছে। ভীম এইবার আসন ছাইড়া পাছার ধুলা ঝাইড়া মুচকি হাসি দিয়া যুধিষ্ঠিরের কাছে নিজের বেদবিদ্যার রহস্য পরিষ্কার করে- তুমি তো মনে করো আমি খালি খাই আর কিলাকিলি করি; কিন্তু বেদব্যাস দ্বৈপায়নের নাতি আমি; চতুর্বেদী ঋষি শুকদেবের ভাতিজা। সেই হিসাবে দুই-চাইর পাতা বেদ পড়া তো আমার কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে; তাই না?

যুধিষ্ঠির এখনো কিছু কয় না। ভীমের মনে হয় বেদের ব্যাখ্যা খণ্ডাইতে না পারলেও যুধিষ্ঠির মনে মনে দুঃখ পাইছে। তারে একটু সান্ত্বনা দেওয়া দরকার। সে গলায় দরদ মাখাইয়া যুধিষ্ঠিরের কান্ধে হাত রাখে- আরে ভাইজান; কষ্ট পাওয়ার কী আছে? গুণীজনরা তো কইয়াই দিছেন যে বাটপারের লগে বাটপারি করা কোনো পাপ না...

এইবার দপ কইরা যুধিষ্ঠিরের চোখ জ্বইলা উঠে। সাথে সাথে ভীম টের পায় একটা মারাত্মক ভুল কইরা ফালাইছে সে। সে এখন যে কথাটা কইছে সেইটা বেদেও নাই আবার কোনো বেদজ্ঞও কয় নাই। সে লগে লগে তার দোষ কাটায়- না না। এইটা কিন্তু বেদের কথা না। এই কথাটা আমি কৃষ্ণের কাছে শুনছি...

যুধিষ্ঠিরের জ্বইলা উঠা চোখ আবার ফ্যাকাশে হইয়া উঠে। ভীম মজা পায়। এই অবস্থায় যুধিষ্ঠিররে একটা খোঁচা না মরতে পারলে ভীমের কইলজা ঠান্ডা হয় কেমনে? সে একটু দূর গিয়া হাসে- ভাইজান। তুমি মূর্খ কইয়া আমার কথা ফালাইয়া দিলেও কৃষ্ণের কথা ফালানোর ক্ষমতা তো তোমার নাই...

ভীমের হাতে চটকনা খাওয়ার ডরে বড়ো ভাইদের কথাবার্তা না শোনার ভান কইরা মুখ ঘুরাইয়া হাসে নকুল সহদেব। দ্রৌপদী হাসব না কানব বুইঝা

উঠতে পারে না। ভীম যেভাবে দ্বৈপায়ন শুকদেবের রেফারেন্স দিয়া যুধিষ্ঠিররে বেদ আর ধর্ম শিক্ষা দিতাছে তা দেখার মতো একটা বিষয়। ভীম বোধ হয় আইজ সিদ্ধান্তই নিয়া ফালাইছে যে সাক্ষাৎ দ্বৈপায়নের মতো ঠান্ডা মাথায় যুধিষ্ঠিররে বেদের যুক্তি দিয়া হস্তিনাপুর ফিরত নিয়া যাবে। আইজ যুধিষ্ঠিরের ধৈর্যশক্তির পরীক্ষা হইতাছে না সে বেকুব বইনা গেছে সেইটা এখনো দ্রৌপদী ঠাহর করতে পারে নাই। দ্রৌপদী দূরে খাড়াইয়া ত্যাড়া চোখে ভীমের বেদ শিক্ষার ইস্কুলের দিকে নজর রাইখা গাছ লতা পাতা নাড়াচাড়া করে। যুধিষ্ঠির ঠাডাপড়া মানুষের মতো কাঠ হইয়া বইসা আছে। যুধিষ্ঠিররে যথেষ্ট পরিমাণ ধর্মশিক্ষা দিবার কৃতিত্ব জাহির করার লাইগা ভীম বারবার নকুল সহদেব আর দ্রৌপদীর চোখে পড়ার চেষ্টা করতাছে। কিন্তু নাটকের বাকি অংশ দেখার লোভে সকলেই মুখ ঘুরাইয়া কান খাড়া কইরা আছে দুই ভাইয়ের দিকে...

ভীমের লাইগা দুঃখ হয় দ্রৌপদীর। মানুষটা সরল-সোজা কিন্তু পরিবারের কোনো বিষয়ই বিন্দুমাত্র অবহেলা নাই তার। ধৃতরাষ্ট্রের পোলাগো লগে অন্য কোনো পাণ্ডবই প্রায় মারামারি করে নাই; যা করার করছে শুধু এই ভীম। ধৃতের পোলাদের একমাত্র শত্রুও এই ভীম। মানুষটা খায় একটু বেশি; কিন্তু বনবাসে আসার দিন ভীমেরে খাওনের খোঁটা দিয়া দুর্যোধন যেভাবে ভ্যাংচাইছে তা সহ্য হয় নাই দ্রৌপদীর। নিজের দুঃখ ভুইলাও সেদিন তার মনে হইছিল এই কামটা ভালো করল না দুর্যোধন...

ভীম হাঁটে ঝুঁইকা ঝুঁইকা; লম্বা লম্বা পা ফালাইয়া। মোটা মানুষ হওয়ায় হাঁটার সময় তার হাঁটু ভাঙ্গে কম। পুরা পা ফালাইয়াই সে ঝুঁইকা ঝুঁইকা হাঁটে। রাগের মাথায় যখন হাঁটে তখন তার হাঁটার ঝাঁকুনি আরো বাড়ে। হস্তিনাপুর ছাড়ার সময় পঞ্চপাণ্ডব আর দ্রৌপদী যখন হাঁটতে হাঁটতে আসছিল তখন দুর্যোধন আইসা ভীমের পাশাপাশি তারে ভ্যাংচাইয়া ঝুঁইকা ঝুঁইকা হাঁটা শুরু করে- হি হি হি...

দুর্যোধন ভীমেরে ভ্যাংচাইয়া হাঁটে আর হাসে- হি হি হি। ভাইরে। আমার পেটলা ভাই ভীম; তোর লাইগা দুঃখে আমার বুকটা ফাইটা যায়। কত মারামারি করলি দুইডা খাওনের লাইগা। কিন্তু তোর পেট থাকলেও কপাল নাই। নির্বোধ যুধির লাইগা তোর পেট ভইরা খাওনটাও গেলো। আমি জানি রে ভাই; রাজ্য থাকা না থাকায় তোর কিছু যায় আসে না; কিন্তু রাজ্যের লগে লগে যে তোর গামলা ভইরা খাওনের বন্দোবস্তও গেলো। আহারে...

দুর্যোধন কান্নার ভান কইরা ভীমের সামনে আইসা চোখ মোছে- আমার ভাইরে ভাই। পেটলা উপাসি ভাই আমার; আঁউ আঁউ আঁউ...

দ্রৌপদী ভীমের কাছাকাছি থাকে। ভীমের হাঁটার গতিই বইলা দেয় যেকোনো সময় সে সবকিছু ভুইলা দুর্যোধনরে মাইরা বসতে পারে। কিন্তু দুর্যোধনও যে ভীমের উপরে তার জীবনের সব রাগ আইজই মিটাইতে চায়। দুর্যোধন ভীমেরে ভ্যাংচাইয়া কান্দে- ভাইরে আমার ভীম ভাই। বনের লতাপাতা কচুঘেঁচু খাইয়া যুধিষ্ঠির ঠিকই ধর্ম করতে পারব; কিন্তু তোর এই গতরটা টিকব কেমনে রে ভাই? আহারে; তেরো বচ্ছর পর যখন তুই ফিরা আসবি তখন তো আর তোর এই তাকত থাকব না রে ভাই। আমার মাথায় গদা মারার বদলা ভর দিয়া হাঁটার লাইগা তোর হাতে থাকব একটা বাঁশের লাঠি। হি হি হি...

দুর্যোধন বারবার ভীমের পথ আগলায়। ভীম একটাও কথা না কইয়া ফুঁসতে ফুঁসতে দুর্যোধনরে এড়ায়। দুর্যোধন আবার দৌড়াইয়া গিয়া ভীমের কাছে খাড়ায়- আমি তোরে কথা দিলাম ভাই। তুই যেদিন ফিরা আসবি সেদিন তোরে আমি পেট ভইরা ঘিয়ে ভুনা মাংস খাওয়ামু। তোর লগে যতই শত্রুতা

থাউক; আমি আস্ত একখান ঘিয়ে ভুনা বলদের রান দিমু তোরে। তুই তো জানোসই যে আমি ডেলি ডেলি কতশত ফকির খাওয়াই; সেই ক্ষেত্রে তোরে একটা বলদের রান দিতে পারব না আমি? অবশ্যই দিমু। আরে তুই আমার পাণ্ডুকাকার পোলা না? আমার ভাই...। কিন্তু রে ভাই...

দুর্যোধন আবার ভীমের সামনে আইসা কান্দনের ভান কইরা চোখ মুছে- কিন্তু সেই দিন তো গরুর রান চাবানোর লাইগা তোর মুখে একটাও দাঁত থাকব না রে ভাই। তুই মাংস খাবি কেমনে? হি হি হি...। এখন দাঁত আছে কিন্তু খাওন নাই; খাওন যখন পাবি তখন থাকব না দাঁত। হি হি হি। ...আইচ্ছা যা; কথা যখন দিছি তখন তোরে যেমনেই পারি আমি মাংস খাওয়ামু। আমি নিজে মাংস চাবাইয়া থুক কইরা তোর পাতে ফালামু আর তুই সেই থুতু চাইটা সেদিন মাংসের স্বাদ নিবি? এইটাই হইব তোর উপযুক্ত আপ্যায়ন তাই না রে ভাই? ঝুটা ছাড়া তো তোর কপালে আর কিছু জুটার কথা না। হি হি হি...

অদ্ভুতভাবে ভীম একটাও কথা কয় না সেদিন। কিন্তু ভীমরে দেইখাই দ্রৌপদীর মনে হইছিল দুর্যোধন কামটা ভালা করতাছে না। সবাই সবকিছু ভুইলা গেলেও প্রতিশোধ ভোলে না ভীম। ভীমরে এই টিটকারি দিবার খেসারত দুর্যোধনরে এক দিন দিতেই হবে...

বনে আইসা ভীমের সত্যিই কষ্ট হইতাছে। এর লাইগা সে লাফালাফিও করে। কিন্তু আইজ যে সে বুদ্ধি কইরা যুধিষ্ঠিররে বেদ বুঝাইতে গেছে এইটা দেইখা দ্রৌপদী হাসি থামাইতে পারে না। ভীমের মুখে বেদবাণী শোনার ধৈর্য পরীক্ষায় বোধ হয় যুধিষ্ঠির পাশ কইরা ফালাইছে। সে বেশ শান্তশিষ্ট হইয়া চুপ মাইরা বইসা এখন ভীমের পেটে বেদের স্টক মাপতাছে। ভীমও এখন যুধিষ্ঠিরের লগে ধৈর্যের কম্পিটিশনে নামছে। অশেষ ধৈর্য নিয়া একেকটা কথা

ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বারবার বলতে বলতে ভীমের খেয়াল হইছে তার বেদের স্টক শেষ কিন্তু এখন পর্যন্ত যুধিষ্ঠির একটাও শব্দ বলে নাই। সে একটু ঘাবড়াইয়া গেলেও ধৈর্য হারায় না। বেদ ছাইড়া এইবার সে যুধিষ্ঠিররে কূটনীতি বুঝাইতে শুরু করে- ভাইজান। না হয় আমরা বারো বছর বনবাস করলাম। কিন্তু তারপরে তেরো নম্বর বছরে তো আমাগো লুকাইয়া থাকতে হবে। লুকাইতে না পারলে তো আবার আরো বারো বছরের লাইগা বনবাস। তো তুমি কি মনে করো যে তেরো নম্বর বছরে দুর্যোধনের চেলারা আমাগো খুঁইজা বাইর করব না? আমরা যেইখানেই যাই না কেন; সবখানে তার চর আছে; এইখানেও আছে। তার মানে আমরা কিন্তু জীবনেও হস্তিনাপুর ফিরা যাইতে পারব না...

ভীমের এইবারের কথায় মিনতির সুর। এইবার যুধিষ্ঠির মুখ খোলে- একবার যখন ধর্মমতে কইছি যে বারো বছর বনবাস আর এক বছর অজ্ঞাতবাস করব। তখন তেরো বচ্ছরের আগে আমারে তুমি কোনোভাবেই হস্তিনাপুর নিতে পারবা না। যত যাই ব্যাখ্যা দেও আমারে দিয়া কোনো অধর্ম করাইতে পারবা না তুমি...

বেদ শেষ। কূটনীতি শেষ। যুধিষ্ঠিরের সিদ্ধান্ত জানার লগে লগে ভীমের ধৈর্যও শেষ। এইবার এক লাফে ভীম তার নিজের চেহারা ধরে- ধর্ম কইরা কোন বালটা ছিঁড়বা তুমি? ধর্ম কইরা রাজ্য পাইলেও পাশা খেলার কথা শুনলে তো তোমার হুঁশবুদ্ধি কিছু থাকে না। তখন তো আবার বাজি ধইরা নিজের বিচি পর্যন্ত হারাইয়া বসবা তুমি...

০৭

রাজ্যনাশ হইবার পর পাণ্ডবগো রাজপুত্র পোলাপানরা বাপ-কাকারে বনে পাঠাইয়া এখন আদরে মাখনে আরামে থাকতাছে নিজেগো রাজা মহারাজা মামাদের ঘরে। আর যে জীবনে রাজবাড়িতে থাকেও নাই; খায়ও নাই কিংবা নিজেরে রাজপুত্র বইলা পরিচয়ও দেয় নাই; দুঃসময়ে ভীম তারেই সংবাদ দিলো বনে-বাদাড়ে বাপ-কাকা আর সৎমায়ের মালপত্র টানার কামে। সে ঘটোৎকচ; পাণ্ডব বংশের প্রথম সন্তান; ভীম আর হিড়িম্বার পোলা...

ভীমেরে সামলাইতে পারত দ্রৌপদী কিন্তু সে এখন ভীমের কোয়ালিশন হইয়া যুধিষ্ঠিরের অপজিশন। ভীমরে কিছুটা সামলাইতে পারত অর্জুন কিন্তু অস্ত্র জোগাড়ের নামে সে পলাইছে বনবাস ছেড়ে। এই অবস্থায় দৌড়ের উপ্রে না রাখলে ভীমেরে সামলানো কঠিন। তাই এক দিন ভবঘুরে মুনি লোমশরে পাইয়া তার নেতৃত্বে যুধিষ্ঠির তীর্থ যাত্রার একটা পরিকল্পনা বানাইয়া ফালায়। কিন্তু তীর্থযাত্রায় দরকারি মালপত্র বহন করব কেডায়...

ভীমের সংবাদ পাইয়া ঘটোৎকচ আইসাই যুধিষ্ঠিররে ঠেলায়- লও জ্যাঠা। তীর্থফির্ত বাদ দিয়া আমার ঘরে চলো। এই বয়সে তোমাগো বনে-বাদাড়ে ঘুইরা কাম নাই। সবাইরে নিয়া আমার লগে চলো...

যুধিষ্ঠির ঘটারে বোঝায়- তোর বাড়ি যাওয়া ঠিক হইব না বাজান। কারণ আমরা যে প্রতিজ্ঞা করছি বনবাসে থাকার। এখন তোর বাড়ি গেলে তো সেই প্রতিজ্ঞা থাকে না...

- হ। আমার বাড়ি গেলে তোমাগো প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গে কিন্তু বনবাসের প্রতিজ্ঞা কইরা যে অর্জুন কাকু বনের বাইরে গিয়া রাজা বাদশার বাড়িতে ঘি-মাখন খাইয়া দিন কাটায় তাতে প্রতিজ্ঞার কিছু হয় না?

যুধিষ্ঠির ঘটার কথার উত্তর দেয় না কিন্তু ধৌম্য আগাইয়া আসে- শোনো ঘটোৎকচ। বাপ-কাকা-জ্যাঠারে এমনভাবে কওয়া ঠিক না। তাগো বিষয় আশয় তাগোরেই দেখতে দাও...

ঘটোৎকচ পিটপিট কইরা ধৌম্যের দিকে তাকায়- অ্যারে...। পরখাউকি বামনা দেখি এইখানেও আছে। তুমি অত চিন্তা করো ক্যান? বাপ-কাকারে খাওয়াইতে পারলে তোমার খন্দকও ভরাইতে পারব আমি। এখন সইরা খাড়াও; আমি জ্যাঠার লগে কথা কই...

এই অপমানটা ধৌম্যের লাগে- এইভাবে কওয়া উচিত না ঘটা। আমি তোমার মুরব্বি মানুষ। তাছাড়া আমি সম্রাট যুধিষ্ঠিরের পুরোহিত...

- বালের পুরোহিত তুমি। সম্রাটের জুয়া খেলা ছাড়াইতে পারো নাই তো কোন বালটা ছিঁড়ছ তুমি পুরতগিরি কইরা?

এইবার ভীমের মনে হয় পোলারে থামান দরকার। সে জায়গায় খাড়াইয়া ঘটারে দাবড়ানি দেয়- থাপড়াইয়া কইলাম তোর কান ফাটাইয়া ফালামু। বেশি বক বক করছ তুই...

- হ আব্বা। কথাবার্তা একটু বেশিই কই। কিন্তু মায়ে কয় আমার এই দোষটা নাকি বাপের থাইকা পাওয়া...

ঠাঠা কইরা হাইসা উঠে যুধিষ্ঠির- হা হা হা। তোরে আমি কইছি না ভীম; যে তুই বেশি কথা কস? এইবার নিজের পোলার মুখে হুনলি তো?

দ্রৌপদী হাসে। যুধিষ্ঠিররে জীবনেও এমন হাসতে দেখে নাই সে। ঘটা আবার গিয়া যুধিষ্ঠিররে ধরে- ও জ্যাঠা তোমার চ্যালাচামুন্ডা যা আছে সব নিয়া চলো। তোমার বামনার লাইগাও আমার ঘরে ঘাসপাতার অভাব হইব না...

ধৌম্য চুপসাইয়া গেছে। ভীম ধৌম্যরে বাঁচাইতে আইসা পোলা আর ভাইয়ের ডবল টেক্কায় পুরাটাই বেকুব। এইবার দ্রৌপদী আগাইয়া আসে- এইভাবে কয় না বাপ। ব্রাহ্মণ মানুষ। মনে কষ্ট পাইলে অভিশাপ লাগব যে...

- যারে জন্ম দিয়া বাপে ফালাইয়া গেছে জঙ্গলে; সেই পোলারে তুমি ঠোলা বামনার অভিশাপের ডর দেখাও ছুডু মা? এখন আমিও ডাঙ্গর দুইটা পোলার বাপ। দশ বিশজন মানুষ নাইড়া খাই। কোনো হালার আশীর্বাদ ছাড়াই যখন অতটুকু আসতে পারছি তখন অভিশাপে ডরানের কী আছে? চলো বাইত যাই...

ঘটার এই খোঁচাটা সরাসরি ভীমের দিকে। ভীম চামে চামে কাটে। দ্রৌপদী তাকায় যুধিষ্ঠিরের দিকে। ঘটা দ্রৌপদীরে ছাইড়া আইসা খাড়ায় যুধিষ্ঠিরের সামনে- বুঝলা জ্যাঠা। তোমরা আশ্বিনে কাত্তিকে কয় দিন রাজা হইলেও জীবনের বেশির ভাগ কাটাইছ বনে-জঙ্গলে। তাই এই সবে তোমাগো অভ্যাস আছে। কিন্তু ছুডু মা তো খাঁটি রাজকইন্যা। তুমি তোমার সিংহাসন নিয়া যা ইচ্ছা করতে পারতা কিন্তু ছুডু মায়েরে বনে-জঙ্গলে আইনা কষ্ট দেওন কিন্তু ঠিক হয় নাই...

- কপালে না থাকলে কী আর করব রে বাপ?

- কপাল কইও না জ্যাঠা। তোমার খাইসলতের দোষ। তুমি নিজের বুদ্ধিতে কোনো বালও ছিঁড়তে পারো না। তোমারে রাজা বানাইছে কুন্তী আর সম্রাট বানাইছে কৃষ্ণ। তারপর যখনই তারা তোমারে একলা ছাইড়া দিছে তখনই তুমি করলা একটা আকাম...

- তোরে মাথার উপ্রে তুইলা কিন্তু একটা আছাড় দিমু ঘটা...

ভীম এইবার নাক গলায় যুধিষ্ঠিররে বাঁচাইতে। কিন্তু ঘটা নির্বিকার- তা দেও। কিন্তু তার আগে আমার যুক্তিটা খণ্ডাইতে পারলে ভাবতাম জীবনে পয়লাবারের মতো একটা বাপের কাম করলা...

- তুই কিন্তু সত্যি সত্যি এখন মাইর খাবি...

ভীম থাবা বাগাইয়া আসলে যুধিষ্ঠির থামায়- ওরে কইতে দে। বংশের বড়ো পোলা। বাপ চাচার পরে সেই হইব এই বংশের রাজা। সে তো বাপ-জ্যাঠার একটু সমালোচনা করতেই পারে...

- তোমার নিজের রাজ্য থাকলে না উত্তরাধিকার নিয়া ভাববা। নিজেই এখন জঙ্গলে বইসা বাল ফালাও আবার আরেকজনরে দেও সিংহাসনের ভাগ...

পোলারে সামলাইতে গিয়া ভীম নিজেই খেইপা উঠে যুধিষ্ঠিরের উপর। যুধিষ্ঠিরও একটু গরম হয় ভীমের উপর- পোলাপানের সামনে মুখ খারাপ করলে কিন্তু পোলার সামনেই তোরে আমি একটা চটকনা দিমু ভীম...

এইবার ঘটা নেয় মধ্যস্থের ভূমিকা- আহা জ্যাঠা। তুমিও দেখি রাগ করো। আসোলে যারা মারামারি করে তাগো মুখ একটু খারাপই হয়। ধরো গিয়া তুমি করো ধর্মকর্ম। তোমার যা ডাকাডাকি তা সব ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব কিংবা সর্বনিম্নে দ্বৈপায়ন। তুমি তো আর তাগো শালা বাইঞ্চুত কইয়া ডাকতে পারো না। কিন্তু অর্জুন কাকায় যখন কর্ণরে মারতে যাইব তখন যদি- খানকির পোলা কর্ণ তোরে আমি খাইয়া ফালামু কইয়া আওয়াজ না দেয় তো মাইরের জোশ পাইব কই?

- কর্ণ আমাগো শত্তুর হইলেও তারে মা তুইলা গালি দেওয়া কিন্তু ঠিক না ঘটা...

যুধিষ্ঠিরের কথায় ঘটোৎকচ হাসে- হ জ্যাঠা। তা অবশ্য ঠিক; কার গালি যে কার পিঠে লাগে কে জানে? তো যা কইতাছিলাম জ্যাঠা। তোমাগো খাইসলতের যেমন দোষ আছে; হিসাব-নিকাশেও কিন্তু ভুল আছে। ধরো আব্বায় ফালাইতাছে দুর্যোধন কাকুরে মারার লাইগা আর অর্জুন কাকা কাগুকৃষ্ণের লগে মিলা পিছলা পথ খুঁজতাছে কর্ণ জ্যাঠারে মারার...

- কর্ণ আবার তোর জ্যাঠা হয় কেমনে?

ভীমের ধামকিতে ঘটোৎকচ ত্যাড়া চোখে যুধিষ্ঠিররে সার্ভে কইরা আবার ভীমের দিকে ফিরে- শত্তুর হইলেও তিনি আমার মুরব্বি মানুষ আব্বা। নাম ধইরা ডাকলে তো আবার জ্যাঠায় আপত্তি করব। তাই তিনারেও জ্যাঠা কইলাম আরকি। তো যাই হোক তোমরা একজন ধৃতরাষ্ট্র আর গান্ধারীর পোলা দুর্যোধনরে মারতে চাও আর আরেকজন মারতে চাও সূর্যপুত্র; ঠিক না জ্যাঠা? কর্ণরে তো মাইনসে সূর্যপুত্রই কয়?

- হ। সে সূর্যপুত্র হিসাবেই পরিচিতি

- তার মায়ের নাম যেন কী জ্যাঠা?

ভীম আবার বাগড়া দেয়- ওর মায়ের নাম রাধা গাড়োয়ানি

ঘটোৎকচ আবার যুধিষ্ঠিরের দিকে তাকায়- কর্ণরে রাধার পোলা কইলে তো তারে আর সূর্যপুত্র কওয়া যাইব না। কইতে হইব অধিরথের পোলা। তাই না জ্যাঠা?

যুধিষ্ঠির এইবার একটু বিরক্ত হয়- এইটা নিয়া পরে তোর লগে কথা কমু আমি। যা কইতেছিল তা ক। কারো বাপ-মায়ের নাম দরকার নাই। নাম কইলেই ওগোরে সবাই চিনে...

- হ। কথা হইল তোমরা মারতে চাও দুর্যোধন আর কর্ণরে। কিন্তু হিসাব কইরা কি দেখছ যে কার ঘাড়ে পা দিয়া মাখনটা কার ঘটি থাইকা খাইতাছে কে?

- তুইই ক...

যুধিষ্ঠিরের কথায় ঘটা আগে বাড়ে- আসোল মাখনটা কিন্তু খাইতাছে ভরদ্বাজের বাটপার পোলা; যারে তোমরা গুরু দ্রোণাচার্য কইয়া নম নম করো...

- এমন কইরা কয় না বাপ। তিনি কিন্তু আমাগো গুরু আর বহু বড়ো সাধক

- ল্যাওড়ার সাধক। আর তোমাগো গুরু হইলে আমার কী? চোররে চোর কইতে অসুবিধা কই? ওই চোট্টা হালায় কিন্তু একটা বাটপার আর মিচকা শয়তান। পানি না ছুঁইয়া খলুইতে মাছ তোলে। চিন্তা কইরা দেখো তো তোমাগো যে কুরু পাণ্ডব কর্ণে অত মারামারি; সেই কুরু পাণ্ডব কর্ণরে সে কিন্তু গুরুদক্ষিণা নিবার নামে এক কইরা ফালাইছিল ছুডু মায়ের বাপ দ্রুপদের রাজ্য কাইড়া নিবার সময়। তোমরা কিন্তু কুরু পাণ্ডব কর্ণ একলগে যুদ্ধ কইরা ঠিকই দ্রুপদের অর্ধেক রাজ্য কাইড়া নিয়া দিছিলা তারে। আবার দেখো সেই কুরু পাণ্ডবে পাশা খেইলা তোমরা যে রাজ্যটা হারাইলা; সেই রাজ্যের রাজা কিন্তু এখন শকুনিও না; দুর্যোধনও না- কর্ণও না। তোমাগো ইন্দ্রপ্রস্থ রাজ্যের রাজাও কিন্তু এখন তোমাগো সেই গুরু দ্রোণচোট্টা...

ভীম হা কইরা পোলার মুখের দিকে তাকায়- তুই অত হিসাব শিখলি কেমনে?

- আব্বা। আমি তো আর তোমার কোলে চইড়া বড়ো হই নাই। বড়ো হইছি একলা একলা মাইনসের লাত্থিগুঁতা খাইয়া। হিসাবে ভুল করলে তো অত বড়ো হইয়া দুই পোলার বাপ হইতে পারতাম না...

পোলার খোঁচায় যতটা না আঘাত পায় তার থাইকা পোলার বুদ্ধিতে বেশি খুশি হয় ভীম। সে আগাইয়া আইসা আসন গাইড়া বসে- আমিও তো কই হালায় লোভী বামুন। না হইলে বামুন হইয়া অস্ত্র চালায় ক্যান?

- হিসাব আরো আছে আব্বা; সেইটা হইল ক্ষতির হিসাব। ক্ষতিটা কার বেশি হইছে জানো? বেশি হইছে ছুডু মায়ের। তোমরা আসোলে কেউই কোনো দিন রাজপুত্র আছিলা না; আছিলা কুন্তীপুত্র। মাঝখানে কিছু দিন রাজবাড়িতে ছিলা এর বেশি কিছু না। কিন্তু ছুডু মায়ে জন্মের পয়লা দিন থাইকাই রাজকইন্যা। বিবাহের পর সে হইছে রাজরানি। এখন সেই ছুডু মায়ের বাপের রাজ্যও নিছে দ্রোণ আবার তার স্বামীগো রাজ্যও ভোগ করতাছে দ্রোণ আর এখন তারেই ঘুইরা বেড়াইতে হইতাছে বনে-বাদাড়ে। আর লাঞ্ছন যা হইবার সেইটাও তো হইছে ছুডু মায়ের একলাই...

দ্রৌপদী দৌড়াইয়া আসে। তার লাঞ্ছনার হিসাব দিতে গিয়া এখন আবার ঘটা কাহিনি বয়ান করুক তা চায় না সে। দ্রৌপদী দ্রুত আইসা কথা আগলায়- খালি গপ্প করলে হইব? আয় আগে কিছু খাওয়া-দাওয়া কইরা নে...

লাফ দিয়া উঠে ঘটা- আরে। আমি তো ভুইলাই গেছিলাম। তোমাগো লাইগা কিছু খাওন নিয়া আসছি আমি। আব্বা আসো। তোমার লাইগা আস্ত একটা গরু মাইরা ঘিয়ে ভুনা কইরা আনছি; তোমার পোলার বৌ নিজের হাতে রান্না করছে...

- তোর বৌয়ের হাতের রান্না আমি খামু না...

- ক্যান? সে আবার কী করল?

ভীম উইঠা যায়- খাই বেশি বইলা আমারে কি তুই ভুক্ষাসি পাইছস যে যার তার হাতের রান্না খামু?

ঘটা এইবার মেরুদণ্ড সোজা কইরা ভীমের সামনে গিয়া খাড়ায়- আমার বৌয়ের জাত নিয়া কথা কবা না কলাম আব্বা। তোমার সাক্ষাৎ দাদা দ্বৈপায়ন আছিল নমশূদ্র মাইমল বেটির পুত আর তোমার নিজের বাপ তো বাতাস; ধরাও যায় না ছুঁয়াও যায় না; দেখার তো প্রশ্নই নাই; পবন। আমারে জাত দেখাইও না তুমি...

- জাতের গুষ্টি মারি আমি। কিন্তু তোর বৌয়ের হাতের রান্না আমি খামু না...

ভীম সইরা যায়। ঘটা গিয়া আবার তার সামনে খাড়ায়- ক্যান? খাবা না ক্যান?

- খামু ক্যান? তুই যে বিয়া করছস আমারে কইছিলি?

ঘটোৎকচ এইবার ভীমেরে ভালো কইরা দেইখা আস্তে আস্তে গিয়া দ্রৌপদীর সামনে খাড়ায়- তুমি কও তো ছুডু মা; আব্বারে গিয়া কি আমার কওয়া উচিত আছিল যে; আব্বাজান আপনার পোলার বিবাহে আপনার নিমন্ত্রণ? নাকি তারই গিয়া মাইনসেরে কওয়া দরকার ছিল যে; আমার পরথম পোলার বিবাহে আপনাগো নিমন্ত্রণ? তুমি একটু ন্যায্য বিচার করো তো ছুডু মা; কামলা খাটার দরকার না পড়লে যে বাপে একবার সংবাদও নেয় না পোলায় বাঁইচা আছে কি মরছে; আমি বিয়া করার সময় সেই বাপের পারমিশন না নেওয়া কি খুব অন্যায় হইছে আমার?

দ্রৌপদী এই প্রশ্নের উত্তর খুঁইজা পায় না। ভীম আঙ্গুল দিয়া মাটি খামচায়। যুধিষ্ঠির ঘটার দিকে আগাইয়া আসে- মনে কষ্ট নিস না বাপ। দোষ আমারই বেশি। পরিবারের মুরুব্বি হিসাবে আমারই কর্তব্য আছিল নিজে খাড়াইয়া তোর বিবাহ তদারকি করা। কিন্তু পারি নাই; সেইটা খালি তোর বাপের না; আমাগো সবারই অন্যায় হইছে মানি...

যুধিষ্ঠিরের কথার সূত্র ধইরা ভীম এইবার গলা খাঁকারি দেয়- হ। অন্যায় হইছে আমিও মানি। কিন্তু তুই তো একবারের লাইগা তোর বৌটারে দেখাইলিও না। অথচ তুই বৌ নিয়া হস্তিনাপুর গিয়া মায়ের লগে দেখা করস আমি সংবাদ পাই...

যুধিষ্ঠির কথা কাটে- বৌমার লগে কিন্তু আমার দেখা হইছে ভীম। আমি কিন্তু তারে আশীর্বাদও করছি। বৌটা খুবই লক্ষ্মী; দাদি সত্যবতীর লগে তার ব্যবহারে খুব মিল...

- হ জ্যাঠা। তুমি যে তারে আশীর্বাদ করছ তাতে অহিলা খুবই খুশি হইছে। তোমার লাইগা সে আলাদা কইরা পায়েস রাইন্ধা পাঠাইছে। কইছে- জ্যাঠারে নিয়া দিও; জ্যাঠায় মিঠা জিনিস খুব পছন্দ করে...

ঝেংটি মাইরা এইবার ভীম সইরা যায়- তাইলে তোর জ্যাঠারেই মাংসগুলান খাওয়া। আমি খামু ক্যান? আমারে কি বৌ দেখাইছস?

দ্রৌপদী মিটিমিটি হাসে। যুধিষ্ঠির আস্তে গিয়া ভীমের কান্ধে হাত রাখে- তোরে না কইছি সবখানে লাফাবি না? পোলার খোঁজ নিস নাই জীবনেও একবার। এতে পোলার মনে দুঃখু থাকতেই পারে। হের লাইগা পোলায় হস্তিনাপুর গিয়া দাদির লগে দেখা করছে কিন্তু অভিমান থাইকা ইন্দ্রপ্রস্থ গিয়া বাপ-কাকারে

বৌ দেখায় নাই। সেইটা সে করতেই পারে। এইটা নিয়া তর্ক করলে তুই কিন্তু বেকায়দায় পইড়া যাবি...

- কিন্তু তোমারে তো দেখাইছে...

ঘটা কিছু কইতে গেলে যুধিষ্ঠির হাত তুইলা থামাইয়া হাসে- তোর পোলায় আমারেও বৌ দেখায় নাইরে বেকুব। সে বৌ-পোলা নিয়া মায়ের কাছে গেছে শুইনা আমিই গেছিলাম তাগোরে দেখতে...

ভীম আরো কিছু কইতে গিয়া যুধিষ্ঠিরের চোখে চোখে তাকাইয়া ঘটনাটা বোঝে। সাথে সাথে এই প্রসঙ্গ ছাইড়া সে অন্য প্রসঙ্গে মোড় ঘোরায়- হ হ। সেইটা তো আমিও করছি। ওর বড়ো পোলা অঞ্জনরে আমি কিন্তু ছুডু একটা গদাও উপহার দিছি...

- হ আব্বা তা দিছ। কারণ নাতিরে খাতির না করলে দরকারে-অদরকারে তোমার পাশে লাঠি নিয়া খাড়াইব কেডায়?

যুধিষ্ঠির ঘটারে থামাইয়া দেয়- যা হইবার হইছে। কই খানা বাইর কইরা তোর আব্বারে খাইতে দে। ঘিয়ে ভুনা মাংস সে খুব পছন্দ করে...

কুন্তী ছাড়া কারো সামনে যুধিষ্ঠির আর ভীমরে এমন বিলাই হইতে দেখে নাই দ্রৌপদী। সে ঘটারে জিগায়- তুই এত কথা জানস তা তো জানতাম না। তোরে তো ইন্দ্রপ্রস্থেও দেখছি। কিন্তু তোর মুখে তো এত কথা শুনি নাই...

- কথা কেমনে শুনবা? এখন তোমরা জঙ্গলে আছ তাই তোমাগোরে পরিবারের মানুষ মনে হইতাছে। ইন্দ্রপ্রস্থে তো তোমরা আছিলা রাজা-মহারাজা। তোমাগোর লগে কথা কওয়া তো দূরের কথা; কাছে যাইতেই ডর লাগত। কত কাম তোমাগো। আমার মতো জংলি পোলার দিকে তাকানোর

কি সময় আছিল কারো? আমার তো আর মণিমুক্তার হার নাই; মাথায় মুকুটও নাই...

যুধিষ্ঠির আবার থামায়- রাগ করিস না বাপ। বুঝসই তো রাজনীতিতে অনেক মাইনসেরে সময় দেওয়া লাগে। অনেক কাম...

- কী রাজনীতি তোমরা করতা সেইটা তো দেখতেই পাইতাছি; বিচি পর্যন্ত জুয়ার দানে বন্ধক দিয়া এখন বনে আইসা আঙ্গুল চোষো...

যুধিষ্ঠির কথাটা গায়ে মাখে না- যতবারই গেছস আমি কিন্তু তোর সংবাদ নিছি। আমারে তুই দোষ দিবার পারস না...

- তোমারে দোষ দেই না জ্যাঠা। তুমি আমারে খাতির করতা সত্য। কিন্তু জীবনে একবার মাত্র মায়েরে নিয়া গেলাম তোমার রাজসূয় যজ্ঞে। তাও যাইচা যাই নাই; গেছিলাম তোমার আর দাদির নিমন্ত্রণ পাইয়া। কিন্তু তোমার তিন পয়সার দারোয়ান আমারে দরজায় আটকাইয়া দিলো- কয় জংলিফংলির রাজবাড়িতে ঢুকার পারমিশন নাই...

সেদিন হিড়িম্বার লগে আছিল ঘটোৎকচ আর তার মায়াযুদ্ধের সম্পূর্ণ বাহিনী। তারা জানে সম্রাট যুধিষ্ঠিরের সিংহাসনের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী এই ঘটা। ঘটার লগে ঢোল-নাকাড়া বাজাইয়া ভবিষ্যৎ সম্রাটের লগে যখন তারা আইসা খাড়াইল দরজায় তখনই ঘটল এই ঘটনা- জংলিদের ভিতরে যাওয়া নিষেধ...

বলতে দেরি কিন্তু চোক্ষের পলকে দারোয়ানের চিত হইয়া পড়তে দেরি হয় নাই। পাশ থাইকা কেউ একটা আওয়াজ দিলো- ভাঙ...

সঙ্গে সঙ্গে হিড়িম্বা দৌড়াইয়া আসে- ঘটা এইগুলারে থামা। আমরা আসছি তোর দাদির নিমন্ত্রণে...

বহুত কষ্টে ঘটা তার বাহিনী থামায়। ঘটার যেখানে অপমান সেইখানে যজ্ঞের অধিকার কারো নাই। মায়াযুদ্ধের কাহিনি শুনছে অনেকেই। কিন্তু চোক্ষের পলকে এক পাল মায়াযোদ্ধার খেইপা উঠা দেখে ঘাবড়ে যায় দারোয়ান দল। নিজের দলেরে সামলাইয়া ঘটা গিয়া বড়ো দারোয়ানের সামনে খাড়ায়- যুধিষ্ঠিররে গিয়া কও; হিড়িম্বার পোলা ঘটোৎকচ আসছে। তার সংবাদ পাওয়া পর্যন্ত আমি এইখানে শান্ত হইয়া খাড়ামু। যা করার করব সংবাদ পাওয়ার পর...

সকল রথী-মহারথী রাজা-মহারাজা থুইয়া যুধিষ্ঠির দৌড়াইয়া আইসা জড়াইয়া ধরে ঘটারে- রাগ করিস না বাজান। তোরে চিনতে পারে নাই...

যুধিষ্ঠির হিড়িম্বার কাছে গিয়াও জোড় হাত করে- রাগ কইরো না বইন..

হিড়িম্বারে নারীমহলে পাঠাইয়া যুধিষ্ঠির ঘটারে নিজের পাশে বসাইয়া ঘোষণা দেয়- এই পোলা হইল ভীম আর হিড়িম্বার ছেলে ঘটোৎকচ; আমাগো বংশের জ্যেষ্ঠ সন্তান। আপনেরা সকলে তারে আশীর্বাদ করেন...

যুধিষ্ঠির ঘটার কান্ধে হাত রাখে- সেই দিন দারোয়ানটা তোরে চিনতে পারে নাই বাজান। আসোলে আমরা ভাইগোই দায়িত্ব আছিল দরজায় খাড়াইয়া অতিথিগো চিনা বাড়ির ভিতরে নিয়া যাওয়া। কিন্তু কী কারণে যে সেই সময় আমাগো কেউই দরজার সামনে আছিল না; সেই সুযোগে দারোয়ানটা তোর লগে বেয়াদবি কইরা ফালাইছে। কিন্তু পরে তো সকলের সামনে বুক

ফুলাইয়াই আমি তোরে পরিচয় করাইয়া দিছি পাণ্ডব বংশের জ্যেষ্ঠ সন্তান কইয়া...

- হ। জ্যাঠা। তুমি তা করছ। সমবেত সকলের সামনে ঘোষণাও দিছ যে বংশের বড়ো পোলা হিসাবে জ্যাঠা বাপ-কাকার পরে সিংহাসনের উত্তরাধিকারও আমি। তোমার উপরে কোনো রাগ নাই জ্যাঠা। যার যা পাওনা তা দিতে তুমি কোনো দিন কিপটামি করো না। কিন্তু মায়েরে যে অন্দরে পাঠাইয়া দিলা; সেইখানে তোমাগো বৌরা কী ব্যবহারটা করল মায়ের লগে সেইটা খেয়াল আছে তোমার?

পাণ্ডবগো মোট নয় বৌয়ের লাইগা নয়খান আসন সাজাইয়া রাখা ছিল অন্দরের ভিতর। হিড়িম্বারে নিয়া কুন্তী বংশের বড়ো বৌ হিসাবে হাতে ধইরা বসায় মধ্যের আসনে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার দিয়া উঠে দ্রৌপদী- জংলি রাক্ষুসীরে ঘরের ভিত্রে আসতে দিছে কেডা?

পাণ্ডবগো বাকি বৌরাও দ্রৌপদীর লগে তাল মিলায়। কুন্তী যখন দৌড়াইয়া যায় দ্রৌপদীরে থামাইতে তখন দাদি কুন্তীর লগে দেখা করার লাইগা ঘটোৎকচও গিয়া হাজির হইছে অন্দরমহলের দরজায়। ঘটা কয়েক মিনিট থ মাইরা বুইঝা ফালায় ঘটনা; হিড়িম্বারে কেউই পাণ্ডবগো অন্য বৌদের লগে বসতে দিতে রাজি না...

এক লাফে ঘটা গিয়া খাড়ায় সকলের মাঝখানে- আমার মা এই বংশের বড়ো বৌ। সকলের মাঝখানেই হইব তার আসন...

- এই তুই কেডা? জংলি রাক্ষুসী ভীমের লগে পেট লাগাইয়া তোরে বিয়াইছিল দেইখা তুইও নিজেরে পাণ্ডব মনে করস নাকি?

- খবরদার। আমার মায়ের নামে বাজে কথা কবা না কেউ...

- আ-রে-রে। রাক্ষুসী সতিনের পোলা দেখি রাজপুত্রের মতো গরম দেখায়...

- মুখ সামলাইয়া কথা কবা। আমার মায়ে তোগো সতিন হয় নাই। তোরাই সতিন হইছস আমার মায়ের। তোরাই আমার বাপ-কাকা-জ্যাঠারে রাজা-বাদশা দেইখা পেট লাগাইতে আসছস। আমার মায়ে যখন বাপেরে বিয়া করে তখন ভালোবাইসাই রাস্তার এক ফকিররে বিয়া করছিল...

- ফকিররে বিয়া কইরা জন্ম দিছে তোর মতো ফকিন্নির পুত। তাতে হৈছেটা কী?

ঘটা খাড়াইয়া থাকে ভীমের মতো- তোরা হইলি পাণ্ডবগো দাসীবান্দি। দাসীবান্দিগো কাছে নিজের পরিচয় নিয়া আলাপ করার দরকার মনে করি না আমি...

কুন্তী দৌড়াইয়া আইসা ঘটারে জড়াইয়া ধরে- দাদা ভাই থাম। তোরে আমি কিরা দেই পাগলামি করিস না। এরা সবাই তোর কাকি জেঠি। তোর সম্মানের মানুষ...

ঘটা থামে। কিন্তু খুব ধীরে কুন্তীরে জানাইয়া দেয়- তোমারে একটা কথা কইয়া দেই দাদি। আমার মায়েরে কেউ অসম্মান করলে কে বাপের বৌ আর কে জ্যাঠার বৌ তা কিন্তু দেখব না। চুলের মুঠা ধইরা আছড়াইয়া কইলাম মাইরা ফালামু সব বান্দিগুলারে...

কুন্তী যখন ঘটারে থামাইতে ব্যস্ত তখন এক ভয়ংকর হুমকি উইঠা আসে দ্রৌপদীর মুখে- তোরে আমি কর্ণ দিয়া খুন করামু কইলাম সতিনের পুত...

০৮

হারামজাদি কুন্তীবুড়ি তার পোলাগো রাজা বানানের লাইগা ঠকাইছে আমার মায়েরে। সিংহাসনের লোভে এক দিন বয়সী আমারে জঙ্গলে ফালাইয়া থুইয়া নিজের পোলারে নিয়া পলাইছে বুড়ি। হইলনি রাজা? পাইলিনি সিংহাসন? দেখ তোর রাজপুত্তুরেরা এখন ফকিরের মতো গাছের ছালবাকলা পইরা রাস্তায় ঘোরে আর পাঁচটা পোলা থুইয়া তোর নিজেরে খাইতে হয় পরের ঘরে ভিক্ষার ভাত...

রাগে মাটিতে লাত্থি মারতে মারতে যুধিষ্ঠিরের সামনে ফিরা আসে ঘটা- খালি বুড়ি হাবড়ি দাদির লাইগা সেই দিন কিছু করতে পারলাম না জ্যাঠা। বুড়ি আমার গলা জড়াইয়া কয়- তুই আমার পয়লা নাতি। আমি তোরে মিনতি করি তুই থাম...

কুন্তীবুড়িটা সত্যই একটা হতভাগী জ্যাঠা। তার লাইগা মায়া হয়। বিয়া কইরা পাইল নামর্দ স্বামী। তারপর বারো বেটার লগে পেট লাগাইয়া তারেই আবার রক্ষা করতে হইল স্বামীর সংসার। তারপর পাঁচটা বলদা পোলারে একলা একলাই বানাইল রাজা। কিন্তু অত কিছুর পরেও বুড়া বয়সে আবার তারে গিয়া পরের ভাত খাইয়া বাঁইচা থাকতে হয়...

যুধিষ্ঠির আইসা ঘটার হাত জোড় কইরা ধরে- তোর মায়েরে কইস আমারে মাপ কইরা দিতে। তার উপরে বহুত অবিচার করছি আমরা...

দ্রৌপদী সইরা যায়। সেদিন হিড়িম্বারে অপমানটা তার হাতেই শুরু হইছিল। যুধিষ্ঠির কথা ঘুরায়- তুই না কইছিলি বৌমা আমার লাইগা পায়েস রাইন্ধা পাঠাইছে? কই দে খাই...

ঘটা খাওনের বোঁচকা খুলতে গিয়া দেখে পোঁটলা খুইলা পায়েসের পাতিল পাশে রাইখা গপাগপ কইরা মাংস খাইতাছে ভীম। সে ভীমের দিকে তাকায়- কই আব্বা? একটু আগে না কইলা আমার বৌয়ের রান্না খাইবা না? এখন তো দেখি চামে চামে অর্ধেকটাই শেষ কইরা ফালাইছ...

যুধিষ্ঠির হাসে- খাইব না মানে? খাওনের কথা শুইনা তোর বাপ দুর্যোধনের দেওয়া বিষ পর্যন্ত খাইয়া ফালাইছিল ছোটবেলা। আর এইটা তো পোলার বৌয়ের রান্না...

ভীম তাকায় না। খাইতেই খাইতেই আওয়াজ দেয়- ভালোমন্দ পাইলে দুইটা খাই। হের লাইগা খোঁটা দেওয়া কিন্তু ঠিক না...

- খাইবা না ক্যান? খাও। কিন্তু পোলার বৌয়ের রান্না খাইয়া তো একটু কইতে হয় ভালো কি মন্দ হইছে...

ভীম মুখে মাংস নিয়া চাবাইতে থাকে- তুই আমার পোলা হইয়া কথা কস তোর জ্যাঠার মতো। খাওনের ধরন দেইখা বুঝস না ব্যাটা রান্না কেমন হইছে?

- কিন্তু বাকি দুই কাকা তো বইসা বইসা ভাবতাছে বাপের সতিলা ভাই বইলা আমি তাগোর লাইগা কিছু আনি নাই। কই কাকুরা আসো খাইতে বসো। খাওয়া-দাওয়া কইরা রওনা দেই...

- কই যাবি?

- কই যাব মানে? কইলাম না তোমাগো আমার বাড়ি নিয়া যামু?

ঘটা কাকাদের খাবার তুইলা দিতে দিতে ভীমের দিকে তাকায়- তা আব্বা কইলা না তো রান্না কেমন হইছে?

- ভালৈছে...

- অ্যাহ। খাইতাছে কনুই পর্যন্ত চাইটা আর কওয়ার সময় চিমটি দিয়া কয় ভালৈছে। কইলে কী হয় যে আমার বৌয়ের রান্না তোমার মা আর বৌয়ের রান্না থাইকা ভালা...

- তুই থাম তো ঘটা। মানুষটা খাইতাছে খাইতে দে...

সহদেবের কথায় ঘটোৎকচ হাসে- অহিলাবতী কয় কী জানো কাকু? কয় ভিত্রের কথা কইয়া ফালাইলে কৃষ্ণের মতো ভিত্রে আর কোনো বিষ নিয়া ঘুরতে হয় না...

- কৃষ্ণের ভিত্রে বিষ?

- হ বিষই তো। হালার বাইরে থাইকা ভিত্রে বেশি কালা...

- কৃষ্ণের বদনাম করলে তোর জ্যাঠায় কিন্তু থাবড়াইব তোরে...

- থাবড়াইব। কিন্তু শিশুপালের মতো মাইরা তো ফালাইব না। হের লাইগাই তো তার সামনে গিয়া বদনাম করি না

- তুই তাইলে কৃষ্ণরে ডরাস?

- বিষাক্ত সাপ কেডায় না ডরায়?

এইবার যুধিষ্ঠির কথা ধরে- ক্যান? কৃষ্ণরে তুই ডরাস ক্যান?

- ডরাই ক্যান সেইটা তুমিও জানো জ্যাঠা। হালায় তো সামনে দিয়া মারে না। মারে পিছন থাইকা। একবার আমার লগে তার দেখা হইছিল আমার এলাকায়। আমার বাড়িত গিয়া আমার অস্ত্রপাতি আর প্র্যাকটিস দেইখা সে কয়- ভাতিজা তুই তো আমার সুমান বীর হইছস। এই কথা শুইনা কিন্তু আমি ডর খাইলাম। কারণ কৃষ্ণ কাউরে তার সমান কিংবা তার থাইকা বড়ো বীর কওয়া মানে তার খবর আছে। আমি কইলাম- কাগু। বড়ো হই আর ছুডু হই। ভাতিজা হিসাবে তোমার কাছে আমার একটা মিনতি; তুমি যদি আমারে মারতে চাও তো সামনে দিয়া মাইরো। তাইলে আমিও একটা ফাইট দিবার সুযোগ পামু। দয়া কইরা পিছন দিয়া মাইরো না আর মন্ত্রপড়া কুত্তা লেলাইয়া দিও না...

- কুত্তা লেলানো কী রে?

নকুলের প্রশ্নে ঘটা তাকায়- বুঝলা না? কৃষ্ণের কিছু চ্যালা আছে না; যারা কৃষ্ণ যা কয় তারেই বেদ বইলা মানে? এই যেমন ধরো আমাগো অর্জুন কাকু বা সাত্যকি। কৃষ্ণ যদি কয়- তুই ঘটার বুকে তির মার; তাইলে কিন্তু অর্জুন কাকু এক মুহূর্তও চিন্তা না কইরা আমার বুকে তির বিন্ধাইয়া গিয়া কৃষ্ণরে জিগাইব- হে জনার্দন। তুমি কেন মোরে মোর ভ্রাতুষ্পুত্রের বুকে তির বিন্ধাইতে কহিলা? তখন কৃষ্ণের রেডি উত্তর তো আছেই- তোর ভাতিজা হইলেও সে আগের জন্মে আছিল রাক্ষস। এর লাইগা তোরে কইছি তারে মাইরা ফালাইতে। এতে তোর পুণ্য হইছে। ...হা হা হা। সে তো আবার হগগলের পূর্ব জন্মের কাহিনি জানে। যারা তার শত্রু তারাই হয় পূর্বজন্মের রাক্ষস আর তার দোস্তরা সব দেবতা; অর্জুন কাকুর পূর্ব জন্ম নিয়াও একখান দেবতা কাহিনি বানাইছে না সে?

হঠাৎ ঘটার খেয়াল হয় সবাই খাইতাছে কিন্তু দ্রৌপদী নাই। ছুডু মা কই গেলা কইয়া ডাক পাড়তে দ্রৌপদী আইসা খাড়ায়...

- আরে তুমি খাইতাছ না ক্যান? কইলাম না এইগুলা তোমার সতিনের তৈয়ারি না। এইগুলা বানাইছে তোমার পোলার বৌ। আসো খাও...

- তোর বৌ তোর বাপ-কাকার লাইগা রান্না কইরা পাঠাইছে। পাণ্ডবগো দাসীবান্দির ওইগুলা খাওয়ার কী কাম?

ঘটা এইবার হা কইরা একবার যুধিষ্ঠির একবার দ্রৌপদী আর একবার নকুল সহদেবের দিকে তাকায়। কী বলবে সে খুঁইজা পায় না। মাংস চাবাইতে চাবাইতে ভীম আস্তে আওয়াজ দেয়- মায়েরে কষ্ট দিছস। মাপ চা হারামজাদা। নাইলে কিন্তু তোর খবর আছে...

হঠাৎ ঘটা এক কাণ্ড কইরা বসে। এক ঝটকায় দ্রৌপদীরে কান্ধে তুইলা বনের ভিতর হাঁটা ধরে। ভ্যাবাচেকা খাইয়া দ্রৌপদী চিল্লায়- ওই কী করস? কই যাস?

- তোমারে তোমার সতিনের বাড়ি নিয়া যামু। স্বামী তোমারে সতিনের ভাত খাওয়ায় নাই। এইবার সতিনের পোলা তোমারে সতিনের ভাত খাওয়াইব...

- আরে কী করে। ছাড়। তোর বাপেরে ডাকলে কিন্তু অসুবিধা হইব...

- বাপ জ্যাঠা কৃষ্ণ কর্ণ যারে ইচ্ছা ডাকো। দেখি কে তোমারে বাঁচায়। সেই দিন আমারে রাক্ষুসীর পোলা কইছিলা না? এইবার দেখবা রাক্ষস কারে কয়...

- ছাড় বাপ। ছাড়। আমার কষ্ট হইতাছে...

- আগে কও খাইবা কি না...

- আইচ্ছা খামু নে। ছাড়...

হো হো কইরা হাসে যুধিষ্ঠির ভীম আর নকুল সহদেব। ঘটার কাণ্ড দেইখা ধৌম্যও হাসে- গোঁয়ারের একটা সীমা থাকে। কিন্তু ভীমের এই পোলটার কোনো সীমা পরিসীমা নাই। মায়েরে গালিও দিলো আবার মাপ না চাইয়া তারে খাইতেও রাজি কইরা ফালাইল...

ঘটা দ্রৌপদীরে নামাইয়া নিজে পায়েস বাইড়া দিয়া ধৌম্যের দিকে ফিরে- চোখ দিয়া না চাইটা খাইয়া ফালাও। আব্বায় যা শুরু করছে তাতে একটু পরে হাড্ডিও পাইবা না। নাকি অপেক্ষা করতাছ যে তোমারেও তেলামু আমি?

ধৌম্য নিজেই আগাইয়া আসে- আরে না। তোর কাছে তেল আশা করার মতো বেক্কল আমি না। পরখাউকি বামুন হইয়া যখন জন্মাইছি তখন খাওনের উপর রাগ করলে কি আর চলে? বীরের রাগ খাওনরে আগে আর ফকির-বামুনের রাগ খাওনের পর; দে খাই...

খাইতে খাইতে দ্রৌপদীর খেয়াল হয় সবাই খাইতাছে ঘটোৎকচ ছাড়া। সে জিগায়- তুই খাবি না?

- তুমি যা রানছ পরে আমি তাই খামু। তোমরা খাও...

- আমি তো শাক রানছি

- শাকই সই। তোমরা রাজবাড়িতে চইলা গেলে জীবনে তো আর কোনো দিন তোমার হাতের রান্না খাওয়ার সুযোগ হইব না...

- তুই কিন্তু আবার আমারে খোঁচাখুঁচি করতাছস...

ঘটোৎকচ এইবার মাথা নুয়াইয়া দ্রৌপদীর পায়ের কাছে পড়ে- মাপ চাই ছুডু মা। ধইরা নেও এইডাই তোমারে আমার শেষ খোঁচা। তয় আমার বৌ অহিলা

কী কয় জানো? কয় ভিত্রে কথা রাখতে নাই। ভালো হোক মন্দ হোক পেটের কথা বাইর কইরা দিয়া তারপর খাইতে বসো। ভিত্রে কথা চাইপা রাইখা খাইতে বসলে খাওন বদহজম হয়। তখন বুক জ্বলাপোড়া করে আর ঘুমও ঠিকঠাক হয় না। তাই সে সব সময় কয় পয়লা ভিত্রের কথা সব বাইরে ফালাও; তারপরে পেট ভইরা খাইয়া একটা ঘুম দেও; তারপরে হাতে গদা নিয়া দেখো তুমার সামনে কেউ খাড়াইতে পারে কি না...

- তুই মনে লয় তোর বৌয়ের সব কথা শুনস?

- আমার আর কে আছে যে আমারে কিছু কইব আর আমি শুনুম? আগে আছিল একলা মা। এখন বৌটা হইছে। আর তো কেউ নাই...

দ্রৌপদী হাসে- এইটাও কিন্তুক খোঁচার কথা হইল..

- কিন্তু এই খোঁচা তো তোমার লাগার কথা না। লাগলে লাগতে পারে তোমার স্বামীগো...

- তোর লগে নিরালায় কিছু কথা আছে আমার...

সকলে খাইতে বসলে যুধিষ্ঠির ঘটারে আড়ালে নিয়া যায়- সেই সময় তুই কর্ণরে জ্যাঠা কইয়া ক্যান ডাকলি?

ঘটা সরাসরি যুধিষ্ঠিরের চোখে তাকায়- কর্ণ তোমার বড়ো ভাই তাই তারে জ্যাঠা কইছি...

- তুই কেমনে জানলি এই সব?

- জানছি তোমার রাজসূয় যজ্ঞের সময়। সেই দিন যখন ছুডু মা কর্ণরে দিয়া আমারে খুন করানের হুমকি দিলো; তখন মনে হইল পাঁচ পাণ্ডবের বৌ

দ্রৌপদী পাণ্ডবগো কথা কইল না; কৃষ্ণের বান্ধবী পাঞ্চালী কৃষ্ণের কথা কইল না; কইল কর্ণের কথা। তাইলে তো সেই লোকটার লগে একবার দেখা কইরা আসা লাগে। তার নাম আর গুণ আগে শুনছি। কিন্তু সে অত গুণী যে আমারে খুন করাইবার লাইগা পাণ্ডবগো বৌ আর কৃষ্ণের বান্ধবীরেও তার শরণাপন্ন হইতে হয় সেইটা তো বুঝি নাই। তাই তারে পাইয়া একটা প্রণাম করতে গিয়া আমি টাসকি খাইলাম। দেখি তার পায়ের পাতা দেখতে এক্কেবারে দাদির পায়ের পাতার মতো। তোমাগো তিন ভাইয়ের পায়ের পাতাও তো এই রকম। তো প্রণাম কইরা মাথা না তোলায় কর্ণ আমারে ধইরা তোলে। কয়- আমি তো কোনো মুনিঋষি না; এক সাধারণ সৈনিক। আমারে তুমি অত লম্বা প্রণাম করো ক্যান? তুমি কে বেটা? আমি কইলাম একজন কইছে যে আপনেরে দিয়া আমারে খুন করাইব। তাই ভাবলাম অত বড়ো বীররে একটা প্রণাম কইরা যাই। আমি হিড়িম্বার পোলা; দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীম আমার বাপ...

কর্ণ আমারে জড়াইয়া ধইরা কয়- যে কইছে সে তোমারে আর আমারে দুইজনরেই ডরায় তাই এই কথা কইছে। তয় আমি খুনি না। যোদ্ধা। শুধু সেই যুদ্ধেই আমার হাতে মানুষ মরে যে যুদ্ধে তাগো হাতে আমারও মরার ডর থাকে। আর কেউ কইলেই যে আমি তোমারে খুন করব এইটা ভুল; আমি কৃষ্ণও না; অর্জুনও না। আমি রাধাপুত্র কর্ণ। সামনাসামনি যুদ্ধ ছাড়া মানুষের দিকে অস্ত্র ধরি না আমি...

সে কথা কয় আর আমি তার পায়ের পাতা আর চোখের দিকে তাকাই- তার চোখটাও এক্কেবারে দাদির মতো। আমার সন্দেহ হয়। সবাই জানে এই বেডার বাবা অধিরথ; মা রাধা কিন্তু তারে কয় দেবতা সূর্যের পোলা; ঠিক যেমন তোমরা পাণ্ডবগো বাপ পাণ্ডু; কিন্তু তোমরা একেকজন একেক দেবতার পোলা হিসাবেই পরিচিত। তোমাগো কাহিনির লগে কর্ণের কাহিনিটা আমার

কেমন যেন মিল মিল লাগে। আমার সন্দেহ হয় গাড়োয়ানের বেটি রাধার তো দাদি কুন্তীর মতো দেবতার পোলা জন্মাইবার কথা না...

আমি কিন্তু পরে তার বাড়ি গেছিলাম তার বাপ-মায়েরে দেখতে। দেখলাম বিন্দুমাত্র মিল নাই কর্ণের লগে অধিরথ কিংবা রাধার চেহারায়। তারপরে গিয়া সরাসরি দাদিবুড়িরে চাইপা ধরলাম- তোমার চেহারার লগে কর্ণের চেহারা অত মিলা যায় ক্যান?

দাদি পয়লা গাঁইগুঁই করলেও পরে স্বীকার যাইয়া আমারে কয়- তুই কাউরে কইস না ভাই। তাইলে আবার সবকিছু লন্ডভন্ড হইয়া যাইব। আমি জিগাইলাম আর কেডা কেডা জানে? দাদিবুড়ি কয়- যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ ছাড়া আর কেউ জানে না। কর্ণও হয়ত না...। এর লাইগা তোমারে একটু খোঁচাইলাম জ্যাঠা। দেখলাম তুমি কেমন চমকাইয়া উঠলা...

- আমি চমকামু ক্যান?

- তুমিই তো চমকাইবা। কারণ কর্ণের পরিচয় সবাই জাইনা গেলে তোমার বনবাস বেহুদা যাইব। কুন্তীর বড়ো পোলা হিসাবে রাজা তো হবে কর্ণ। তাই কর্ণরে তোমার এত ডর...

যুধিষ্ঠির এইবার খেইপা উঠে- তোর কি মনে হয় আমি অতটাই লোভী?

- তুমি লোভী না জ্যাঠা। তুমি ধুরন্ধর। বুদ্ধিমান আর শক্তিমানগো মাথায় কাঁঠাল ভাইঙ্গা খাওনের লাইগা বেক্কলগিরি তোমার একটা কৌশল। তুমি ঠিকই জানো; অর্জুন ভীম কৃষ্ণ যতই লাফালাফি করুক না ক্যান; রাজ্যটা তোমারই। আর সেইটার প্রমাণ তুমি দিছ পুরা দেশটারেই পাশা খেলায় বাজি ধইরা। পুরা রাজ্য বাজি ধরার আগে তুমি কাউরে ল্যাওড়া দিয়াও পুছো নাই। তুমি আসোলে বুঝাইতে চাইছ যে- আমার রাজ্য আমি পানিতে ফালামু; তোগো কী? তুমি সবাইরে বুঝাইয়া দিছ যে- কেউ যদি আমার গৌরবের

ভাগীদার হইতে চাও তয় আমার দুর্দশারও ভাগীদার হইতে বাধ্য। আমিই ঠিক করুম তোমরা রাজবাড়িতে থাকবা না জঙ্গলে থাকবা। আসোলে দাদি কুন্তীর উপযুক্ত পোলাই তুমি জ্যাঠা। তোমার বাকি ভাইরা যে কাজগুলা করে সেই কাজগুলা যার ভাইবেরাদর নাই সে বেতন দিয়া লোক রাইখা করায়। এই যেমন দ্রোণ আর কর্ণরে বেতন দিয়া রাখছে দুর্যোধন। এখন সেই কামের লাইগা তোমার ভাইয়েরা আছে তাই তুমি তাগোরে সেনাপতি কিংবা মন্ত্রী বানাইছ; না বানাইলেও তেমন কিছু যাইত-আসত না...

যুধিষ্ঠির অনেকক্ষণ ঝিম মাইরা থাইকা মুখ খোলে- তোর বাপ-কাকায় করে যুদ্ধ আর আমি করি রাজনীতি। ফারাকটা নিশ্চয়ই তোরে বুঝাইয়া কইতে হবে না?

- তা বুঝি বইলাই তো এই সব কথা সকলের সামনে তোমারে কই না। সকলের সামনে পাশা খেলার লাইগা তোমারে খোঁচাখাচাও দেই। কিন্তু আড়ালে আসছ বইলা কইলাম যে তুমি পুরা রাজ্য আর ভাইবেরাদর সবার জীবনও তোমার নিজস্ব সম্পত্তি বইলা ভাবো; তাই কাউরে না পুইছাই তুমি বাজি ধরছ। বাজি হাইরা একবারের লাইগাও কও নাই; ফিরা যাইবার কথা। এইটা তোমার একটা অসাধারণ গুণ জ্যাঠা...

যুধিষ্ঠির ঘটার হাত চাইপা ধরে- তোর লগে রাজনীতি নিয়া আলাপ করতে কোনো দোষ নই। সেই সব বিষয় বুঝার যোগ্যতাও তোর আছে। তোরে আমি কই; কর্ণের বিষয়টা তোর বাপ-কাকা কেউ জানে না। জানান ঠিকও হইব না। তোরে আমার অনুরোধ...

- হা হা হা। অনুরোধের দরকার নাই জ্যাঠা। আমি তো দাদিরেও কইয়া আসছি যে; সে যদি না কর্ণের পরিচয় প্রকাশ করে তয় আমিও করুম না...

- আমিও করব না। মায়ে যদি নিজের পোলারে স্বীকার না করে তো আমরা করব ক্যান? ঠিক কি না?

- এই কথা কইও না জ্যাঠা। দাদি তার পোলা স্বীকার করে না কিন্তু তোমার লাইগা। তয় জ্যাঠা; কৃষ্ণ থাইকা একটু সাবধানে থাইকো...

- ক্যান?

- এই হালা দুইমুখা সাপ। লেঙ্গুর মাথা দুইটা দিয়াই ছোবল মারে। দেখলা না তোমার সভাতেই সে তার আরেক পিসির পোলার কল্লা নামাইয়া দিলো। তার স্বার্থে টান পড়লে কিন্তু তোমার মাথা নামাইতেও সে দেরি করব না। আর এখন তো সে তোমারে ছাতা হিসাবে ব্যবহার কইরা দেবতা হইতে চায়...

যুধিষ্ঠির হাসে- সে আমরে ব্যবহার করে ছাতা হিসাবে আর আমি তারে করি ঢাল হিসাবে। সে হইতে চায় দেবতা আর আমি হইতে চাই সম্রাট। দুইজনের চাওয়া কিন্তু দুইটা। রাজনীতিতে যতক্ষণ পর্যন্ত একজনের লগে আরেকজনের চাওয়া-পাওয়া ঠোকাঠুকি না খায় ততক্ষণ পর্যন্ত তারা বন্ধু হইতে পারে। এতে কোনো সমস্যা নাই। কৃষ্ণ রাজা হইতে চায় না; আর আমি দেবতা হইতে চাই না। তাই সে আমার লাইগা আর আমি তার লাইগা ঠিকাছি। হিসাব খুবই সোজা আর নিরাপদ ভাতিজা...

- কিন্তু ভবিষ্যতে কী না হইতে পারে?

- ভবিষ্যৎ সব সময়ই আন্ধা। ভবিষ্যতে যে কেউ যেকোনো সময় ভাইসা যাইতে পারে। সেইটা নিয়া চিন্তার কিছু নাই। যাউকগা। তোরে একটা কথা কই; তুই তোর বাড়ি যাওয়ার লাইগা আর চাপাচাপি করিস না...

- ক্যান?

- রাজসূয় যজ্ঞের সময় দ্রৌপদী তোর মায়ের লগে কাইজা করছে। এখন তারে নিয়া আবার তোর মায়ের বাড়ি গেলে সে তা মাইনা নিতে পারব না। বহুত কষ্ট পাইয়াও বনে আইসা এখন একটু স্বাভাবিক হইছে সে। খামাখা তারে আর কষ্ট দেওয়া ঠিক না...

- ঠিক আছে জ্যাঠা। তোমার যুক্তি আমি মানি। চলো তাইলে। তোমাগো লগে আমিও তীর্থ দেইখা আসি...

০৯

- ও মুনিবর; এই বেডায় না নিজের মায়ের মাথা কাটছিল?

অগস্ত্য মুনির আশ্রম আর ভৃগুতীর্থ দেইখা বধূসরা-নন্দা-অপরনন্দা নদী পার হইয়া ঋষভকূট পর্বত ডিঙ্গাইয়া কৌশিক নদীর তীরে বিশ্বামিত্রের আশ্রম পরিদর্শন কইরা যুধিষ্ঠিরের তীর্থযাত্রীদল আইসা উপস্থিত হয় মহেন্দ্র পর্বতে ভার্গব ঋষি পরশুরামের ডেরায়। এই ভ্রমণের গাইড ভবঘুরে মুনি লোমশ আর মালপত্র বহনের কামে আছে হিড়িম্বার পোলা ঘটোৎকচ। দলের বাকি তীর্থযাত্রী দলে আছে যুধিষ্ঠির ভীম নকুল সহদেব দ্রৌপদী পুরোহিত ধৌম্য আর বহু অনুচর ব্রাহ্মণ। অত পথ ঘটা কোনো কথা কয় নাই। মালপত্র ঘাড়ে নিয়া চুপচাপ হাঁটছে বাপ জ্যাঠা আর সৎমায়ের লগে। কিন্তু পরশুরামের আশ্রমে আইসাই সে মুনি লোমশরে কইরা বসে এই প্রশ্নখান...

ঘটার এমন প্রশ্নে ভ্যাবাচেকা খাইয়া লোমশ তারে ধর্ম বোঝাইতে চায়। কিন্তু ঘটা তারে থামাইয়া দেয়- ধর্মের কাহিনি যারা খায় আপনি তাগোরে তা খাওয়ান। এর সম্পর্কে আমি যা জানি তা সঠিক কি না আমারে কন...

লোমশ কথা না বাড়াইয়া যুধিষ্ঠিরের দিকে তাকায়। ঘটার এমন প্রশ্নে যুধিষ্ঠিরও ডর খাইছে ভীষণ। ঋষি পরশুরাম এখনো জীবিত। দুনিয়াতে তার সমান শক্তি আর গোস্বা মনে হয় আর কারো নাই। শিবের শিষ্য হইয়াও কুড়াল দিয়া স্বয়ং শিব-নন্দন গণেশের দাঁত ভাইঙ্গা ফালাইছিলেন তিনি। ঘটার এমন কথা শুইনা যদি তিনি কুড়াল তুইলা নেন তয় এইখানেই তীর্থ আর জীবন দুইটারই সমাপ্তি সবার...

যুধিষ্ঠির যুক্তি বুদ্ধি তর্কে যায় না। সরাসরি আইসা ঘটার কান্ধে হাত রাখে- আমার মাথার কিরা দেই বাপ। উল্টাসিধা কিছু কইস না এইখানে। তিনি শুনলে রুষ্ট হইবেন...

- হইলে হইল; পোছে কেডায়?

- আইচ্ছা ঠিকাছে। পোছার দরকার নাই। কিন্তু তুই তার লগে কোনো বেয়াদবি করিস না; এইটাই আমার অনুরোধ...

- তা না হয় করলাম না। কিন্তু তোমার প্রধান তিন শত্রু ভীষ্ম দ্রোণ আর কর্ণ; তিনজনই যে এই পরশুরামের শিষ্য তা তো তুমি জানো জ্যাঠা...

- আরে বেটা সেইটা তো জানিই। সবাই তা জানে...

- এইটা কিন্তু তোমার লাইগা একটা দুশ্চিন্তার বিষয় জ্যাঠা...

যুধিষ্ঠির অবাক হইয়া তাকায়- এইখানে দুশ্চিন্তার কী আছে?

- দুশ্চিন্তার কথা হইল; তোমার পক্ষে কিন্তু পরশুরাম ঘরানার কোনো যোদ্ধা নাই। ওগোর যুদ্ধকৌশল আর অস্ত্রচালনা কিন্তু তোমাগো থাইকা আলাদা। তোমার পক্ষে যারা আছে তারা সবাই দ্রোণচোট্টার শিষ্য। তিরাতিরির বেশি কিছু করতে পারব না তারা। আর পরশুরামের শিষ্যরা কিন্তু তিরের লগে ভার্গবাস্ত্র মানে কুড়ালে তুলনাহীন; বিশেষত কর্ণ। হেয় কিন্তু তির থাইকা ভল্ল আর কুড়ালে কম উস্তাদ না। কুরুগো লগে তোমার যুদ্ধ হইলে কিন্তু এই পরশুরামের তিন শিষ্যই তোমারে বেশি ভুগাইব জ্যাঠা...

যুধিষ্ঠির হাসে- ওগোর লগে থাকব পরশুরামের তিন শিষ্য আর আমার লগে থাকব কৃষ্ণ। পরশুরামের শিষ্যরা কী পারে না পারে তা সকলেই জানে। কিন্তু কৃষ্ণ কী পারে তা কারো পক্ষেই ধারণা করা সম্ভব না। সেই ক্ষেত্রে আমার দিকেই কিন্তু সুবিধা বেশি ভাতিজা...

ঘটা স্বীকার করে- তা অবশ্য ঠিক। একলা আব্বারে নিয়া সে জরাসন্ধের মতো রাজারে শুয়াইয়া ফালাইছে। কুরুরা তো নস্যি তার কাছে...

যুধিষ্ঠির ঘটারে চোখে চোখে রাইখা পরশুরামের আশ্রমে মাত্র এক রাইত থাইকা আবার মেলা দেয় দক্ষিণ দিকে। ঘুরতে ঘুরতে যখন তারা আইসা প্রভাসতীর্থে স্থির হইল কিছু দিন তখন সংবাদ পাইয়া দেখা করতে আসে কৃষ্ণ আর বলরাম; লগে কৃষ্ণের দুই পোলা প্রদ্যুম্ন-শাম্ব আর সাত্যকিসহ কৃষ্ণের আরো কিছু চ্যালা ও শিষ্য। ভীমের গদার উস্তাদ বলরাম সিধাসাধা মানুষ। আইসাই পাণ্ডবগো দুর্দশা দেইখা সে খেইপা উঠে- খালি ধর্ম করলেই যে মঙ্গল হয় না আর অধর্ম করলেই অমঙ্গল আসে না; তার প্রমাণ হইল ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির এখন ছালবাকলা পইরা জঙ্গলবাসী আর দুর্যোধন করতাছে দুনিয়া শাসন...

- ধর্মাত্মা মানুষ কেমনে আবার জুয়া খেলে উস্তাদ?

ভীমের এই খোঁচা শুইনা বলরাম টের পায় সে যা বুঝাইতে চাইছিল তা হাঁটা দিছে অন্য পথে। সে ধর্মটর্মের ধারও ধারে না আবার তা ব্যবহারও করে না। বলরামরে দেখলে মনে হয় না সে যাদব বংশের মানুষ। সে যা কয় তা সোজাসুজি কয়। কিন্তু ভীম এমন কইরা তার কথার মইদ্যে বাম হাত ঢুকাইয়া দিব ভাবতেও পারে নাই। ভীম গদায় তার সাক্ষাৎ শিষ্য। ভীমের কইলজা-ছিঁড়া কথার ধরন সে জানে। এখন যুধিষ্ঠিরের পক্ষে কিছু কইতে গেলে বলরামরেও ধুইতে ছাড়ব না ভীম...

বলরাম বেকায়দায় পইড়া কৃষ্ণের দিকে তাকায়। কৃষ্ণ সাধারণত জটিল কোনো আলোচনায় বলরামরে নিতে চায় না। কিন্তু সাক্ষাৎ বড়ো ভাই; সব সময় এড়াইতেও পারে না। তাই সেও যখন পাণ্ডবগো দেখতে আসতে চাইল

তখন কৃষ্ণ তারে না করতে পারে নাই। কিন্তু আইসাই যে সে দর্শন কপচাইতে গিয়া ঝামেলা পাকাইব তা কে জানত...

যুধিষ্ঠিরও ভ্যাবাচেকা খাইয়া কৃষ্ণের দিকে তাকায়। আলোচনাটারে এখন অন্য দিকে নেওয়া দরকার। কৃষ্ণ ঘটোৎকচের দিকে তাকায়- ভাতিজা কেমুন আছস? তোর মা আর পোলারা ভালা তো? আমি নিত্যই তোগো সংবাদ লই; কিন্তু যামু যামু কইরাও তোর মা আর পোলাপানরে দেখতে যাওয়ার সময় কইরা উঠতে পারি না বাপ...

- তুমি যে ওগোরে মনে রাখো সেইডা আমার মা আর পোলাগো সৌভাগ্য কাগু। কিন্তু একটা কথা; তুমি আমার মায়ের কথা জিগাইলা; পোলাগো কথা জিগাইলা কিন্তুক আমার বৌয়ের কথা জিগাইলা না ক্যান?

কৃষ্ণ হাসে- তুই একটা বুদ্ধিমান পোলা। তোর ঠিকই বোঝার কথা যে তোর এই বিয়ায় আমি খুশি হইতে পারি নাই...

- ক্যান কাগু? আমি কি কারো বৌ মাইয়া বা বাগ্দত্তারে লুট কইরা বিয়া করছি যে তোমার মুখে চুনকালি পড়ছে?

কৃষ্ণ এইবার একটু নইড়া-চইড়া বসে। বৌ মাইয়া বাগ্দত্তা ছিনতাইয়ের কথা কইয়া ঘটা যে কৃষ্ণরেই খোঁচাটা মারল তা সকলেই বোঝে। কিন্তু এইখানে থাইমা গেলে বেইজ্জতির সীমা থাকব না। তাই কৃষ্ণ খোঁচাটা না খাওয়ার ভান কইরা সরাসরি মাঠের বলটা পাণ্ডবগো দিকে নিয়া যায়- দূর বেটা। আমার মুখ রক্ষা না রক্ষায় কী আসে যায়? তুই তোর বাপ-জ্যাঠার শত্রু বংশের মাইয়া বিয়া করছস দেইখা আমার একটু খারাপ লাগছে; এই আর কি। তুই জানস যে ইন্দ্রপ্রস্থ রাজ্য নির্মাণের সময় তোর বাপ-জ্যাঠার লগে নাগ বংশের শত্রুতা তৈরি হয়। সেই থাইকা এখন পর্যন্ত নাগ বংশ পাণ্ডবগো ঘোরতর শত্রু। তুই কি না গিয়া বিয়া করলি সেই নাগ বংশেরই মেয়ে...

ঘটা এইবার লজ্জার ভান কইরা হাসে- হ কাগু তা করছি। আমার বাপ-কাকারা তোমার লগে মিলা নাগ বংশরে উচ্ছেদ কইরা দিছিল তাগোর বাপ-দাদার ভিটামাটি থাইকা। সেই কারণে তারা আমাগো বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিবার রাস্তা খুঁজতে পারে। সেই হিসাবে তাগোরে আমরা শত্রু ভাবতে পারি; তোমার কথাটায় যুক্তি আছে। কিন্তু কাগু; আমার বাপ আর জ্যাঠার সবচে বড়ো যে শত্রু; সেই দুর্যোধনের মাইয়ার লগে তো তুমি তোমার নিজের পোলার বিয়া দিছ। আমার কামটা কি তোমারটা থাইকা বেশি খারাপ হইছে?

এমন ধরা খাইব কৃষ্ণ ভাবে নাই। তার পাশেই তার পোলা শাম্ব বসা; যে কি না আবার দুর্যোধনের মাইয়ার জামাই। দ্রৌপদীর চোখে কৃষ্ণের চোখ পড়ায় দ্রৌপদী হাসে। ভীম না শোনার ভান কইরা অন্য দিকে তাকাইয়া আছে। যুধিষ্ঠির বুঝতে পারে না কারে কী বইলা থামায়। কৃষ্ণ ভাইবা দেখে ছোটলোকের পন্থা ধইরা এখন দায় ঠেইলা না দিলে বাঁচার উপায় নাই। সে জোর গলায় ঘটারে সমর্থন করে- ঠিক কইছস ভাতিজা। তুই যা করছস তার থাইকা বেশি অপরাধ শাম্ব করছে দুর্যোধনের মাইয়া বিবাহ কইরা। আমি তোর লগে পুরাই একমত। কিন্তু তুই তো জানস যে; এই বিষয়ে সে আমারে কিছু জিগায় নাই। নিজেই বুদ্ধি কইরা দুর্যোধনের মাইয়ারে তুইলা আনতে গিয়া বান্ধা খাইছিল দুর্যোধনের হাতে। আমি যখন শুনলাম যে দুর্যোধন ওরে বাইন্ধা থুইছে; আমি কিন্তু পোলারে ছাড়াইয়া আনতে যাই নাই; কারণ রাজা যুধিষ্ঠিরের যে শত্রু; সে আমারও শত্রু। সে যদি আমার পোলারে মাইরাও ফালাইত তবু আমি গিয়া তারে অনুরোধ করতাম না পোলারে ছাইড়া দিতে। কিন্তু তোর বড়ো জ্যাঠা বলরাম তো আবার সন্ন্যাসী মানুষ। সে কইল- তোমাগো একজনের লগে আরেকজনের যাই সম্পর্ক থাউক; আমার কাছে কিন্তু ভীম আর দুর্যোধন দুইজনই সুমান শিষ্য। আমার ভাতিজা গেছে শিষ্যের মাইয়ারে উঠাইয়া আনতে আর শিষ্য বাইন্ধা থুইছে আমার ভাতিজারে। এইখানে আমার একটা দায়িত্ব আছে। জিগাইয়া দেখ। তোর বলাই জ্যাঠা গিয়া তার শিষ্যের লগে মিটমাট কইরা শাম্বর বিয়া দিছে...

বলাই যেমনে বসা ছিল তেমনে বইসাই উত্তর দেয়- আমি যা ভালো মনে করছি তাই করছি। আমার ভাতিজার লগে আমার শিষ্যের ঝামেলা বাঁধছে আমি তা মিটাইয়া দিছি। অসুবিধা কই? যুদ্ধ হইলে কে কই থাকব না থাকব সেইটা কৃষ্ণ আর তার পোলা শাম্ব জানে। ওগোরেই জিগা...

ঘটা আবারও হাসে- তা ঠিক জ্যাঠা। তুমি যা করছ তাতে আমার কোনো অভিযোগ নাই। ঠিক কামটাই করছ তুমি। তো কৃষ্ণ কাগু। বলাই জ্যাঠা সোজাসিধা মানুষ। যা ভালো মনে করে তাই করে। কিন্তু কাগু; আমার বাপ-জ্যাঠার যুদ্ধ হইলে কিন্তু কোনো দিনও নাগ বংশের লগে হইব না। হইব দুর্যোধনের লগে। তা এইবার তুমি কও তো; আমার বাপ-জ্যাঠার লগে আলোচনা করার সময় তুমি দুর্যোধনের মাইয়া লক্ষণার স্বামীরে এইখানে নিয়া আসছ ক্যান?

যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের দিকে তাকাইয়া অনুমান করে তার রাগের পরিমাণ। নিজের চোখের সামনে সে দেখছে কৃষ্ণ কীভাবে নিজের পিসাতো ভাই শিশুপালের মাথা নামাইয়া দিছিল ভরপুর সভায়। ঘটোৎকচের লাইগা যুধিষ্ঠিরের ভয় হয়। কিন্তু কৃষ্ণের ধৈর্যেরও সে সম্মান করে। শিশুপাল একশোটা গালি দেওয়া পর্যন্ত কৃষ্ণ অপেক্ষা করছিল সেই দিন...

কৃষ্ণ নিজেরে সামলাইয়া ঘটার দিকে তাকাইয়া হাসে- ভাতিজা। আমি যে ঘটনার লগে আছিলাম না; ঘটনা ঘটার আগে জানতামও না। সেই ঘটনার সব দোষ তুই আমারে দিতাছস ক্যান? আমি শাম্বরে নিয়া আসছি আমার পোলা হিসাবে। এখন দুর্যোধনের জামাই হিসাবে সে কী করব না করব সেই সব প্রশ্নের উত্তর বোধ হয় শাম্বরই দেওয়া দরকার। কইরে শাম্ব; ঘটার প্রশ্নগুলার উত্তর দে...

নিজের বাপ কৃষ্ণরে এমন ধরা খাইতে জীবনেও দেখে নাই শাম্ব। বাপ যেমনে ঘটার খোঁচাগুলা সামলাইতাছিল তাতে সে অতক্ষণ বাপের কৌশলে মুগ্ধই আছিল। কিন্তু বাপ যে হঠাৎ কইরা উত্তর দিবার দায়িত্বটা তার ঘাড়েই ফালাইয়া দিব তা সে ভাবতেও পারে নাই। এই প্রশ্নের কী উত্তর দিব না দিব কিছু না ভাইবাই সে কয়- দুর্যোধন আমার শ্বশুর ঠিকাছে। কিন্তু আমি তোমারে কইয়া দিতে পারি ঘটা; যদি শ্বশুর মশাইর লগে যুধিষ্ঠির জ্যাঠার যুদ্ধ হয় তয় আমি কিন্তু শ্বশুরের বিরুদ্ধে গিয়া পাণ্ডবগো পক্ষেই যুদ্ধ করুম...

- তা তো করবাই। কিন্তু করবা দুর্যোধনের গুপ্তচর হইয়া। পাণ্ডবপক্ষে থাইকা তোমার বৌ লক্ষণারে দিয়া তুমি পাণ্ডবগো সংবাদ পাচার করবা দুর্যোধনের কাছে...

শাম্ব তো নাদান পোলা। স্বয়ং কৃষ্ণেরও এইবার নিজেরে বেকুব মনে হয় প্রসঙ্গটা শুরু করার লাইগা। বলরাম নিশ্চিন্তে তামাশা দেখতাছে। তার মোটাবুদ্ধির শিষ্য ভীমের পোলা বুদ্ধির প্যাঁচে যে কৃষ্ণরেও চাইপা ধরছে তাতে বলরামের খুশিই লাগে। দ্রৌপদী মুচকি হাসে। ভীম হাসে মুখ ঘুরাইয়া- আমার পোলায় খালি আমার মতো খায় না। বুদ্ধির জোরে সে কৃষ্ণরেও কাইত কইরা দিতে পারে...

কৃষ্ণের চ্যালা সাত্যকির এইবার মনে হয় শাম্বর কথাটারে সমর্থন কইরা কিছু একটা কওয়া দরকার। না হইলে যুদ্ধের সময় শাম্ব পাণ্ডবগো পক্ষে যুদ্ধ করলেও লক্ষণা যে পাণ্ডবপক্ষের সংবাদ তার বাপ দুর্যোধনের কাছে পাচার করব না সেইটা নিয়া কোনো কিছু প্রমাণ করা যাইব না এখন। সে তাড়াহুড়া কইরা কয়- আমি কই কি; যুদ্ধের ঘটনা যুদ্ধে প্রমাণ হওয়াই ভালো। তুমি শাম্বর বিষয়ে যে সন্দেহ করছ তা যৌক্তিক। কিন্তু আমি আমার বংশের

মাইনসেরে চিনি। আমি বিশ্বাস করি শাম্ব কোনো দিনও তার বাপ আর পাণ্ডবগো ছাইড়া দুর্যোধনের চর হইব না। কথাটা যদি প্রমাণ করতে চাও তো আমি বলি- চলো; এখনই আমরা দুর্যোধনের লগে যুদ্ধ শুরু করি। তখন দেখা যাইব কে কার পক্ষে আছে আর কে নাই...

- কিন্তু এখন যুদ্ধ করবা কেমনে? জ্যাঠায় তো পণ করছে যা করার তা তেরো বছর পরেই করব। হবায় তো গেছে চাইর বছর...

এইটা একটা সহজ প্রশ্ন। তাই কিছু না ভাইবাই সাত্যকি উত্তর দেয়- অসুবিধা নাই। যুধিষ্ঠির প্রতিজ্ঞাবদ্ধ মানুষ। তার প্রতিজ্ঞায় আমাগো বাধা দেওয়ার দরকার নাই। তিনি তার বনবাসের মেয়াদ শেষ কইরাই ইন্দ্রপ্রস্থ ফিরা যাবেন। তার আগে পর্যন্ত না হয় যুধিষ্ঠিরের পক্ষে অভিমন্যুই রাজ্য শাসন করব...

- অভিমন্যু ক্যান? জ্যাঠার পক্ষে অভিমন্যু রাজ্য শাসন করব ক্যান? বংশের বড়ো পোলা হইলাম আমি; পাঁচ পাণ্ডবের পরে বাপ-জ্যাঠার সিংহাসনের অধিকারে আমিই পরথম। আর পাণ্ডবগো নয় পোলার মধ্যে অভিমন্যু হইল সবার ছোট; নয় নম্বর। তার অধিকার সবার থাইকা পরে। আট-আটটা বড়ো ভাই রাইখা পাণ্ডবগো পক্ষে রাজ্য শাসনের লাইগা তুমি অভিমন্যুর নাম কইলা কেন? সে কৃষ্ণের ভাগিনা বইলা?

সাত্যকির ঘাম ছুটতে থাকে- না। না। পাণ্ডবগো প্রতিনিধি কে হইব তা পাণ্ডবরাই ঠিক করব; সত্য কথা। অভিমন্যুর নাম মুখ দিয়া আসলো কারণ সে তো আমাগো সামনেই থাকে; তাই

- ছুডু মা দ্রৌপদীর পাঁচ পোলাও কিন্তু এখন দ্বারকায় তোমাগো সামনেই আছে। তুমি তো তাগোর নাম নেও নাই। আর অত বড়ো গতর নিয়া আমি যে তোমার সামনে খাড়াইয়া আছি তাও তোমার চোখে পড়ে নাই না? আসোলে তোমরা তলে তলে যুধিষ্ঠিরের সিংহাসনটা অভিমন্যুরেই দিতে চাও; তাই

সেইটাই তোমার মুখ থাইকা বাইর হইয়া আসছে। তয় মনে রাইখ সাত্যকি; বাপ-কাকার পরে ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসন কিন্তু আমার। এইখানে কোনো ঘিরিঙ্গি করতে আসবা না কেউ...

কৃষ্ণ এইবার ফাঁক খুঁইজা পায়- ধুত্তুরি। তোমরা কী সব পোলাপানের বিষয় নিয়া কাইজা শুরু করলা। যুদ্ধ সিংহাসন উত্তরাধিকার এই সব এখনো বহুত দেরি। আর সবকিছুর সিদ্ধান্ত একমাত্র নিতে পারেন যুধিষ্ঠির। তিনিই রাজা। তার যারে ইচ্ছা তারেই তিনি উত্তরাধিকার দিবেন। আর তিনি যেদিন মনে করবেন সেই দিনই যুদ্ধ হইব। এইটা নিয়া কিন্তু অন্য কারো কিছু আলাপ করার সুযোগ নাই...

যুধিষ্ঠিরও এইবার কথা খুঁইজা পায়- হ হ হ। কৃষ্ণ যেদিন বলবে সেই দিনই যুদ্ধ হইব। তার আগে কারো কিছু ভাবার দরকার নাই...

ঘটা আরো যেন কী বলতে চাইতেছিল। কিন্তু দ্রৌপদী তারে টান দেয়- ঘটা। বাপ এদিকে আয় তো। অতিথিরা সেই কখন থাইকা বইসা আছে। তুই আমার লগে আয়। মায়েরে যে একটু রান্নায় সাহায্য করা লাগে বাপ...

যুধিষ্ঠিরও দ্রৌপদীর কথায় তাল দেয় - হ হ। তুই যা। তোর মায়ের কামে একটু হাত লাগা...

দ্রৌপদী ঘটারে টাইনা রান্নার কাছে নিয়া আসে- তুই তো কৃষ্ণরে এক্কেবারে ধুইয়া ফালাইছস। আমার তো ডর লাগতাছিল যে কৃষ্ণ না কখন আবার খেইপা উইঠা শিশুপালের লগে যা করছিল তোর লগেও তা করে...

- ওইগুলার ধার ধারি না আমি। আমি শিশুপাল না। সামনা-সামনি আমারে মারতে হইলে আমিও তারে ছাইড়া কথা কমু না সেইটা সে ভালো কইরাই জানে। আমার মায়াযুদ্ধের কৌশল দেইখাই সে আমারে কইছিল আমি তার থাইকা বড়ো যোদ্ধা?

- মায়াযুদ্ধ কী রে?

ঘটোৎকচের মায়াযুদ্ধ হইল আজকে দিনের মার্শাল আর্ট। ভঙ্গির লগে বর্ণনা দিয়া ঘটা তার মায়াযুদ্ধের কৌশল দ্রৌপদীরে বোঝায়- মায়াযুদ্ধ হইল গিয়া শত্রুর চোখে ঘোর লাগাইয়া যুদ্ধ করা। কোন দিকে সে মাইর খাইব সেইটা তারে বুঝতে না দেওয়া। এই যুদ্ধে অস্ত্র থাইকা চোখ আর নাচের কাম বেশি। শত্রু তোমারে যেখানে দেইখা বর্শা তির বা খড়গ মারব; মারার পর দেখব তুমি সেইখানে নাই। বিষয়টা হইল চোক্ষের পলকে শত্রুর টারগেট থাইকা সইরা যাওয়া আর শত্রুরে এক দিকে দেখাইয়া অন্য দিকে ঘাই মারা। মনে করো তুমি ভান করলা যে তলোয়ার দিয়া তুমি তার মাথায় কোপ মারতে যাইতাছ। তখন সে দুই পা ফাঁক কইরা ঢাল দিয়া তার মাথা বাঁচাইতে যাইব। কিন্তু তুমি তলোয়ার দিয়া তার মাথায় না মাইরা এক ঝটকায় মাটিতে শুইয়া দিলা তার বিচিতে একটা লাত্থি। এইরকম আরকি। ...কৃষ্ণ ভালো কইরাই জানে যে ওর চক্র দিয়া আমার বালও ছিঁড়তে পারব না সে...

- তুই তো সব সময় কস যে সিংহাসনে তোর লালসা নাই। কিন্তু অভিমন্যু রাজা হইব শুইনা তুই খেইপা উঠলি ক্যান?

- আমি এখনো কই সিংহাসনে আমি মুতি। আইজ যদি জ্যাঠায় তার সিংহাসন দুর্যোধনরেও দান কইরা দেয়; তাতেও আমার কোনো আপত্তি নাই। কিন্তু আমার আপত্তি আছে অভিমন্যুরে নিয়া। সে বংশের সব থাইকা ছোট পোলা। আমি না পাইলে সিংহাসন পাইব তোমার বড়ো তিন পোলা প্রতিবিন্ধ্য সুতোসোম আর শ্রুতকর্মা। সিরিয়াল মতে এর পরে সিংহাসন যাইব অর্জুন কাকুর দুই পোলা ইরাবান আর বভ্রুবাহনের কাছে। এর পরে সিংহাসন আবার

আসব তোমার ছোট দুই পোলা শতানীক আর শ্রুতসেনের কাছে। এইভাবে বড়ো আট ভাই পার হইবার পর না আসব অভিমন্যুর পালা। আমার আপত্তি ওগো সাহস দেইখা। কোন সাহসে যাদব বংশ পাণ্ডব রাজ্যর উত্তরাধিকার বিলিবণ্টন করে? অভিমন্যু কৃষ্ণের ভাগিনা। আমার বাপ-কাকার রাজ্য আরেকজন বিলিবণ্টন করতে গেলে তো আমি ছাইড়া দিমু না। জান ধইরা হইলেও আমি ফাইট দিমু; তাতে আমি বাঁচি বা মরি। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের রাজ্য অভিমন্যু পাইব এইটা কেমনে হয়?

- দুর বেটা। অভিমন্যুর উপরে রাগ করার কী আছে? সে এখনো ছোট একটা পোলা। কারো সাথেও নাই পাছেও নাই

- তা নাই ছুডু মা। তার উপর আমার রাগও নাই। সে আমাগো ভাইগো মইদ্যে সবার ছোট; তার লাইগা আমি একটা মুক্তার মালাও নিয়া গেছিলাম তোমাগো রাজসূয় যজ্ঞের সময়; যেইটা আমি তারে কোলে নিয়া পরাইয়া দিছি। কিন্তু কানপড়া জিনিসটা খুবই খারাপ। এরা তারে দ্বারকায় রাইখা কানপড়া দিতাছে যে যুধিষ্ঠিরের পরে সেই হইব রাজা। সে ওইটা শুইনাই বড়ো হইব। তারপর রাজা হইবার লাইগা বড়ো আটটা ভাইরে ঘুমের মইদ্যে খুন করব সে...

- এইডা কী কস?

- হ ঠিকই কই। কানপড়ায় মাইনসেরে যেমন রাক্ষস বানায় তেমনি মেরুদণ্ডহীনও বানায়। দেখো না; নিয়মমতো ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুর পরে বিদুরেরই রাজা হইবার কথা। কিন্তু ছুডুবেলা থাইকা তারে সবাই কানপড়া দিছে যে তুই দাসীর পোলা; রাজা হইবার অধিকার তোর নাই। তাই সে নিজেও জীবনে ভাবতে পারে নাই যে হস্তিনাপুরের রাজা তারই হইবার কথা। ফলে এখন তার ভাতিজার কাছেও তারে শুনতে হয় দাসীপুত্র ডাক। অথচ দেখো নিয়মমতো যুধিষ্ঠির দুর্যোধন তো কোন ছার; সেই কিন্তু আইনত হস্তিনাপুর রাজ্যের উত্তরাধিকার...

- কিন্তু সেইটা কি নিয়মের মধ্যে পড়ে?

- নিয়মের মধ্যে ঠিকই পড়ে। কিন্তু তার হেডম নাই দেইখা হয় না। তার কীসের অভাব? খালি একবার বুক চিতাইয়া গিয়া যদি কইত যে পাণ্ডুর পরে এই সিংহাসন আমার। তখন যুধিষ্ঠির দুর্যোধন বন্যার স্রোতে ভাইসা যাইত। কে ঠেকাইতে পারত তারে? কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ধৃত-পাণ্ডু দুইজনরে জন্ম দিলেও তিনি কন তারা অম্বিকা আর অম্বালিকার পোলা; একমাত্র বিদুররেই তিনি সব সময় কন আমার পোলা। তার কিছু করা লাগত না; খালি গিয়া যদি নিজের বাপেরেই কইত; আর দ্বৈপায়ন আইসা খাড়াইয়া যদি খালি একবার কন- হ। বিদুরই এই সিংহাসনের ন্যায্য উত্তরাধিকার; তাইলে দুনিয়াতে কে আছে তারে ঠেকায়? ভীষ্ম তো দ্বৈপায়নরে দেখলে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করার লাইগা মাটিতে আছাড় খাইয়া এখনো নাকমুখ থ্যাঁতলাইয়া ফালান। কেউ আছে দ্বৈপায়নরে ঠেকানোর? যে লোক দেবতাগো জন্ম দেয়-মারে তার লাইগা একটা সিংহাসন তো কানি আঙ্গুলের একটা চিমটি দিয়া বড়ো পোলা থাইকা ছোট পোলার কোলে ফালাইয়া দিবার মতো তুচ্ছ বিষয়। কিন্তু তা হইল না। কারণ। ছোটবেলা থাইকা কানপড়া শুইনা বিদুর নিজেরেও দাসীপোলা ভাইবা মেরুদণ্ডহীন হইয়া আছে। সব যোগ্যতা থাকতেও ভাতিজাগো মুখে দাসীপুত্র ডাক শুইনাই মরতে হইব তারে...

- দ্বৈপায়নের ক্ষমতা তুই অত বড়ো মনে করস?

- করব না মানে? দেখো না আগে যেখানে বামুনরা শূদ্র আর মেয়ে মাইনসেরে বেদ শুনতেই দিত না; সেইখানে ব্রাহ্মণগো পুটকি মাইরা দ্বৈপায়ন সবার লাইগা বেদের পাতা খুইলা দিছেন। বেদের কোন কথার কোন অর্থ হইব তা শুধু জানেন তিনি; তার পোলা শুকদেব আর তার চাইর শিষ্য। আর তার কিছু ক্ষমতা তো তুমি নিজের জীবনেই দেখছ। পাঁচজনের লগে এক মাইয়ার বিয়া কোনোমতেই হয় না। কিন্তু দ্বৈপায়ন খাড়াইয়া যেই কইলেন- হয়; অমনি আর কেউ কোনো টু শব্দও করল না। বিদুর একটা বেক্কল হালায়। দ্বৈপায়নের পোলা হইয়া না হইতে পারল শুকদেবের মতো ঋষি; আবার বিচিত্রবীর্যের উত্তরাধিকার হইয়াও না হইতে পারল রাজা। সে থাইকা গেলো রাজবাড়ির এক বেহুদা পণ্ডিত আর দাসীর পোলা হইয়া। আর উল্টা দিকে দেখো;

সিংহাসনে বিন্দুমাত্র অধিকার না থাকলেও খালি বাপ আর মামার কানমন্ত্র পাইয়া এখন দুর্যোধন কইরা বসছে সিংহাসনের দাবি...

- যাউকগা। তোর বাপ-জ্যাঠা যত দিন আছে তত দিন তোর নিজের এই সব বিষয় নিয়া চিন্তার দরকার নাই? তাগোর রাজ্য তাগোরেই সামলাইতে দে...

- তা নিয়া কে চিন্তা করে? রাজ্য নিয়া চিন্তা করে তোমাগো পোলারা। এর লাইগা তারা বিভিন্ন রাজবাড়িতে থাইকা শিক্ষাদীক্ষা করতাছে। আমি বাপ-কাকারে বাপ-কাকা হিসাবেই জানি বইলা তাগো লগে আইসা জঙ্গলে বাল ফালাই। ওই সিংহাসনে মুতনের টাইম আছে নাকি আমার? তয় একটা কথা কি জানো; মাইনসে কয় কৃষ্ণ আর অর্জুন হরিহর আত্মা। আসোলে তা ভুল। হরিহর আত্মা হইল কৃষ্ণ আর যুধিষ্ঠির। দেখলা না কৃষ্ণ কইল যুধিষ্ঠির যখন কইব তখন যুদ্ধ হইব আর যুধিষ্ঠির কইল কৃষ্ণ যখন মনে করব তখনই হইব যুদ্ধ? হাঃ হাঃ হাঃ অর্জুন হইল কৃষ্ণ আর যুধিষ্ঠিরের একটা যৌথ মালিকানার লাঠি। যখন যার দরকার তখন সে সেই লাঠি ব্যবহার করে। এর বেশি কিছু না...

যাদবরা বিদায় নিল। প্রভাসতীর্থ ছাইড়া পাণ্ডবরাও বাইরাইল পথে। আগে হাঁটে পাণ্ডবগণ; মালপত্র ঘাড়ে নিয়া দ্রৌপদীর পাশে হাঁটে ঘটা। হাঁটতে হাঁটতে তার যা কথাবার্তা সবই তার বৌপোলাপান নিয়া। তার দুই পোলার দুইটাই লড়াইর কৌশলে এখনই বহুত পাকা। বড়ো পোলা অঞ্জনপর্বা লড়াইতে দারুণ হইলেও বিদ্যাশিক্ষায় তার বেশি আগ্রহ নাই। কিন্তু তার ছোট পোলা বর্বরীক দুইটাতেই দারুণ। বর্বরীক তার মায়ের খুব ভক্ত। অহিলাবতী তার ছোট পোলারে কইয়া দিছে সব সময় দুর্বলের পক্ষে থাকতে। বর্বরীক কয় সে হইল গিয়া হারু পার্টির সহায়...

ঘটার কালো মুখ ঝকঝক কইরা উঠে- বুঝলা ছুডু মা। ঋষি দ্বৈপায়নের বংশ আমরা। এই বংশে হগগলেই খালি মারামারি করলে হইব? একটা-দুইটা ঋষিও তো জন্মানো লাগে। আমার মনে লয় এই বংশে আমার পোলা বর্বরীকই হইব পরবর্তী ঋষি...

দ্রৌপদীর তাজ্জব লাগে সতিনের এই পোলাটারে দেইখা। জীবনে কোনো দিনও ঘটারে সে চোক্ষের বিষ রাক্ষুসী সতিনের পোলা ছাড়া কিছু ভাবতে পারে নাই। তীর্থ ভ্রমণের আগে ভীম যখন মালপত্র টানার কামে তারে সংবাদ দিয়া আনল তখনো সে তারে মাগনায় একটা কুলিমজুর ছাড়া কিছু ভাবে নাই। কিন্তু পরতে পরতে হিড়িম্বার পোলাটারে বিস্ময়ে আবিষ্কার করে দ্রৌপদী। কৃষ্ণ তারে স্বীকৃতি দিছে তার সমান যোদ্ধা বইলা। কিন্তু বুদ্ধির প্যাঁচেও যে সে কৃষ্ণরে ধরাশায়ী করতে পারে তা তো নিজের চোখেই দেখছে কিছু দিন আগে। সে বিয়াও করছে স্বয়ংবরায় বুদ্ধির পরীক্ষা দিয়া। দ্রৌপদী মানতে বাধ্য হয়- এই বংশে যদি কেউ যুদ্ধের লগে লগে বুদ্ধিরও চর্চা করে তবে এই ঘটা...

শ্বেতকেতুর আশ্রমের উঠানে বোঁচকা নামাইয়া রাইখা ঘটোৎকচ দ্রৌপদীর দিকে ফিরে- বুঝলা ছুডু মা। তোমার দুর্দশা আর অপমানের গোড়ায় যে দুইজন মানুষ দায়ী তার মধ্যে প্রথমজন কিন্তু ঋষি উদ্দালকের পোলা এই শ্বেতকেতু...

দ্রৌপদী হা কইরা ঘটার মুখের দিকে তাকায়- ক্যামনে? তার লগে কুরু-পাণ্ডবের কোনো সম্পর্ক আছে বইলা তো জানি না। তাছাড়া তিনি তো গত হইছেন আমার বাপ-দাদা চৌদ্দ পুরুষ জন্মানোরও আগে...

- হ। বহুত আগেই মইরা ভূত হইছে হালা। কিন্তু যে সিস্টেম বানাইয়া থুইয়া গেছে সেই সিস্টেমেরই বলি হইছ তুমি...

- মানে?

- মানে এই বেডায়ই পয়লা বিধান করছিল যে বিয়াইত্তা নারীরা হইব স্বামীর ইচ্ছার অধীন। সেই বিধানরে আরো জোরদার করে উতথ্যের পোলা দীর্ঘতমা; যে আবার সম্পর্কে আছিল তোমার দ্রোণচোট্টার জ্যাঠা। আর তাগোর সেই বিধানের জোরেই কিন্তু জ্যাঠায় তোমারে তুইলা দিতে পারছে পাশা খেলার দানে। বুঝলা?

যুধিষ্ঠির তোতলায়। মুনি লোমশ এই কয় দিনে ঘটারে ভালোই চিনছে। সে যুধিষ্ঠিররে বাঁচাইতে গিয়া কয়- এইটা কিন্তু খালি শ্বেতকেতুর আশ্রম না। এইখানে কিন্তু মুনি ভরদ্বাজও বাস করতেন...

ঘটা হাসে- মুনিবর সেই কাহিনিতেও কিন্তু আপনে আমারে ভুলাইতে পারবেন না। ভরদ্বাজের এক পোলা দ্রোণ যেমন এখন কুরু-পাণ্ডব দুই দলেরই পুটকি মারতাছে। আরেক পোলা যবক্রীত যে এইখানে বইসা মুনি-ঋষিগো পুটকিতে আঙ্গুল দিত তা কিন্তু আমি জানি। ...বুঝলা ছুডু মা। দ্রোণ যেমন মূর্খ হইয়াও ব্রাহ্মণের দাবি করে- তার ভাই যবক্রীত তেমনি বেদ না জাইনাই কইয়া বেড়াইত সে বেদ বিশেষজ্ঞ। এইখানে বাপের লগে যবক্রীত যে রৈভ্যের আশ্রয়ে থাকত-খাইত; এক দিন হালায় সেই রৈভ্যেরই পোলার বৌয়ের হাত ধইরা টানাটানি করছিল দেইখা রৈভ্য তারে বাপ ভরদ্বাজের চোখের সামনে শূল দিয়া খোঁচাইয়া নরকে পাঠায়। সেই দুঃখে ভরদ্বাজও কিন্তু আগুনে ঝাঁপ দিয়া নিজের লজ্জা লুকায়। সেই যবক্রীতের ভাই কিন্তু আমার জ্যাঠা-কাকার মহাগুরু চোট্টা দ্রোণ...

- থাউক। আমি আর এই বিষয়ে কিছু শুনতে চাই না। চল কিছু খাওনের বন্দোবস্ত করি...

ঘটা আর কথা বাড়ায় না। কয়েক দিন এইখানে থাইকা পাণ্ডবেরা প্রস্তুতি নেয় কৈলাস পর্বতে উঠার। যুধিষ্ঠির আমতা আমতা করে- এই রাস্তা বহুত কঠিন। সকলে বোধ হয় সেইখানে যাইতে পারব না...

ভীম হাসে- তুমি আর তোমার বামুনের দল পারবা কি না সেইটা কও। পাঞ্চালী আর নকুল সহদেব যদি না পারে তয় আমি তাগোরে কান্ধে কইরা নিয়া যামু...

যুধিষ্ঠির আর কিছু কয় না। সকলেই হাঁটতে থাকে। হাঁটতে হাঁটতে ঘটা দ্রৌপদীরে আস্তে কইরা কয়- অর্জুন কাকু কিন্তু কৈলাসের আশেপাশে আছে। জ্যাঠায় অর্জুন কাকুর লগে নিরালায় কানাকানি করতে চায় দেইখা কিন্তু অন্য সবাইরে কৈলাস যাইতে আপত্তি করছে। কিন্তু আব্বায় যে খোঁচাটা মারছে তাতে জ্যাঠার আর কিছু কওয়ার নাই...

- অর্জুন কৈলাসে আছে তুই জানলি কেমনে?

- জানছি মুনি লোমশের কাছে। কাকু ভালোই আছে এখন। খালি শুরুতে এক কিরাতের লগে বাহাদুরি করতে গিয়া নাকি মরতে বসছিল। পরে মাপ-টাপ চাইয়া বাঁইচা আসছে। এরপরে অবশ্য বেবুঝের মতো আর কোথাও শক্তি দেখাইতে যায় নাই; বিভিন্ন দেশের অতিথিশালায় ঘি-মাখন খাইয়া ভালোই দিন কাটাইছে। কাকু নাকি অস্ত্রশিক্ষা বাদ দিয়া চিত্রসেনের কাছে নাচ-গানও শিখছে এই কয় দিনে...

অর্জুনের প্রসঙ্গে ঘটার লগে আলাপ করতে ইচ্ছা হয় না পাঞ্চালীর। সে চুপচাপ হাঁটে। রাস্তাটা সত্যিই কঠিন। হাঁটতে হাঁটতে গন্ধমাদন পর্যন্ত গিয়া তারা পড়ে তুফানের তলে। দ্রৌপদী আর চলতে পারে না। ভীম ঘটার দিকে তাকায়- মায়েরে কান্ধে নেও পুত...

সতিনের পোলার কান্ধে চইড়া গন্ধমাদন পর্বতে উঠতে থাকে দ্রৌপদী। হা দ্রৌপদী। নিজে সে পাঁচ-পাঁচটা রাজপুত্তুরের জননী। রাজপুত্তুরেরা নানার ঘর রাজবাড়িতেই আরামে আছে। আর যে সতিনের পোলারে কর্ণ দিয়া খুন করার হুমকি সে নিজের মুখে দিছে; তার কান্ধে চইড়াই কি না তারে আইজ পার হইতে হয় দুর্গম পথ। ...দ্রৌপদীর চোখে জল। এই প্রথমবারের মতো সে প্রশংসায় স্মরণ করে হিড়িম্বারে- রাজপুত্তুর দরকার নাই তোমার। ভালোবাসার পুরুষরে বরণ কইরা যে পোলা পাইছ তুমি সহস্র রাজপুত্তুর থাইকাও মহামূল্যবান তোমার এই ঘটা...

সকলে গিয়া হাজির হইল বদরিকাশ্রমে। এইখানে বইসাই সন্ধান পাঠানো হইল অর্জুনের। এইখানে এক সপ্তা থাকার পরে এক দিন একটা ঘটনা ঘটাইল দ্রৌপদী। বাতাসে উইড়া আসা একটা পদ্ম ফুলের পাপড়ি দেইখা সে গিয়া ভীমের কাছে আব্দার জানাইয়া বসে- তুমি যেইখান থাইকা পারো এই ফুলের চারা আমারে আইনা দেও। আমি কাম্যকবনে নিয়া লাগামু এই গাছ...

পাঞ্চালী একখান আব্দার করছে আর ভীম বইসা থাকব? সে অস্ত্রপাতি নিয়া জঙ্গল তছনছ কইরা খুঁজতে লাগে সেই ফুলগাছ। জঙ্গলের সব পশুপাখি দৌড়াইলেও হনুমানের দল আইসা থাবাইয়া খামচাইয়া ভীমেরে এক্কেবারে অস্থির কইরা ফালায়। ভীম পয়লা হনুমানের লগে মারামারি করতে গেলেও শেষে পলাইয়া বাঁইচা গিয়া হাজির হয় যক্ষরাজ কুবেরের দিঘিতে। সেইখানেই ফুইটা আছে শতে শতে এই ফুল। ভীমেরে আর আটকায় কেডা? কিন্তু ভীম যেই পানিতে নামতে গেছে অমনি কুবেরের সেপাইরা আইসা শুরু করে আক্রমণ। ভীমও শুরু করে গদার খেলা। শতে শতে কুবের সৈন্য পড়তে থাকে ভীমের গদার বাড়িতে। এই দিকে ভীমের সন্ধান নিয়া যুধিষ্ঠির যখন শুনল সে দ্রৌপদীর ফুল আনতে গেছে। তখনই যুধিষ্ঠির আরেক দফা ডর

খাইল। এইটা কুবেরের এলাকা। ফুল আনতে গিয়া যদি আবার ভীম কুবেরের লোকজনের লগে ঝামেলা পাকায়?

ঘটাসহ সকলরে নিয়া দৌড়াইতে দৌড়াইতে যুধিষ্ঠির দিঘির ঘাটে গিয়া দেখে সে যা ভয় করতাছিল তাই ঘটাইছে ভীম। অনেক লোকরে মাইরা চ্যাপটা কইরা ফালাইছে সে। যুধিষ্ঠির ভীমেরে দাবড়ানি দিয়া বাকিদের মাথায় হাত-টাত বুলাইয়া মাফ চাইয়া লড়াই থামায়। ঘাড় থাইকা গদা নামাইয়া ভীম ঘটার কাছে গিয়া পইড়া থাকা লোকগুলারে দেখায়- দেখলি কেমন পিডানিডা দিলাম?

- হ। তা দিছ। কিন্তু বেহুদা। একটা ফুলগাছ যেখানে মানুষ চাইলেই দেয় সেইখানে লাঠালাঠি করা কোনো কামের কথা না...

ভীমের বড়োই ইচ্ছা আছিল পোলারে নিজের বাহাদুরি দেখায়। কিন্তু হালায় যেন তার জ্যাঠা থাইকাও বড়ো ধার্মিক...

ভীম আরেকটা চান্স পায় পোলারে নিজের কেরামতি দেখানোর। এক দিন পোলারে নিয়া সে গেছে শিকারে। এমন সময় শোনে আকুলিবিকুলি কইরা সহদেবের চিক্কুর। গিয়া দেখে তীর্থযাত্রী দলের এক ব্রাহ্মণ যুধিষ্ঠির নকুল সহদেব আর দ্রৌপদীরে বাইন্ধা থুইয়া সকল অস্ত্র আর অলংকার নিয়া পলাইতাছে। ঘটা কয়- ব্রাহ্মণ মারলে তুমি প্রায়শ্চিত্ত কইরা কূল পাইবা না। পাবলিকে কোনো দিনও ব্রাহ্মণের খুনিরে রাজা হিসাবে মাইনা নিব না। তার থাইকা তুমি খাড়াও আব্বা। আমি ওইটারে থাপড়াই...

ভীম পোলার দিকে তাকাইয়া হাসে- বাপের বুদ্ধিতেও কিছুটা ভরসা রাখিস ব্যাটা। দেখ না কৃষ্ণের থিউরি দিয়া কেমনে ওর ব্রাহ্মণত্ব ছাড়াই...

ব্রাহ্মণরে কাইত করতে ভীমের একটার বেশি কিলের দরকার হয় না। দুই পা ধইরা টান দিয়া তারে দুই টুকরা করতেও কষ্ট হয় না ভীমের। ব্রাহ্মণের দুই টুকরা শরীর দুই দিকে ফিককা ফালাইয়া ভীম সকলের বান্ধন-বুন্ধন খুইলা দিয়া যুধিষ্ঠিরের সামনে খাড়ায়- আমি আগেই সন্দেহ করছিলাম ভাইজান; এইটা কোনো ব্রাহ্মণ না। এইটা হইল রাক্ষস জটাসুর। ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ ধইরা আছিল বইলা আমি তারে কিছু কই নাই। এখন দেখলেন তো এইটা আসলেই রাক্ষস?

যুধিষ্ঠির মিনমিন করে- তা অবশ্য ঠিক। তা অবশ্য ঠিক। এইটা তো ব্রাহ্মণ না। এইটা তো সত্যই একটা রাক্ষস। রাক্ষস বধ কইরা তুমি যেমুন তোমার পরিবাররে বাঁচাইছ তেমনি বহুত পুণ্যিরও কাম করছ ভাই...

ভীম দুই মুষ্টি উপরে তুইলা ধৌম্য আর বাকিসব ব্রাহ্মণের দিকে ফিরে। সাথে সাথে সকল ব্রাহ্মণ মাথা ঝাঁকায় যুধিষ্ঠিরের সুরে- হ হ। ঠিক কথা। আমরা না চিনলেও রাক্ষস-খোক্কশ এইগুলা ভীম সব থিকা ভালো কইরা চিনে। বহুত রাক্ষস যেমন মারছে তেমনি রাক্ষসকুলে বিবাহ কইরা একটা সন্তানও জন্ম দিছে ভীম। ভীম যখন কইছে এইটা রাক্ষস জটাসুর; আমরাও কই সে রাক্ষস জটাসুরই বটে...

ভীম পোলার দিকে তাকায়- কী রে? তুই না কইছিলি প্রায়শ্চিত্তি করা লাগব? এখন দেখলি তো কতটা পুণ্য কামাইছে তোর বাপ?

পাণ্ডবেরা সিদ্ধান্ত নিল অর্জুনের অপেক্ষায় বদরিকাশ্রমে থাকার। ঘটা বলে- আমি তয় বৌ পোলা আর মায়ের কাছে যাই...

বাপ-জ্যাঠা-কাকার কাছে বিদায় নিয়া ঘটা একটা পেন্নাম কইরা খাড়ায় দ্রৌপদীর সামনে- লাগলে সংবাদ দিও জননী। মায়ের লগে যেই আচরণ করি সেই আচরণে তোমারও অধিকার আছে। আর যদি এর মইদ্যে দেখা না হয়; তাইলে নয় বচ্ছর পরে দুই পোলারে নিয়া হাজির হমু পাণ্ডবপক্ষের যুদ্ধে। তখন দেখা হইব। আশা করি তখন তোমার কর্ণের হাতে মরার আগে সামনা-সামনি একটা ফাইটেরও সুযোগ পামু আমি...

ধক কইরা উঠে দ্রৌপদীর বুক। কী কুক্ষণে কী কথা বাইর হইছিল তার মুখে। ঘটারে জড়াইয়া ধরে পাঞ্চালী- রানি দ্রৌপদীরে জননী দ্রৌপদী বানাইবার পরে আর ওই কথা মনে রাখিস না বাপ...

ঘটা মনে মনে হাসে- তুমি না জানলেও আমি কিন্তু কর্ণের পরিচয় জানি ছুডু মা। তুমি বেশি বড়ো কোনো অভিশাপ দেও নাই আমারে। তুমি খালি কুন্তীর ভাসাইয়া দেওয়া বড়ো পোলার সামনে খাড়া কইরা দিছ কুন্তীর ফেলাইয়া আসা বড়ো নাতিটারে। অভিশাপ যারে যা দিবার দাদি কুন্তীই তা দিয়া থুইছে আগে...

১০

নারদের বুদ্ধিতে একেক ভাইয়ের ঘরে দ্রৌপদীর বার্ষিক পালা ঠিক হইবার পর অর্জুন যাইচা অপরাধ করে বারো বচ্ছরের নির্বাসন-শাস্তি নিয়া পথে পথে তিনটা বিয়া কইরা শেষে ফিরছিল দেশে। আর বনবাসের শুরুতেই আবার সে অস্ত্র সংগ্রহের নামে আরো পাঁচ বচ্ছরের লাইগা চইলা যায় দ্রৌপদী থাইকা দূরে। তাই এইবার অর্জুন ফিরা আসলে সমস্ত পালাটালা ভাইঙ্গা যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীরে বরাদ্দ দেয় অর্জুনের ঘরে। কিন্তু এই অর্জুন তো আর সেই অর্জুন নাই। পাঁচ বচ্ছরের অস্ত্র সংগ্রহকালে কোথায় যেন কী করতে গিয়া বিচি হারাইয়া ফিরতে হইছে তার।

দ্রৌপদী হাসে- থাউক। সময়কালে দূর কইরা দিয়া অসময়ে কাছে আসার দরকারই বা কী?

আগে গেছে ছয় বছর। এখন গেলো চাইর। এগারো বছরের শুরুতে ভীম কয়- এইবার তো আমাগো প্রস্তুতি নেওয়া লাগে। যুধিষ্ঠিরও যুক্তি মানে। ভীমের সংবাদ পাইয়া আবার আইসা হাজির হয় ঘটোৎকচ। অর্জুন খুঁইটা খুঁইটা ভাতিজার যুদ্ধকৌশল দেখে। অর্জুন যুদ্ধ করে লক্ষ্য নির্দিষ্ট কইরা। নির্দিষ্ট শত্রু লক্ষ্যের ভিতরে না আসলে অস্ত্র উঠায় না সে; যেইখানে ভীমের কৌশল গণমাইর; কে মরল আর কে বাকি থাকল তা দিনের শেষে গিয়া সে হিসাব করে। ঘটোৎকচ বাপের গদাম কৌশলের লগে আয়ত্ত করছে তার মাতৃ বংশের মায়াযুদ্ধের কৌশল। তার উপরে হাতল অস্ত্রে দুর্ধর্ষ সে। বল্লম কুড়াল তলোয়ার তিনটাই চালাইতে পারে ম্যাজিকের মতো। এর শরীরটা যেন লোহার হাড্ডির উপর রাবারের মাংস দিয়া তৈরি। মারলে মাইর ফিরা আসে কিন্তু কিছুই লাগে না ঘটার। ভাতিজার লড়াইকৌশল দেইখা অর্জুন যুধিষ্ঠিরের দিকে তাকায়- ঘটায় কিন্তু কর্ণরে ফাইট দিবার যোগ্যতা রাখে ভাইজান...

খুশিতে ডগমগ করে ভীম। ফকিন্নির পোলা কর্ণ তারে মাকুন্দা কইয়া গালি দিলেও সে তার কিচ্ছু করতে পারে নাই কোনো দিন। তার পোলায় যদি কর্ণরে কিলাইতে পারে তয় ভীমের থাইকা বেশি খুশি হইব না কেউ...

লোমশ থাইকা গেলেন গন্ধমাদনে। পাণ্ডবরা রওনা দেয় ফিরতি পথে। সতিনের পোলা ঘটার কান্ধে চইড়া ফিরতে ফিরতে মুখ লুকাইয়া কান্দে পাঁচ পোলার জননী দ্রৌপদী। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ অর্জুন সকলেই সর্বদা কর্ণরে ফাইট দিবার মতো যোদ্ধা খোঁজে। কৃষ্ণ আগে ইঙ্গিত দিয়া গেছে ঘটার শক্তি বিষয়ে। এইবার অর্জুন সেই ইঙ্গিতরে প্রায় সিদ্ধান্তে নিয়া গেছে; অর্জুনের আগে পাণ্ডব বংশের কেউ যদি কর্ণের সামনে খাড়ায় তবে নিশ্চিত সেইটা ঘটোৎকচ। কিন্তু দ্রোণ আর পরশুরামের শিষ্য কর্ণের সামনে কতক্ষণ টিকব স্বশিক্ষিত ঘটার রণকৌশল? ঘটার কান্ধে বইসা নিঃশব্দে তড়পায় দ্রৌপদী। তার অভিশাপ কি তবে সত্যিই ফলে যাবে এক দিন?

বৃষপর্বার আশ্রমে এক রাইত আর বদরিকায় এক মাস থাইকা সকলে কিরাতরাজ সুবাহুর রাজ্যে উপস্থিত হইলে ঘটা বিদায় নেয়। ভীম তার কান্ধে চাপড় দেয়- যা বেটা পোলাগো নিয়া তৈয়ার হ...

ঘটোৎকচ বাপ-কাকা আর মায়েরে পেন্নাম কইরা গিয়া যুধিষ্ঠিরের সামনে খাড়ায়- ভাতিজা এখনই যুদ্ধের লাইগা তৈয়ারি জ্যাঠা; খালি তোমার নির্দেশখান বাকি...

যুধিষ্ঠির বুকে বল পায়। ঘটোৎকচের বাহিনী আসন্ন মহাযুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষের পয়লা বাহিনী; কর্ণের সামনে খাড়াইবার মতো পয়লা যোদ্ধাও ঘটোৎকচ। যুধিষ্ঠির ঘটারে জড়ায়ে ধরে- সময় আসুক বাপ...

ঘটা বিদায় নিবার পর তারা আইসা উপস্থিত হয় যমুনার উৎপত্তিস্থান বিশাখাযুপ। বিশাখাযুপে এক বছর বাসকালে এইখানেও ঝামেলা করতে গিয়া ভীম বান্ধা খায় নহুষ বংশের কাছে আর আবারও যুধিষ্ঠির গিয়া হাত জোড় কইরা তারে ছাড়াইয়া আইনা সইরা আসে দ্বৈতবনে...

বারো বচ্ছর পূর্ণ হইবার কয়েক মাস আগে কৃষ্ণ আবার আইসা হাজির হয় পাণ্ডবগো কাছে। এইবার সত্যভামা ছাড়া কাউরে সে সাথে আনে নাই। সকলের লগে কুশল বিনিময় কইরা কৃষ্ণ তাকায় যুধিষ্ঠিরের দিকে- মহারাজ। যাদবসেনারা যুদ্ধের লাইগা এখন সম্পূর্ণ প্রস্তুত। চাইলে এখনই আমরা যুদ্ধ কইরা আপনারে আপনের রাজ্য জয় কইরা দিতে পারি। আপনি ইচ্ছা করলে সেই রাজ্যে এখনই যাইতে পারেন আবার চাইলে বনবাসের মেয়াদ শেষ কইরাও ফিরতে পারেন...

যুধিষ্ঠির হালকা স্বরে কয়- অত দিন যখন অপেক্ষা করছি বাকি কয়টা দিন না হয় অপেক্ষাই করলাম। খামাখা কয়টা দিনের লাইগা আর পণ না ভাঙ্গি...

মুনি মার্কণ্ডেয় আইসা পড়ায় কথা আর বেশিদূর আগায় না। কৃষ্ণ আর পাণ্ডবেরা শুনতে থাকে মুনি মার্কণ্ডেয়র পুরাণকথা আর সত্যভামা দ্রৌপদীরে নিয়া গিয়া আড়ালে খাড়ায়- তুমি তো পাঁচ-পাঁচটা স্বামীরে সামলাইয়া রাখো; আমারে একটু বুদ্ধি দেও তো বইন যাতে কৃষ্ণরে আমি ধইরা রাখতে পারি?

দ্রৌপদী হাসে- ভাতার যদি টের পায় তুমি তারে বাইন্ধা রাখতে চাও তাইলে কিন্তু পলাই পলাই করব। তুমি বরং স্বাভাবিক থাইকো। তয় মাঝে মাঝে যদি তারে বুঝাইয়া দিও যে তারে ছাড়া তুমি দুনিয়ার কাউরে পোছো না তাইলেই সোনায় সোহাগা। তবে একটা কথা; স্বামীর সামনে নিজের পোলারেও কিন্তু বেশি খাতির কইরো না কোনো দিন...

বারো বচ্ছরের বাকি সময় পাণ্ডবরা দ্বৈতবনেই ঘর তুইলা থাকে। সংবাদ পাইয়া দুর্যোধনের মনে হয়- যাই নিজের চোক্ষে একবার পাণ্ডবগো দুর্দশা দেইখা আসি...

পাণ্ডবগো আস্তানার কাছেই আছিল দুর্যোধনের গোপপল্লি। দুর্যোধনের প্রস্তাব নিয়া কর্ণ আর শকুনি যায় ধৃতরাষ্ট্রের কাছে- এই বছর পালের গরুবাছুর তো গোনাগুনতি দরকার। শিকারের লাইগাও সময়টা উপযুক্ত। তাই দুর্যোধনের ঘোষযাত্রা আর শিকারের অনুমতি প্রার্থনা করি মহারাজ...

আন্ধা ধৃতরাষ্ট্র চোখ পিটপিট করেন- প্রস্তাব ভালো আর দরকারিও বটে; কিন্তু হুনছি গোপপল্লির কাছেই এখন পাণ্ডবেরা থাকে। যুধিষ্ঠির ঠান্ডা মানুষ; তোমাগো দেখলে সে কিছু বলব না। কিন্তু ভীমের মেজাজ আর পাঞ্চালীর রাগের কথা ভাইবা আমার বড়ো ডর লাগে। তোমরা সেইখানে গিয়া লাফালাফি করবা আর তারা বইসা থাকব এইটা ভাবতে আমার কষ্ট হয়। তাছাড়া শুনছি এর মধ্যে অর্জুন নাকি বহুত অস্ত্রও জোগাড় কইরা ফালাইছে...

শকুনি কয়- কথা দেই মহারাজ; পাণ্ডবরা যেই দিকে আছে সেই দিকে আমরা পাও বাড়ামু না। আমরা খালি পালের গরুবাছুর গোনাগুনতি কইরা দুই-চাইরটা শিকার সাইরা আবার ফিরা আসব ঘরে...

ধৃতরাষ্ট্র মিনমিন কইরা অনুমতি দিলেও দুর্যোধনরে ডাইকা কন- তোর যাওয়ার কাম নাই বাপ। তুই বরং ঘোষযাত্রায় অন্য লোক পাঠা...

কিন্তু অন্যের চোখ দিয়া কি আর ছালবাকলা পরা পাণ্ডব আর দ্রৌপদীর দুরবস্থা দেইখা সুখ পাওয়া যাবে? দুর্যোধন বরং বাড়ির সব বৌদের বস্ত্রে অলংকারে

সাজুগুজু করাইয়া সাথে নিয়া রওনা দেয় মৃগয়ায়। কৌরবগো শান শওকত দেইখা নিশ্চয় মনের জ্বালা আরেক কাঠি বাইড়া যাবে পাণ্ডব আর পাঞ্চালীর...

গেছে গরুবাছুর গুনতে আর শিকার করতে। তাই হাতে গোনা কিছু দেহরক্ষী আর কামলা গোছের মানুষ ছাড়া দুর্যোধনের লগে তেমন সৈন্যসামন্ত নাই। তারা ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারে নাই যে পাণ্ডবগো আশেপাশেই মৃগয়ার নামে সৈন্যসামন্ত নিয়া অর্জুনের দোস্ত গান্ধর্বরাজ চিত্রসেন পাহারা দিতাছে তাদের। ঝামেলাটা সেইখানেই ঘটে। দুর্যোধনের খেলাধুলার ঘরবাড়ি বানাইতে গিয়া তার কামলারা মারামারি বাঁধাইল চিত্রসেনের আর্মিগো লগে আর চিত্রসেন আইসা দিলো সব তছনছ কইরা। রথ হারাইয়া কর্ণ দিলো চম্পট আর চিত্রসেন দুর্যোধনের লগে বাড়ির সব মাইয়াদের বাইন্ধা রওনা দিলো নিজের শিবিরে...

দুর্যোধনের চ্যালারা আইসা পড়ল যুধিষ্ঠিরের পায়- রক্ষা করেন মহারাজ। আপনার পরিবারের মাইয়াগো ধইরা নিয়া গেছে চিত্রসেন

ভীম কয়- খারাপ কী? আমরা যা করতে চাই; চিত্রসেন তা আগেই কইরা ফালাইছে। ভালৈ তো...

কিন্তু বংশের নারীগো নিয়া চিত্রসেনের টানাটানি পছন্দ করে না যুধিষ্ঠির। সে ভীম আর অর্জুনরে পাঠায় তাগোরে উদ্ধার কইরা আনতে। অর্জুনরে দেইখা চিত্রসেন হাসে- কও দোস্ত। কী করতে হবে?

অর্জুন কয়- মেয়েগো ছাড়ো আর দুর্যোধনরে বাইন্ধা নিয়া চলো যুধিষ্ঠিরের কাছে...

ছালবাকলা পইরা বইসা আছে যুধিষ্ঠির আর তার সামনে রাজার পোশাক পরা দুর্যোধনরে বাইন্ধা নিয়া আসছে চিত্রসেন। বাড়ির যে মাইয়াগো সে নিয়া আসছিল দ্রৌপদীর দুর্দশা দেখাইতে; তারা এখন দ্রৌপদীর উঠানে দুর্যোধনরে দেখতাছে যুধিষ্ঠিরের সামনে হাঁটু মুইড়া বসতে...

দুর্যোধন মাথা তোলে না। যুধিষ্ঠির চিত্রসেনরে কয় হাতের বাঁধন খুইলা দিতে। দুর্যোধন উইঠা খাড়ায়। যুধিষ্ঠির তার দিকে তাকাইয়া কয়- যাও বাড়ি যাও। সব জায়গায় বাহাদুরি দেখাইতে যাইও না...

শত্রুর দয়ায় প্রাণ নিয়া বাঁইচা থাইকা কী লাভ? দুর্যোধন সবাইরে হস্তিনাপুর ফিরা যাইবার আদেশ দিয়া নিজে সিদ্ধান্ত নেয় আত্মহত্যার। ভাইয়েরা তার পায়ে ধইরা কান্দাকাটি করে। মামা শকুনি হাতে ধইরা বোঝায় কিন্তু দুর্যোধন এই জীবন রাখব না আর। সব দেইখা কর্ণ আইসা খাড়ায় দুর্যোধনের সামনে- হইছেটা কী শুনি? যুদ্ধে সেনাপতিরা শত্রুর হাতে ধরা খায় এইটা কি নতুন কিছু? বন্দি হইবার পরে সৈন্য আর প্রজারা আবার সেনাপতিরে শত্রুর হাত থাইকা ছাড়াইয়া আনে; সেইটাও তো নতুন কিছু না। পাণ্ডবগোরে তুমি শত্রু মনে করতাছ কেন? তারা এখন তোমার রাজ্যে বসবাস করা প্রজা। তাগোর দায়িত্ব হইল রাজা দুর্যোধনরে শত্রুর হাত থাইকা ছাড়াইয়া আনা। তারা যা করছে তা অনুগত প্রজার দায়িত্বের বেশি কিছু করে নাই। তুমি তাগোরে ধন্যবাদ দিছ তাতেই তাগো জীবন ধন্য হইবার কথা। এইবার লও বাড়ি যাই...

কিন্তু এই যুক্তি দিয়া কি দুর্যোধন নিজেরে সান্ত্বনা দিতে পারে? সে কয়- কর্ণ তোমরা যাও; গিয়া রাজ্য শাসন করো। আমি বরং মরি...

কর্ণ এইবার দুর্যোধনরে একটা ঝাঁকি দেয়- বেকুবি কইরো না কইলাম। মান-অপমান ওইগুলা ব্রাহ্মণের বিষয়। ক্ষত্রিয়ের কাজ শত্রুমারা। নিজে মইরা গেলে কোনো দিনও শত্রু মারার সম্ভাবনা নাই বরং বাঁইচা থাকলেই কিছু না কিছু চান্স পাওয়া যায়। চলো গিয়া সেই বন্দোবস্ত করি...

হস্তিনাপুর ফিরা আইসাই দুর্যোধন পড়ে ভীষ্মের সামনে- কইছিলাম না যাইও না? লাফাইতে লাফাইতে তো গেলা; সেইখানে কী হইছে তার সংবাদ রাখি না মনে করো? তোমার গাড়োয়ানের পোলা কর্ণ তো পয়লা ধাক্কাতেই তোমারে থুইয়া পলাইছে। শেষ পর্যন্ত তো পাণ্ডবগো দয়াতেই বাঁইচা বাড়ি ফিরলা? কই? নিজের শানশওকত ঠিকমতো দেখাইতে পারছিলা তো পাঞ্চালীরে?

দুর্যোধন ভীষ্মের কথার কোনো উত্তর না দিয়া হাঁটে। বাড়িতে গিয়া ঝিমায়। বাঁচা-মরার প্রশ্নে না হয় মান-সম্মান তুচ্ছ কিন্তু বাঁইচা থাকলে তো সম্মান লাগে। ভীষ্ম খোঁচাইব; প্রজারা হাসব এইটা তো হইতে পারে না। এমন একটা কিছু করতে হবে যাতে সবাই এই প্রসঙ্গটা ভুইলা যায়...

রাজা হিসাবে বড়োসড়ো কিছু করা মানে হইল বড়োসড়ো যুদ্ধের জয় না হয় বড়ো একখান যজ্ঞ করা। বড়ো যুদ্ধের যেহেতু আপাতত সুযোগ নাই তাই যজ্ঞই করব দুর্যোধন। যজ্ঞের মইদ্যে সবচে বড়ো রাজসূয় যজ্ঞ। কিন্তু সেইখানে একটা সমস্যা আছে। বংশে রাজসূয় যজ্ঞ করছে আপনা কাকাতো ভাই যুধিষ্ঠির। আর রাজা হিসাবে এখনো জীবিত আছে নিজের বাপ ধৃতরাষ্ট্র; যার আবার রাজ্যে অভিষেক হয় নাই কোনো দিন। সে মূলত এখনো ভাই পাণ্ডুর রাজ্যের ভারপ্রাপ্ত রাজা। বংশে রাজসূয় যজ্ঞ করা ব্যক্তি জীবিত থাকতে যেমন দ্বিতীয় কেউ তা করতে পারে না তেমনি নিজের বাপ ভারপ্রাপ্তেরও রাজসূয় করার সুযোগ নাই। তাই দুর্যোধনের লাইগা একমাত্র বিকল্প হইল রাজসূয় যজ্ঞ থাইকা কিছুটা কম মর্যাদার বৈষ্ণব যজ্ঞ; করদ রাজাগো কাছ থিকা কর তুইলা সেই টাকায় সোনার লাঙ্গল বানাইয়া মাটি চইষা উদ্বোধন হবে এই যজ্ঞের...

কিন্তু যজ্ঞের ঝকমকানি ছালবাকলা পরা পাণ্ডবগো তো দেখাইতে হয়। দুর্যোধন পাণ্ডবগো নিমন্ত্রণ পাঠায় যজ্ঞে যোগদানের। যুধিষ্ঠির বিনয়ের সাথে প্রত্যাখ্যান কইরা কয়- এখন হস্তিনাপুর গেলে যে বনবাসের শর্ত লঙ্ঘন হয়; তাই আমরা যাইতে অপারগ। তয় দুর্যোধনের লাইগা আমার আশীর্বাদ থাকল। তারে কইও আমাগো তেরো বচ্ছর পূর্ণ হইলে হস্তিনাপুরে আবার দেখা হইব আমাদের...

ভীম কয়- হ। তেরো বছর পূর্ণ হইলে আমরা হস্তিনাপুর গিয়া দুর্যোধনরে আগুনে ফালাইয়া যে যজ্ঞ করুম; সেইখানে তার লগে দেখা হইব আমাদের...

যজ্ঞ শেষে কেউ কয় যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ থাইকা ভালোছে; কেউ কয় খারাপ। কর্ণ কয়- দুঃখ কইরো না দুর্যোধন। পাণ্ডবরা নিপাতে গেলে রাজসূয় যজ্ঞ করবা তুমি। তবে তোমার এই যজ্ঞ যেমনই হোক না কেন; এই যজ্ঞের পুণ্যের লগে তুমি কর্ণের একটা একটা পণ যোগ করো আইজ- যত দিন অর্জুন বাঁইচা থাকব তত দিন এই কর্ণ মদ-মাংস খাবে না আর কেউ কিছু চাইলে কোনো অবস্থাতেই তারে না বলব না আমি...

যজ্ঞের কোনো সংবাদেই কান তোলে না যুধিষ্ঠির। সে খালি ভাবতে থাকে কর্ণের পণ- যত দিন অর্জুন জীবিত থাকব তত দিন কেউ তার কাছে কিছু চাইলে কোনো অবস্থাতেই তারে না বলবে না সে। তার মানে অর্জুনরে হত্যা না করার বর চাইলেও কর্ণ তা দিব। যুধিষ্ঠির ভাবতে থাকে কর্ণের কাছে কী চাওয়া যায়। এমন সময় দ্বৈপায়নের কথায় পাণ্ডবরা জায়গা বদলাইয়া ফিরা আসে কাম্যকবনে। কারণ বনের এক জায়গায় বেশি দিন বসবাস করলে বনের যেরম ক্ষতি হয় সেরম নিজেরও শিকড় গজায়। ওই দিকে দুর্যোধন কোনোমতেই ভুলতে পারে নাই কোনো অপমান। পাণ্ডবরা তার যজ্ঞের নিমন্ত্রণেও সাড়া দেয় নাই। এরি মধ্যে এক দিন মুনি দুর্বাসার দেখা পায় দুর্যোধন। একটু খবিস কিসিমের এই মুনি। বদরাগী আর কথায় কথায়

মাইনসেরে অভিশাপ দেওয়া তার কাম। তেলবাজ মুনি দুর্বাসারে খুশি করা খুব কঠিন। সেই যুগে একবার মাত্র তারে খুশি করতে পারছিল কুন্তী আর এই যুগে তারে তেল মারতে মারতে খুশি কইরা ফালায় দুর্যোধন। মুনি তার সেবায় খুশি হইলে সে কয়- আমার উপ্রে যদি আপনি খুশি হইয়া থাকেন তয় আমার একটা অনুরোধ রাখেন। আপনি তো জানেন যে আমার বড়ো ভাই যুধিষ্ঠির খুব ভালা মানুষ। সে এখন বনে আছে। আমারে সে কইয়া দিছে যে আপনারে পাইলে যেন কই আপনি আপনের শিষ্যগো নিয়া তার বনবাসের বাড়িতে এক দিন নিমন্ত্রণ খাইতে যান...

পঙ্গপালের মতো এক পাল শিষ্য নিয়া সত্যি সত্যি এক দিন যুধিষ্ঠিরের কাম্যকবনে গিয়া হাজির হয় দুর্বাসা মুনি- খাইতে আইলাম তোমাদের ঘরে...

দুর্যোধন দুর্বাসারে যুধিষ্ঠিরের ঘরে খাইতে পাঠায় নাই। পাঠাইছে যুধিষ্ঠিরের বাড়িতে খাইতে না পাইয়া দুর্বাসা কী অভিশাপ দেয় তা দেখার লাইগা। কিন্তু কৃষ্ণ যে সেই দিন সেইখানে উপস্থিত সেইডা তো আর জানে না কেউ। মুনি আইসা খাইতে চাইলে যুধিষ্ঠির কয়- ঠিকাছে; যান নদী থাইকা স্নান কইরা আসেন। দ্রৌপদী কপাল থাবড়ায়-এখন কেমনে কী করি। বনবাসে আসার শুরুতেই ধৌম্য তারে যে তামার পাত্রখান দিছে; তাতে খুব দ্রুত রান্না হইলেও দুর্বাসার পঙ্গপালের লাইগা খাওন পাকানোর টাইম তো তাগো গোসলের টাইম থাইকা বহুত বেশি হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু স্নান শেষ কইরা আইসা যদি দুর্বাসা খাওন না পায় তো ছারখার কইরা দিব সব...

কৃষ্ণ দ্রৌপদীরে থামায়- খাড়াও দেখতাছি আমি...

কৃষ্ণ এক লোকেরে দিয়া দুর্বাসার কাছে সংবাদ পাঠায়- কও গিয়া বসুদেবের পোলা কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের বাড়ির সব খাওন খাইয়া ফালাইছে আইজ...

কৃষ্ণের নাম শুইনা দাড়ি লোম সব খাড়া হইয়া উঠে দুর্বাসার। গোসলটোসল বাদ দিয়া সে শুরু করে দৌড়। শিষ্যরা জিগায়- গুরু কই যান? দৌড়াইতে দৌড়াইতে মুনি কয়- পলাও। যাদব জাউরা কৃষ্ণের লগে মুনিগিরি করা ঠিক না। মাইরা থুইয়া কইয়া দিব পূর্বজন্মে আছিলাম রাক্ষস। খাওনের কাম নাই পলাও...

কাম্যকবনেই আরেক ঘটনা ঘটে অন্য দিন। পাণ্ডবরা গেছে শিকারে। বাড়িতে দ্রৌপদী আর পুরোহিত ধৌম্য। এই সময় ধৃতরাষ্ট্রের মাইয়া দুঃশলার জামাই সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ আরেকটা বিয়ার আশায় যাইতেছিল শাল্বরাজ্যে। পথে কাম্যকবনে দ্রৌপদীরে দেইখা তার মাথা আউলা- এই বনে এমন সুন্দরী নারী কেমনে কী? এর সামনে তো অন্য মাইয়ারা বান্দরের সমান...

জয়দ্রথের চ্যালা কোটিকাস্য সংবাদ নিয়া আইসা বিস্তারিত জানাইলে জয়দ্রথ কয়- শাল্বরাজ্যে গিয়া কাম নাই। এরেই বিয়া করব আমি...

জয়দ্রথ নিজে আউগাইয়া গিয়া প্রস্তাব তোলে দ্রৌপদীর কাছে- ফকির পাণ্ডবগো লগে থাইকা কী করবা তুমি? তার থাইকা আমারে বিবাহ কইরা তুমি হও সিন্ধুর রানি...

দ্রৌপদী ধাক্কা মাইরা জয়দ্রথরে মাটিতে ফালাইয়া দিলেও জয়দ্রথ তারে বাইন্ধা নিজের রথে তুইলা ফালায়। রথ চলা শুরু করলে দ্রৌপদী চিক্কুর দিয়া ডাকে ধৌম্যরে আর চলন্ত রথের পিছনে দৌড়াইতে দৌড়াইতে ভীমের নাম ধইরা চিল্লায় ধৌম্য পুরোহিত- ভীম। কই গেলিরে ভীম...

ধৌম্যের চিক্কুর আর ঘোড়ার দাগ দেইখা পাণ্ডবেরা পৌঁছাইয়া যায় জয়দ্রথের কাছে। মাইরের শুরুতেই ভীমের হাতে চ্যাপটা হয় কোটিকাস্য। দ্রৌপদীরে ছাইড়া জয়দ্রথ পলায়। যুধিষ্ঠির আশ্রমে ফিরা আসে দ্রৌপদী ধৌম্য আর নকুল সহদেবরে নিয়া। ভীম আর অর্জুন ধাওয়া দেয় জয়দ্রথের পিছে। যুধিষ্ঠির অর্জুনরে কইয়া দেয়- ওরে জানে মাইর না। ও আমাগো বইনের জামাই...

ভীম তার চুলের মুঠি ধইরা আছড়ায়। অর্জুন কয়- যুধিষ্ঠির কইছেন তারে জানে না মারতে...

ভীম কয়- এ হালা দ্রৌপদীরে অসম্মান করছে এর বাঁচার কোনো অধিকার নাই...

কিন্তু অর্জুন ভীমেরে সামলায়। ভীম টাইনা জয়দ্রথের মাথার চুল ছিঁড়া ফালাইয়া ধইরা নিয়া আসে দ্রৌপদীর কাছে...

যুধিষ্ঠির কয়- যথেষ্ট শিক্ষা হইছে তার। এইবার জননী গান্ধারী আর বইন দুঃশলার কথা ভাইবা এরে ছাইড়া দেও...

ভীম কয়- তোমার কথায় ছাড়া যাইবা না তারে। পাঞ্চালী যদি ছাড়তে কয় তবেই শুধু ছাড়া পাইব সে...

যুধিষ্ঠিরের দিকে তাকাইয়া দ্রৌপদী হাসে- যে আমারে জুয়ার দানে তুলতে পারে তার কাছে আমার অসম্মান আর কী এমন বিষয়? দেও। তোমাগো বোনাইরে ছাইড়াই দেও...

অজ্ঞাতবাসে যাইবার আগে আগে জয়দ্রথরে ধরা-মারার থাইকা কর্ণের নিবীর্যকরণ বেশি গুরুত্বপূর্ণ যুধিষ্ঠিরের কাছে। কর্ণের কাছে অর্জুনের প্রাণভিক্ষা চাওয়া হবে চূড়ান্ত অসম্মানের বিষয়। তাই কর্ণের প্রতিজ্ঞার ফাঁক দিয়া কর্ণরেই কাবু করার বিষয়ে লোমশ মুনি পরামর্শ দিছেন এবং নিজেই দায়িত্ব নিছেন কর্ণরে দুর্বল করার। সেই সংবাদটা এইমাত্র আইসা পৌঁছাইছে যুধিষ্ঠিরের কানে। আইজ এক ব্রাহ্মণ কর্ণের কাছে গিয়া চাইয়া বসছে তার তামার তৈয়ারি অভেদ্য বর্ম আর কানবন্ধনীখান...

কর্ণের তামার বর্মটা তির দিয়া ভেদ করা সম্ভব না। বনবাসের শুরুতে পুরোহিত ধৌম্য দ্রৌপদীরে যে পাত্রখান দিছেন সেইটাও একই ধাতুর জিনিস; সূর্যের আলো পড়লে ঝকঝক করে বইলা সকলে দ্রৌপদীর পাত্রখানরে সূর্যদত্ত কয়। কর্ণের বর্মখানও সূর্যবর্ম নামে বিখ্যাত। মূলত বহু দূরের বঙ্গ মুল্লুকে আছে এই ধাতুর খনি। আর্যগো হাতে সিন্ধুপারের দেশগুলা ধ্বংস হইবার আগে বঙ্গের বেপারিরা এই সব ধাতুর জিনিসপত্র আইনা বেচাবিক্রি করত সিন্ধুপারের নগরে বাজারে। কিন্তু এখন সেই সব বাজার-হাটও নাই; তাই বেপারিগো যাতায়াতও নাই। দুয়েকটা তামার জিনিস শুধু টিকা আছে কারো পারিবারিক সংগ্রহে নাইলে কোনো ভবঘুরে ব্রাহ্মণের পোঁটলায়...

কর্ণের বর্মখান ঘটোৎকচের কাঁসার বর্ম থাইকাও বেশি সুবিধার। গদার বাড়ি পড়লে কাঁসা ফাইটা টুকরা হইয়া যায়। কিন্তু তামা ভাঙ্গে না; একটু চ্যাপা হয়। পরে টোকা দিলে আবার তা ঠিক হইয়া যায়। কর্ণের কানবন্ধনীটাও একই ধাতুর; কান-মুখ ঢাইকা রাখা মুখোশের মতো। এমন বর্ম আর কানবন্ধনী পইরা নামলে কর্ণের মুখসহ সবই থাকে তিরের নাগালের বাইরে। কিন্তু নিজের প্রতিজ্ঞার ফান্দে পইড়া আইজ সেই বর্ম আর কানবন্ধনীটাই এক ব্রাহ্মণরে দান কইরা দিতে হইছে কর্ণের...

যুধিষ্ঠির স্বস্তি পায়- কর্ণ তাইলে এখন অর্জুনের তিরের নাগালের ভিতর...

১১

ভাগ্যের ভাটিযাত্রায় সম্রাজ্ঞী দ্রৌপদী এখন স্বৈরিন্ধী ছদ্মনামে মৎস্যদেশের রানি সুদেষ্ণার দাসী। বহু হিসাব-নিকাশ কইরাই তেরো নম্বর বচ্ছরে অজ্ঞাতবাস করতে পাণ্ডবরা বাইছা নিছে মৎস্যদেশের রাজা বিরাটের প্রাসাদ। পাশা খেলার শর্ত হিসাবে দুর্যোধন যদি এখন পাণ্ডবগো খুঁইজা বাইর করতে পারে তয় আরো বারো বচ্ছরের বনবাস আর এক বচ্ছর অজ্ঞাতবাস...

বিরাট রাজা পাশামশগুল আর শকুনির হাতে ধরা খাওয়ার পর গত বারো বচ্ছর প্র্যাকটিস কইরা যুধিষ্ঠির এখন পাশা এক্সপার্ট। কঙ্ক নাম নিয়া যুধিষ্ঠির দখল কইরা ফালায় বিরাট রাজার পাশাসঙ্গীর পদ। ভীম খায় যেমন বেশি রান্নাও করে ভালো; বল্লব ছদ্মনামের ভীম জায়গা পায় বিরাটের বাবুর্চিখানায়। অর্জুনের পক্ষে ছদ্মবেশ নেওয়া কঠিন। কারণ ধনুকের ছিলার ঘষায় তার বাহুতে যে দাগ পড়ছে তা দেইখা যেকোনো আন্ধায়ও তারে তিরন্দাজ বইলা চিনা নিতে পারে। তাই বাজুবন্ধ-জাতীয় অলংকার দিয়া বাহুর দাগ ঢাইকা কানে দুল- হাতে শাঁখা- চুলে বেণি কইরা ছাইয়া পোশাকে হিজড়া হইয়া সে গিয়া খাড়ায় বিরাটের কাছে- মোর নাম বৃহন্নলা। বাড়ির মাইয়াগো নাচ গান বাদ্য শিখাইবার চাকরি প্রার্থনা করি মহারাজ...

পাঁচ বচ্ছরের অস্ত্র সংগ্রহকালে গন্ধর্বরাজ চিত্রসেনের কাছে শিখা নাচ গান বাজনার বিদ্যায় বিরাটের পরীক্ষায় পাশ দিয়া মহিলামহলের ড্যান্স মাস্টারের পদ পায় বৃহন্নলা অর্জুন। গ্রন্থিক নামের নকুল চাকরি পায় বিরাটের ঘোড়াশালে। তান্তিপাল নামের সহদেব হয় বিরাটের গরুর রাখাল আর নিজেগো মধ্যে কথাবার্তার লাইগা আরো পাঁচটা গুপ্তনাম রাখে পাঁচ ভাই; জয় জয়ন্ত বিজয় জয়সেন আর জয়দবল...

পাণ্ডবেরা জীবনে মাইনসের বাড়িতে খাটে নাই তাই আসার আগে ধৌম্য তাগোরে শিখাইয়া দেন রাজার বাড়িতে থাকার কিছু নিয়ম-কানুন- পয়লা কথা হইল রাজার বাড়ি থাকার সময় না শব্দটা এক্কেবারে ভুইলা গিয়া রাজার সকল কথায় হ্যাঁ জনাব- জ্বি জনাব বলাটা আয়ত্ত করতে হবে সবার। রাজা যদি মিথ্যাকথা কন; তয় তারে সত্য বইলা মাইনা নিতে হবে; না হয় ধইরা নিতে হবে তোমার কান তা শোনে নাই। রাজা যেখানে বসেন; তা আসন হোক আর হাতিঘোড়াই হোক তাতে বসলে যেমন বেয়াদবি হয় তেমনি রাজার মুখামুখি বসলেও তুমি মারাত্মক বেয়াদব। রাজার পিছন দিকে থাকে বডিগার্ড তাই রাজার ডানে কিংবা বামেই বসা লাগে মুখে তালা দিয়া। রাজারে কোনোভাবেই কোনো উপদেশ যেমন দেওয়া যাবে না তেমনি রাজার সামনে নিজের বুদ্ধি কিংবা বীরত্বেরও বড়াই করা যাবে না। কিছু কইতে হইলে কওয়ার আগে রাজারে কিছু তেল মারা যেমন সাধারণ নিয়ম তেমনি কথার উপসংহার যেন রাজার পক্ষেই যায় সেইটাও চিরস্মরণীয় বিধান। কথাবার্তা যা কওয়ার কইতে হইব আস্তে এবং বিনয়ের সাথে অনুমতি নিয়া। হা হা কইরা হাসা যাইব না। রাজার কথায় খুশিতে ডগমগ হওয়া যাইব না আবার দুঃখে কাঁদুকাঁদু ভাবও দেখান যাইব না। হাঁটাচলা করতে হইব নিঃশব্দে। আর ফাইনাল কথা হইল রাজবাড়ির মাইয়াগো লগে পিরিতি; শত্রুগো লগে খাতির আর রাজার সামনে হাঁচি কাশি থুতু পাদ ঢেঁকুর এক্কেবারে নিষিদ্ধ জিনিস...

পাণ্ডবগো অজ্ঞাতবাসের মন্ত্রণা জানল শুধু ধৌম্য আর কৃষ্ণ। দ্রৌপদীর সকল দাসদাসী বাবুর্চি রথের সারথি আর বাকিসব কর্মচারীগো সাথে যুধিষ্ঠিরের অগ্নিহোত্র নিয়া ধৌম্য চইলা গেলো পাঞ্চাল দেশে। ঘোড়া রথ গরুবাছুর গেলো দ্বারকায় কৃষ্ণের জিম্মায়। আর অস্ত্রগুলা থাকল মৎস্যদেশে ঢোকার মুখে বিশাল একটা গাছের খোঁড়লে লুকানো অবস্থায়...

বিরাটের ঘরে দশ মাস ভালোই গেলো সকলের। খালি দ্রৌপদীর রূপ নিয়া একটু দুশ্চিন্তায় থাকলেন বিরাটের রানি সুদেষ্ণা। যদি রাজার চোখে এই রূপ পড়ে তো নির্ঘাত তার কপালটা পুইড়া যাইতে পারে। এর মধ্যে এক দিন মৎস্যদেশে আইসা উপস্থিত সুদেষ্ণার ভাই আর বিরাটের সেনাপতি কীচক। দ্রৌপদীরে দেইখা তার চক্ষু ছানাবড়া। রাজবাড়ির দাসীর কাছে ঘুরাইন্যা-পেচাইন্যার কিছু নাই তাই কীচক সরাসরি যায় দ্রৌপদীর কাছে- বহুত টেকাপয়সা আর বৌয়ের সম্মান দিমু দাসী; তুই মোর কাছে আয়...

দ্রৌপদী বিনয়ের মধ্যেই থাকে- আমি মহাশয় এক বিয়াইত্তা নারী; এই সব করলে আমার ডর লাগে স্বামীর হাতে না আমার লগে আপনারও জান যায়...

বিরাটের সেনাপতি সে। দাসীর স্বামীরে ডরানোর কী কাম তার। সোজা আঙ্গুলে যখন ঘি উঠে না তখন সে তার বইনের কাছে যায়- তোমার দাসীরে আমার ঘরে পাঠানোর বন্দোবস্ত করো বইন...

সুদেষ্ণা দেখেন ভালে তো। স্বৈরিন্ধীরে যদি স্বামীর চোখ থাইকা সরাইতে হয় তবে ভাইয়ের ঘরে ঠেইলা দেওয়াই ভালো। তিনি কন- তুই ঘরে যা। আমি মদ আনার লাইগা তারে তোর ঘরে পাঠামু আইজ। তারপর যা করার কইরা নিবি তুই...

দ্রৌপদী মদ আনতে কীচকের ঘরে যাইতে গাঁইগুঁই করে- আপনের ভাইরে আমার কেমন জানি লাগে। আপনে মদ আনতে অন্য কাউরে পাঠান...

সুদেষ্ণা কয়- আমি পাঠাইছি জানলে কীচক তোমারে কিছুই করব না। যাও...

কীচকের ঘরে পৌঁছাইলে কথা দিয়া দ্রৌপদীরে পটাইতে না পাইরা কীচক তার কাপড় ধইরা টানে। দ্রৌপদী কাপড় টাইনা নিলে কীচক ধরে হাত। এইবার দ্রৌপদী তারে ধাক্কা দিয়া দৌড় লাগায় রাজসভার দিকে আর পিছন পিছন গিয়া সকলের সামনে চুলের মুঠায় ধইরা কীচক দ্রৌপদীরে লাগায় কয়খান লাথি...

যখন সে সম্রাজ্ঞী আছিল তখন পাঁচ স্বামীর সামনে তার লাঞ্ছনার সময় ভীম আগাইতে গেলে আটকাইছে অর্জুন আর আইজ দাসী অবস্থায় ভীমেরে আটকায় যুধিষ্ঠির। তাই দ্রৌপদী কাইন্দা বিচার চায় বিরাটের কাছে। কিন্তু এক দাসীর লাইগা নিজের শালার আর কী বিচার করবেন বিরাট?

দ্রৌপদী কান্দে আর যুধিষ্ঠির কয়- ভিত্রে যাও। এইখানে কান্নাকাটি করলে সভাসদের পাশা খেলায় ডিস্টার্ব হয়...

রাইতে সে যায় বল্লব ভীমের ঘরে- যুধিষ্ঠির যার স্বামী তার কপালে দুঃখ ছাড়া আর কিছু থাকব না সেইটা আমি জানি কিন্তু শুইনা রাখো; আগামীকাল সূর্য উঠা পর্যন্ত যদি কীচক বাঁইচা থাকে তবে বিষ খাওয়া দ্রৌপদীর মরা মুখ দেখবা তুমি...

ভীম তারে থামায়- প্রকাশ্যে করা যাবে না কিছু। তুমি তারে কাইল সন্ধ্যায় অন্ধকার নাচঘরে আসার লোভ দেখাও...

পরের দিন কীচক আবার দ্রৌপদীরে আটকায়- দেখলা তো; আমারে কিছু কওয়ার সাহস রাজারও নাই। তাই তোমারে কই; এখনো সময় আছে লাইনে আসো; টেকাপয়সা যা চাও দিমুনে...

দ্রৌপদী হাইসা কয়- জানো তো আমি পরের বৌ। যদি কথা দেও যে তোমার আমার মোলাকাতের কথা কেউ জানব না; আর আসার সময় একলাই আসবা তাইলে তোমার প্রস্তাবে আমি রাজি...

সন্ধ্যা-রাত্তিরে একলা অন্ধকার নাচঘরে হাতড়াইয়া দ্রৌপদীরে পাইতে গিয়া কীচক সাক্ষাৎ পায় ভীমের। তারপর দ্রৌপদী গিয়া সকলরে ডাকে- নাচঘরে গিয়া দেখো আমার লগে বেয়াদবি করায় আমার স্বামীর হাতে কী দশা হইছে কীচকের...

সক্কলে গিয়া দেখে নাচঘরে পইড়া আছে কীচকের ভর্তা। কীচকের লাশ নিতে গিয়া দ্রৌপদীরে খাড়াইয়া হাসতে দেইখা কীচকের চ্যালারা কয়- তোর লাইগা সেনাপতি মরছে তাই তোরেও তুইলা দিমু সেনাপতির চিতায়...

কীচকের চ্যালারা দ্রৌপদীরে বাইন্ধা রওনা দেয় আর দ্রৌপদী লাগায় এক চিক্কুর- জয় জয়ন্ত বিজয় জয়সেন জয়দবল...

চিৎকারটা যে শোনার সে ঠিকই শোনে। কাপড় দিয়া মুখ বাইন্ধা ঘুরপথে গিয়া একটা গাছ উপড়াইয়া কীচকের সবগুলা চ্যালারে চ্যাপটা করার পর দ্রৌপদী এক পথে আর ভীম ঘুরপথে যখন রাজবাড়ি যায় তখন মৎস্যদেশের লোকজন দ্রৌপদীরে দেইখা ডরে কাঁপে আর ছাইয়াবেশী অর্জুন আইসা

জিগায়- হুনলাম কি জানি কি গিয়াঞ্জাম হইছে? কও তো কেমনে কী হইল পরে?

দ্রৌপদী কয়- মাইয়ালোকের মাঝখানে তো আরামেই আছ। খামাখা এক দাসীর দুঃখ শুইনা তোমার কী কাম?

অর্জুন দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে- হ। সকলেরই দুঃখু আছে খালি আমার কিছু নাই...

এক দাসীর লাইগা সন্ধ্যায় মরছে সেনাপতি আর ভোরে মরছে একশো পাঁচটা সৈনিক। রাজা বিরাট গিয়া রানি সুদেষ্ণারে কয়- তোমার দাসীরে যেখানে ইচ্ছা যাইতে কও। তার স্বামী কোন দিন না জানি আমারেও মাইরা ফালায়...

রানি সুদেষ্ণার কথায় দ্রৌপদী কয়- অত দিন যখন রাখছেন আর তেরোটা দিন আমারে থাকতে দেন...

পুরা একটা বচ্ছর পাণ্ডবগো গরু খোঁজা খুঁজছে দুর্যোধন কিন্তু কোথাও কোনো সংবাদ পায় নাই। একেকবার মনে হইত মনে হয় বাঘ-ভাল্লুকের পেটে গেছে সব। কিন্তু আবার মনে হয় অতটুকু আশা করা বেকুবি ছাড়া কিছু না। অবশেষে কীচকের মরণবর্ণনা আর গাছের বাড়িতে একশো পাঁচ কীচক-চ্যালার চ্যাপটা হওয়ার সংবাদে লাফ দিয়া উঠে দুর্যোধন- পাইছি। এমন মাইর ভীম ছাড়া মারতে পারে না কেউ। আমি নিশ্চিত ওই সবগুলা মৎস্যদেশেই ঘাপটি মাইরা আছে। এখন গিয়া যদি তাগোরে ধরা যায় তবে নির্ঘাত আরো বারো বচ্ছরের বনবাস...

সাজাও সৈন্য লাগাও আক্রমণ...

দুর্যোধনের বন্ধু ত্রিগর্তরাজ সুশর্মা মৎস্যদেশের দক্ষিণ দিকে আক্রমণ কইরা বিরাটের বহু গরুবাছুর দখল কইরা নেয়। সংবাদ পাইয়া সৈন্যদের লগে যুধিষ্ঠির ভীম নকুল সহদেবরে নিয়া দক্ষিণ সামলাইতে আইসা সুশর্মার হাতে বিরাট রাজা ধরা খাইলে যুধিষ্ঠির কয়- অত দিন যার ভাত খাইলাম তার বিপদে তো সাহায্য করতে হয়। ভীম একটু আউগা দেখি...

ভীম থাবা দিয়া গাছ উপড়াইতে গেলে যুধিষ্ঠির দাবড়ানি দেয়- হালা বেকুব। গাছ উপড়াইয়া লড়াই করতে গেলে পাব্লিকে যে তোরে চিনা ফালাইব সেই খেয়াল আছে? গাছ বাদ দিয়া তুই অন্যকিছু নে...

বিরাটরে মুক্ত কইরা সুশর্মারে চটকনা দিয়া গরুবাছুর উদ্ধার কইরা গদাই লস্করি চালে রাজা বিরাটের লগে চার পাণ্ডব বিজয় উদ্যাপন করে মৎস্যদেশের দক্ষিণ সীমানায় আর ঠিক তখনই দেশের উত্তর সীমানায় ভীষ্ম কৃপ দ্রোণ কর্ণ অশ্বত্থামারে নিয়া আক্রমণ শানায় দুর্যোধন...

রাজধানীতে যখন উত্তর সীমান্তের সংবাদ আসে তখন বাড়িতে একলা বেটামানুষ বিরাটের পোলা উত্তর। সংবাদ শুইনা মহিলামহলে গিয়া উত্তর লাফায়- ভীষ্ম কৃপ দ্রোণ কর্ণ অশ্বত্থামা দুর্যোধনের আমি একলাই প্যাঁদানি দিয়া চ্যাপটা কইরা দিতে পারি। কিন্তু আমার রথের সারথি তো মইরা গেছে কিছু দিন আগে। যুদ্ধের লাইগা আমিই যথেষ্ট কিন্তু আমার ঘোড়া চালাইব কেডায়?

উত্তরের ভড়ং দেইখা দ্রৌপদী কয়- যুবরাজ। তোমার বইন উত্তরার হিজড়া ডান্স মাস্টার কিন্তু খুব ভালো রথ চালাইতে পারে। দ্রৌপদীর কথা শুইনা উত্তরা দৌড়াইয়া গিয়া অর্জুনরে ধরে- খালি সারথির অভাবে আমার ভাই

আইজ ভীষ্ম কৃপ দ্রোণ কর্ণ অশ্বত্থামা দুর্যোধনরে মারতে পারতাছে না। তুমি নাকি রথ চালাইতে জানো? তয় যাও না আমার ভাইটার লগে...

উত্তরের তাফালিং দেইখা অর্জুন হাসে আর উল্টাপাল্টা কইরা বর্ম কবচ পরতে গিয়া রাজমহলের মাইয়াগো হাসায়। বীরপুরুষের বেশে রথে উইঠা বৃহন্নলার ঘোড়া দাবড়ানি দেইখা টাসকি খায় উত্তর যুবরাজ আর কাছে গিয়া দুর্যোধন বাহিনীর আওয়াজ শুইনা মিনতি শুরু করে অর্জুনের কাছে- ও খালাম্মা গো। বাজানে সকল আর্মি নিয়া গেছে। আমি একলা একটা ছুটু মানুষ; অতগুলা মাইনসের লগে আমি কেমনে কী করি কও? তোমার পায়ে ধরি গো খালাম্মা তুমি রথ ফিরাও। যুদ্ধ করব না আমি...

লাফ দিয়া রথ ছাইড়া উল্টা দিকে দৌড় লাগায় উত্তর আর চুড়ি বাজাইয়া বেণি দুলাইয়া গিয়া তার চুলের মুঠায় ধইরা আটকায় অর্জুন আর তা দেইখা হাসে দুর্যোধনের সৈন্যসেপাই- হালার একটা কাপুরুষ আর একটা আধাপুরুষের লগে মারামারি করতে নি অত বড়ো বাহিনী আনছে দুর্যোধন?

উত্তররে রথে তুইলা অর্জুন কয়- যুদ্ধ করা লাগব না তোর। তুই রথ চালা...

উত্তররে নিয়া অর্জুন সেই অস্ত্রলুকানো গাছের কাছে গিয়া তারে ডালের খোঁড়লটা দেখায়- গাছে উঠ্...

গাছ থিকা নাইমা উত্তরের হার্ট অ্যাটাক হইবার জোগাড়- এইগুলা কার হাতিয়ার?

অর্জুন কয়- পাণ্ডবগো

উত্তর কয়- তারা তয় কই?

অর্জুন কয়- তোমার বাপের লগে যে পাশা খেলে সে যুধিষ্ঠির। যে লোকটা তোমাগো রান্না পাকায় সে ভীম। তোমার সামনে খাড়া অর্জুন। ঘোড়ার পাহারাদার নকুল আর গরুর রাখালটা হইল সহদেব...

উত্তর কয়- তোমার কাণ্ডে তাব্দা খাইলেও বিশ্বাস যাইতে কষ্ট হয় যে তোমরাই পাণ্ডব। তয় তুমি যদি অর্জুনের দশটা নাম কইতে পারো তবে তোমার সকল কথা মাইনা নিমু আমি...

- ধনঞ্জয় বিজয় শ্বেতবাহন ফালগুন কিরীটী বিভৎসু সব্যসাচী অর্জুন জিষ্ণু আর কাইলা বইলা ছুডুকালে বাজানে ডাকত কৃষ্ণ; হইছেনি দশটা নাম?

ধনুকের টঙ্কার শুইনাই দ্রোণ কন- নিশ্চিত অর্জুন...

দুর্যোধন কয়- তাইলে তো অজ্ঞাতবাসের এক বচ্ছর পূর্ণ হইবার আগেই ধরছি তারে। এখন নিশ্চিত আরো বারো বচ্ছর বনবাস...

দ্রোণ কন- তার তির সামলাইতে হাগা বাইরাইব এখন; বনবাস তো পরে...

দুর্যোধন কয়- এই বুড়া খালি অর্জুন অর্জুন করে। এরে পিছনে যাইতে কও...

কর্ণ সর্বদাই দুর্যোধনের পক্ষ আর অর্জুনের বিপক্ষে থাকে। বাপের অপমানে অশ্বত্থামা দুর্যোধনরে কিছু কইতে না পাইরা কর্ণের লগে কাইজা বাঁধায়। ভীষ্ম কাইজা থামাইয়া দুর্যোধনরে দিয়া গুরু দ্রোণের কাছে মাপ চাওয়ান আর কৃপ দ্রোণ কর্ণ ভীষ্মের তেলানিতে দ্রোণ তারে মাপ কইরা দিলে জ্যোতিষ-টুতিশ নক্ষত্র গণনা কইরা ভীষ্ম কন- তেরো বচ্ছর তো পুরা হইয়া গেছে তাগো...

দুর্যোধন কয়- আমার হিসাবে এখনো তিন দিন বাকি...

ভীষ্ম কন- তেরো বচ্ছর পুরা না হইলে অর্জুন দেখা দিত না তোমারে...

দুর্যোধন কয়- আপনে বরাবরই পাণ্ডবগো সাপোর্ট করেন; এখনো করতাছেন আর ভবিষ্যতেও করবেন। কিন্তু জাইনা রাখেন; বচ্ছর পুরা হউক আর না হউক। পাণ্ডবগো একমুঠা মাটিও দিমু না আমি। আপনে যুদ্ধের আয়োজন করেন...

যুদ্ধের সিদ্ধান্ত হইলে চাইর ভাগের এক ভাগ সৈনিক নিয়া হস্তিনাপুর রওনা দেয় দুর্যোধন। এক ভাগ সৈনিক সামলায় দখল করা গরু আর বাকি দুই ভাগ তৈয়ারি হয় অর্জুনের মোকাবেলায়..

অর্জুন উত্তররে কয়- রথ ঘোরাও। আগে গরু আর দুর্যোধনরে ধরি...

দ্রোণ বুইঝা ফালান অর্জুনের প্লান। তিনি সবাইরে নিয়া রওনা দেন অর্জুনের পিছে। কিন্তু পৌঁছাইবার আগেই গরু উদ্ধার কইরা দুর্যোধনরে ধাওয়া করে অর্জুন। এমন সময় কুরু বাহিনী দেইখা অর্জুন কয়- মুরব্বিরা থাউক। তুমি ঘুরুন্টি দিয়া কর্ণের কাছে যাও...

অর্জুনের হঠাৎ আক্রমণে কর্ণ পিছাইলে কৃপাচার্য আগাইতে আইসা রথের ঘোড়া খোয়াইয়া ভাগল দিলে অর্জুন মুখামুখি হয় দ্রোণের- আপনে আমার গুরু। আপনেরে মারব না আমি...

দ্রোণ কন- আমি দুর্যোধনের ভাত খাই। তুমি না মারলেও তোমারে যে আমার মারতে হবে বাপ...

অর্জুন কয়- ঠিকাছে তয় তির চালান...

দুইজনেই দুইজনের আশপাশ দিয়া কতক্ষণ তিরাতিরি করে আর বাপেরে অর্জুনের লগে যুদ্ধ করতে দেইখা অশ্বত্থামা আগাইয়া আসলে চামে কাইটা পড়েন দ্রোণ। অশ্বত্থামার তির শেষ হইলে তারে ছাইড়া কর্ণের শরীরে একটা তির বিঁধাইয়া অর্জুন গিয়া তিরাতিরি শুরু করে ভীষ্মের সাথে। এর মাঝে দুর্যোধন আইসা পড়লে ভীষ্মের দেহে একটা তির ঢুকাইয়া অর্জুন সরাসরি তির চালায় দুর্যোধনের বুকে...

তীর খাইয়া দুর্যোধন রক্তবমি করতে করতে দৌড়ান দিলে অর্জুন রওনা দেয় বিরাটের রাজধানীর দিকে। ফিরতে ফিরতে উত্তররে কয়- খবরদার। বাড়ি গিয়া আমার পরিচয় দিবা না কলাম। বলবা যা কিছু ঘটছে তার সবই ঘটাইছ তুমি...

বাড়ি ফিরা বিরাট আছড়ায় কপাল- ভীষ্ম কৃপ দ্রোণ কর্ণ অশ্বত্থামা দুর্যোধনের লগে যুদ্ধ করতে গেছে তার নাদান পোলা এক হিজড়ারে নিয়া। সে বুক থাবড়ায় আর কয়- তোমরা আউগাইয়া দেখো আমার পোলায় অতক্ষণ বাঁইচা আছে কি নাই...

কিন্তু উত্তরের সন্ধানে নামার আগেই লোকজন শোনে জয়জয় ধ্বনি। সবাইরে ডিফিট দিয়া গরু নিয়া ফিরতাছে উত্তর। পোলার কীর্তি দেইখা বিরাট লাফ দিয়া উঠলে উত্তর কয়- আমি কিছু করি নাই। একজন দেবতা আইসা যা কিছু করার কইরা দিয়া চইলা গেছেন আবার...

তিন দিন পর অজ্ঞাতবাসের এক বচ্ছর পূর্ণ হইলে পাণ্ডবেরা বিরাটের কাছে নিজেগো পরিচয় দেয়। বিরাট তাব্দা খাইয়া কয়- অত বড়ো মানুষগুলা যখন অত দিন আমার বাড়িতে ছিলেন তখন এই পরিচয় সূত্রটারে আমি আত্মীয়তায় স্থায়ী কইরা নিতে চাই অর্জুনের লগে আমার মাইয়া উত্তরার বিবাহ দিয়া...

অর্জুন কয়- আপনের কইন্যা আমার ঘরে যাবে। তয় সেইটা হবে আমার পুত্রবধূ হিসাবে। আমার পোলা আর কৃষ্ণের ভাগিনা অভিমন্যুর সাথে বিবাহ হইব তার...

অর্জুনের প্রস্তাবে দ্রৌপদী মুখটিপা হাসে। এমন বিয়ার প্রস্তাব অর্জুন কেন ফিরাইয়া দিছে আর কেউ না জানুক; দ্রৌপদী তো জানে...

১২

তেরো বচ্ছর দূরে দূরে বড়ো হইয়া জোয়ান পোলারা যেমন না পারে মায়েরে মায়ের মতো ভাবতে তেমনি দ্রৌপদীও পারে না ফিরাইয়া আনতে তেরো বচ্ছর আগে হারাইয়া ফেলা মাতৃত্বের রূপ। তাই অভিমন্যুর বিবাহেও দ্রৌপদী নেহাত পাণ্ডববধূরূপে রূপের ঝলকানি দেওয়া সাজগোজ করে আর উত্তরার লগে ছোট ভাই অভিমন্যুর বিবাহে যোগ দিয়া দ্রৌপদীর পাঁচ পোলা; প্রতিবিন্ধ্য সুতোসোম শ্রুতকর্মা শতানীক আর শ্রুতসেন থাকে দূরে দূরে সাধারণ অতিথির মতো...

উত্তরা অভিমন্যুর বিবাহ উসিলায় মৎস্যদেশের উপপ্লব্য নগর পরিণত হইছে কুন্তী আর দ্রৌপদীর পিতৃ বংশের সমাবেশস্থলে। নিজের দুই পোলা বলরাম আর কৃষ্ণরে নিয়া হাজির হইছেন স্বয়ং বসুদেব; যাদব বংশীয় অসংখ্য যোদ্ধা আর প্রধানের লগে আছে প্রদ্যুম্ন শাল্ব আর সাত্যকিও। দুই পোলা ধৃষ্টদ্যুম্ন আর শিখণ্ডীর লগে বিশাল এক সেনাবাহিনী নিয়া আসছেন দ্রৌপদীপিতা পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ। বিবাহের পর দিনই বসে পাণ্ডবগো বনবাসোত্তর প্রথম রাজনৈতিক সভা। দ্বারকা-পাঞ্চাল গোত্রের সাথে এই সভায় যোগ দেয় পাণ্ডবগো নতুন সম্বন্ধী মৎস্যদেশের রাজপরিবার আর সকলের সামনে সভায় প্রসঙ্গটা উত্থাপন করে কৃষ্ণ...

সংক্ষেপে কাহিনি বয়ান শেষে কৃষ্ণ সকলের দিকে তাকায়- যুধিষ্ঠির এইবার তার ন্যায্য পাওনা চান; আপোসে যদি তা না পাওয়া যায় তবে যুদ্ধেও পিছপা হবেন না তিনি। এখন আমাদের দায়িত্ব হইল দ্বিতীয় পন্থার লাইগা যুধিষ্ঠিরের হাত শক্তিশালী করা। তয় যুদ্ধ ঘোষণার আগে দুর্যোধনের মনোভাব জানা প্রয়োজন। তাই আমার প্রস্তাব হইল; একজন চালাকচতুর দূত পাঠানো হউক দুর্যোধন কী করতে চায় না চায় তা জানতে আর পাশাপাশি চলুক নিজেগো শক্তির সমন্বয়...

কৃষ্ণ তার কাহিনি বয়ানে যুধিষ্ঠিরের প্রশংসা আর দুর্যোধনের পুরাটাই বদনাম করে। এই জিনিসটা পছন্দ হয় না বলরামের- দূত পাঠানোর প্রস্তাব ভালো। তয় সেইটা যেন যুদ্ধ বাঁধানোর দূতিয়ালি না হইয়া সত্যি সত্যি শান্তির লাইগাই হয় সেইটাও খেয়াল রাখতে হবে। কারণ আমার মতে দুর্যোধন কোনো অন্যায় যেমন করে নাই তেমনি পাণ্ডবগো পৈতৃক সম্পত্তিও সে দখলও করে নাই। পাশা খেলার শর্তমতেই পাণ্ডবরাজ্যের ন্যায্য অধিকারী হইছে সে। বেকুবি আর অন্যায় যদি কেউ কইরা থাকে তয় তা করছে যুধিষ্ঠির। কারণ লাফাইতে লাফাইতে সে নিজের বুদ্ধিতেই শকুনির লগে পাশা খেইলা হারাইছে বাপের রাজ্যপাট...

বলরামের কথায় খেইপা উঠে সাত্যকি- তুমি যেমন চাষা। তোমার কথাবার্তাও সেই রকম চাষামার্কা খ্যাত; দুর্যোধন কোনো অন্যায় করে নাই; ঢংয়ের কথা কও? কথা যদি কইতেই হয় তো এইখানে আমরা দুর্যোধনরে সাপোর্ট করতে আসছি না যুধিষ্ঠিররে সাহায্য করতে আসছি সেইটা বুইঝা কথা কইলে সবার লাইগাই ভালো। কৌরবরা যতই কউক না কেন অজ্ঞাতবাসের তিন দিন থাকতেই পাণ্ডবগো তারা খুঁইজা বাইর কইরা ফালাইছে; কিন্তু এইখানে আমাদের সকলের সিদ্ধান্ত হইল কথাটা আমরা বিশ্বাস করি না। আমরা সকলেই মনে করি পাণ্ডবরা পাশা খেলার সবগুলা শর্তই অক্ষরে অক্ষরে পালন করছে। তাই এখন আমাগো দায়িত্ব হইল পাণ্ডবগো তাদের ন্যায্য মাটি ফিরা পাইতে সাহায্য করা। দুর্যোধন যদি ভালোয় ভালোয় ফিরাইয়া দেয় তয় ভালো। আর যদি না দেয় তয় আমরা সকলেই যুধিষ্ঠিরের পক্ষে যুদ্ধ করব। এইটাই সারকথা...

দ্রুপদ সাত্যকিরে সমর্থন কইরা কথা আগে বাড়ায়- দুর্যোধন এমনি এমনি দিব না। ধৃতরাষ্ট্র পোলার কথায় উঠেন বসেন; সুতরাং তিনিও ভিন্ন কিছু

বলবেন না। ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কুরুরাজের বেতনভুক পোষ্য; দুর্যোধনের সিদ্ধান্তের বিপক্ষে যাওয়ার ক্ষমতা তাগো নাই। আর কর্ণ শকুনি দুঃশাসন তো সর্বদাই দুর্যোধনের পক্ষের মানুষ। সুতরাং বলরামের কথা আমিও সমর্থন করতে পারলাম না। আমি বরং মনে করি দুর্যোধনের কাছে গিয়া বেশি মিঠা কথা কইলে সে আমাগো দুর্বল ভাবতে পারে। তাই আমার মত হইল দেরি না কইরা আরো সৈন্য সংগ্রহের লাইগা এখনই বিভিন্ন দিকে সুযোগ সন্ধান শুরু করা ভালো। আমি যদ্দুর জানি দুর্যোধন অলরেডি সৈন্য সংগ্রহ শুরু কইরা দিছে। তাই যত আগে আমরা মিত্রগো পক্ষে টানতে পারব তত লাভ। তয় এই সবের লগে দূতিয়ালিও চলুক। সেই ক্ষেত্রে দ্যূত হিসাবে আমি আমার পুরোহিতরে হস্তিনাপুর পাঠাইতে পারি; কৃষ্ণ তারে বুঝায়ে দিবেন তিনি কী কইবেন না কইবেন কুরুরাজের কাছে...

বলরাম বেকুবটা যেখানেই থাকে সেখানেই প্রসঙ্গ না বুইঝা কথা কইতে গিয়া সব মাটি কইরা দেয়। আর সেইটা কাটাইতে গিয়া সাত্যকি আবার পুরাটাই গান্ধা কইরা ফালায়। এই বলরাম আর সাত্যকির ঠোকাঠুকির লাইগা একবার ভীমের পোলা কী নাকান-চুবানটাই না দিছে কৃষ্ণরে। তাই এইবার আগে থাইকাই কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিররে কইয়া দিছে এই আলোচনায় যেন ঘটোৎকচ না থাকে। কৃষ্ণের কথায় যুধিষ্ঠির তারে বিয়াতেও নিমন্ত্রণ করে নাই। কিন্তু নিজের সাক্ষাৎ বড়ো ভাই বলরাম; সারা বংশের মানুষ যেখানে আসতাছে সেইখানে ভাগিনার বিয়ায় তো আর তারে আসতে নিষেধ করা যায় না...

আলোচনাটা আর চালানোও সম্ভব না। সংক্ষেপে সভা শেষ করার লাইগা কৃষ্ণ পয়লা বলরামরে সাপোর্ট কইরা ঠান্ডা করে- ভাইজানের কথাটা ফালান দিবার মতো না। কুরু-পাণ্ডব দুই বংশের লগেই আমাদের সমান সম্বন্ধ। দুর্যোধন আমার পোলার শ্বশুর আর আমি পাণ্ডবগো মামাতো ভাই। অন্য দিকে ভীম আর দুর্যোধন দুইজনই বলরামের সাক্ষাৎ শিষ্য। তাই আমরা দুই

পক্ষেরই যেমন মঙ্গল চাই তেমনি শান্তিও চাই। তয় মূল কথা হইল এইখানে আমরা উত্তরা-অভিমন্যুর বিবাহে দাওয়াত খাইতে আসছি; যুদ্ধের আলোচনা করতে আসি নাই। তাই আমি কই কি; দ্রুপদরাজ যে প্রস্তাব দিছেন সেইটাই সবচে ভালো প্রস্তাব। আপনি আপনের পুরোহিতরেই হস্তিনাপুর পাঠান। আপনে মুরুব্বি মানুষ; কী কইতে হইব না হইব তা আপনিই তিনারে বুঝাইয়া দেওয়া সব থিকা ভালো। আর এরপরে কী করতে হবে না হবে তা থাউক পাণ্ডবগো সিদ্ধান্তের উপর। ...বিবাহের খানাপিনা আর আদর আপ্যায়নের লাইগা সকলের পক্ষ থিকা আমি মৎস্যদেশের রাজা বিরাট আর তার পরিবাররে ধন্যবাদ জানাই। সুখী জীবন কামনা করি উত্তরা আর অভিমন্যুর। ...অনুমতি দিলে আমরা এখন সকলে যার যার ঘরে ফিরা যাই। তারপর পাণ্ডবগো আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব পাওয়ার পর স্বতন্ত্রভাবে সিদ্ধান্ত নিমু কে কার পক্ষে যুদ্ধ করব আর কার পক্ষে না...

দ্বারকাবাসীরা চলে যায়। দ্রুপদের পুরোহিত রওনা দেয় হস্তিনাপুর। যুধিষ্ঠির-বিরাট আর দ্রুপদ নিতে থাকেন যুদ্ধের প্রস্তুতি। সকল সংবাদ পৌঁছায় দুর্যোধনের কানে এবং দ্রুততালে সে চালায়ে যায় তার মিত্র আর সৈন্যের সন্ধান...

যুদ্ধে সহায়তার আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব নিয়া একই দিনে একইসাথে কৃষ্ণের ঘরে হাজির হয় দুর্যোধন আর অর্জুন। দুইজনেই কৃষ্ণের আত্মীয়। কাউরেই যেমন ফিরান সম্ভব না তেমনি উচিতও না। তাই কৃষ্ণ তার সামরিক ক্ষমতারে দুই ভাগে ভাগ করে; এক ভাগে থাকে তার দুর্ধর্ষ নারায়ণী গোপ সৈন্য আর অন্য ভাগে থাকে নিরস্ত্র কৃষ্ণ নিজে। নারায়ণী সৈন্য যাবে ভাড়ায় আর কৃষ্ণ যাবে বিনা পয়সায়। কৃষ্ণ পক্ষ নিব কিন্তু যুদ্ধ করব না কোনো পক্ষেই। আর অর্জুন যেহেতু বয়সে দুর্যোধন থাইকা ছোট তাই কৃষ্ণ প্রথমে অর্জুনরেই সুযোগ দেয় দুই ভাগ থাইকা যেকোনো একটা পছন্দ কইরা নিতে...

- কৃষ্ণ...

বিন্দুমাত্র দ্বিধা না কইরা নিরস্ত্র কৃষ্ণরেই বাইছা নেয় অর্জুন আর কৃষ্ণের গোপ সৈন্য ভাড়া পাইয়া খুশি হইয়া বলরামের কাছে যায় দুর্যোধন। সিধাসাধা এই মানুষটার কাছে কুরু-পাণ্ডব যুদ্ধ মানে তার দুই সাক্ষাৎ গদার শিষ্য ভীম আর দুর্যোধনের লড়াই। সে দুর্যোধনরে কয়- বহুত চেষ্টা করলাম যুদ্ধ থামাইতে। কিন্তু দেখলাম কৃষ্ণ এর মধ্যেই পক্ষ ঠিক কইরা ফালাইছে। কিন্তু আমি যেহেতু কাউরে ফালাইয়া কাউরে টানতে পারব না। তাই আমার সিদ্ধান্ত হইল আমি কারো পক্ষেই যামু না। যুদ্ধ করব না আমি...

দুর্যোধন দ্বারকা থিকা আরো কিছু কমবেশি প্রতিশ্রুতি নিয়া বাড়ি যায় আর অর্জুন কৃষ্ণরে কয়- যুদ্ধে তুমি হইবা আমার সারথি...

যুধিষ্ঠিরের আমন্ত্রণে নকুল সহদেবের মামা মদ্ররাজ শল্যে আসতাছিলেন ভাগিনার কাছে। কিন্তু আসার পথে দুর্যোধন তারে পটাইয়া নিজের পক্ষে নিয়া যায়। তিনি পক্ষ পরিবর্তনের সংবাদটা ভাগিনারে জানাইতে আসলে যুধিষ্ঠির কয়- অসুবিধা নাই মামা আপনে দুর্যোধনের পক্ষেই যুদ্ধ করেন। কারণ আমি জানি শত্রুপক্ষে যুদ্ধ করলেও আপনে আমাগোরে মায়া কইরা মারবেন যাতে না মরি। সেইটা নিয়া আমি ভাবি না। তয় আপনে যেহেতু মামা কৃষ্ণের সমান যোদ্ধা তাই দুর্যোধন যেন আপনের সম্মানটা রাখে সেইটা একটু দেইখেন...

এমন তেলানিতে শল্য চক চক কইরা উঠে- তুমি সর্বদাই সত্য কথা কও; আর আমি যে কৃষ্ণের সমান এই কথাটাও তুমি ছাড়া কেউ স্বীকার করতে নারাজ। তয় সম্মান রাখার কথাটা একটু বুঝাইয়া কও তো ভাগিনা...

যুধিষ্ঠির কয়- নিশ্চয়ই শুনছেন মামা; কৃষ্ণ কিন্তু যুদ্ধে যোগ দিলেও যুদ্ধ করব না। সে হইব পাণ্ডবপক্ষের সবচে বড়ো যোদ্ধা অর্জুনের সারথি। এখন আপনে

যদি অস্ত্র লইয়া সৈনিকগো লগে দৌড়াদৌড়ি করেন তাইলে তো কৃষ্ণের লগে আর আপনের সমানে-সমান মর্যাদাটা রক্ষা হয় না। তাই আমি কই কি; আপনে যদি কুরুপক্ষের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা কর্ণের সারথি হইতে পারেন তাইলে কৃষ্ণের লগে আপনের সমান মর্যাদা রক্ষায় আর কোনো সমস্যা থাকে না...

শল্য কয়- বুদ্ধি খারাপ দেও নাই ভাগিনা। কিন্তু তাই বইলা ছোটলোকের পোলার রথ চালাইতে হইব মোর?

যুধিষ্ঠির কয়- সেইটা করলে আপনে ভাগিনাগো সবচে বড়ো উপকারটাও করতে পারবেন মামা...

শল্য কয়- কেমনে?

যুধিষ্ঠির কয়- কর্ণের রথ চালাইতে চালাইতে আপনে মনের সাধ মিটাইয়া সারাক্ষণ তারে গালাগালি করবেন। তাতে মাথাগরম কর্ণ আউলা হইয়া উল্টাপাল্টা অস্ত্র চালাইব আর এক ফাঁকে আপনের ভাগিনা অর্জুন তারে পাইড়া ফেলব খ্যাতে...

শল্য হিসাব কইরা দেখে মন্দ না। কৃষ্ণের সমান মর্যাদাও পাওয়া যাবে আর ভাগিনাদের উপকারও করা যাবে সব থিকা বেশি- আমি রাজি ভাগিনা...

মোট সাতটা বাহিনী জোগাড় হইছে পাণ্ডবগো। তার মধ্যে বড়ো তিনটা আত্মীয় বাহিনী: দ্রুপদের পাঞ্চালসেনা বিরাটের মৎস্যসেনা আর ঘটোৎকচের একচক্রাসেনা। এর বাইরে আছে সাত্যকির যাদবসেনা; ধৃষ্টকেতুর চেদিসেনা; জয়ৎসেনের মগধসেনা আর খুচরা কিছু সৈনিক নিয়া পাণ্ডবগো নিজস্ব একটা বাহিনী...

অন্য দিকে ধৃতরাষ্ট্রপুত্র বিন্দু আর অনুবিন্দুর অবন্তি বাহিনী; মেয়েজামাই জয়দ্রথের সিন্ধু বাহিনী; দুর্যোধনের শ্বশুর ভগদত্তের চীনা আর কিরাতসেনা

এবং নিজস্ব তিনটা বাহিনী নিয়া দুর্যোধনের পারিবারিক বাহিনীর সংখ্যা ছয়। কৃষ্ণের কাছ থিকা আনা কৃতবর্মার অন্ধক ও যাদবসেনা; শল্যের মদ্রসেনা; যবন আর শক সেনা নিয়া সুদক্ষিণের কম্বোজ বাহিনী; নীলের নেতৃত্বে দক্ষিণাত্যের মহিষ্মন্তিসেনা আর সোমদত্তের পুত্র ভূরিশ্রবার বাহিনী। মোট এগারোটা বাহিনী প্রস্তুত দুর্যোধনের পক্ষে লড়াই করার লাইগা...

দুই পক্ষে সেনাসংগ্রহের মাঝে এক দিন সন্ধির প্রস্তাব নিয়া দ্রুপদের পুরোহিত আইসা হাজির হন রাজা ধৃতরাষ্ট্রের কাছে। পয়লা মিঠা কথায় বনবাসে পাণ্ডবগো দুর্দশার কথা কইয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্রের মন গলানোর চেষ্টা করেন। তারপর পাণ্ডবগো লগে শকুনি দুর্যোধনের দুষ্কর্ম আর অন্যায়ের কিছু ইঙ্গিত দিয়া তিনি সভাজনের কাছে অনুরোধ করেন যেন তারা পাণ্ডবগো ন্যায্য পাওনার লাইগা রাজা ধৃতরাষ্ট্ররে সুপারিশ করেন। তারপরে তিনি এইটাও স্মরণ করাইয়া দেন যে পাণ্ডবরা মোটেই বিবাদ চায় না কিন্তুক কুরুদের সৈন্যসংখ্যা যত বেশিই হোক না ক্যান; যুদ্ধ শুরু হইলে পাণ্ডবগো সামনে টিকতে পারব না তারা। কারণ ভীম অর্জুনের অস্ত্রের লগে কৃষ্ণের বুদ্ধিও যোগ হইছে পাণ্ডব শিবিরে এখন...

ভীষ্ম কন- কথা ঠিকাছে; পাণ্ডবগো অধিকারও ঠিকাছে আবার আপনার প্রস্তাবও ঠিকাছে। কিন্তু মনে লয় আপনে আমাগো ডর দেখাইতে আসছেন। কথা কইবেন কন; কিন্তু ভয়টয় কিছু দেখাইয়েন না কলাম...

কর্ণ খেইপা উঠে পুরোহিতের দিকে- ব্রাহ্মণ হইয়া অন্যায় আব্দার আপনে ক্যামনে করেন? পাণ্ডবরা যদি প্রতিজ্ঞা পালন করত তবে আপনে না কইলেও দুর্যোধন সসম্মানে তাগোর রাজ্য ফিরাইয়া দিত। কিন্তু তারা তো অজ্ঞাতবাসের এক বচ্ছর পুরা হইবার তিন দিন আগেই ধরা খাইছে। এখন

তারা যদি রাজ্য ফিরা পাইতে চায় তবে গিয়া কন যেন শর্তমতে আরো বারো বচ্ছর বনবাস আর এক বচ্ছর অজ্ঞাতবাস শেষ কইরা যেন আসে...

হস্তিনাপুরের রাজনীতিতে কর্ণরে কোনো দিনও সহ্য করতে পারেন না ভীষ্ম। তিনি এইবার পুরোহিতরে ছাইড়া কর্ণরে ধরেন- অত লাফাইও না তুমি। মৎস্যদেশে অর্জুন কী প্যাঁদানিটা দিছিল মনে আছে তো? এই ব্রাহ্মণের কথা না শুনলে যুদ্ধক্ষেত্রে কিন্তু মাটি খাইতে হইব সবার...

ধৃতরাষ্ট্র দুইজনরে থামাইয়া দ্রুপদের দূতরে কন- যা কইছেন তা আমি শুনছি আর বিবেচনাও করতাছি। এখন চিন্তাভাবনা কইরা উত্তর দিবার লাইগা আমারে কিছু সময় দেন। আমি আমার বক্তব্য দিয়া পাণ্ডবগো কাছে অতি শিগ্গির সঞ্জয়রে পাঠামু কইয়েন...

ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়রে ডাইকা কন- আমি কিন্তু পাণ্ডবগো কোনো দোষ দেখি না। কুরুদেশে দুর্যোধন আর কর্ণ ছাড়া অন্য কেউ তাগোর দোষ দেখে কি না তাও আমার জানা নাই। কিন্তু কী আর করব কও? নিজের পোলারে তো ফালাইতে পারি না। যাই হউক; আমিও মনে করি ভীম অর্জুন আর কৃষ্ণ যেইখানে একলগে আছে সেইখানে যুদ্ধের আগেই যুধিষ্ঠিররে তার রাজ্য ফিরাইয়া দেওয়া ভালো। অজ্ঞাতবাসের তিন দিন বাকি না বচ্ছর পুরা হইছে তা এখন ভাবা অবান্তর। আমার চরদের কাছে বসুদেবের পোলা কৃষ্ণের যে কাহিনি শুনছি তাতে রাত্তিরে আমার ঘুম হয় না সঞ্জয়। তার উপ্রে শুনতাছি অর্জুন আর কৃষ্ণ সর্বদা একই রথে থাকব। বিষয়টা তুমি বুঝতে পারতাছ সঞ্জয়? তুমি যুধিষ্ঠিরের কাছে গিয়া কও- তোমার জ্যাঠা মোটেও যুদ্ধ চান না। তারপর নিজের বুদ্ধি খাটাইয়া এমন কিছু কইবা যাতে যুধিষ্ঠির খুশি হয়। তয় আমাগো

লগে কারা কারা আছে তাও একটু শুনাইয়া দিও; যাতে আমাগো অতটা ফেলনা মনে কইরা না বসে। অবশ্য খেয়াল রাইখ যেন তারা খেইপা না যায়...

সঞ্জয় যুধিষ্ঠিররে যথেষ্ট তেলাইয়া কয়- রাজা ধৃতরাষ্ট্র তার ভাতিজাগো মঙ্গলকামনার লগে লগে সকলের লাইগা শান্তি চান। তাছাড়া পঞ্চপাণ্ডবের লগে যেইখানে কৃষ্ণ ধৃষ্টদ্যুম্ন চেকিতানরা আছে সেইখানে যুদ্ধ কইরা খামাখা বংশক্ষয় করার মতো বোকা তিনি নন। কারণ কুরু-পাণ্ডব দুই বংশেরই অভিভাবক তিনি। তাই আমি কই তোমরাও শান্তির পথে ভাবো। কারণ বুইঝা দেখো; যুদ্ধ চাইলে কিন্তু তোমাগো যুদ্ধ করতে হইব ভীষ্ম দ্রোণ অশ্বত্থামা কৃপ শল্য কর্ণ আর দুর্যোধনের লগে। সেইটাও কিন্তু খুব সোজা কাম না তা নিশ্চয়ই তুমি ভালো কইরা জানো যুধিষ্ঠির...

সঞ্জয় এইবার কৃষ্ণ আর দ্রুপদের দিকে ফিরে- আপনেরা মুরুব্বি মানুষ। আপনাগোরেই কই; ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্র চান যে আপনেরাই দুই বংশে শান্তির ব্যবস্থা করেন...

যুধিষ্ঠির কয়- যুদ্ধ ছাড়াই যদি যুদ্ধের জিনিস পাওয়া যায় তো কোন আক্কেলে আমি যুদ্ধ করতে যামু? কিন্তু জ্যাঠা ধৃতরাষ্ট্রের নিজের বুদ্ধি ভালো হইলেও চলার সময় তো তিনি তার পোলা দুর্যোধনের বুদ্ধি নিয়া চলেন; যে আবার লাফায় দুঃশাসন কর্ণ আর শকুনির কথায়। কথা হইল; বহু দিন তারা পুরা রাজ্য ভোগ দখল করছে। এইবার আমারে আমার ইন্দ্রপ্রস্থ ফিরাইয়া দিলে আমিও আগে যা হইছে তা ভুইলা গিয়া যুদ্ধটুদ্ধের কথা চিন্তাও করুম না আর...

সঞ্জয় কয়- এমন কথা কইও না যুধিষ্ঠির। আমার মতে তারা যদি রাজ্যের ভাগ নাও দেয়; তবু তোমার শান্তির পথে যাওয়াই উত্তম। শান্তি বহুত বড়ো জিনিস। তুমি যদি কৃষ্ণের গ্রামে গিয়া ভিক্ষা কইরাও খাও তবুও বহুত শান্তিতে থাকবা; যা তুমি যুদ্ধ কইরা রাজ্য পাইলেও পাইবা না কোনো দিন। জীবন

আর কয় দিন বলো? আমি কই কি তুমি তাগোরে যা দিছ তা তো দিয়াই দিছ; এইবার বাকি জীবনটা শান্তিতে কাটানোর ব্যবস্থাই দেখো...

যুধিষ্ঠির এইবার সঞ্জয়রে ঠেইলা দেয় কৃষ্ণের দিকে- আমরা দুইজনেই দুইজনের বক্তব্য কইলাম। কৃষ্ণ নিরপেক্ষ মানুষ; আমি তার কাছেই তুইলা দিলাম বাকি বিচারের ভার...

কৃষ্ণ আবার বল ঠেলে যুধিষ্ঠিরের দিকে- বুঝলা সঞ্জয়। যুদ্ধ না কইরা যদি উপায় থাকে তবে যুধিষ্ঠির নিজের ভাই ভীমরে হাত পা বাইন্ধা আটকাইয়া যুদ্ধ থামানোর পক্ষে আছেন। তয় কথা হইল কি; কৌরবরা তো ডাকাইত। আর তুমি তো জানোই যে ডাকাইত মারা পুণ্যের কাম। আর ধরো গিয়া ভীষ্ম দ্রোণ ধৃতরাষ্ট্র কৃপ এরা মুরুব্বি হইলেও তারা ডাকাইতের ঠাঙ্গিদার। কারণ দ্রৌপদীর লগে যা করা হইছে তা তো তাগো চোখের সামনেই হইছে। এই সব বুইড়ারা তো সেই কলঙ্ক না থামাইয়া দুর্যোধনরে বলতে গেলে ইন্ধনই দিছেন। আমার মনে হইতাছে সঞ্জয় পাশা খেলার পরে কুরুসভায় পাঞ্চালীর লাঞ্ছনার ঘটনাটা তুমি নিজে ভুইলা গিয়া আমাদেরও ভুইলা যাইতে কইতাছ। তা যাই হউক; পাণ্ডবগো ক্ষতি না কইরা যদি শান্তি করা যায় তয় আমি সেইটার পক্ষে কাজ করতে রাজি। কিন্তু আমার কথা কি তোমার কৌরবরা মানব? মনে তো হয় না। তাই আজকের আলোচনার সারকথা হিসাবে তুমি রাজা ধৃতরাষ্ট্ররে কইবা যে; পাণ্ডবগো যুদ্ধ করার যথেষ্ট ক্ষমতা থাকলেও তারা মূলত শান্তিকামী। তারা তাগো ন্যায্য পাওনাটা চায়; আপনি সেই ব্যবস্থা করেন...

- হ হ। জ্যাঠারে আমার প্রণাম দিয়া কইও আমরা পাঁচ ভাইরে যদি পাঁচটা গ্রাম দেওয়া হয় তবে আর কিছুই চাওয়ার নাই আমাদের...

ধুম কইরা যুধিষ্ঠিরের এই প্রস্তাবে বেকুব হইয়া বইসা থাকে কৃষ্ণসহ সবাই আর হস্তিনাপুর ফিরা গেলে সঞ্জয়রে জাপটাইয়া ধরেন ধৃতরাষ্ট্র- কী সংবাদ কও?

সঞ্জয় কয়- মহারাজ অবস্থা খারাপ। এর বেশি কিছু এখন কইতে পারব না। আমারে এক রাইত ঘুমাইতে অনুমতি দেন; বিস্তারিত কাইল সকালে সকলের সামনে কমু মহারাজ...

ভোরবেলা প্রধানমন্ত্রী বিদুররে ডাকেন ধৃতরাষ্ট্র- পাণ্ডবগো শিবিরে গিয়া ডর খাইছে সঞ্জয়। তার ডর দেইখা সারা রাইত ডরে আমারও ঘুম হয় নাই ভাই...

বিদুর কয়- আপনি তো মহারাজ একান্তে আমার সব কথাই বোঝেন কিন্তু পোলার সামনে গেলে তো আবার নিজের বুঝ পাল্টাইয়া ফেলেন। তা আমি আর কী কমু কন? যুধিষ্ঠির তো আপনেরে মান্যই করত; এখনো করে। আপনি খালি তার বাপের অংশটা তারে দিয়া দেন; আমি নিশ্চিত কইতে পারি যে সে আপনেরে আবার মাথায় তুইলা রাখব...

ধৃতরাষ্ট্র স্বীকার যান- কথা সত্য বিদুর। দুর্যোধন সামনে না থাকলে কোনো দিনও তোমার মতের লগে কোনো অমত হয় না আমার। কিন্তু পোলাটা সামনে আসলে যে কী হয় আমার। কপাল বিদুর। সবই কপাল...

পর দিন সকালে রাজসভায় সঞ্জয় বিস্তারিত কইয়া উপসংহার টানে- যুদ্ধ লাগলে পাণ্ডবরা আমাগো নির্বংশ কইরা ফালাইব মহারাজ...

সঞ্জয়রে সমর্থন করেন ভীষ্ম- আমিও তাই বলি দুর্যোধন। কৃষ্ণ আর অর্জুন যেইখানে একসাথে আছে সেইখানে যুদ্ধে আমাগো পরাজয় ছাড়া কিছুই দেখি না আমি। যদিও তুমি দুঃশাসন শকুনি আর ছোটলোক কর্ণ ছাড়া কারো কথা

কানে তোলো না; তবুও তোমারে কই; যুদ্ধের চিন্তা বাদ দিয়া তুমি পাণ্ডবগো সম্পত্তি ফিরাইয়া দেও...

ভীষ্ম চান্স পাইলেই কর্ণরে ধুইতে যান। কর্ণও ভীষ্মের কথা ধরে আর বহু কষ্টে দুইজনরে থামাইয়া দ্রোণ ধৃতরাষ্ট্ররে পরিষ্কার জানায়ে দেন ভীষ্মের মতই তার মত। কিন্তু সেই দিকে নজর না দিয়া ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়রে জিগান- আইচ্ছা আমাগো এগারোটা বাহিনী জোগাড় হইছে শুইনা কী কইল যুধিষ্ঠির?

সঞ্জয় কিছু কয় না। ধৃতরাষ্ট্র আবার প্রশ্ন করেন- আইচ্ছা তার লগে আর কারা কারা আছে সেই সম্পর্কে তুমি কিছু কও তো সঞ্জয়...

সঞ্জয় কয়- বহু লোক মহারাজ। দুই পোলা নিয়া রাজা দ্রুপদ; কেকয়রাজের পাঁচ পোলা; সাত্যকি; কাশীরাজ; দ্রৌপদীর পাঁচ পোলা; সুভদ্রার পোলা অভিমন্যু; শিশুপালের পোলা ধৃষ্টকেতু; জরাসন্ধের পোলা সহদেব আর জয়ৎসেন। তবে সব থাইকা বড়ো কথা হইল; কৃষ্ণ সর্বক্ষণ আছে যুধিষ্ঠিরের লগে...

সঞ্জয়রে থামাইয়া ধৃতরাষ্ট্র কন- এগো কাউরে নিয়া আমার কোনো ডর নাই। আমার খালি ডর কুন্তীর মাইজা পোলা ভীমেরে। যুধিষ্ঠিরের কাছে মাপ চাইলে সে মাপ কইরা দিব। কৃষ্ণ-অর্জুনের কাছে আত্মসমর্পণ করলে তারাও আর অস্ত্র উঁচাইব না। কিন্তু বদমেজাজি ভীমটার ভিত্রে এক ফোঁটা দয়ামায়া যেমন নাই তেমনি জীবনে কোনো দিন প্রতিশোধের কথাও ভোলে না সে। অন্য কে কী করব না করব জানি না; কিন্তু আমার সব সময়ই ডর লাগে আমার সবগুলা পোলাই হয়ত মারা পড়ব এই নির্দয় ভীমের গদায়...

ধৃতরাষ্ট্র এইবার নিজের পোলার দিকে ফিরেন- আমরা যুদ্ধ করতে পারি। ভীষ্ম কৃপ দ্রোণ আছেন আমাগো লগে। কিন্তু এরা আমাগো পক্ষে যুদ্ধ করলেও এই

তিনজনের কেউই পাণ্ডবগো উপর অস্ত্র উঠাইবেন না সেইটাও আমি জানি দুর্যোধন। আর অস্ত্র উঠাইলেই বা কী? বানপ্রস্থে যাওয়ার বয়সী মানুষের কাছে তুমি আর কতটাই বা যুদ্ধ আশা করতে পারো? তোমার পক্ষে যদি সততা নিয়া কেউ যুদ্ধ করে তবে সে একলা কর্ণ। কর্ণের ক্ষমতা নিয়া আমার সন্দেহ নাই। কিন্তু এই পোলাটা যেমন অতিশয় দয়ালু তেমনি অস্থির আর মাথাগরম। তার গুরু পরশুরাম ঠিকই কইছেন; চূড়ান্ত মুহূর্তে অতিরিক্ত উত্তেজনায় কর্ণের ভুল করার আশঙ্কা অতিশয় প্রবল। ভাবনা কইরা দেখো দুর্যোধন; একই রথে যখন থাকব কৃষ্ণের বুদ্ধি আর অর্জুনের অস্ত্র তখন তোমার অস্থিরচিত্ত কর্ণের কাছে ভুল করা ছাড়া আর কীইবা আশা করতে পারো তুমি? তাই মুরুব্বিগো লগে আমিও একমত। যুদ্ধে যাওয়া মোটেও ঠিক হইব না। আমি সন্ধির প্রস্তাবই পাঠামু যুধিষ্ঠিরের কাছে...

দুর্যোধন হাসে- অতটা ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই মহারাজ। পাণ্ডবরা বনে যাবার শুরুতে যখন কৃষ্ণ আর পাঞ্চালরা আইসা আমাগো হুমকি-ধামকি দিতাছিল তখন একবার আমি ভাবছিলাম- থাউক। এই সব ঝামেলায় গিয়া খামাখা আব্বা আর প্রজাগো কষ্ট না বাড়াই। তার থাইকা ভালো; পাণ্ডবগো ডাইকা তাগো রাজ্য দিয়া সন্ধি করি। কিন্তু তখন দাদা ভীষ্ম আর গুরু দ্রোণ আমারে তা করতে নিষেধ কইরা কইছিলেন যে যুদ্ধ কইরা যাদব পাঞ্চালরা কুলাইতে পারব না আমাগো লগে। কিন্তু এখন বুঝতাছি বয়সের কারণে তারা ডর খাইছেন। তাতে আমার কোনো অসুবিধা নাই। কারণ এখন আমাগো অবস্থা আগের থিকা শতগুণে ভালো। আর অন্য দিকে তেরো বচ্ছর বনে-জঙ্গলে থাইকা পাণ্ডবগো অবস্থা এখন আগের থিকা বহুত খারাপ। তার অকাট্য প্রমাণ তো সঞ্জয়ের মুখে নিজের কানেই শুনলেন। যুদ্ধ ডরাইয়া যুধিষ্ঠির এখন রাজ্যের বদলা পাঁচখান গ্রাম ভিক্ষা চাইতাছে পাঁচ ভাইয়ের লাইগা। আর আরেকটা কথা; ভীম সম্পর্কে আপনার দুর্ভাবনা এক্কেবারে খামাখা। ভীম আর আমি তো একলগে বলরামের কাছে গদা শিখছি। উস্তাদের ভাষ্যমতেই গদাযুদ্ধে আমি ভীম থাইকা বহুগুণ বেশি ক্ষমতাশীল। সে যদি

আমার সামনেও আসে তবু তার বেশিক্ষণ টিকার কোনো সম্ভাবনা নাই। আর সৈনিকের সংখ্যার দিকে আমরা পাণ্ডবগো থাইকা এখন দেড়গুণেরও বেশি সেইটা তো সকলেই জানে...

ধৃতরাষ্ট্র দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন- যুদ্ধের হিসাব তোমার হিসাবের মতো সোজা হইলে তো হইতই বাপ। তুমি সবকিছু হিসাব করলা কিন্তু যাদব বংশীয় কৃষ্ণের বুদ্ধির হিসাবটা বাদ দিয়া নিজের হিসাবে বড়ো বেশি ফাঁক রাইখা দিলা দুর্যোধন। আইচ্ছা সঞ্জয়; কও তো যুদ্ধের লাইগা যুধিষ্ঠিররে সবচে বেশি নাড়া দিতাছে কেডায়?

- ধৃষ্টদ্যুম্ন। দ্রৌপদীর ভাই ধৃষ্টদ্যুম্ন আর তার লগে আছে তার ভাই শিখণ্ডী...

ধৃতরাষ্ট্র আরেকটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন- শুনছি দ্রুপদের এই দুই পোলা আরো বেশি নিষ্ঠুর। অস্ত্র চালাইতে গেলে মুরব্বি কিংবা ব্রাহ্মণেরও ধার ধারে না তারা...

যুধিষ্ঠিরের কথায় উপপ্লব্য নগরে বইসা ঝিমায় কৃষ্ণ। যুদ্ধের লাইগা সকলরে জড়ো কইরা শেষে সঞ্জয়রে কী কথা কইয়া পাঠাইল যুধিষ্ঠির? সে এখন মাত্র পাঁচটা গ্রাম চায় দুর্যোধনের কাছে? কিন্তু বেকুব হইবার তখনো অনেক বাকি কৃষ্ণের। যে ভীম ধৃতরাষ্ট্রের পোলাগো মারবার লাইগা সারাক্ষণ যুদ্ধমন্ত্র জপে; বনবাস আর লাঞ্ছনার রাগে একলা একলা কথা কয়; হাসে; রাগে হাঁটুর ভিতর মুখ লুকাইয়া কান্দে; সেই ভীমও গলা নামাইয়া কয়- যুদ্ধ না কইরা যা পাওয়া যায় তাই ভালো কৃষ্ণ। তুমি সেই ব্যবস্থাই করো...

অর্জুন মূলত যুধিষ্ঠিরের ছায়া। যুধিষ্ঠিরের বাড়া কোনো সিদ্ধান্ত থাকে না তার। নকুলও রিপিট করে যুধিষ্ঠিরের কথা...

কৃষ্ণ অবাক হইয়া তাকায় উনষাট বছর বয়সের যুধিষ্ঠির- আটান্ন বছরের ভীম আর সাতান্ন বছর বয়স অর্জুনের দিকে। আইজ প্রথম কৃষ্ণের মনে হয় বয়স যেমন পাণ্ডবগো জাপটাইয়া ধরছে তেমনি বনবাসের কষ্টে সত্যিই এরা এখন একদল ভাইঙ্গাপড়া মানুষ। এরা সৈন্যসমাবেশ করছে শুধু দুর্যোধনরে ডর দেখাইতে; যুদ্ধ করতে না...

কৃষ্ণ আমতা আমতা করে- ঠিকাছে; তোমাগো প্রস্তাব নিয়া তবে আমি হস্তিনাপুর যাব। কিন্তু যুদ্ধ আটকাইতে পারব কি না তার গ্যারান্টি দিতে পারব না আমি...

- আমি যুদ্ধই চাই। যুদ্ধ যাতে হয় সেই ব্যবস্থাই তুমি করবা হস্তিনাপুর গিয়া...

গলাটা সহদেবের। যেখানে ভীম পর্যন্ত ভচকাইয়া গেছে সেইখানে সহদেবরে কিছু জিগানোরই দরকার মনে করে নাই কৃষ্ণ। সহদেব কৃষ্ণের চোখে চোখ রাইখা কয়- কৌরবরা যদি শান্তিও চায় তবুও তুমি যুদ্ধ ঘটাবা এইটাই আমার কথা। যুধিষ্ঠির ভীম আর অর্জুন যদি যুদ্ধ না করতে চান তবে আমি একলা হইলেও যুদ্ধ করব। কারণ রাজ্য পাওয়া না পাওয়ার থাইকা আমার কাছে পাঞ্চালীর লাঞ্ছনার প্রতিশোধ নেওয়াটই বড়ো...

সাত্যকিও চিৎকার দিয়া উঠে- পাঁচ গ্রামের হিসাব বুঝি না আমরা। আমরা যুদ্ধই চাই...

প্রবীণ সভাসদগণের পরামর্শ আর সঞ্জয়ের বর্ণনা বিবেচনা কইরা কুরুসভায় রাজা ধৃতরাষ্ট্র সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন- শোনো দুর্যোধন। যুদ্ধের চিন্তা বাদ দিয়া

তুমি পাণ্ডবগো তাদের সম্পত্তি ফিরাইয়া দিবার আয়োজন করো। বাকি যে অর্ধেক রাজ্য থাকব তাতে কোনোকিছুরই কোনো অভাব হইব না তোমার। যুদ্ধে ভীষ্ম দ্রোণ কৃপের যেমন মত নাই; আমারও নাই...

- একটা সুঁই পরিমাণ মাটিও পাণ্ডবগো দিমু না আমি...

রাজার সিদ্ধান্তের উপর দুর্যোধনও তার পরিষ্কার সিদ্ধান্ত জানায়ে দেয়- আর কেউ যদি যুদ্ধ নাও করে তবু আমি দুঃশাসন আর কর্ণই যুদ্ধ করব পাণ্ডবগো লগে...

কর্ণ দুর্যোধনরে সমর্থন করে আর দুর্যোধনরে কিছু কইতে না পাইরা ভীষ্ম শুরু করেন কর্ণরে গালাগাল- তুমি আর কতা কইও না। তুমি কৃষ্ণরে চিনো? কৃষ্ণের চক্রের ক্ষমতা জানা আছে তোমার? কৃষ্ণের চক্রের কাছে তোমার জারিজুরি মুহূর্তও টিকব না সেইটা জানো? তুমি আসোলে কোনো যোদ্ধাই না। তুমি একটা ফালতু ভ-। তোমার সকল জারিজুরি খালি মুখে। তুমি পরশুরামের কাছে নিজের মিথ্যা পরিচয় দিয়া যেইভাবে তার শিষ্য হইছিলা; এখনো তুমি সেই রকম মিথ্যা বড়াই করতাছ। তোমার আসোল পরিচয় পাইয়া পরশুরাম যেমন তোমারে আশ্রম থাইকা লাত্থি দিয়া বাইর কইরা দিছিলেন; এক দিন দেখবা দুর্যোধনও তোমার আসোল পরিচয় পাইয়া তোমারে থাবড়ায়ে বাইর করব হস্তিনাপুর থাইকা। কারণ অর্জুন আর কৃষ্ণরে যদি কেউ জয় করবার পারে তবে সেইটা তুমি না; পারলে সেইটা একমাত্র আমার পক্ষেই সম্ভব। অথচ আমিই...

- ঠিকাছে দেখি তবে জয় করেন...

কর্ণ হাতের ধনুক ফিককা ফালায় দুর্যোধনের সামনে- তোমার দাদায় যখন আমারে অতটাই ছোট আর নিজেরে অতটা বড়ো মনে করেন তখন দেখি

তোমার দাদায় কেমনে কৃষ্ণ আর অর্জুনরে জয় করেন। আমি এই অস্ত্র ছাড়লাম। তোমার দাদা ভীষ্ম না মরা পর্যন্ত আমি আর অস্ত্র ধরুম না কইয়া দিলাম। এইটা আমার প্রতিজ্ঞা দুর্যোধন। তোমার দাদা মরার পর আমার যোগ্যতা দেখবা তুমি...

- রাধাপুত্র কর্ণ। তোমার স্বভাবে অনেক গড়মিল থাকলেও যত দূর জানি একবার প্রতিজ্ঞা করলে তুমি সেইটা রাখো। মনে রাইখ আমি না মরা পর্যন্ত আর অস্ত্র ধরবা না তুমি...

ভীষ্মের কথার কোনো উত্তর না দিয়া গটগট কইরা কর্ণ বাইর হইয়া গেলে ধৃতরাষ্ট্র হাসেন- কইছিলাম না দুর্যোধন। কর্ণ পোলাটার মাথা গরম হইলে বুদ্ধিশুদ্ধিও লোপ পায়? দেখলা তো সে তোমার লাইগা যুদ্ধ করতে আইসা জ্যাঠার উপর রাগ কইরা তোমরারেই সে একলা ফালাইয়া গেলো যুদ্ধের সামনে...

ভীষ্মও হাসেন- যাউক। এক পাগলরে তো যুদ্ধ থাইকা সরাইতে পারলাম। অন্তত আমি যদ্দিন বাঁইচা আছি তদ্দিন আর যুদ্ধ করব না কর্ণ। তা তুমি এখন কী সিদ্ধান্ত নিবা দুর্যোধন?

- যুদ্ধ। যেকোনো অবস্থায় যুদ্ধই আমার সিদ্ধান্ত পিতামহ। আর আপনি যখন কইছেন যে কৃষ্ণ অর্জুনরে আপনি পরাজিত করতে পারেন; তাই আমার সিদ্ধান্ত হইল আপনেই হইবেন আমার যুদ্ধের সেনাপতি...

পাণ্ডবগো দূত হইয়া হস্তিনাপুর যাইবার আগে কৃষ্ণ গিয়া খাড়ায় দ্রৌপদীর সামনে। অনেকক্ষণ চুপ থাইকা অতি ধীরে মুখ খোলে পাঞ্চালী- হস্তিনাপুরে

পাণ্ডবগো সন্ধির প্রস্তাব নিয়া যাও কৃষ্ণ। আমার আপত্তি নাই। কিন্তু যখন তুমি দুর্যোধনের কাছে সন্ধির প্রস্তাব করবা তখন তোমার সখীর এই খোলা চুলের কথা স্মরণ রাইখ; যা এক দিন হাত দিয়া টানছিল দুঃশাসন। আর সখীর কাছে করা তোমার নিজের প্রতিজ্ঞার কথাটাও যেন তোমার মনে থাকে। এর বেশি আমার আর বলার কিছু নাই। কিন্তু পাণ্ডবগো মতো তুমিও যদি মনে করো যে পুরানা দিনের সেই সব কথা আর মনে করতে চাও না। তবে জাইনা যাও; বৃদ্ধ বাপ; দুই ভাই আর অভিমন্যুর লগে এখন নিজের পাঁচটা জোয়ান পোলাও আছে দ্রৌপদীর। তোমরা না থাকলেও কেউ না কেউ তো থাকব যে দ্রৌপদীর লাইগা আগুন জ্বালাইব হস্তিনাপুর...

কৃষ্ণ মুখ খোলে- তুমি নিশ্চিন্ত থাকো পাঞ্চালী। পাণ্ডবরা কৌরবগো ক্ষমা কইরা দিলেও তাগো নরকে যাওয়া ঠেকাইতে পারব না কেউ...

১৩

তেরোটা বচ্ছর পর ভাতিজার কাছে ভাইঙ্গা পড়ে কুন্তী- কৃষ্ণরে; পুতুল খেলার বয়সে নিজের বাপ মোরে দান কইরা দিছিল ভিনগ্রামে। নিজের নাম পৃথা বাদ দিয়া পালকপিতা কুন্তীভোজের নামে কুন্তী বইনা বড়ো হইয়া বিবাহ করলাম এক সম্রাটরে; কিন্তু রাজনীতির খপ্পরে পইড়া জঙ্গলে সংসার করতে হইল ষোলোটা বছর। বিধবা হইবার পর ভাসুরের চক্রান্তে আদাড়ে-বাদাড়ে ঘুইরা নাবালক পাঁচটা পোলারে বড়ো কইরা বানাইলাম রাজা। তারপর পোলাগো অপকর্মে আরো তেরোটা বচ্ছর আমার বাঁচতে হইল দেবরের ভাতে। কৃষ্ণরে; পিতা স্বামী ভাসুর পুত্র; এমন কেউ নাই যে আমার লগে অবিচার করে নাই। এইবার ক দেখি বাপ; যে কারণে ক্ষত্রিয় নারী পোলা জন্ম দেয়; সেই কাল কি উপস্থিত হইছে আমার? কেমন আছে হতভাগী দ্রৌপদী? কেমন আছে পোলারা সবাই?

কৃষ্ণ কুন্তীর কাছে সকলের কুশল সংবাদ দিয়া তারে সান্ত্বনা দেয়- দুঃখ কইর না পিসি। ক্ষত্রিয় যাদব বংশের মাইয়া তুমি; কুন্তীভোজের বংশে গিয়া হইছিলা রাজকন্যা। তারপর সম্রাটরে বিবাহ কইরা তুমি যেমন সম্রাজ্ঞী হইছিলা তেমনি বীরপুত্র জন্ম দিয়া পাইছিলা রাজমাতার সম্মান। দুঃখ-কষ্ট ক্ষত্রিয় জীবনে থাকেই; কিন্তু আবার সেই সময় উপস্থিত তোমার। শিগগিরই তোমার পোলাগো আবার দেখতে পাইবা পৃথিবীর অধিপতিরূপে। সেই নিমিত্তেই আমার হস্তিনাপুর আসা; কাইল সকালে প্রস্তাব নিয়া যাব ধৃতরাষ্ট্রের কাছে...

যুধিষ্ঠিরের পাঁচটা গ্রামের অনুরোধও প্রত্যাখ্যান হইলে কার্তিক মাসের এক সকালে দূতিয়ালির উদ্দেশ্যে কৃষ্ণ রওনা দেয় হস্তিনাপুর। যুধিষ্ঠির চায় নাই কৃষ্ণ হস্তিনাপুর আসুক; কিন্তু এটাও সে জানায়ে দেয়- কৃষ্ণ তুমি ভিন্ন এখন আমাগো উদ্ধারের আর কেউ নাই। তবে তোমারে অনুরোধ; শান্তির চেষ্টাই বেশি কইরো তুমি...

ভোরবেলা উপপ্লব্য নগর থাইকা রওনা দিয়া এক রাত্রি বুকস্থল গ্রামে কাটাইয়া পরের দিন সন্ধ্যায় কৃষ্ণ আইসা হাজির হয় হস্তিনাপুর। আসার আগে যুধিষ্ঠিররে পরিষ্কার জানায়ে আসে- শান্তিপূর্ণ সমাধানের আশা বেশি না কইরা যুদ্ধের লাইগা তৈয়ারি থাকেন...

কৃষ্ণ আসার সংবাদে এক বিশাল সংবর্ধনার আয়োজন করে ধৃতরাষ্ট্র আর দুর্যোধন। বেশুমার খানাখাদ্যের লগে কৃষ্ণরে উপহার দিবার লাইগা রেডি রাখা হয় অঢেল স্বর্ণ মণিমুক্তা হাতিঘোড়া আর হাজারে হাজার দাসদাসী। এই সব দেইখা বিদুর কয়- আপনের মতিগতি বোঝা মুশকিল মহারাজ। পাণ্ডবগো আপনে পাঁচটা মাত্র গ্রাম দিতে নারাজ অথচ অঢেল ঘুস দিয়া কৃষ্ণরে কিনতে চান...

ভীষ্ম সবাইরে সতর্ক কইরা দেন- সংবর্ধনা দেও আর নাই দেও; কৃষ্ণের লগে যেন কেউ খারাপ ব্যবহার না করে; খবরদার...

দুর্যোধন কয়- খারাপ ব্যবহার করব না তার লগে। তয় তারে আমি বাইন্ধা থুমু কইলাম। তাইলেই আর পাণ্ডবরা লোম নাড়াইতে সাহস করব না...

ধৃতরাষ্ট্র পোলারে ধাতানি দেন- বেকুবি কইরো না দুর্যোধন। কৃষ্ণ দূত আর তোমার বেয়াই...

ভীষ্ম কন- ধৃতরাষ্ট্র তোমার পোলারে সামলাও। কৃষ্ণরে খালি সে বেয়াই হিসাবেই দেখছে; জীবনেও প্রতিপক্ষ হিসাবে দেখে নাই। কোনো বেয়াদবি যেন না হয় তার লগে। সাবধান...

নগর দুয়ার থিকা কৃষ্ণরে আউগাইয়া আনতে শত শত লোকের সাথে স্বয়ং উপস্থিত হন ভীষ্ম দ্রোণ কৃপের মতো মানুষ। দূতিয়ালির লাইগা আসছে কৃষ্ণ;

কিন্তু সে সম্পূর্ণ সশস্ত্র আর বিশাল এক সেনাবাহিনী নিয়া তার লগে আছে তার ডাইন হাত দুর্ধর্ষ বৃষ্ণি বংশীয় সেনাপতি সাত্যকি। ভীষ্ম মনে মনে হাসেন। দূতিয়ালি করতে সেনাবাহিনী লগে নিয়া আসার মানে তিনি বোঝেন। রাজা সুবলের কাছে আন্ধা ভাতিজা ধৃতরাষ্ট্রের লাইগা তার মেয়ে গান্ধারীর বিবাহ প্রস্তাব নিয়া যাওয়ার সময় তিনি নিজেও লগে নিয়া গেছিলেন বিশাল এক সেনাবাহিনী। সুবল সেনাবাহিনীর দিকে তাকাইয়া আন্ধা ধৃতরাষ্ট্রের লগে নিজের মাইয়ার বিবাহে এক বাক্যে রাজি হইছিলেন সেদিন...

কৃষ্ণ কিছুই নিল না হাতে। না উপহার না খাবার। খালি পা ধোয়ার পানি নিয়া সকলের লগে সেলামালকি বিনিময় কইরা গিয়া হাজির হইল রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সামনে। ধৃতরাষ্ট্র সিংহাসন ছাইড়া উইঠা অভিবাদন জানাইলেন কৃষ্ণরে। কৃষ্ণ তার লগে শুভেচ্ছা বিনিময় কইরা পিসি কুন্তীর লগে দেখা করতে সোজা গিয়া হাজির হয় বিদুরের ঘরে...

কুন্তীরে দেইখা কৃষ্ণ যায় বেয়াই দুর্যোধনের ঘরে। সেইখানে দুঃশাসন আর কর্ণের লগে আরো বহু রাজারা উপস্থিত। দুর্যোধন তারে আপ্যায়ন করে- বেয়াই খাও...

কৃষ্ণ কয়- বেয়াই আমি এখন তোমার প্রতিপক্ষের দূত। দূতিয়ালি সফল না হইলে যেমন দূতের পক্ষে খানাপিনা গ্রহণ করা সম্ভব না; তেমনি সম্পর্ক ভালো থাকলে কিংবা বিপদে পড়লেই শুধু অন্যের খাদ্য গ্রহণ করা যায়। তুমি আত্মীয় হইলেও যেহেতু পাণ্ডবগো শত্রুপক্ষ তাই তুমি এখন আমারও শত্রুপক্ষে আছে। আমি এখন সম্পর্কের খাতিরে যেমন তোমার খাবার খাইতে পারি না; তেমনি আমি এইখানে আইসা বিপদে পড়ছি সেইটাও মনে করি না। আপাতত মাফ করো আমারে। আমি হস্তিনাপুরে খালি বিদুরের দেওয়া খাবারই খামু; কারণ আমার পিসি আছেন তার ঘরে আর মানুষটাও নিরেট এবং নিরপেক্ষ...

কৃষ্ণ বিদুরের ঘরে গেলে ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আইসা কন- তোমার থাকা-খাওয়ার লাইগা আমরা বহুত আয়োজন করছি কৃষ্ণ; আইসো আমাগো লগে...

কৃষ্ণ কয়- আপনারা আমারে দেখতে আসছেন তাতেই সম্মানিত হইছি আমি। বিদুরের ঘর ছাড়া আর কোথাও খাবার নিতে অনুরোধ কইরেন না আমারে...

খাইতে বইসা বিদুর কন- তোমার এইখানে আসা বোধ হয় ঠিক হয় নাই কৃষ্ণ। যত যাই হোক; ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ সকলেই কিন্তু যুদ্ধ করব দুর্যোধনের পক্ষে। সে কারণে তোমার কোনো প্রস্তাবই মানব না দুর্যোধন। তাছাড়া যাগো লগে তোমার শত্রুতা আছে তারা সবাই আইসা হাজির হইছে হস্তিনাপুর আর কালকের সভাতেও তারা থাকব। আমি দুশ্চিন্তায় আছি কাইল এই সব শত্রুগো মাঝে তোমার যাওয়া ঠিক হইব কি না...

কৃষ্ণ কয়- আপনের কথা ঠিক আছে। কিন্তু বিপদের আশঙ্কা যতই হোক; আমি না গেলে পরে কথা উঠব যে কৃষ্ণ পারলেও পারত কিন্তু তবুও সে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ থামাইতে চেষ্টা করে নাই। আর বিপদ নিয়া চিন্তা কইরেন না; সব ধরনের প্রস্তুতি আছে আমার...

পর দিন সকালে বিদুরের বাড়ি থিকা কৃষ্ণরে সভায় আউগাইয়া নিতে আসে শকুনি আর দুর্যোধন। কৃষ্ণ রওনা দেয় বিদুর আর সাত্যকির লগে আর তার পিছে পিছে যায় তার সেনাদল। সভায় প্রবেশ করলে রাজা ধৃতরাষ্ট্রসহ ভীষ্ম দ্রোণ আর যারা যারা আছিল সকলে খাড়াইয়া কৃষ্ণরে সম্মান জানাইয়া বসতে অনুরোধ করলে কৃষ্ণ কয়- আমার লগে দ্বৈপায়ন পরশুরাম নারদসহ বেশ কিছু মুরুব্বি আছেন যারা আজকের সভায় থাকতে চান। তারা বাইরে খাড়াইয়া আছেন। তাগোরে আমন্ত্রণ দিয়া বসার আসন না দিলে তো আমার পক্ষে এই সভায় আসন গ্রহণ করা কঠিন...

ধৃতরাষ্ট্র বড়োই টাসকি খান এই কথা শুনে। গতকাল তিনি শুনছিলেন কৃষ্ণ বিশাল একটা সেনাবাহিনী নিয়া আসছে সাথে। কিন্তু ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেন নাই যে সালিশদার হিসাবে এতগুলান মুনিঋষিও সাথে নিয়া আসছে সে। মনে মনে কৃষ্ণের বুদ্ধির তারিফ করেন ধৃতরাষ্ট্র। এমন লোকদের সাথে নিয়া আসছে কৃষ্ণ যাগো সামনে কোনো উল্টাপাল্টা করা সম্ভব না। বিশেষ করে সর্বজনশ্রদ্ধেয় তার নিজের ঔরসদাতা পিতা কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন। দুর্যোধনরা যেমন তার পোলার ঘরের নাতি তেমনি পাণ্ডবরাও তার নাতি। কৃষ্ণ তারে সভা শুরুর আগেই বেশ চিপায় ফালাইয়া দিছে তিনি বুঝতে পারেন। বিষয়টা নিয়া পোলার লগে আগে কিছু আলোচনা কইরা নিলে সুবিধা হইত। কিন্তু এখন আর করার কিছু নাই। এখন চুপচাপ খালি শুইনা যাইতে হইব; দরকার পড়লে দুর্যোধনের বিপক্ষেও কথা কইতে হবে। যা করার পরে করা ছাড়া আপাতত কিচ্ছু করার নাই...

দ্বৈপায়নের লগে অন্য ঋষিদের কথা না হয় বোঝা গেলো; তারা মুনি ঋষি মুরুব্বি মানুষ; সভাসমাবেশে গিয়া বসতে খাইতে বলতে কিংবা দান-প্রণাম নিতে পছন্দ করেন। কিন্তু পরশুরামরে কেন নিয়া আসছে কৃষ্ণ? তিনি তো এই সব সভা সমাবেশ যান না। ভাবতে ভাবতে কৃষ্ণের বুদ্ধিতে আরেকবার মুগ্ধ হন রাজা ধৃতরাষ্ট্র- কর্ণ; কর্ণরে দমাইয়া রাখতেই পরশুরামরে ধইরা নিয়া আসছে কৃষ্ণ। পরশুরাম সব সময়ই শিষ্য কর্ণরে পাতলা পোলা বইলা বকাঝকা করতেন। আইজ অত বছর পরে নিশ্চয়ই কর্ণ গুরুর কাছে নিজেরে আর মাথাগরম পাতলা পোলা হিসাবে প্রমাণ করতে চাইব না। পরশুরাম জ্যাঠা ভীষ্মেরও গুরু। জ্যাঠা ফাঁক পাইলেই নাতির বয়সী কর্ণের লগে খামাখা ঠোকাঠুকি করেন; জিনিসটা পছন্দ না হইলেও ধৃতরাষ্ট্র কিছু কইতে পারেন না। আইজ গুরুর সামনে ওমন কিছু কইরা নিশ্চয়ই ধাতানি খাইতে চাবেন না ভীষ্ম। দ্রোণেরও গুরু পরশুরাম। তিনিও নিশ্চয়ই আইজ নিজের শিষ্য

অর্জুনের প্রশংসা করতে গিয়া গুরুর শিষ্য কর্ণরে গালাগাল করবেন না ভুলেও। ধৃতরাষ্ট্র মনে মনে হাসেন- পরশুরামের তিন জাতের তিন শিষ্য আছে ধৃতরাষ্ট্রের সভায়; ব্রাহ্মণ দ্রোণ; ক্ষত্রিয় ভীষ্ম আর নমশূদ্র কর্ণ; তিনজনরেই আইজ এক লাইনে নিয়া আসছে কৃষ্ণ পরশুরামরে সভায় হাজির কইরা। আর একইসাথে এই সভায় দুর্যোধনরে বড়ো একলাও কইরা ফালাইছে এই জাউরা যাদব...

ভীষ্ম আর বিদুর গিয়া মুরুব্বিগো আমন্ত্রণ কইরা সভায় নিয়া আসলে সকলে খাড়াইয়া সেলামালকি দিয়া তাগোর বসার ব্যবস্থা করেন। তারপর রাজা ধৃতরাষ্ট্ররে সম্বোধন কইরা কৃষ্ণ শুরু করে ধর্ম আর অধর্ম নিয়া শাস্ত্রসম্মত বয়ান। ধৃতরাষ্ট্র অধৈর্য হইলেও চাইপা যান; বহুত চালাক এই কৃষ্ণ। পয়লাই ধর্ম অধর্ম নিয়া কথা কইয়া মুরুব্বিগো পটাইতাছে হালায়...

ধর্ম-অধর্ম বয়ান শেষে কৃষ্ণ শুরু করে স্বয়ং রাজা ধৃতরাষ্ট্ররে তেলানি- মহারাজ চিন্তা কইরা দেখেন তো কুরুগো লগে আছেন ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ কৃপ আর পাণ্ডবগো লগে আছে সাত্যকি আর পাঞ্চাল। কুরুরা আপনার পোলা আর পাণ্ডবরা আপনার ছোট ভাইয়ের পোলা; পিতার অবর্তমানে আপনি নিজেই যাগো পিতা। একটু ভাবনা কইরা দেখেন তো মহারাজ এই কুরু-পাণ্ডব যদি তাগোর মিত্রদের নিয়া একসাথে আইসা আপনার ছাতার নীচে খাড়ায় তবে জগতে আপনার থাইকা শক্তিশালী রাজা আর থাকব কি না কেউ? আমার হিসাবে কেউ না; আমার এই হিসাবে যদি কোনো ভুল থাকে তো এইখানে উপস্থিত মুরব্বিয়ানরা আমারে সংশোধন করেন...

মুরুব্বিরা সকলে কৃষ্ণের কথায় সমর্থন জানাইলে কৃষ্ণ পরের প্রসঙ্গে যায়- আমার আগমনের মূল উদ্দেশ্য মহারাজ; একটু চেষ্টা কইরা দেখা যাতে

আপনার নেতৃত্বে থাকা মহান ভারত বংশটা যেন ধ্বংস না হয়। যার সারকথা হইল শান্তি...

মুরুব্বিরা এইবার সশব্দে কৃষ্ণরে সমর্থন করেন। ধৃতরাষ্ট্র কোনো কথা কন না। শুরুতেই কৃষ্ণ তারে প্যাঁচ মাইরা ধরছে। এখন সভার সকলের সমর্থন আদায় কইরা অজগরের লাহান আস্তে আস্তে সেই প্যাঁচ টাইট দিতাছে সে। কিন্তু এখন কিছু কওয়া যাইব না। কান খাড়া কইরা ধৃতরাষ্ট্র খালি রেডি থাকেন কৃষ্ণের পরের কথা শুনতে...

কৃষ্ণ এইবার সকলের দিকে তাকায়- এইখানে যারা আছেন। ময়মুরুব্বি মুনিঋষি অস্ত্রগুরু যোদ্ধা আর রাজনীতিবিদগণ। তারা কেউই অশান্তির পক্ষে না। একলা সমস্ত দুনিয়া ধ্বংস কইরা দিবার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও পরশুরাম যেমন শান্তি চান; তেমনি পাণ্ডব পাঞ্চাল যাদবদের ধ্বংস করার ক্ষমতা থাকার পরেও গঙ্গানন্দন ভীষ্মও চান শান্তি। আর আপনার ভাতিজা পাণ্ডবেরা যে শান্তিকামী তা তো আপনিও স্বীকার করবেন মহারাজ। কারণ আপনার আদেশের প্রতি শ্রদ্ধা জানাইয়াই তারা তেরো বচ্ছর বনে-জঙ্গলে কষ্ট করছে; কিন্তু আপনার আদেশ লঙ্ঘন করে নাই। অথচ চাইলে তো তারা আরো আগেই আইসা হাঙ্গামা বাঁধাইতে পারত। তো এখন মহারাজ; আপনার পিতৃহীন ভাতিজারা আপনের কাছেই প্রার্থনা করতাছে শান্তির বিধান। তাগো পিতার বড়ো ভাই হিসাবে আপনারে অভিভাবক মাইনাই তারা আপনার কাছে প্রার্থনা করতাছে তাগো ন্যায্য পাওনা আদায়ের বিচার। কারণ তারা মনে করে একমাত্র আপনেই পারেন শান্তিপূর্ণ উপায়ে তাগো ন্যায্য পাওনা দিতে। অন্য কোনোভাবে সেই পাওনা আদায় করতে গেলে যে ক্ষয় হইব তা মূলত আপনারই বংশের ক্ষয়। কারণ সকলে শান্তির পক্ষে থাকলেও আপনি জানেন যে আপনার পোলা দুর্যোধন শান্তির পক্ষে নাই। এখন আপনার পোলাদের সাথে যদি সম্পত্তি নিয়া আপনার ভাতিজাগো খুনাখুনি হয় তবে কি তাতে আপনের শান্তি হইব মহারাজ?

নিজেরে বড়োই কোণঠাসা অবস্থায় আবিষ্কার করেন ধৃতরাষ্ট্র। সকলের কাছ থিকা সমর্থন আদায় কইরা এইবার তার কাছ থিকাও সমর্থন আদায়ের জাল ফালাইছে কৃষ্ণ। সভার একটা মানুষও কোনো কথা কইতাছে না। কৃষ্ণ সরাসরি এইবার দুর্যোধনের নাম ধইরা অভিযোগ করল কিন্তু তারপরেও কর্ণ চুপ। অন্য সময় হইলে অতক্ষণে কর্ণ লাফ দিয়া ধইরা ফালাইত কৃষ্ণের কথা। কিন্তু পরশুরামরে হাজির কইরা সেই কর্ণরেও এক্কেবারে নিঃশব্দ কইরা ফালাইছে কৃষ্ণ। কৃষ্ণ পোলাটা জানে কোন সাপের ফণা কোন জড়ি দিয়া ঠান্ডা করা লাগে...

ধৃতরাষ্ট্র কৃষ্ণের কৌশল বুইঝা চুপ কইরা থাকেন। আন্ধা চোখে তিনি কিছু না দেখলেও বুঝতে পারেন সভার সকলেই এখন তার দিকে তাকাইয়া আছে। তার কাছ থিকা কোনো উত্তর না পাইয়া কৃষ্ণ তার আগের কথাটারে আরেকটু বিস্তার করে- মহারাজ আপনি নিশ্চয় স্বীকার করবেন যে পাণ্ডবরা কোনো দিনও আপনার লগে কোনো বেয়াদবি করে নাই। জতুগৃহ দাহের পর ফিরা আসলে আপনি যখন তাগোরে অনাবাদি খাণ্ডবপ্রস্থে পাঠাইলেন; বিনা বাক্যেই তো তারা আপনের বিচার মাইনা নিছে। তারপর দীর্ঘ দিন মেহনত কইরা সেই রাজ্য বিস্তার কইরা আশপাশের সকল রাজারে আইনা তো আপনারই অধীন করছিল তারা। তারা তো কোনো দিনও আপনার ক্ষমতা লঙ্ঘন করে নাই। এমনকি যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে আপনারে যে সম্মান তারা দিছে তার সাক্ষী তো এইখানে উপস্থিত অনেক মুরুব্বিয়ানই আছেন; বিশেষত মহাঋষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন। তো এখনো তারা আপনার উপরে সেই শ্রদ্ধা রাখে আর সারা জীবনই আপনেরে সেই শ্রদ্ধা দিতে রাজি। কারণ তারা বিশ্বাস করে পিতার অবর্তমানে আপনিই তাগো পিতা। তারা মনে করে; যে পিতার আদেশে তারা এক দিন বনবাসে গেছে; বনবাসের শর্তপালন শেষে সেই পিতার উদ্যোগেই

ন্যায্য পাওনা আর অধিকার নিয়া ঘরের পোলারা আবার ফিরা আসব ঘরে। আপনেই এখন তাগো একমাত্র সহায় মহারাজ...

কৃষ্ণ বোঝে ধৃতরাষ্ট্র এইবারও উত্তর দিবেন না। তাই সে এইবার ধৃতরাষ্ট্রের দিক থাইকা চোখ ফিরাইয়া সভাজনদের দিকে তাকায়- এইখানে অনেক ময়মুরুব্বি আর রাজা-বাদশা আছেন। আপনারাই কন আমি যা কইলাম তার মধ্যে অন্যায্য কিছু কইলাম কি না যাতে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের অসম্মান হয়?

সভাজনরা মাথা নাইড়া সমর্থন করলে কৃষ্ণ আবার ধৃতরাষ্ট্রের দিকে ফিরে- এই সভায় এমন একজন আছেন মহারাজ; যিনি পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে গিয়া এককালে একলাই সমস্ত ক্ষত্রিয়কুল নির্বংশ কইরা দিছিলেন। পরে নিজের পিতামহ ঋষি ঋচীকের আদেশে একলাই আবার শান্তি স্থাপন করছেন দুনিয়ায়। কারণ তারে বাধ্য কইরা শান্তিচুক্তি করার মতো দুনিয়াতে দ্বিতীয় কেউ আগেও যেমন ছিল না; এখনো নাই। যোদ্ধা হিসাবে তিনি যেমন সর্বশ্রেষ্ঠ তেমনি একইসাথে ঋষিপুত্র আর নিজেও ঋষি। তিনি রাজা ছিলেন; চাইলে এখনো দুনিয়ার রাজত্ব করতে পারেন। কিন্তু স্বেচ্ছায় রাজত্ব ছাইড়া তিনি এখন সন্ন্যাস জীবন যাপন করেন। এই সভাতেই যার তিন-তিনজন মহারথী শিষ্য ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ আছেন; আমি সেই ভার্গব ব্রাহ্মণ জমদগ্নিপুত্র পরশুরামরে এইবার অনুরোধ করব আমার বক্তব্য বিচার কইরা কিছু কথা কইতে- ভগবান পরশুরাম। আপনে কন; আমি যা কইলাম তাতে ভুল কিছু কইলাম কি না...

ধৃতরাষ্ট্র উসখুস করেন। ঠাইসা ধরছে তো ধরছে তার উপরে এখন এমন একজনরে তার সামনে খাড়া কইরা দিছে যার লগে বেদ ব্রাহ্মণ অস্ত্র যুদ্ধ রাজত্ব কোনো কিছুতেই দ্বিমত করার সাহস রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নাই। রাজা

ধৃতরাষ্ট্র চুপ কইরা অপেক্ষা করেন পরশুরামের কথার। পরশুরাম সংক্ষেপে সরাসরি কন- কৃষ্ণের যুক্তি আর ব্যাখ্যায় কোনো ফাঁক নাই; পক্ষপাতিত্বও নাই। অসাধারণ কইছে সে। শান্তির পক্ষে এর থিকা বড়ো কোনো উপায় যেমন নাই; তেমনি আপনার লাইগাও এর চেয়ে সম্মানজনক কোনো পন্থা নাই মহারাজ। যুদ্ধ আমি বহুত করছি জীবনে। রক্তক্ষয় কোনো সমাধান না। শান্তিই সব থিকা বড়ো; এইটা আমার নিজের জীবনের উপলব্ধি। তাই আমিও কই; আপনি ভাতিজাগো তাদের ন্যায্য পাওনা দিয়া মিটমাট কইরা নিয়া শান্তিতে থাকেন...

ধৃতরাষ্ট্র এইবারও কিছু কন না। পরশুরামের কথা শেষ হইলে ঋষি কণ্ব সরাসরি দুর্যোধনরে কন- আমিও ঋষি পরশুরামের লগে একমত দুর্যোধন। খামাখা যুদ্ধ কইরা জীবন ক্ষয় করার কোনো মানে নাই। তুমি বরং কৃষ্ণের প্রস্তাব মাইনা নিয়া পাণ্ডবগো লগে আপোসরফা কইরা ফালাও...

এইবার নিজের উরু থাবড়াইয়া গলা খাঁকারি দেয় দুর্যোধন- আমি কী করব না করব সেই বুদ্ধি আপনের কাছে নিতে হইব আমার? আপনে চুপ থাকলে ভালো হয়...

নারদ দুর্যোধনরে থামান- অত রাগ আর জিদ কোনোটাই ভালো না দুর্যোধন। ময়মুরুব্বিগো কথা তোমার শোনা উচিত। আমিও মনে করি তুমি যদি পাণ্ডবগো লগে মিটমাট কইরা ফালাও তাতে সবারই মঙ্গল হয়; বিশেষ কইরা তোমার নিজের...

আর চুপ কইরা থাকার উপায় নাই। দুর্যোধন ঋষি কণ্বের লগে বেয়াদবি কইরা ফালাইছে। এখনই না সামলাইলে অবস্থা বেগতিক হইতে বেশিক্ষণ লাগব না। আর মুরুব্বিগো লগে বেয়াদবি করলে কৃষ্ণ হয়ত এই সভাতেই দুর্যোধনের

মাথা নামাইয়া ফালাইব সকলের সমর্থন নিয়া। কারণ এই মুরুব্বিরা আসছেন কৃষ্ণের নিমন্ত্রণে। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে শিশুপালের মাথাটা যেমনে কৃষ্ণ ভরা সভায় ফালাইয়া দিলো সেইটা মনে কইরা ভয়ে কাঁইপা উঠেন ধৃতরাষ্ট্র। ধৃতরাষ্ট্র দেরি না কইরা গলা খোলেন- আমি ঋষি কণ্ব আর নারদের কথা সম্পূর্ণ সমর্থন করি। কিন্তু আমি আন্ধা মানুষ। নামে রাজা হইলেও রাজত্বের কাম তো চালায় আমার পোলা দুর্যোধন। আমি কৃষ্ণের ব্যাখ্যা আর প্রস্তাবও সমর্থন করি। কিন্তু কী আর কমু; আমার যে হাত-পা বাঁধা। আমার পোলা আমার কথা যেমন কানে তোলে না তেমনি তার মা গান্ধারী; কিংবা বিদুর কিংবা জ্যাঠা ভীষ্মের কথাও শোনে না সে। আমি কই কি; কৃষ্ণ। তুমি ঠান্ডা মাথার বুদ্ধিমান মানুষ। দুর্যোধনের আত্মীয়ও বটে। আমি তোমারেই অনুরোধ করি তুমি তোমার বেয়াই দুর্যোধনরে কথাগুলা একটু বোঝাও...

কৃষ্ণ বোঝে ধৃতরাষ্ট্র একটা চাল চাইলা দিলেন। অন্য কেউ দুর্যোধনরে কিছু কইতে গেলে সে যদি উল্টাপাল্টা কিছু কয় তবে বিষয়টা অন্য দিকে চইলা যাইব। তাই তারেই দিলেন দুর্যোধনের ভার; আর তার লগে দুইজন যে আত্মীয় সেইটা স্মরণ করাইয়া বুঝাইয়া দিলেন যাতে দুর্যোধন কিছু কইলে কৃষ্ণ মাইন্ড না করে...

ঠিকাছে। কৃষ্ণ বুঝাইতে চেষ্টা করে দুর্যোধনরে- দুর্যোধন। তোমার বাবা কাকা দাদাসহ সকল মুরুব্বিগো কথা তো জানোই। অন্য দিকে তোমার সঙ্গীদের মধ্যে অশ্বত্থামা সঞ্জয়; তোমার ভাই বিকর্ণ আর বিবিংশতি; তোমার মিত্র সোমদত্ত; বাহ্লীকরাজ সকলেই কিন্তু সন্ধির পক্ষে। আমিও কই; তুমিও তোমার বাবার কথা মাইনা লও...

দুর্যোধন কোনো কথা কয় না। কৃষ্ণ আরো আগে বাড়ে- পাণ্ডবগো লগে যুদ্ধে কী ফল হইতে পারে তা তো কিছু দিন আগে বিরাট নগরে অর্জুনের লগে যুদ্ধেই টের পাইছ তুমি। আমি তোমারে নিশ্চয়তা দিতাছি; পাণ্ডবগো লগে

ভাগাভাগির পরও ধৃতরাষ্ট্রের মহারাজ পদ যেমন থাকবে; তেমনি যুবরাজ পদও হারাইতে হইব না তোমার। তুমি বহু দিন তাগো অংশও ভোগ করছ; এইবার তাদের পাওনাটা তাদের দিয়া দেও...

এইবার ভীষ্ম মুখ খোলেন- কৃষ্ণের কথাটা রাখ দুর্যোধন; আখেরে লাভ হইব তোর। এমন প্রস্তাব পায়ে ঠেইলা আন্ধা বাপ-মায়েরে কান্দাইস না...

দ্রোণও দুর্যোধনরে তেলান- গুরু হিসাবে কই; কৃষ্ণ আর ভীষ্মের কথাটা মাইনা ল। ঘাউড়ামি কইরা বংশের সকলের মরার ব্যবস্থা করিস না। অর্জুনের লগে যেখানে কৃষ্ণ থাকব সেইখানে যুদ্ধ কইরা মরা ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারি না আমি...

বিদুর কন- তোমার লাইগা আমি ভাবি না ভাতিজা। কিন্তু তোমার বুড়া বাপ-মায়ের ভবিষ্যৎ দুঃখের কথা ভাইবা আমার বড়ো দুশ্চিন্তা হয়। তুমি মাইনা লও সকলের কথা...

ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর ঘুরাইয়া ফিরাইয়া আরো বহুক্ষণ দুর্যোধনরে তেলান- মিটমাট কইরা ফালা সব। মাইনা নে সকলের প্রস্তাব...

অনেকক্ষণ সকলের কথা শুইনা দুর্যোধন কৃষ্ণের দিকে তাকাইয়া বেশ ঠান্ডা মাথায় শুরু করে- আচ্ছা কৃষ্ণ। তুমি তো পাণ্ডবগো পক্ষে কইতে গিয়া আমারে গালাগালই করলা বেশি। আমার বাপ দাদা কাকা আর উস্তাদেও দেখি খালি আমারই দোষ দেখেন; কিন্তু আমি তো বহুত চিন্তা কইরাও আমার কোনো দোষ বাইর করতে পারি না। আমার দোষটা কই কও তো? যুধিষ্ঠির পাশা খেলা পছন্দ করে; সেইটা খেইলা সে মামা শকুনির কাছে হারছে; তাতে আমারে তুমি কেমনে দোষ দিবা? আমি তো তাগো রাজ্য ছিনাইয়া নেই নাই। একবার পাশা খেলায় রাজ্য হারাইবার পর যখন বাবা তাগোরে আবার

সবকিছু ফিরাইয়া দিলেন; তখনো তো আমি কোনো বাধা দেই নাই। ভাবছি আচ্ছা ঠিকাছে; বাবা মহারাজ; তিনি তার ভাতিজাগো রাজ্য ফিরাইয়া দিছেন। সেইখানে আমার কিছু কইবার নাই। কিন্তু এতেও যেমন যুধিষ্ঠিরের শিক্ষা হয় নাই তেমনি তার লোভও কমে নাই। সে পাশা খেইলা কুরুরাজ্য জিতার লোভে নিজের রাজ্য আর বারো বছর বনবাসের লগে এক বছর বাড়তি অজ্ঞাতবাসের বাজি রাইখা আবার খেলতে আসছিল মামা শকুনির লগে; এবং শর্তমতো খেলায় হাইরা সে বনবাসে গেছে ভাইবেরাদর নিয়া। সেইখানে আমার কী দোষ? আমিও তো একই বাজি ধরছিলাম; যদি যুধিষ্ঠির বাজিতে জিতা যাইত তবে আমিও তো আমার ভাইবেরাদর নিয়া বনবাসে যাইতাম এবং শর্তমতে বারো বছর বনবাস আর এক বছর অজ্ঞাতবাস শেষ কইরা ফিরতাম দেশে। কিন্তু পাণ্ডবরা তো পাশার শর্ত পুরা করতে পারে নাই। তাগো বারো বছর বনবাস শেষ হইছে ঠিক। কিন্তু অর্জুন বাহাদুরি দেখাইতে গিয়া অজ্ঞাতবাসের এক বছর পুরা হইবার তিন দিন আগেই ধরা খাইছে। নিয়ম অনুযায়ী তো তারা এখন আরো বারো বছর বনবাস আর এক বছর অজ্ঞাতবাস না কইরা রাজ্যের দাবি করতে পারে না। আমার যুক্তি সেইখানেই। পাণ্ডবরা নিজের দোষে শর্ত পুরা না করতে পাইরা এখন কেনই বা রাজ্য ফিরত চায় আর আমার বিরুদ্ধে কেন যুদ্ধ করতে চায় সেইটা তুমি আমারে একটু বুঝাইয়া কও তো কৃষ্ণ...

কৃষ্ণ কয়- তাজ্জব বিষয়। তুমি কইতাছ নিজের কোনো দোষ দেখো না তুমি। কিন্তু কও তো ভাইয়ের বৌ দ্রৌপদীরে রাজসভায় যে লাঞ্ছনা করছিলা সেইটা কি তোমার দোষ না?

দুর্যোধন কয়- বা রে। দাসীর লগে সবাই যে ব্যবহার করে আমিও তা করছিলাম। সেইখানে দোষটা কী? যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীরে হারার পরে সে তো আর আমার ভাইয়ের বৌ থাকে নাই; দাসী হইয়া গেছিল। কিন্তু তার লগে রাজ্য ফিরত চাওয়ার কী সম্পর্ক?

কৃষ্ণ কয়- ঠিকাছে। তাইলে বারণাবতে কুন্তীসহ পাণ্ডবগো যে পুড়াইয়া মারার ব্যবস্থা করছিলা তুমি; সেইটারেও কি তুমি তোমার দোষ কইতে নারাজ?

দুর্যোধন কয়- বারণাবতে ঘর পোড়ানোর দায় তুমি আমারে কেমনে দেও কৃষ্ণ? পাণ্ডবরাই তো বরং বারণাবতে রাজকর্মচারী পুরোচনের লগে আরো ছয়জন মানুষ পুড়াইয়া পলাইছিল। এইরকম অপরাধ করার পরেও যখন তারা বিয়াশাদি কইরা ফিরা আসল তখন নিয়ম অনুযায়ী মানুষ হত্যার দায়ে তাগো শাস্তি দেওয়ার বদলা বাবায় দয়া কইরা তাগোরে অর্ধেক রাজ্য দিছিলেন। আমি কি একবারও পুরোচনসহ সাতজন মানুষ হত্যার লাইগা তাগো শাস্তি দাবি করছি? তারপর তারা রাজসূয় যজ্ঞসহ বহু বছর এইখানে থাইকা বহুকিছু করল; আমি কি বাধা দিছি? তাইলে সেইখানে তুমি কেমনে আমার দোষ খোঁজো?

কৃষ্ণ হতাশ হয়- ঠিকাছে। তুমি যদি তোমার কোনো দোষ দেখতে না পাও তবে আমিও আর দেখাইতে চাই না। তবে কথা হইল পাণ্ডবরা তো তোমার সম্পত্তির ভাগ চাইতাছে না। তারা তোমার দখলে থাকা তাগো বাপের সম্পত্তিটাই ফিরত চাইতাছে...

দুর্যোধন হাসে- বাপের সম্পত্তি বিক্রি কইরা দিলে কি তার উপর আর কোনো অধিকার থাকে কৃষ্ণ; তুমিই কও দেখি? যুধিষ্ঠিরে তো তার বাপের সম্পত্তি আমার কাছে হারাইয়া ফালাইছে। ওইটা এখন আর তার বাপের সম্পত্তি কেমনে থাকে?

কৃষ্ণ এই বিষয়ে আর কোনো কথা কয় না। শুধু কয়- দুর্যোধন। তোমার অবস্থা দেইখা মনে হয় তুমি সবকিছু ধইরা রাখতে গিয়া সবকিছু হারাইতে রাজি। তবু সবার অনুরোধ সত্ত্বেও সমঝতায় তোমার মত নাই...

- থাকার কথাও না কৃষ্ণ। যখন আমি ছোট ছিলাম তখন একবার বাবায় রাজ্যের অর্ধেক তাগোরে দিছিলেন। কিছু কই নাই। তারপর পাশা খেলায় সব আমার হইবার পরও বাবায় আবার সব তাগোরে ফিরাইয়া দিছিলেন। কিছু কই নাই। কিন্তু এখন অন্ধ পিতার এই রাজত্ব রক্ষার দায়িত্ব আমার। আমি একবিন্দু মাটিও দিমু না কাউরে। আমারে শত ভয় দেখাইলেও এইরকম অন্যায় শর্তে নত হমু না আমি। তোমরা যুদ্ধ করতে চাও তো করো। আমি রাজি। এর লাইগা যদি আমার মরতে হয় তবে মরব...

কৃষ্ণ কয়- সেইটাই হয়ত হবে দুর্যোধন। পাণ্ডবরা তাগো রাজ্য ফিরা পাইব নিশ্চিত। তুমি প্রস্তাব মানলে পাইব তোমারে জীবিত রাইখা আর না মানলে পাইব তোমার মৃত্যুর পরে...

দুর্যোধনের এই সব যুক্তি ধৃতরাষ্ট্রের মনে ধরলেও তিনি পরিষ্কার যে এইখানে কারো দোষগুণ বিচারে কেউ আগ্রহী না। সকলেই পাণ্ডবগো রাজ্য ফিরাইয়া দেওয়া না দেওয়ার এক পয়েন্টে আইসা খাড়াইছে। তিনি কিছু বলেন না। কিন্তু সবকিছু বিবেচনা কইরা দুঃশাসন দুর্যোধনরে কয়- ভাইজান। অবস্থা যা দেখতাছি তাতে তো মনে হইতাছে সবাই মিলা এখন তুমি আমি আর কর্ণের হাত-পা বাইন্ধা নিয়া পাণ্ডবগো হাতে তুইলা দিব...

দুঃশাসনের কথায় দুর্যোধন ধুম কইরা উইঠা চইলা যায় সভার বাইরে। একটা দীর্ঘশ্বাস ছাইড়া ভীষ্ম কন- এই জেদেই খাইব পোলাটারে...

এইবার কৃষ্ণ ভীষ্মরে ঝাড়তে শুরু করে- ঝামেলাটা আপনাগো মতো মুরুব্বিরাই পাকাইছেন। একটা মূর্খরে আপনারা দিছেন রাজার ক্ষমতা কিন্তু এখন আর তারে সামলাইতে পারেন না। এখন তো আমারও মনে হইতাছে যে সবাই মিলা দুর্যোধন কর্ণ শকুনি আর দুঃশাসনরে বাইন্ধা পাণ্ডবগো হাতে

না দিলে শান্তির আর কোনো উপায় নাই। অথবা অন্তত দুর্যোধনরে বান্ধা তো একান্তই ফরজ...

ভীষ্ম কোনো উত্তর দেন না কৃষ্ণের খোঁচার। কৃষ্ণ এইবার ধৃতরাষ্ট্ররে কয়- মহারাজ। পোলার প্রতি আপনার ব্যক্তিগত দুর্বলতার লাইগা যেন বংশক্ষয় না হয় সেইটা দেইখেন। কারণ শাস্ত্রে কয়- কুলরক্ষার লাইগা একজনরে ত্যাগ; গ্রামরক্ষার লাইগা কুল ত্যাগ; দেশরক্ষার লাইগা গ্রাম ত্যাগ আর আত্মরক্ষার লাইগা দুনিয়া ত্যাগ বুদ্ধিমানের কাজ...

কৃষ্ণের কথায় ময়মুরুব্বিরা আবার সায় দেন। ধৃতরাষ্ট্র বোঝেন কৃষ্ণ আস্তে আস্তে কড়া হইতাছে তার উপর। তার মুখ থাইকা একটা সিদ্ধান্ত বাইর করতে পারলে দুর্যোধনরে সে বাইন্ধাই নিয়া যাবে পাণ্ডবগো কাছে। সেই ক্ষেত্রে এই সভায় দুর্যোধনরে রক্ষার কেউ নাই; কারণ পরশুরামের কারণে কর্ণও স্থবির হইয়া আছে। আপাতত দুর্যোধন যদি মিনরাজিও হয় তবে সব দিক রক্ষা। বহুক্ষণ চিন্তা কইরা ধৃতরাষ্ট্র বিদুররে পাঠাইলেন গান্ধারীরে নিয়া আসতে দুর্যোধনরে বোঝানোর লাইগা। কিন্তু সব শুইনা গান্ধারী উল্টা খেইপা উঠেন ধৃতরাষ্ট্রের উপর- বেয়াদব লোকের ক্ষমতা পাওয়াই উচিত না তবু সে পাইছে। এর লাইগা আপনেই দোষী মহারাজ। কুসঙ্গী পোলারে ক্ষমতা দিয়া এখন পস্তাইতাছেন...

ধৃতরাষ্ট্ররে ঝাড়লেও বিদুর যখন আবার গিয়া দুর্যোধনরে সভায় নিয়া আসে তখন গান্ধারী চেষ্টা করেন তারে বুঝাইতে- বাপ। তোর আব্বা; তোর দাদা; তোর গুরু আর ময়মুরুব্বিগো কথাটা রাখ। পাণ্ডবগো লগে মিললে তোর শক্তি কমব না বরং আরো বাড়ব। তুই সবার কথা মাইনা নিলে কৃষ্ণ দুই পক্ষের মাঝেই সমঝোতা কইরা দিবে। যুদ্ধে মঙ্গল নাই বাপ; আর সব সময় জয়ী হওয়া যাবে এমন কথাও নাই। তাছাড়া কুরুরাজ্যের পোষ্য হিসাবে ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ তোর পক্ষে যুদ্ধ করলেও পাণ্ডবগো তারা শত্রু মনে কইরা অস্ত্র চালাইবেন

না এইটা নিশ্চয়ই তুই বুঝস। বেশি লোভ করিস না বাপ। শান্ত হ। সকলের কথা মাইনা ল...

দুর্যোধন গান্ধারীর কথায় কান না দিয়া শকুনি দুঃশাসন আর কর্ণের লগে কানাকানি কইরা আবার বাইর হইয়া যায়। সাত্যকিও দৌড়াইয়া বাইরে গিয়া সভাঘরের দরজায় নিজের সৈন্যসমাবেশ ঘটাইয়া ভিত্রে আইসা কয়- মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র। এই দিকে সবাই শান্তির আলোচনা করতাছে আর ওই দিকে আপনের পোলা দুর্যোধন ধান্দা করতাছে কৃষ্ণরে বন্দি করার। অবস্থাটা একটু বুইঝা দেখেন মহারাজ...

সাত্যকিরে থামাইয়া কৃষ্ণ কয়- মহারাজ। দুর্যোধন যদি আমারে বন্দি করতে চায় তবে তারে অনুমতি দেন। তাইলে হয় সে আমারে বন্দি করব না হয় আমি তারে। তাতে অন্তত এক পক্ষের সমস্যা সমাধান হইব...

- আরে না না। এইটা কী কও? তোমার যদি দুর্যোধনের লগে মারামারিই করতে হয় তয় অত ময়মুরুব্বি এইখানে আছেনই বা ক্যান? খাড়াও খাড়াও দেখতাছি আমি...

ধৃতরাষ্ট্র আবার দুর্যোধনরে ডাইকা আইনা ঝাড়ি দেন- বেকুবি কইরো না দুর্যোধন...

কৃষ্ণ কয়- হ দুর্যোধন। বেকুবি করা ঠিক হইব না। আমারে একলা মনে কইরা তো বাইরে গেছিলা। গিয়া দেইখা আসছ তো যে আমি এইখানে একলা আসি নাই? তয় যা দেখছ তা একাংশ মাত্র; ভীষ্ম দ্রোণ সঞ্জয় বিদুর পুরাটা দেখছেন গতকাইল; যদি চাও তয় তোমারেও পুরাটা দেখাইতে আমার অসুবিধা নাই...

শত্রুরে কাবু করার লাইগা বেদে যে চাইরটা নীতির কথা আছে তার সবগুলাই ধৃতরাষ্ট্র আর দুর্যোধনরে পটানোর লাইগা কামে লাগায় কৃষ্ণ। বেদে কইছে পয়লা সাম করো। মানে শত্রুরে তেলাও। কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্ররে তেলাইয়াই শুরু করছিল তার কথা। সেইটায় কাজ না হওয়ায় সে যায় দানে; দান মানে ভাগাভাগি; সেইটাতে রাজি হয় নাই দুর্যোধন। মিঠাইমার্কা দুইটা উপায় ফেইল মারলে সে নিছে মিঠাকড়া পথ- ভেদ; মানে শত্রুপক্ষের মাঝে বিভাজন তৈরি কইরা দুর্যোধনরে একলাও কইরা ফালাইছে সে। কিন্তু সেইটাতেও কাম না হওয়ায় শেষ পন্থার প্রয়োগও করছে সে- দণ্ড। মানে ডান্ডা গরম করা; মানে ডর দেখানো। কিন্তু বেদের কোনো পন্থাই কাম করে নাই দুর্যোধনের ক্ষেত্রে...

অবশেষে সকলে তেলাইয়া কৃষ্ণরে ঠান্ডা করলেও সভা শেষ হয় কোনো মীমাংসা ছাড়াই। পুরা সভায় একটাও কথা কয় না দুইটা মানুষ; দ্বৈপায়ন আর কর্ণ। সকলেই বারবার তাগো দিকে তাকায় কিন্তু প্রতিবারই তারা এড়ায়ে যায়। ভালোই হইছে এক দিকে- দ্বৈপায়ন যদি কোনো প্রস্তাব রাখতেন আর সেইটা অমান্য করত দুর্যোধন তবে দুর্যোধনরে সত্যি সত্যিই বন্দি কইরা ফালাইত বাকিরা। আর পরশুরামের কারণে কর্ণ যে কিছু কয় নাই তাতে মঙ্গল হইছে সকলেরই; কারণ এই পোলাটাও কম বেয়াদব না...

সভা থিকা বাইর হইয়া কৃষ্ণ রথে উঠবার আগে ধৃতরাষ্ট্র তার হাত ধরেন- আমারে ভুল বুইঝ না কৃষ্ণ। পোলাগো উপ্রে আমার কতটা নিয়ন্ত্রণ তা তো তুমি দেখলাই। যুধিষ্ঠিররে কইও আমি শান্তির পক্ষে কিন্তু আমি যে নিরুপায় মানুষ তাও তারে বুঝাইয়া কইও...

রথে উঠতে উঠতে কৃষ্ণ ভীষ্ম আর দ্রোণের দিকে ফিরে- সভায় যা হইল তা আপনেরা সকলেই দেখলেন। দুর্যোধন আমারে বন্দি করার চেষ্টা করছিল তাও দেখলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্রও পরিষ্কার জানাইলেন দুর্যোধনের উপর তার

কোনো নিয়ন্ত্রণ নাই। এইবার আমারে অনুমতি দেন; আমি যুধিষ্ঠিরের কাছে গিয়া যা হয় একটা সিদ্ধান্ত নেই...

বিদায় নিয়া কৃষ্ণ ফিরা যায় কুন্তীর কাছে। এইবার কুন্তীরে পুরা কাহিনি বিস্তারিত কয়। পাণ্ডব-পাঞ্চালী কে কী প্রস্তাব করছিল আর আইজ কী ঘটল কুরুসভায়...

কুন্তী কয়- যুধিষ্ঠিররে গিয়া কইবা তোর মায়ে তোরে ব্রাহ্মণ কইরা জন্ম দেয় নাই। জন্ম দিছে ক্ষত্রিয় কইরা। ব্রাহ্মণ কিংবা কাপুরুষের মতো কথা তোর মুখ থাইকা শুনতে চায় না তোর মা। আর ভীম অর্জুন নকুল; এই তিন কুলাঙ্গাররে কইবা পাঁচ পোলার মা হইয়াও আইজ তাগো মায় পরের ভাত খাইয়া বাঁচে পাঁচটা গ্রাম ভিক্ষা পাইবার আশায় না। কইও তোগো মায় তোগোরে রাজ্য দিছিল; সেই রাজ্যে তোগোরে সে আবার দেখতে চায়...

কৃষ্ণ কয়- পিসি এইটাই পাঞ্চালী সহদেব আর আমার মত। যুদ্ধটা খালি যদি দুর্যোধনের লগে হইত তবে আমি আজকেই যুদ্ধ ঘোষণা কইরা দিতাম। কিন্তু সমস্যা অন্য জায়গায়। যুদ্ধ তো খালি ধৃতরাষ্ট্রের পোলাগো লগে তোমার পোলাগো হইব না। যুদ্ধ তো হইব তোমার এক পোলার বিরুদ্ধে তোমার অন্য পোলাদের। এর লাইগাই তোমার মতামত জানতে আসা। যুদ্ধ শুরু হইলে তোমার নিজের পোলারাও যে পরস্পরের মুখোমুখি খাড়াইব সেইটা তো জানো পিসি। যুদ্ধ ঘোষণার আগে তোমার বড়ো পোলা কর্ণের বিষয়ে আমি তোমার মতামত জানতে চাই। দুনিয়ার সবাই দুর্যোধনরে ছাইড়া গেলেও তোমার পোলা কর্ণ কিন্তু তারে ছাড়ব না। এইবার তুমি কও কী কর্তব্য আমার?

কুন্তী অনেকক্ষণ ঝিম মাইরা ভাবে- যারে একবার ভাসাইয়া দিছি সে যদি আবার উল্টা স্রোতে ভাইসা আসে তয় তারে আমি কোলে নিমু। তবে তার লাইগা সাঁতার দিমু না আমি...

১৪

কুন্তীবুড়িটা বহুত হতভাগী হইলেও ভাবতে পারে নাই যে নিজের সবচে বড়ো দুর্ভাগ্যটা নিজেরই গর্ভে জন্ম দিছে সে। কুন্তী ঝিম ছাইড়া মুখ খোলে কৃষ্ণের কাছে- আমি তো কর্ণরে বাদ দিয়াই আমার সন্তান গণনা করি কৃষ্ণ। এখন সে যদি না আইসা যোগ দেয় আমার পোলাগো লগে তবে কোনো দিনও তারে যোগ করব না আমি...

কৃষ্ণ যে উত্তর খুঁজতেছিল তা সে পাইয়া যায়। কিন্তু কুন্তী একটা শর্ত জুইড়া দিছে- যদি সে যোগ না দেয়। তার মানে কুন্তীর পোলাগো লগে কর্ণ যোগ দিব কি না তা দেখার দায়িত্ব কুন্তী কৃষ্ণরেই দিছে...

কুন্তীর ঘর থিকা বাইর হইয়া ভীষ্ম দ্রোণ বিদুরের কাছে বিদায় নিয়া কৃষ্ণ গিয়া হাজির হয় কর্ণের কাছে- তোমার লগে নিরালায় কিছু কথা আছে আমার...

কর্ণরে নিজের রথে তুইলা যাইতে যাইতে কৃষ্ণ কয়- তুমি খালি বড়ো যোদ্ধাই না; বুদ্ধিমানও বটে। তাই ভূমিকা বাদ দিয়া সরাসরি কই- আমি জানি যে তুমি জানো তুমি রাধার পালিত আর কুন্তীর গর্ভজাত সন্তান। সেই হিসাবে তুমি যুধিষ্ঠিরের বড়ো ভাই; আমারও পিসতুতো ভাই। আমি যা কইতে চাই তা হইল; তুমি দুর্যোধনরে ছাইড়া পাণ্ডবপক্ষে আসো। পাণ্ডবগো লগে যোগ দিলে হস্তিনাপুরের সিংহাসনে তুমিই হইবা রাজা; যেইখানে যুধিষ্ঠির যুবরাজ হইয়া তোমার মাথায় পাখা দুলাইব। ভীম অর্জুন নকুল সহদেব আর পাণ্ডবগো সকল পোলাপান যেমন তোমারেই কুর্নিশ করব তেমনি অন্ধক বৃষ্ণি পাঞ্চাল আর যাদবগো আনুগত্যও পাইবা তুমি। আর সবকিছুর উপ্রে; দ্রৌপদীরও এক ভাগ পাইবা তুমি অন্য ভাইদের লগে...

অতক্ষণ কর্ণ কোনো কথা না কইলেও এইবার হাসে- থামো কৃষ্ণ। লোভ দেখাইতে দেখাইতে একেবারে সীমা ছাড়াইয়া গেলা তুমি। কও তো; তুমি কেমনে আরেকজনরে দ্রৌপদীর ভাগ দেও? নাকি তুমিও দ্রৌপদীরে যুধিষ্ঠিরের মতো নিজের সম্পত্তি মনে করো যে ইচ্ছামতো তারে বাজিতেও যেমন ধরা যায় তেমনি যার তার কাছে তারে দানও করা যায়?

কৃষ্ণ একটু থতমত খায়। আমতা আমতা করে- না মানে এককালে দ্রৌপদীর স্বয়ংবরায় তো তুমিও প্রার্থী হইয়া খাড়াইছিলা; তাই কইলাম আরকি...

- দ্রৌপদীর স্বয়ংবরায় তো তুমি নিজেও একজন প্রার্থী আছিলা কৃষ্ণ। পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিয়া কি তবে তুমিও দ্রৌপদীর ভাগ পাইছ?

- না না না সেইটা কেন হবে? আমি তো পাণ্ডবগো লাইগা সেই দিনই প্রতিযোগিতা থাইকা নিজেরে প্রত্যাহার কইরা নিছিলাম। কিন্তু তুমি যেমন নিজেরে প্রত্যাহার করো নাই। তেমনি শুধু ক্ষত্রিয় পরিচয় না থাকার কারণে যোগ্যতা প্রমাণের সুযোগ ছাড়াই দ্রৌপদী তোমারে অপমান কইরা খেদাইয়া দিছিল সেদিন। তাই ভাবছিলাম দ্রৌপদীর প্রতি এখনো হয়ত তোমার অনুরাগ আছে...

- অনুরাগ না কৃষ্ণ। দ্রৌপদীর উপর রাগ আছিল আমার। সুযোগ পাইয়া কুরুসভায় সেই রাগ ঝাড়তেও দ্বিধা করি নাই আমি। কিন্তু সেই সভাতেই দ্রৌপদীর উপর শ্রদ্ধাও তৈরি হইছে আমার; যা আমি সেই দিনের সভাতেই সকলের সামনে প্রকাশ্যে বলছি। কারণ এমন নারী কেউ আগে যেমন দেখে নাই; তেমনি কোনো দিন শোনেও নাই এমন নারীর কথা; যে নিজে নৌকা হইয়া দুর্দশার সাগরে ভাসা পাণ্ডবগো দাসত্ব থাইকা উদ্ধার কইরা নিছিল সেদিন। তাই অনুরোধ করি; আমারে লোভ দেখাইতে গিয়া তারে আর অসম্মান কইরো না তুমি। সে তোমারে খুব বড়ো বন্ধু হিসাবেই জানে...

কৃষ্ণ চুপ কইরা থাকে। কর্ণ কথা আগে বাড়ায়- দ্রৌপদীর স্বয়ংবরায় শূদ্র বইলা দ্রৌপদী আমারে যে অপমান করছিল সেইটার লাইগা কিন্তু দ্রৌপদী দায়ী না কৃষ্ণ। দায়ী তোমার পিসি কুন্তী। আমারে তো পরিচয়হীন শূদ্র দ্রৌপদী বানায় নাই; বানাইছে তোমার পিসি কুন্তী...

- সেই কুন্তীই এখন তোমার যথার্থ পরিচয়ে তোমারে প্রতিষ্ঠিত করতে চান কর্ণ...

হা হা কইরা হাইসা উঠে কর্ণ- আমার কি এখন পরিচয়ের অভাব আছে যে তোমার পিসির কাছ থিকা আমারে পরিচয় ধার নিতে হবে?

কর্ণের প্রশ্নে কৃষ্ণ কথা বদলায়- না না না। তোমার পরিচয়ে অভাব থাকব ক্যান? এই আর্যাবর্তে শিক্ষাদীক্ষা বীরত্ব রাজত্ব বন্ধুত্ব দানশলীতা এমন কোনো ক্ষেত্র নাই যেইখানে মাইনসে তোমারে এক নামে না চিনে। আমি সেইটা কই নাই। আমি কইতেছিলাম কুন্তীর মাতৃত্ব আর পাণ্ডবগো লগে ভ্রাতৃত্বের পরিচয়ের কথা...

কর্ণ আবার হাসে- শূদ্র হইলেও মা-বাবা কিংবা ভাইয়েরও কিন্তু কোনো অভাব কোনো দিন আমার হয় নাই কৃষ্ণ। শূদ্রাণী রাধা সেদিন যেমন বেওয়ারিশ শিশু কর্ণের মা হইছিল; আইজ বিখ্যাত কর্ণের মাও শুধু রাধা। আমারে যে বুকের দুধ দিয়া গুমুত পরিষ্কার কইরা তিলে তিলে বড়ো কইরা তুলছে; সেই রাধার বদলা অন্য কাউরে মা বলা আমার পক্ষে সম্ভব না কৃষ্ণ...

কৃষ্ণ মিন মিন করে- ভুল বুইঝ না। তোমারে মা বদলাইতে কই নাই আমি। আমি কইতে চাইছিলাম যে; তুমি যদি আইজ কুন্তীপুত্র হিসাবে পরিচিত হও তবে যুধিষ্ঠির না; কুরুরাজ্যের অজেয় রাজা হইবা তুমিই...

ঠা ঠা কইরা আবার হাইসা উঠে কর্ণ- তোমারে আমি রাজা ধৃতরাষ্ট্র থাইকা বেশি বুদ্ধিমান মনে করতাম কৃষ্ণ। কিন্তু এখন দেখি বুদ্ধিতে ধৃতরাষ্ট্র আর তোমার মধ্যে তেমন কোনো ফারাক নাই। রাজা ধৃতরাষ্ট্র যেমন ঘুস দিয়া তোমারে পক্ষে নিবার ধান্দা করছিলেন। তেমনি তুমিও দেখি ঘুস দিয়া আমারে পক্ষে টানতে চাইতাছ...

- না না না। ঘুস না। পাণ্ডবগো বড়ো ভাই হিসাবে তোমার ন্যায্য অধিকারের কথাই আমি তোমারে কইতে চাইতাছি কর্ণ...

- ন্যায্য-অন্যায্য তোমাগো যেমন ইচ্ছা তোমরা তেমন হিসাব করতে পারো। কিন্তু মনে রাইখ তুমি যদি আইজ আমারে কুরুরাজ্য দানও করো; তবু সেই রাজ্য আইনা আমি আবার দুর্যোধনরেই দান কইরা দিমু...

কৃষ্ণ হা কইরা তাকাইয়া থাকে কর্ণের দিকে- কিন্তু কেন কর্ণ?

- কারণ আমার অসহায় কালে অধিরথ আর রাধা যেমন আমারে সহায় দিছিলেন; তেমনি আমার পরিচয়হীনতার কালে দুর্যোধনই আমারে দিছিল প্রথম ক্ষত্রিয় পরিচয়...

কৃষ্ণ উৎসাহী হয়ে উঠে- আমি তো সেই কথাই কই। দুর্যোধন তোমারে ক্ষত্রিয় পরিচয় দিছে। আর কুন্তীপুত্র হিসাবে তুমি হইবা ক্ষত্রিয় মহারাজ...

কর্ণ কৃষ্ণরে থামায়- তুমি ভালো কইরাই জানো রাজত্ব কিংবা ক্ষমতার লোভ আমার কোনো দিনও আছিল না। আমার শুধু লোভ আছিল শিক্ষায়। শূদ্রপুত্র বইলা যখন প্রায় সকল গুরুই আমারে শিক্ষার্থী হিসাবে গ্রহণ করতে আপত্তি জানাইল তখন শুধুই শিক্ষার সুযোগ পাওয়ার লাইগা আমি নিজেরে ব্রাহ্মণ পরিচয় দিয়া ভর্তি হইছিলাম পরশুরামের গুরুকুলে। শুধু এই একটা ক্ষেত্রে আমি আমার পরিচয় গোপন করছি; এর বাইরে সব জায়গাতে সব সময়ই কিন্তু গর্ব নিয়া আমি অধিরথ সূতপুত্র রাধাগর্ভজাত কর্ণ হিসাবেই নিজের

পরিচয় দিছি আর আইজও দেই। পরশুরামের কাছে শিক্ষা গ্রহণের পর আমার চাওয়া আছিল আমার পরিচয় যেন আমার যোগ্যতা দিয়া হয়। অথচ সেইখানেও দেখলাম আমার অযোগ্যতা মাপা হইতে আছে আমার বাপের শূদ্রত্ব দিয়া। তখন দুর্যোধন আমারে রাজা বানাইয়া আমারে সুযোগ দিলো আমার নিজের যোগ্যতা প্রমাণের...

কৃষ্ণ স্বীকার করে- সেইটা একটা ভালো কাম করছে দুর্যোধন। সে তোমারে রাজা বানাইছে দেইখাই তুমি তোমার যোগ্যতা প্রমাণ দিয়া আইজ মহাবীর এবং দানবীর কর্ণ হইছ। এখন তুমি আরেক ধাপ আগাইয়া হইবা মহারাজা; সেইটাই বলতে চাই আমি...

হাত তুইলা কৃষ্ণরে থামায় কর্ণ- থামো কৃষ্ণ। রাজত্বের লোভ আর আমারে দেখাইও না তুমি। রাজত্ব আর ক্ষমতার লোভ যদি আমার থাকত তবে যুধিষ্ঠিরের ছাইড়া যাওয়া ইন্দ্রপ্রস্থ রাজ্যেরও রাজা হইতে পারতাম আমি। দুর্যোধন আমারেই সেই রাজ্যের রাজা হইবার অনুরোধ করছিল। এর বাইরেও চাইলে আমি যে নিজেই রাজ্য জয় কইরা নিতে পারি তাও নিশ্চয়ই তুমি স্বীকার করো...

কৃষ্ণ কয়- ঠিকাছে। তুমি হস্তিনাপুরের সিংহাসন না নেও; কুন্তীরে মা নাইবা কও; কিন্তু যেহেতু জানো যে পাণ্ডবরা তোমারই ছোট ভাই; তাই তোমারে অনুরোধ করি তোমার মায়ের পেটের ছোট ভাইগো লাইগা অন্তত যুদ্ধ থাইকা তুমি বিরত হও। তুমি যুদ্ধবিমুখ হইলে কোনোভাবেই পাণ্ডবগো বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সাহস পাইব না দুর্যোধন...

- ঠিক এই কারণেই যুদ্ধ থাইকা বিরত থাকা আমার পক্ষে সম্ভব না কৃষ্ণ। আমার ভরসাতেই দুর্যোধন যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিছে; আমারেই দ্বৈরথে অর্জুনের প্রতিযোদ্ধা হিসাবে নির্বাচন কইরা রাখছে সে। সারা দুনিয়া দিলেও দুর্যোধনের এই ভরসার লগে বিশ্বাসঘাতকতা করব না আমি। আমি জীবন দিতে পারি;

কিন্তু দুর্যোধনরে ছাড়তে পারব না; অতক্ষণে কথাটা তোমার কাছে পরিষ্কার হওয়া উচিত কৃষ্ণ...

কৃষ্ণ এইবার প্রসঙ্গ পাল্টায়- ঠিকাছে। দুর্যোধনের পক্ষ ছাড়বা না তুমি। ঠিকাছে। কিন্তু পাণ্ডবগো লগে যুদ্ধ হইলে তার পরিণতি নিশ্চয়ই ভাইবা দেখছ তুমি?

কর্ণ হাসে- লোভ দেখাইয়া ব্যর্থ হইয়া এখন আমারে তুমি ডর দেখাইতে শুরু করলা কৃষ্ণ? দুর্যোধনের দলে লোক বেশি হইলেও তার পক্ষের লোক আমি ছাড়া কেউ নাই সেইটা সকলেই জানে। আমি পরিষ্কার জানি আসন্ন যুদ্ধটা পাণ্ডবগো সাত বাহিনীর বিরুদ্ধে কৌরবগো এগারো বাহিনীর যুদ্ধ না; যুদ্ধটা মূলত হইব পাণ্ডবগো সাত বাহিনীর বিরুদ্ধে দুর্যোধন আর কর্ণ; মাত্র দুইটা মানুষের যুদ্ধ। যার ফলাফল যেকোনো শিশুও বইলা দিতে পারে। হউক; তাই হউক। যুধিষ্ঠির বহু বছর ধইরা রাজা হইবার লাইগা কাঙ্গাল হইয়া আছে। যুদ্ধের পর সেই রাজা হউক। আমার কোনো আপত্তি নাই। আমার দুর্যোধনের পক্ষে যুদ্ধ করার কথা; সৎভাবে আমি শুধু সেইটাই করব। একজন ক্ষত্রিয় হিসাবে যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্রহাতেই যেন আমার মৃত্যু হয় সেইটাই আমার একমাত্র কামনা কৃষ্ণ। বন্ধুর লগে বেইমানি কইরা সারা জগতের রাজা হইতেও আমার কোনো আগ্রহ নাই। ...আরেকটা কথা। পাণ্ডবরা জানে কি না জানি না যে আমি তাগো বড়ো ভাই। তোমারে একটা অনুরোধ করি; কথাটা তাগোরে জানাইবার দরকার নাই। আমি না হয় জানলাম তারা আমার ভাই। তারা যেন আমারে শত্রু হিসাবেই জানে। ভাই পরিচয়ে যুদ্ধের ময়দানে আমি কোনো সুবিধা কিংবা দয়া পাইতে চাই না কারো...

হা কইরা অনেকক্ষণ কর্ণের দিকে তাকাইয়া তারে জড়ায়ে ধরে কৃষ্ণ- কঠিন মানুষ তুমি। সারা দুনিয়া দিলেও তুমি যেমন নিতে চাও না তেমনি বিজয়ীও

হইতে চাও না তুমি। ঠিকাছে তয়; প্রত্যাশা করি অধিরথ এবং রাধার পুত্র আর দুর্যোধনের বন্ধু হিসাবেই যেন তুমি মৃত্যুটা বরণ করতে পারো...

কৃষ্ণ একটু থাইমা আবার শুরু করে- এখন সময়টা ভালো। বৃষ্টিও নাই; রাস্তাঘাটে কাদাও নাই। বেশি গরমও না; বেশি ঠান্ডাও না। এই কার্তিক মাসেই তবে যুদ্ধটা হউক। ফিরা গিয়া ভীষ্ম দ্রোণ আর কৃপাচার্যরে কইও যে সাত দিন পরে যেদিন অমাবস্যা; সেই দিনই যুদ্ধের তারিখ ঠিক করছি আমরা দুইজন...

বিদুরের মুখে যুদ্ধের তারিখ শুইনা ছটফট করে কুন্তী। অমীমাংসিত কুরুসভার শেষে উপপ্লব্য নগরে গিয়া পাণ্ডবগো লগে আলোচনার পর কৃষ্ণ যে সিদ্ধান্ত জানাইবার কথা; সেইটা সে হস্তিনাপুরে কর্ণের লগে আলোচনার পরেই জানাইয়া গেছে। তার মানে মাতৃত্ব ভ্রাতৃত্ব রাজত্ব যেমন কর্ণরে পাণ্ডবপক্ষে টানতে পারে নাই তেমনি মৃত্যুর ভয়েও সে ছাড়ে নাই দুর্যোধনের পক্ষপাত। যুদ্ধ হইব কুরু আর পাণ্ডবে। কিন্তু ভাগ্যের ফেরে তার পোলাগো বিরুদ্ধে সেই যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নেয় কি না তারই আরেক পোলা...

কর্ণের মৃত্যু নিয়া কুন্তীর বেশি মাথা ব্যথা নাই। কিন্তু পরশুরামের শিষ্য কর্ণের মৃত্যু ঘটানোর ক্ষমতা নিয়া বহুত দুশ্চিন্তা তার...

কর্ণের লগে এখন আর তার তামার অভেদ্য বর্মটা নাই। পায়েও কোনো জুতা পরে না সে। যুধিষ্ঠিরের পরিকল্পনামতে যুদ্ধের সময় শল্য কর্ণরে গালাগাল কইরা অস্থির রাখবেন। কিন্তু তার পরেও তিরে বর্শায় ভল্লে কুড়ালে তলোয়ারে গদায় কর্ণের সামনে খাড়াইবার মতো একক কোনো যোদ্ধা পাণ্ডবপক্ষে নাই। ভীম স্বল্প পাল্লার গদায় ভালো হইলেও তির বর্শার দূরত্বে সে অসহায়। অর্জুন

তিরে দুর্ধর্ষ কিন্তু বর্শা ছোঁড়ার শক্তিতে সে যেমন কর্ণের থাইকা পিছে তেমনি স্বল্পপাল্লার অস্ত্রে সে নিতান্তই নিরুপায়। কৃষ্ণ অর্জুনের সারথি হইব তাই অর্জুনরে নিয়া দুশ্চিন্তা কম। কৃষ্ণের পরিকল্পনা আর কৌশলী রথ চালানোর ফাঁক দিয়া অর্জুনের শীরের নিশানা করা যেমন কর্ণের পক্ষে কঠিন হইব তেমনি কৃষ্ণ আর অর্জুন; দুইজনের দুইটা ঢাল ভেদ কইরা অর্জুনরে বিদ্ধ করাও হইব প্রায় অসম্ভব। সাধারণ চামড়ার বর্ম পরা খালি পায়ের কর্ণের পক্ষে শল্যের গালাগালি সহ্য কইরা কৃষ্ণের বুদ্ধি; ঘোড়া দাবড়ানি আর অর্জুন-কৃষ্ণের ঢাল অতিক্রম কইরা সফলকাম হওয়া বহুত কঠিন। কিন্তু বাকিরা? বাকি চাইর পাণ্ডব? তাগোরে তো সুরক্ষা দিব না কেউ...

ভীষ্ম যত দিন জীবিত থাকবেন তত দিন যুদ্ধ করব না কর্ণ। কিন্তু কুরু-পাণ্ডব যুদ্ধে ভীষ্মের জীবনও আশঙ্কামুক্ত না। পাণ্ডবরা কেউ তারে হত্যা না করলেও তার নিজস্ব শত্রু বেশুমার। ছোট ভাই বিচিত্রবীর্যের লগে বিবাহ দিবার লাইগা কাশীরাজের তিন কন্যারে ছিনাইয়া আনছিলেন তিনি; ছোট দুই বোন অম্বিকা-অম্বালিকারে জোর কইরা ভাইয়ের লগে বিবাহ দিলেও তার কাণ্ডের কারণে বড়ো বোন অম্বা আত্মহত্যা করে। কাশীরাজের বংশ সেই ক্ষতি এখনো ভুলতে পারে নাই। তারা আইসা যোগ দিছে পাণ্ডবপক্ষে; ভীষ্মের বিরুদ্ধে। ভীষ্মের ঊর্ধ্বতন ষষ্ঠ পুরুষ সংবরণ কাইড়া নিছিলেন পাঞ্চালগো দেশ; সেই থাইকা কুরুদের লগে পাঞ্চালগো বংশপরম্পরায় শত্রুতা। কুরুসভায় দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার সময় মুখ ফিরাইয়া বইসা ছিলেন কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম; সেই কারণে বইনের অপমানের শোধ হিসাবে পাঞ্চাল রাজপুত্র শিখণ্ডী প্রতিজ্ঞা করছে ভীষ্ম হত্যার। আর তার উপর দ্রৌপদীর যমজ ভাই পাঞ্চাল যুবরাজ ধৃষ্টদ্যুম্নই হইল পাণ্ডবপক্ষের প্রধান সেনাপতি...

দেবব্রত ভীষ্ম এককালে আছিলেন অজেয়। সেনাপতি হিসাবে অভিজ্ঞতায় আর বুদ্ধিতে হয়ত এখনো তার জুড়ি নাই। কিন্তু শিখণ্ডীর মতো তরুণ শত্রুগো

বিরুদ্ধে দ্বৈরথ যুদ্ধে নিজেরে আর কতটুকু রক্ষা করতে পারবেন এই শতবর্ষী লেতর বৃদ্ধ মানুষ? আর ভীষ্মের মৃত্যু মানেই যুদ্ধক্ষেত্রে কুন্তীর সন্তানদের বিরুদ্ধে কুন্তীরই আরেক সন্তানের প্রবেশ...

ভাবতে ভাবতে অস্থির কুন্তীর হঠাৎ মনে হয়- কর্ণ পোলাটা খালি বড়ো যোদ্ধাই না; অনেক বেশি দয়ালুও বটে। কৃষ্ণের দেখানো লোভ আর ভয়ে যখন কাজ হয় নাই তখন তার পোলাগো ঢাল হিসাবে কর্ণের দয়ারেই ব্যবহার করব সে...

প্রতি দিন ভোরে নদীতীরে সূর্যপূজা করা কর্ণের নিত্য অভ্যাস। গঙ্গার তীরে সূর্যোদয়ের নির্জন কালটাই কুন্তী বাইছা নেয় কর্ণের লগে দেখা করার সময় হিসাবে। কর্ণ তারে চিনে; তার পরিচয়ও জানে তবু পূজা শেষে তার নিজস্ব গম্ভীর অহংকার নিয়া নিজের পরিচয় দেয়- শূদ্র পিতা অধিরথ আর শূদ্রাণী রাধার সন্তান কর্ণ তোমারে প্রণাম করে গো অর্জুন জননী। কিছু যদি চাওয়ার থাকে তবে নির্দ্বিধায় চাইতে পারো রাধেয় কর্ণের কাছে...

কুন্তী চিৎকার দিয়া উঠে- রাধেয় না বাপ। কৌন্তেয় তুই। তুই আমার সন্তান। পঞ্চপাণ্ডবের বড়ো ভাই...

কর্ণ হাসে- যখন তোমারে আমার দরকার আছিল তখন তুমি আমারে লুকাইয়া ফালাইয়া দিছ। আর আইজ যখন আমারে তোমার দরকার তখন আবার লুকাইয়া আসছ আমারে কুড়াইয়া নিতে। অদ্ভুত মানুষ তুমি। কিন্তু একটা বিষয় তোমার বোঝা দরকার; তোমারও যেমন পোলার অভাব নাই; তেমনি তুমি ফালাইয়া দিলেও রাধার কারণে মাতৃস্নেহেরও অভাব হয় নাই আমার। তাই আইজ যখন রাধার সন্তানের লগে কুন্তীর পোলাগো দ্বৈরথ নিশ্চিত তখন কর্ণ আর শত্রুমাতা কুন্তীর মাঝে নতুন সম্পর্ক পাতাইয়া জননী রাধারে কষ্ট দেওয়া যেমন অনুচিত; তেমনি অনুচিত বীর পাণ্ডবগো অপমান করা...

কুন্তী অনুনয় করে- সম্পর্ক নতুনও না। পাতানোও না। তোর লগেই সবথিকা পুরানা মাতৃত্বের সম্পর্ক আমার...

- হ। আমার লগেই সবথিকা পুরানা মাতৃত্বের সম্পর্ক তোমার; আবার আমার লগেই সবথিকা পুরানা অবিচারের সম্পর্কও তোমার...

কুন্তী অনেকক্ষণ চুপ কইরা মুখ খোলে- তুই আমার কোনো যুক্তিই শুনবি না জানি। তবু তরে একটা জিনিস ভাইবা দেখতে অনুনয় করি। নিজের ভাইগো চিনার পরেও তুই ক্যান তোর ভাইদের শত্রু দুর্যোধনের পক্ষ নিবি?

- পক্ষ নিমু; কারণ তুমিই আমারে ঠেইলা দিছ দুর্যোধনের পক্ষে। তুমি আমার ক্ষত্রিয় পরিচয় ছিনাইয়া নিছিলা বইলাই আমারে দুর্যোধনের কাছ থিকা ক্ষত্রিয় পরিচয় ধার নিতে হইছে। সেই থাইকাই আমি দুর্যোধনের পক্ষে। অথবা বলতে পারো তোমার পোলাগো বিপক্ষে...

- তুই তোর ভাইগো পক্ষে আয় বাপ। বড়ো ভাই হিসাবে তুইই হবি হস্তিনাপুরের রাজা...

কুন্তীরে থামায় কর্ণ- যত রকম লোভ আর ডর দেখানো যায় সব তোমার ভাতিজা কৃষ্ণ দেখাইয়া গেছে গো পাণ্ডব জননী। অনুরোধ করি এই দুইটা জিনিস বাদ দিয়া যদি অন্য কিছু কইবার থাকে তবে কও...

- তুই একবার অন্তত আমারে মা বইলা স্বীকার কর বাপ...

- তা হয় না। কারণ তাতে আমার রাধামায়ের অপমান হয়

- আমি তোর জন্মদাত্রী কর্ণ...

- তাতে কিছু যায় আসে না। কারণ নিজের ইচ্ছায় তুমি জন্ম দিয়া অদরকারি মনে কইরা যারে ফালাইয়া দিছ; তারে কুড়ায়ে দিনের পর দিন লালন-পালন

করছে রাধা। এখন শুধু জন্ম দিবার কারণে তোমারে মা বইলা স্বীকার করলে রাধার দুধের লগে বেইমানি হয়। আমি তোমারে মা ডাকতে অপারগ অর্জুন জননী...

কুন্তী অনেকক্ষণ ঝিম মাইরা থাইকা কয়- যোগ দিস না পাণ্ডবগো লগে। আমারে মা ডাকারও দরকার নাই। কিন্তু তার পরেও তোরে জিগাই; যুদ্ধ কইরা কি শান্তি হবে তোর? নিজের ভাইগো মাইরা কি শান্তি পাবি তুই?

- শান্তি হবে না। কে কারে মারব তাও জানি না; হয় আমি পাণ্ডবগো অথবা তারা আমারে। কিন্তু তার পরেও যুদ্ধ হওয়া লাগবে। কারণ আইজ যদি আমি দুর্যোধনরে ছাইড়া যাই তবে আমার পরিচয় হবে ভিতু লোভী আর বেইমান। আমি মৃত্যু মাইনা নিতে পারি কিন্তু লোভী কাপুরুষ কিংবা বেইমান পরিচয় না...

কুন্তী ভাইবা পায় না আর কী বলা যায়। বলে- দিবার সময়ে তোরে কিছুই দেই নাই আমি; স্বীকার করি। এখন দিতে চাইলেও তা দরকার নাই তোর। তবু তোরে আমি জন্ম দিছি; সেই অধিকার থাইকা প্রার্থনা করি; তোর বীরত্বের মতো দয়ার সংবাদও সকলে জানে। হতভাগী জন্মদাত্রীরে অন্তত একটা দয়া কর বাপ...

- অর্জুনের প্রাণভিক্ষা চাইও না শুধু। আসন্ন যুদ্ধে অর্জুনের দ্বৈরথে আমার কোনো বিকল্প দুর্যোধনের হাতে নাই...

কুন্তী একটু ভাবে- ঠিকাছে। অর্জুন বিষয়ে তোরে কোনো অনুরোধ করব না আমি। তবে দয়া কইরা তোর জন্মদাত্রীরে অন্তত এইটুকু কথা দে; যে তোর বাকি চাইর ভাইরে হত্যা করবি না তুই...

একটা নিঃশব্দ হাসি খেইলা যায় কর্ণের মুখে- আমারে জন্ম দিবার দায় নিতে চাও নাই তুমি; অথচ আইজ আমারেই তুমি দিতে চাও জন্ম নিবার দায়? আইচ্ছা নিলাম। কথা দিলাম তোমার পাঁচ পোলার মাঝে রাধেয় কর্ণের হাতে যুধিষ্ঠির ভীম নকুল আর সহদেবের কোনো মৃত্যু আশঙ্কা নাই...

চোখ মুইছা কুন্তী ফিরে। পিছন থিকা ডাক দেয় কর্ণ- অর্জুন জননী; যুদ্ধের পরে তোমার বাকি চাইর পোলার লগে বাঁইচা থাকব হয় অর্জুন না হয় কর্ণ। সেই হিসাবে সারা জীবন যে পাঁচ পোলার হিসাব করছ তুমি; যুদ্ধের পরেও কিন্তু তোমার পোলার সংখ্যা পাঁচই থাকব। হয় কর্ণরে নিয়া পাঁচ; না হয় অর্জুনরে নিয়া পাঁচ। ছয় পোলা যখন জীবনেও গুনো নাই তখন বাকি জীবন না হয় আর নাই গুনলা ছয় সন্তান...

পালকপিতা কুন্তীভোজের বাড়িতে কুমারী কুন্তীর হইবে সন্তান প্রসব। দাঁতে দাঁত চাইপা সেই দিন প্রসব চিৎকারটা সামলাইছিল যাদব বংশজাত কুন্তী। আইজ অন্তত এক পোলার নিশ্চিত মৃত্যু আশঙ্কায় বৃদ্ধা কুন্তীর কণ্ঠ থাইকা বাইর হইয়া আসে তেষট্টি বছর আগেকার সেই বকেয়া প্রসব চিৎকার- কর্ণ...। কর্ণরে... বাজান আমার...

১৫

কৃষ্ণের পাঞ্চজন্য শঙ্খের লগে অর্জুনের দেবদত্ত শঙ্খ আর তার উত্তরে ভীষ্মের শঙ্খের নাদে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ শুরু হইয়া যায়। মাঠের পশ্চিমে কুরু আর পূর্বে খাড়ায়া আছে পাণ্ডব-পাঞ্চাল। দুই রঙের পোশাকে দুই পক্ষ দাঁড়াইছে যাতে পরিষ্কার চিনা যায় পার্টি আর বিরোধী দল। হাতির সামনে হাতি; ঘোড়ার সামনে ঘোড়া; পায়দল খাড়া পায়দলের সম্মুখে; গদারু গদা বাগাইয়া আছে গদারুর দিকে; তিরন্দাজ-তিরন্দাজ মুখোমুখি আর বর্শাতি-ভল্লব খাড়া

পরস্পর কপাল নিশানা করে। সকলেই রেডি হইয়া প্রস্তুত আছে সেনাপতির হুংকারের অপেক্ষায় আর ঠিক এই সময় যুধিষ্ঠির ঘটাইল কাণ্ডখান...

যুধিষ্ঠির আছিল দুই দলের মাঝখানে; পাণ্ডব-পাঞ্চালের সকলেরই আছিল তার দিকে চোখ। হঠাৎ সে অস্ত্র ফালাইয়া; বর্ম ছাইড়া; রথ থাইকা নাইমা; হাত জোড় কইরা হাঁটা দিলো শত্রুসেনাপতি ভীষ্মের দিকে...

শত্রু দলের ভিতর দিয়া হাঁটা দিছে নিরস্ত্র যুধিষ্ঠির; দৌড়াইয়া গিয়া ভীম তারে আটকায়- দুর্যোধনের সেনা দেইখা যুদ্ধের আগেই কি সারেন্ডারের পিলান করতাছ তুমি?

যুধিষ্ঠির কথা কয় না। হাঁটে। ভীমেরে আটকাইয়া কৃষ্ণ হাসে- যাইতে দেও। যুদ্ধ নিয়মের পয়লা ফায়দাটা উঠাইতাছে রাজা যুধিষ্ঠির। নিয়মমতো নিরস্ত্র যুধিষ্ঠির এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ...

ভীষ্ম যখন যুধিষ্ঠিরের কাছ থিকা আশা করতাছিল আক্রমণ তখন সে পাইল সাষ্টাঙ্গে প্রণাম। যুদ্ধের মাঠে এইরকম বেকুব জীবনেও আর বনে নাই সে। অস্ত্রমস্ত্র ছাইড়া আইসা যুধিষ্ঠির তার পায়ে পেন্নাম ঠুইকা খাড়ায়- আপনের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরার অনুমতি চাই পিতামহ; আর আশীর্বাদ করেন যাতে বিজয়ী হই...

যুধিষ্ঠিরের এমন কাণ্ডে গঙ্গাপুত্রের আবেগ জল হইয়া মাঠেতে গড়ায়- নাতিরে; কী আর কমু। খালি ভাতের দায়ে ঠেইকা আছি দুর্যোধনের লগে। নাইলে আমি তো তোর লগেই যাইতে চাই আর জয়ও চাই তোর...

ভীষ্মের কাছ থিকা সইরা যুধিষ্ঠির একইভাবে গিয়া খাড়ায় গুরু দ্রোণের সামনে- পেন্নাম গুরুদেব। গুরুরে পেন্নাম না কইরা আমি কোনো দিনও অস্ত্র ধরি নাই; তাই শত্রুপক্ষে থাইকাও আপনেরে পেন্নাম করি মুই...

সারা জীবন অর্জুনরে বড়ো শিষ্য কইলেও দ্রোণের শিষ্যগো মাঝে পদে সব থাইকা বড়ো যুধিষ্ঠির; রাজসূয় যজ্ঞ করা চক্রবর্তী সম্রাট; যার সামনে শত শত ব্রাহ্মণ হাত জোড় কইরা থাকনের কথা; সেই যুধিষ্ঠির শত্রু হইয়াও শুধু গুরু হইবার কারণে তারে আইসা পেন্নাম কইরা অনুমতি চায়। এমন কাণ্ডে ভরদ্বাজের লোভী পুত্রের চোখও চক চক কইরা উঠে; জগতে এমন বিরল সম্মান মাইনসেরে না দেখাইলে কী হয়?

যদিও যুধিষ্ঠির জিতা গেলে সব থিকা বড়ো ক্ষতি দ্রোণেরই। কারণ পাশা খেইলা যুধিষ্ঠির যেই রাজ্য হারাইছে সেই ইন্দ্রপ্রস্থের বর্তমান রাজা স্বয়ং এই গুরু দ্রোণ; যুদ্ধে যুধিষ্ঠিরের জিতা যাওয়া মানে কিন্তু দ্রোণের রাজ্য হারাইয়া আবার ভিক্ষুক বামুন বইনা যাওয়া। কিন্তু এতগুলা মাইনসের সামনে গুরু বইলা সম্মান দিলো; গুরুর গাম্ভির্য রাইখা তারেও তো কিছু তো কইতে হয়। তাই সকলরে দেখাইয়া দ্রোণ যুধিষ্ঠিরের আশীর্বাদ কইরা কানে কানে কন- ভাতের দায়ে দুর্যোধনের কাছে বান্ধা পইড়া আছিরে বাপ; তবু কিন্তু আমি তোমারই জয় চাই...

যুধিষ্ঠির তারপর যায় মামা শল্যের কাছে। পেন্নাম-টেন্নাম কইরা কয়- কথাটা মনে রাইখেন মামা। আপনে কইছিলেন যে যুদ্ধের সময় কর্ণের মাথা আউলা কইরা রাখবেন...

শল্য কয়- হ ভাগিনা। মনে আছে। করব। আর তুমি যে আমারেও সকলের সামনে পেন্নাম করলা তাতে খুব খুশি আমি...

যুধিষ্ঠির ফিরতি পথ ধরে আর কৃষ্ণ ভীম অর্জুনরে কয়- তোমরা যুদ্ধ জানতে পারো; কিন্তু পলিটিক্স বোঝে রাজা যুধিষ্ঠির। যুদ্ধের আগেই দেখো কেমনে শত্রুপক্ষের তিন পালের গোদারে প্রণাম-নমস্কার কইরা আবেগে ভাসাইয়া দিছে। এখন নিশ্চিত থাকতে পারো; খালি একটা প্রণামের কারণেই এই তিনজন কোনোভাবেই পাণ্ডবগো উপর অস্ত্র উঠাইব না; যদি না পাণ্ডবরা আগে উঠায়...

যুধিষ্ঠির যখন মুরুব্বিগো পটাইতে ব্যস্ত তখন কৃষ্ণ গিয়া খাড়াইছিল কর্ণের সামনে- ভীষ্ম না মরলে তো তুমি কৌরবপক্ষে যুদ্ধ করবা না। তা অত দিন বইসা না থাইকা না হয় আমাগো পক্ষেই যুদ্ধ করো। ভীষ্ম মরলে আবার গিয়া যুদ্ধ করবা দুর্যোধনের পক্ষে...

কর্ণ কৃষ্ণের দিকে তাকাইয়া হাসে- আমি তো আর তোমাগো মতো ভাড়াটিয়া সিপাই না কৃষ্ণ; যে যার কাছে বেতন পাব তার পক্ষেই অস্ত্র ধরব। যুধিষ্ঠির বেতন দিতে পারব না দেইখা তুমি যেমন তোমার সৈন্য দুর্যোধনরে ভাড়া দিয়া নিজে একলা গেছো পাণ্ডবগো লগে আবার পয়সার লোভে পাণ্ডবগো মামা শল্য আইসা যোগ দিছে দুর্যোধনের লগে; আমারে তুমি সেই দলে না ফেললেই ভালো। আমি যুদ্ধ করি বা না করি; দুর্যোধনের পক্ষেই আছি...

নিজের দলে ফিরা আইসা যুধিষ্ঠির একটা আওয়াজ দেয়- কুরুপক্ষের কেউ কি দল ছাইড়া আমাগো দলে আসতে চাও?

এই ডাকে নিজের দল ছাইড়া পাণ্ডবপক্ষে আইসা যোগ দেয় ধৃতরাষ্ট্রের দাসীগর্ভজাত পোলা যুযুৎসু। এইটাও যুদ্ধের নিয়মের মধ্যে পড়ে। গতকাল দুই পক্ষ মাঠে উপস্থিত হইবার লগে লগেই দুই দলের মাঝখানে আইসা

খাড়াইছিলেন কুরু-পাণ্ডব পিতামহ কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন- কিছু নিয়মকানুন ঠিক কইরা দিতে চাই যুদ্ধ শুরুর আগে...

- যেহেতু দুই পক্ষই পরস্পর আত্মীয়; তাই যুদ্ধ শেষ হইবার পর কিংবা শুরু হইবার আগে কারো ভিতর কোনো শত্রুতা থাকতে পারব না; আত্মীয় হিসাবে পরস্পরের লগে পরস্পরের যেমন সম্পর্ক থাকব তেমনি পরস্পরের শিবিরেও থাকব পরস্পর যাতায়াতের অবাধ অধিকার। এইটা আমার পয়লা বিধান...

দ্বৈপায়নের কথায় দ্বিমত করার কোনো লোক থাকার কথা না। তিনি কথা বাড়াইতে থাকেন- দ্বিতীয় কথা হইল গালাগালির উত্তর মুখ খারাপ কইরাই দেওন লাগব। যারা অস্ত্র ফালাইয়া ভাগব তাগোরে কিন্তু মারা যাইব না। যুদ্ধ কিন্তু হইতে হইব সমানে সমান; হাতির লগে হাতি সওয়ার; ঘোড়ার লগে ঘোড়সওয়ার; রথীর লগে রথী আর পায়েদলের লগে পায়েদল মানুষই কেবল যুদ্ধ করবার পারব...

সক্কলে সকল কথা মাইনা নিতাছে দেইখা তিনি আরো ছোটখাটো নিয়ম বাড়াইতে থাকেন- আরেকখান কথা; কারো সম্পর্কে না জাইনা কিন্তু তারে আক্রমণ করা যাইব না। কেউ যদি কাউরে দেইখা ডরে তাব্দা খায় তবে কিন্তু তারেও কেউ মারতে পারবা না। কিংবা ধরো যে লোক অন্য কারো লগে লড়াই করতাছে; কিংবা কেউ যদি আত্মসমর্পণ কইরা ফালায় কিংবা কারো যদি বর্ম না থাকে; তাগোরেও যেমন মারা যাইব না তেমনি কোনো সারথি কিংবা জোগানদার বাদ্যকার কিংবা কামলাগোরে আঘাত করতে পারবা না কেউ...

দ্বৈপায়নের কথায় ভীম মিনমিন করে কৃষ্ণের কানে- শর্ত চাপাইতে চাপাইতে তো দেখি দাদায় যুদ্ধরে ছুডুকালের খেলাধুলার সমান কইরা ফালাইতাছে...

কনুইয়ের গুঁতা দিয়া ভীমেরে থামায় কৃষ্ণ- নিয়ম মাইনা নেওয়া মানে কিন্তু নিয়ম পালন করা বোঝায় না। নিয়ম থাকলে মাঝেমইধ্যে নিয়মের কিছু সুবিধাও পাওয়া যায়। ঠাকুরের নিয়মগুলা কামে লাগব। থাউক...

কারো কোনো কথা নাই বুইঝা দ্বৈপায়ন এইবার হাত ধইরা সঞ্জয়রে আইনা খাড়া করেন সকলের সামনে- এরে চিনা রাখো সকলে। গবলপুত্র এই সঞ্জয়ের যুদ্ধের যেকোনো স্থানে যাতায়াতের থাকব অবাধ অধিকার। কেউ তারে যেমন বাধা দিতে পারব না; তেমনি কেউ তারে চাইপা ধইরা সংবাদ নিবারও চেষ্টা করতে পারব না। এই সঞ্জয় সংবাদ সংগ্রহ কইরা জানাইব আন্ধা রাজা ধৃতরাষ্ট্ররে। এইটাই আমার শেষ বিধান...

দুই দলই তিনটা কইরা বাহিনী নামায় পয়লা দিন। কুরুতে পয়লা বাহিনীর নেতা দ্রোণ; তার পিঠ বাঁচাইয়া দ্বিতীয় দলের নেতা ভীষ্ম আর সকলের পিছনে তৃতীয় দলে দুর্যোধন স্বয়ং। পাণ্ডব-পাঞ্চালে পয়লা দলেই পাণ্ডব সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন; এক্কেবারে দ্রোণের মুখামুখি। দ্বিতীয় দলের নেতা তিনজন; ভীম সকলের সামনে তারপর অর্জুন তারপর অর্জুনের পিঠ সামলাইবার লাইগা পিছনে সাত্যকি। আর সব শেষ দলের তিন নেতার মধ্যে থাকেন বিরাট দ্রুপদ আর স্বয়ং যুধিষ্ঠির...

কর্ণের লগে আলাপে কৃষ্ণের ঠিক করা তারিখেই শুরু হইছে যুদ্ধ; কার্তিক মাসের অমাবস্যার দিন। এই সময়ে গ্রামেগঞ্জে শস্য যেমন ভরপুর আছে তেমনি ফসল উইঠা যাওয়ায় মাছিরাও আর মাঠেঘাটে ভন ভন করে না এখন। কিছু দিন আগে বৃষ্টির কারণে চাইরপাশে ঘাসপাতা পশুখাদ্যের যেমন অভাব নাই তেমনি পুকুর আর কূপগুলা এখনো স্বচ্ছ পানিতে ভরপুর; আবার বৃষ্টি

উইঠা যাওয়ায় পথে মাঠে কাদাও যেমন নাই; ধুলাও তেমনি নাই। না শীত না গরম এই কালটা যুদ্ধের লাইগা খুবই উপযুক্ত সময়...

হিরন্বতী নদীর দক্ষিণ তীর ঘেঁইষা পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত কয়েকটা মাঠ নিয়া এই কুরুক্ষেত্র। কৃষ্ণের পরিকল্পনায় পাণ্ডবগো শিবির তৈরি হইছে এক্কেবারে নদীর তীর ঘেঁইসা পূর্ব দিক বরাবর। পাণ্ডব আর অন্যান্য রাজাগো শিবিরের চাইরপাশে খাল কাটা হইছে যাতে অকস্মাৎ কেউ না আক্রমণ করতে পারে। শিবিরে বসানো হইছে সৈন্যনিবাস জোগানদার আর সেবাদারগো পাড়া; কামার দোকানদার কবিরাজ সাপ্লায়ার জোগালি পশুরাখাল চাকরবাকর আর বেশ্যাপল্লি। প্রচুর পানি ঘাস পশুখাদ্য কয়লা ঘি ধুনা আর অস্ত্রের লাইগাও করা হইছে আলাদা আলাদা গুদাম। পাণ্ডব শিবিরের দক্ষিণে পড়ছে যুদ্ধের মাঠ; উত্তরে নদী; পূর্ব দিকে দ্বৈপায়ন হ্রদ এবং পাহাড় জঙ্গল আর পশ্চিম দিকে কৌরব শিবির...

কৌরব শিবিরেও একই ব্যবস্থা হইছে। তারা শিবির করছে নদীর তীর ঘেঁইসা পশ্চিম দিক বরাবর। পাশাপাশি যেহেতু দ্বৈপায়ন হ্রদ আর পাহাড় জঙ্গল পইড়া গেছে পাণ্ডব শিবিরের পিছনে; তাই তারা খেয়াল রাখছে কুরুক্ষেত্র ঘুরাইয়া দ্বৈপায়ন হ্রদ আর বনে যাইবার পথটা যেন শত্রুরা বন্ধ কইরা দিতে না পারে। তাছাড়া এই পথটা তাগোর সরবরাহ সাপ্লাইয়েরও পথ...

যুদ্ধের মাঠে দুই দলেরই বিন্যাস প্রায় একই রকম। সামনে পদাতি আর গদারু বাহিনী। প্রতি তিনটা লাইনের পিছনে এক লাইন ফাঁকা জায়গা কমান্ডার আর সরবরাহিগো যাতায়াতের লাইগা। পদাতি বাহিনীর পিছনে হাতি সোয়ার বাহিনী; হাতিগুলা মূলত রথেরই বিকল্প; কিন্তু মাঝে মাঝে হাতি নিজেও যুদ্ধে যোগ দিয়া পাড়াইয়া সিধা করে সেনাসৈনিক। আর দুই পাশে তিরন্দাজ দল। তিরন্দাজরা শত্রুর দিকে তির মাইরা পদাতিগো জায়গা কইরা দেয় আউগাইয়া যাবার। আর সুবিধামতো সেনাপতিরা রথেও চড়েন;

হাতিতেও চড়েন আবার দরকার মনে করলে দৌড়াইয়া গিয়াও সৈন্যগো নির্দেশনা দেন...

যুদ্ধের শুরুতে অবশ্য অর্জুন বেশ ঝামেলাই পাকাইছিল। অর্জুন নরম দিলের মানুষ। সে ভীষ্ম দ্রোণরে সামনে দেইখা কাইন্দা-কাইট্টা অস্ত্র ফালাইয়া কয়- আমি যুদ্ধ করতে পারব না কৃষ্ণ। তুমি কও ক্যামনে আমি পিতামহ ভীষ্ম আর গুরু দ্রোণের দিকে তির চালাই?

কৃষ্ণ তারে ধাতানি দেয়- সংকটের সময় নপুংসকের মতো ন্যাকামি বন্ধ কইরা তোমার যা করার তাই করো তুমি। অস্ত্র উঠাও। তোমারে দেইখা মনে হইতাছে তুমি এই পরথম জানলা যে ভীষ্ম দ্রোণের গায়ে তোমার তির মারতে হবে?

অর্জুন কয়- আমি আগে জানতাম ঠিকই কিন্তু এখন মনে হইতাছে এগোরে মাইরা কী লাভ হইব আমাদের?

কৃষ্ণ একটা চূড়ান্ত ধাতানি লাগায় অর্জুনরে- লাভ ক্ষতির লগে তোমার কী সম্পর্ক? তোমার কাম হইল অস্ত্র চালানো তুমি সেইটা করবা। ব্যস...

যাউক গা। ভীষ্ম ভীম আর ভীমের পোলা ঘটোৎকচ ছাড়া সকলেই মূলত হাত মশকো করে পয়লা দিন। ভীষ্ম আর ভীম গণমাইর দিয়া ছত্রভঙ্গ কইরা দেয় বহু সেনাসৈনিক। বিরাটের দুই পোলার মধ্যে উত্তর মারা যায় শল্যের হাতে আর শ্বেত মরে ভীষ্মের হাতে। কুরুপক্ষের বড়ো কেউ মরে না এই দিন। কিন্তু সেনাসৈন্যের দুরবস্থা দেইখা দিনের শেষে যুধিষ্ঠির যায় ঘাবড়াইয়া- যুদ্ধ যা করার তা তো দেখি একলা ভীমই করল। অর্জুন তো উদাসীন। এই অবস্থায়

ভীষ্মরে সামলাইব কেডা? একলা ভীম তো একশো বছরেও এই যুদ্ধ কুলাইতে পারব না...

কৃষ্ণ কয়- অর্জুনের পক্ষে ভীষ্মরে মারা যেমন সম্ভব না তেমনি সম্ভব না গুরু দ্রোণেরেও আঘাত করা। আপনে বরং দ্রুপদের দুই পোলা শিখণ্ডী আর ধৃষ্টদ্যুম্নরে খাড়া করেন এই দুইজনরে ঠেকাইতে। যদিও শিখণ্ডী আর ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণেরই শিষ্য কিন্তু তাগো যেমন চোখের পর্দা নাই তেমনি দ্রোণের শিষ্য হইবার কারণে তারা দ্রোণের দুর্বলতাও জানে...

দ্বিতীয় দিন পাণ্ডবগো লগে ভীষ্ম আর দ্রোণের কিছু তিরাতিরি হইলেও দুই পক্ষই দুই পক্ষরে এড়াইয়া চলে কৌশলে। অর্জুন শুরু করে সেনাসৈনিক মারা। দুর্যোধন গিয়া ভীষ্মরে কয়- আপনের লাইগা আমার দোস্ত কর্ণ ঘরে বইসা খায়; আর আপনে যুদ্ধ করতে আইসা ভাগেন অর্জুনের ডরে...

দুর্যোধনের গুঁতা খাইয়া ভীষ্ম গিয়া আবার অর্জুনের লগে কিছু তিরাতিরি করেন। ভীম কলিঙ্গের রাজা শতায়ু আর তার পোলাপান প্রায় সবাইরেই শুয়াইয়া ফালায়। সেইটা ঠেকাইতে আইসা রথের ঘোড়া মাইরা ভীমরে থামাইতে গেলে ভীম গদাম দিয়া ভীষ্মের সারথি শুয়াইয়া তার লগে সত্যি সত্যি যুদ্ধ শুরু কইরা দিলে তিনি রথ ছাইড়া ঘোড়ায় চাইপা দেন সটান...

তিন নম্বর দিনে ভীম তির মাইরা দুর্যোধনরে তার নিজের রথের উপর ফালাইয়া দেয় অজ্ঞান কইরা। তার উপরে তার গদামের চোটে সৈন্যসামন্ত পুরাই ছত্রখান। জ্ঞান ফিরা পাইয়া দুর্যোধন ভীষ্মরে কয়- আপনে আমারে আগেই কইতে পারতেন যে পাণ্ডব সাত্যকি আর ধৃষ্টদ্যুম্নের লগে যুদ্ধ করতে আপনে ডরান। আপনে দ্রোণ আর কৃপাচার্য অত ডরালুক জানলে আমি

আপনাগো লগে যুদ্ধের প্লান না কইরা কর্ণের লগেই করতাম। আপনেরা কেউ যুদ্ধ যেমন জানেন না; তেমনি লড়াই করার সাহসও নাই কারো...

দুর্যোধনের খোঁচায় ভীষ্ম আবার শুরু করেন খ্যাপা যুদ্ধ। অর্জুনের লগে একেবারে সত্যি সত্যি যুদ্ধ। খ্যাপা ভীষ্মরে দেইখা অর্জুন বেকুব বইনা যায়। রথ ঘুরাইয়া-ঘোড়া দাবড়াইয়া কৃষ্ণ অর্জুনরে বাঁচাইতে পারলেও অর্জুন কাবু হইয়া পড়ে। ভীষ্মের তিরে অর্জুনরে ঘায়েল হইতে দেইখা পাণ্ডব-পাঞ্চাল সৈনিকরা শুরু করে পলায়ন। সাত্যকি পিছন থাইকা ডাইকাও কাউরে ফিরাইতে পারে না। শেষে অবস্থা বেগতিক দেইখা যুদ্ধ করব না এই প্রতিজ্ঞায় মাঠে নামলেও নিজের চক্র নিয়া গিয়া কৃষ্ণ খাড়ায় ভীষ্মের সামনে...

কৃষ্ণরে অস্ত্র তুলতে দেইখা ভীষ্ম ধনুক নামাইয়া হাসেন- তুমি না কইছিলা যুদ্ধ করবা না?

কৃষ্ণ কয়- তির খাইয়া মইরা গেলে মুখের কথার কী দাম?

কৃষ্ণ আগাইয়া যায় ভীষ্মের দিকে। দৌড়াইয়া গিয়া তার পায়ে পইড়া অর্জুন কৃষ্ণরে থামায়। ভীষ্মের হাত থিকা অর্জুনরে বাঁচাইয়া দেয় কৃষ্ণ আর কৃষ্ণের হাত থিকা ভীষ্মরে বাঁচায় অর্জুন। মারামারি-কাটাকাটি চলতে থাকে মাঠের অন্য দিকে; এই দিকে দাদায়-নাতিতে আবার সমঝোতা ভাগাভাগি হয়...

যুদ্ধের চাইর নম্বর দিনটাও ভীমের। ভীমের গদামে পুরা একদল কুরুসেনা যুদ্ধ ছাইড়া পলায়। পরে ভীষ্ম আইসা ভীমেরে ঠেকান। ভীমের লগে যুদ্ধে এখন ভীষ্ম অনেক বেশি সতর্ক। এই মাকুন্দা দাদাফাদা বোঝে না; গদার পুরা শক্তি দিয়াই বাড়িখান মারে। ভীমের লগে ভীষ্মের লড়াইর ফাঁকে দুর্যোধন তির মাইরা ভীমেরে অজ্ঞান কইরা ফালায়। কিন্তু হুঁশ ফিরা পাইয়া সে শল্যরে পিডাইয়া মাঠ ছাড়া করে। আর মাটিতে পাইড়া ফালায় ধৃতরাষ্ট্রের আট আটটা পোলারে; জলসন্ধ সুষেণ উগ্র অশ্ব কেতু বীরবাহু ভীম আর ভীমরথ...

ভীমেরে আটকাইতে আসে ভগদত্ত। ভগদত্তের হাতি বাহিনীর সামনে ভীম এক্কেবারে বেকায়দায় পইড়া রথের ডান্ডা ধইরা ঝুইলা বাঁচার উপায় খোঁজে। বাপেরে এমন ডান্ডাঝোলা দেইখা ভগদত্তের সামনে আইসা খাড়ায় ঘটোৎকচ। এই ঘটোৎকচের যুদ্ধকলায় আর্যাবর্তের সকলেই দারুণ আনাড়ি। বাকিরা বাকিদের শিক্ষার ঘরানা জানে বইলা আক্রমণের কৌশলও যেমন জানে; ঠেকানোর কায়দাটাও জানে। কিন্তু সম্পূর্ণ হড় কৌশলের এই মায়াযোদ্ধার কোনো কায়দা সম্পর্কেই কারো কোনো ধারণা নাই। জঙ্গলে পশুর লগে যুদ্ধ করা ঘটোৎকচ বাহিনী হাতি সোয়াররে আক্রমণ না কইরা শুরু করে হাতির শুঁড়ের মইদ্যে তির আর বর্শা বিন্ধানো; আর লগে লগে শুরু হয় হাতি বাহিনীর আউলাঝাড়া দৌড়...

ঘটোৎকচের হাত থিকা ভগদত্তরে রক্ষা করতে আইসা দ্রোণ ভীষ্ম নিজেরাই ফাইসা পড়েন। ঘটার হাত থিকা ভগদত্তরে বাঁচাইবেন নাকি নিজেরা বাঁচবেন তার কূলকিনারা না পাইয়া শেষ পর্যন্ত ভীষ্ম সূর্য ডোবার আগেই সেই দিনের মতো যুদ্ধবিরতি ঘোষণা কইরা বসেন...

পাঁচ নম্বর দিনের অবস্থাও চাইর নম্বর দিন থাইকা ফারাক করে না খুব। ভীম আর তার পোলায়ই পিটাইতে থাকে সমানে। ভূরিশ্রবার হাতে মারা পড়ে সাত্যকির দশ পোলা। ভীষ্মের হাতে কিছু পাণ্ডব সৈনিক মরে। ছয় নম্বর দিনেও ভীম দাবড়ায়; একবার তির মাইরা দুর্যোধনরে বেহুঁশও কইরা ফালায়। পরে কৃপাচার্য রথে তুইলা নিয়া দুর্যোধনরে বাঁচান। অভিমন্যু আর দ্রৌপদীর পোলাগো হাতে মারা পড়ে ধৃতরাষ্ট্রের চাইর পোলা; বিকর্ণ দুর্মুখ জয়ৎসেন আর দুষ্কর্ণ। চাইর নম্বর দিন যুদ্ধ শেষ হইয়া গেছিল সূর্য থাকতে থাকতেই। ছয় নম্বর দিন যুদ্ধ গড়ায় সূর্যাস্তেরও কিছুক্ষণ পর...

কিন্তু এমন দুঃখ কই রাখে দুর্যোধন। যার গদাগদি করার কথা সেই ভীম নাকি তারে তির মাইরা কাবু কইরা ফালাইল দুই দুইবার। সে দৌড়াইয়া যায় ভীষ্মের কাছে- আপনে হাতপা গুটাইয়া বইসা আছেন বইলাই এই দুর্দশা আমার...

ভীষ্ম কন- হাত পা ছড়াইয়াই বা করবটা কী? পাণ্ডবপক্ষে যারা আছে তাগো লগে পাইরা উঠা অত সোজা না। ভীম অর্জুন তো দূরের কথা; ভীমের পোলা ঘটারে ঠেকাইতেই জান বাইরাইয়া যাইতাছে সবার। তোমার লাইগা আমি সর্বোচ্চ যা করতে পারি তা হইল জানের মায়া বাদ দিয়া যুদ্ধ করা। যাও কথা দিলাম; কাইল থাইকা জানের মায়াটাও ছাইড়া দিলাম...

দুর্যোধন যখনই গুঁতা দেয় তখনই নিজের বাহাদুরি দেখাইতে ভীষ্ম গিয়া খাড়ান অর্জুনের সামনে। সাত নম্বর দিনেও হইল তাই। কিন্তু সেই দিন কৃষ্ণের খেইপা উঠা দেখে আইজ আর অর্জুনের লগে সত্যি সত্যি যুদ্ধে যান না তিনি। কৃষ্ণরে বিশ্বাস নাই। যুদ্ধ করব না কইয়া গা বাঁচাইয়া থাকলেও সময়মতো ঠিকই আইসা সে যুদ্ধে যোগ দেয়। তাই দুর্যোধনরে দেখাইবার লাইগা কতক্ষণ তিনি অর্জুনের লগে তিরাতিরিই করেন। অন্য দিকে দ্রোণের হাতে মারা যায় বিরাটের পোলা শঙ্খ। সাত্যকির দাবড়ানি খাইয়া মাঠ ছাড়ে অলম্বুষ আর আইজ ঘটোৎকচরে ঠাঠা প্যাঁদানি দিয়া যুদ্ধক্ষেত্র থাইকা ভাগাইয়া দেয় ভগদত্ত...

অর্জুন-উলুপীর পোলা ইরাবান মাইর দেয় অবন্তি দেশের বিন্দু আর অনুবিন্দু বাহিনীরে। আর নকুল সহদেব তাগো মামা শল্যের লগে খেলাখেলা কিছু যুদ্ধও কইরা নেয় ফাঁকতালে এই দিন...

দ্রৌপদীর ভাই শিখণ্ডী গিয়া খাড়ায় ভীষ্মের সামনে। কিন্তু ভীষ্মের অস্ত্রপাতি আর চেহারা দেইখা দেয় পিছটান। সেইটা দেইখা যুধিষ্ঠির কয়- তুমি না পণ করছিলা যে ভীষ্মরে মারবা? এখন পলাইতাছ ক্যান? যুধিষ্ঠিরের খোঁচা খাইয়া শিখণ্ডী আবার আগাইয়া যায় ভীষ্মের দিকে কিন্তু মাঝখান থাইকা বাগে পাইয়া শল্য তারে ভালোই পিটানি দেয়। সেইটা হজম কইরা শিখণ্ডী আবার ভীষ্মের সামনে পৌঁছাইতে পৌঁছাইতে সূর্য অস্ত গিয়া সেই দিনের মতো যুদ্ধ শেষ হইয়া যায়...

আট নম্বর দিনে ভীমের হাতে মরে ধৃতরাষ্ট্রের আরো আট পোলা; সুনাভ অপরাজিত কু-ধার পণ্ডিত বিশালাক্ষ মহোদর আদিত্যকেতু আর বহ্বাশী। এইটা দেইখা দুর্যোধন আবার গিয়া ধরে ভীষ্মরে- আপনে আসোলে কোনো বালও ছিঁড়তাছেন না আমাগো লাইগা...

ভীষ্ম কন- কী ছিঁড়ার আছে না আছে জানি না। কিন্তু একটা সত্য কথা হইল যে ভীমের হাত থিকা তুমি আর তোমার ভাইগোরে ভগবানেও বাঁচাইতে পারব না। ভীম ধৃতরাষ্ট্রের পোলাগো যারে পাইব তারেই মারব; সুতরাং তোমারে কই; মরার কথা মাথায় রাইখা ঠান্ডা মাথায় যুদ্ধ করো; তাতে যদি কিছু হয়...

এই দিন অর্জুনের পোলা ইরাবান শকুনির ছয় ভাইরে মাইরা শেষ পর্যন্ত গিয়া মইরা যায় অলম্বুষের হাতে। যুদ্ধে পাণ্ডব বংশের পয়লা সন্তানের মৃত্যু এইটা। কাকাতো ভাইরে মরতে দেইখা পাগলা খ্যাপা খেইপা উঠে ভীম-হিড়িম্বার পোলা ঘটোৎকচ। স্বয়ং দুর্যোধন ঘটোৎকচরে সামলাইতে আইসা বেসামাল হইয়া পড়ে। দুর্যোধনরে বাঁচাইতে আইসা ঘটার হাতে নিজের ধনুকটাও হারাইয়া ফেলেন ধুনর্বিদ্যার গুরু দ্রোণ। বাপেরে বাঁচাইতে আইসা ঘটার হাতে ডবল প্যাঁদানি খায় অশ্বত্থামা। তিনজনরে আড়াল দিতে আইসা থাবড়ানি খায় মদ্ররাজ শল্য আর ঘটোৎকচের হাতে কুরুবীর দ্রোণ দুর্যোধন শল্য অশ্বত্থামার দুর্দশা দেইখা কুরু সৈনিকরা শুরু করে পলায়ন। ভীষ্ম আর সঞ্জয় তাগোরে

পিছন থাইকা ডাকেন কিন্তু সৈনিকরা ভাগতে ভাগতে কয়- বেতন না দিলে নাই; কিন্তু এর সামনে যাইতে কইয়েন না মোদের...

দুর্যোধন দৌড়াইয়া যায় ভীষ্মের কাছে- দাদাজান কিছু করেন। আমি তো অত দিন খালি ভীমের হিসাব করতাম। কিন্তু এখন দেখি ভীমের পোলায়ই আমাগো পিডাইয়া যুদ্ধ শেষ কইরা ফালাইব। কিছু করেন দাদাজান...

ভীষ্ম কন- পোলাপাইনগো রক্ত গরম; গায়ে-গতরে শক্তিও বেশি; ফুসফুসে জিগরও বেশি। তুমি বরং তোমার বয়সী যুধিষ্ঠির আর তার ভাইগো লগেই যুদ্ধ কইরো। ভাতিজা টাতিজা জাতীয় জোয়ান পোলাপানগো সামনে তোমার না যাওয়াই ভালো...

কুরু বাহিনীর একমাত্র ভগদত্তই ঘটোৎকচরে কাবু করতে পারছিল যুদ্ধের সাত নম্বর দিন। তাই ভীষ্ম গিয়া ভগদত্তরে তেলান- আপনে ছাড়া ভীমের পোলারে সামলানোর কেউ নাই; আপনে একটু আউগান জংলিটার দিকে...

ভগদত্তের হাতে গতকাল মাইর খাইয়া তারে সামলানোর কৌশল বাইর কইরা ফালাইছে ঘটোৎকচ। আইজ আর ঘটার সাথে সুবিধা করতে পারে না ভগদত্ত। ঘটা সমানে পিটাইতে থাকে তারে। পিটাপিটি কইরা আবর্জনা সরানোর কাম আছিল ভীমের। কিন্তু বাপের কাম পোলায় কইরা ফালাইতাছে দেইখা ভীম গদা থুইয়া তির নিয়া খেলানেলা করতে করতে ধৃতরাষ্ট্রের আরো সাত পোলা; অনাধৃষ্টি কু-ভেদী বিরাজ দীপ্তলোচন দীর্ঘবাহু সুবাহু আর কনকধ্বজরে মাইরা ফালায়।

অন্য দিকে পোলা ইরাবানের মরার সংবাদ শুইনা অর্জুন ভীষ্ম আর কৃপরে আক্রমণ কইরা বসে। কিন্তু ততক্ষণে সূর্যও ডুইবা যায় আর যুদ্ধও শেষ হইয়া যায়...

রাত্তির বেলা দুর্যোধন আবার সকলরে ধাতায়- ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ শল্য ভূরিশ্রবা কেউই যুদ্ধের কোনো বালও বোঝেন না...

কর্ণ কয়- ভীষ্ম না জানেন যুদ্ধ; না আছে তার শইলে অস্ত্র চালানোর শক্তি। আবার অন্য দিকে আমারেও যুদ্ধ করতে দিবেন না তিনি। তুমি ভীষ্মরে কও অস্ত্র ছাইড়া দিতে। তাইলে আমি পাণ্ডবগো টাইট দিতে পারি...

কর্ণের এত বড়ো খোঁচা হজম করা ভীষ্মের পক্ষে কঠিন। তিনি দুর্যোধনের দিকে তাকান- খাড়াও যুদ্ধ কারে কয় কাইল দেখামু আমি...

নয় নম্বর দিন ভীষ্ম সত্যিই যুদ্ধ দেখান। তছনছ কইরা দেন পাণ্ডবগো। শিখণ্ডীও কোনো সুবিধা করতে পারে না। কৃষ্ণ অর্জুনরে টাইনা নিয়া যায় ভীষ্মের সামনে কিন্তু ভীষ্মের মাইরে অর্জুন কাহিল হইয়া পড়লে আবারও যুদ্ধ না করার প্রতিজ্ঞা ভাইঙ্গা; রথের চাকা তুইলা ভীষ্মরে দাবড়ানি দিয়া; গায়ে তির খাইয়া অর্জুনরে বাঁচাইতে হয় কৃষ্ণের। এই দিন অবশ্য অর্জুন-সুভদ্রার পোলা অভিমন্যু ভালোই দাবড়ায় কৌরবগো; অলম্বুষও পলায় অভিমন্যুর হাতে মাইর খাইয়া। কিন্তু তার পরেও দিনের শেষে এক্কেবারে ভাইঙ্গা পড়ে যুধিষ্ঠির- কোন আক্কেলে যে আমি ভীষ্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিছিলাম। কৃষ্ণ; ভাইরে যুদ্ধটুদ্ধ বাদ দে। আমি বনে যামু। বনবাসই আমার লাইগা ভালো...

কৃষ্ণ কয়- ঘাবড়াইয়েন না বড়ো ভাই। কাইল একটা ব্যবস্থা করব ভীষ্মের। ধৈর্য ধইরা খাড়া থাকেন...

বুইড়া মানুষের হুঁশবুদ্দি ঠিক নাই। নাতিগো লাইগা তার মায়া মমতাও যেমন আছে তেমনি তাগোরে মারতেও চান না তিনি; কথাখান ঠিক। কিন্তু যখনই দুর্যোধনের ধাতানি খান তখনই পাণ্ডবগো লাইগা মায়াটায়া ভুইলা সত্যি সত্যি মারামারি শুরু করেন। এইরকম দুপেলুয়া মাইনসেরে ভরসা করা কঠিন। ইনারে পাইড়া ফেলাই সব থিকা ভালো; যদিও ইনি পড়লে কর্ণ নামব যুদ্ধে; সেইটা আরো ভয়ানক। কিন্তু কর্ণের ক্ষেত্রে একটা সুবিধাও আছে; কর্ণের কাছ থিকা কেউ মায়ার মাইর যেহেতু আশা করে না; সেহেতু তার সামনে অসতর্কও থাকব না কেউ। কিন্তু এই বুইড়ারে দাদা বইলা কাছে গেলে তিনি শত্রু হইয়া মারেন তির। এইরকম চেমা দোস্ত থাইকা কড়া শত্রু কর্ণ বহুগুণ ভালো...

অর্জুন নরম দিলের মানুষ। দাদা ভীষ্মরে টারগেট করতে অর্জুনের হাত কাঁপে কৃষ্ণ তা জানে। তাই অর্জুনরে পিছনে রাইখা দশ নম্বর দিনে ভীষ্মের সামনে কৃষ্ণ শিখণ্ডীরে পাঠায়- আইজ ভাগলে কিন্তু খবর আছে তোর...

শিখণ্ডী চোখ বন্ধ কইরা তির চালায় বুড়া ভীষ্মের গায়ে। ভীষ্মরে যারাই বাঁচাইতে আসো তাগোরে পিছন থাইকা ঠেকায় অর্জুন। শিখণ্ডীর এমন ঝাড়া আক্রমণে ধুপ কইরা রথ থাইকা পইড়া যান গঙ্গাপুত্র ভীষ্ম। ভীষ্মের পতনে যুদ্ধ থাইমা যায়। কুরুপক্ষে শুরু হয় হাহাকার আর পাণ্ডবপক্ষে মাটি দাপাইয়া নাচে ভীম- বুড়া হাবড়া তবে শুইছে অত দিনে...

দুই পক্ষের নরম দিলের সকলে গিয়া খাড়ায় মাটিতে পইড়া থাকা ভীষ্মের সামনে। অর্জুন কাইন্দা-কাইট্টা নিজের তিরের বান্ডিল ভীষ্মের মাথার নীচে দিয়া বালিশ বানায়। ভীষ্ম হাসেন- একটা যোদ্ধারে তার উপযুক্ত বালিশই তুমি দিলা নাতি...

ভীষ্মের চিকিৎসা চলতে থাকে কিন্তু কেউই আশা করে না যে এত তির খাওনের পর এমন লেতর মানুষটা আবার উইঠা খাড়া হইতে পারে। তিনি পইড়া মরণের অপেক্ষা করেন আর দুর্যোধনের হাত ধইরা কন- যুদ্ধ করিস না ভাই...

কান্দাকাটি কইরা সকলে চইলা গেলে ভীষ্মের পা ছুঁইয়া নিঃশব্দে আইসা খাড়ায় কর্ণ- আপনি যারে দুই চোখে দেখতে পারেন না; আমি সেই রাধাপুত্র কর্ণ...

ভীষ্ম দেইখা লন তার আশেপাশে আর কেউ আছে কি না; আছে খালি কিছু সেনাসৈনিক। তিনি তাগোরে দূরে সরতে কইয়া কর্ণের হাত জড়াইয়া ধরেন- আমি জানি তুমি কুন্তীর পোলা। তুমি পাণ্ডবগো পছন্দ করো না আর দুর্যোধনের দোস্ত তাই তোমারে ছুডু করার লাইগাই এত বাজে কথা কইতাম। কিন্তু আমি ভালো কইরাই জানি যে তোমার যুদ্ধকৌশল আর শক্তি কৃষ্ণের সমান কিংবা তার থিকাও বেশি। যত যাই হোক; পরশুরামের শেষ শিষ্য তুমি। তোমার ধ্বংস-ক্ষমতাও আমি জানি। তাই মরারকালে তোমার কাছে আমার মিনতি; আমার মরার মধ্য দিয়াই যেন সব অশান্তির শেষ হইয়া যায়। পাণ্ডবরা তোমার ভাই। তোমারে অনুরোধ করি; তুমি তাগো লগে মিলা যুদ্ধটা বন্ধ কইরা দেও...

কর্ণ কয়- কুন্তীর পোলা হইতে আমারে কইয়েন না আপনে। রাধার পোলা হিসাবে যেমন বাঁইচা আছি; মরলেও যেন মরি রাধার পোলা হিসাবেই। আর আমার জীবনের সব সম্মানই আমি পাইছি দুর্যোধনের কাছে; তার লাইগা আমি জীবনটাও দিতে রাজি। বুড়া হইয়া রোগে ভুইগা মরার ইচ্ছা আমার নাই। গায়ে শক্তি থাকতে যেন যুদ্ধেই মরি সেই আশীর্বাদ করেন...

তিন কূলে মূলত নির্বংশ ভীষ্মের কেউ নাই। এই সব কুরু-পাণ্ডব নাতিটাতি সব তার সৎমা সত্যবতীর পোলার বংশধর। তিনি মিত্র থাকলে শক্তি বাড়ে তাই কুরু বংশ তারে মাথায় তুইলা রাখে। তিনি শত্রু হইলে বিপদ বাড়ে তাই পাণ্ডব বংশ তারে তেলায়। কিন্তু দুই পক্ষই যখন দেখে ভীষ্মের শত্রুতা-মিত্রতা দুইটারই দিন শেষ; তখনই সইরা পড়ে সব। আর তিরের জ্বালা নিয়া মাঠের এক কোনায় ছাপড়ার নীচে শুইয়া মৃত্যুর অপেক্ষা করেন শান্তনুর নিঃসঙ্গ সন্তান দেবব্রত ভীষ্ম...

১৬

কর্ণ কুরুপক্ষের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা তাই পাণ্ডবপক্ষের প্রধান শত্রুও সে। তার পণ আছিল ভীষ্ম না মরলে অস্ত্র তুলব না। এই কারণে ভীষ্মরে না মাইরা আধমরা কইরা রাখছে পাণ্ডবরা। কিন্তু মনে হয় কর্ণ তার পণ কিছু বদলাইছে অথবা ভীষ্মের পতনরেই মরণ হিসাবে ধইরা নিয়া যুদ্ধে নামতাছে সে। সেইটা যাই হউক কিন্তু যুদ্ধের পয়লা দশ দিন তার প্রতিজ্ঞার সুযোগ পাণ্ডবরা পুরাটাই নিছে। একলা ভীষ্ম পয়লা দশ দিন পাণ্ডবগো যে পরিমাণ নাড়াইছেন; তার লগে যদি.যোগ হইত কর্ণের আগ্রাসন তয় অত দিনে নিভা যাইত পাণ্ডবগো চিতার আগুন। অবশ্য এখনো কর্ণ থিকা আরো কিছু সুবিধা পাইব পাণ্ডবজনে। অর্জুন ছাড়া বাকি পাণ্ডবগো কাউরেই হত্যা করব না সে; কেউ না জানলেও কুন্তী জানে এই কথা মাতা কুন্তীরে সে দিছে...

অত দিন ভীষ্ম আছিলেন কৌরবগো প্রধান সেনাপতি। দুর্যোধন কর্ণরে জিগায়। কর্ণ দ্রোণের নাম কয়- তুমি দ্রোণাচার্যরে প্রধান করো; অন্য কাউরে করলে দ্রোণ আনুগত্য দিবেন না...

কুরুপক্ষে দ্বিতীয় প্রধান সেনাপতি হইলেন ভরদ্বাজপুত্র দ্রোণাচার্য; ভীষ্ম যেমন আছিলেন পরশুরামের ছাত্র; দ্রোণও তাই। কিন্তু দুইজনের মূল তফাতটা হইল; ভীষ্ম আছিলেন যোদ্ধা; বহু যুদ্ধ করছেন তিনি; বহু সেনা চালাইছেন জীবনে। কিন্তু দ্রোণ অস্ত্রগুরু অস্ত্রবিশারদ; অস্ত্রশিক্ষা দিতেন; কিছুকাল ধরে রাজাগিরিও করেন। কিন্তু জীবনে কোথাও কোনো যুদ্ধ তিনি করেন নাই কুরুযুদ্ধের আগে। ভীষ্মের অধীনে মাত্র দশ দিন যুদ্ধের অভিজ্ঞতা নিয়া তিনি হইলেন কুরুপক্ষের দ্বিতীয় প্রধান সেনাপতি...

সেনাপতি হইয়া বড়োই আপ্লুত দ্রোণ। দুর্যোধনরে কন- গাঙ্গেয় ভীষ্মের পর তুমি যে আমারে সেনাপতি বানাইছ তাতে আমি যে কী খুশি কেমনে তোমারে কই? কও বাপ; তুমি কী চাও আমার কাছে? যা চাইবা; তোমার জন্য তাই করব আমি...

দুর্যোধন কয়- বেশি কিছু করা লাগব না গুরুদেব। আপনে যদি খালি যুধিষ্ঠিররে আমার কাছে জ্যান্ত ধইরা আনতে পারেন তাইলেই হয়...

দ্রোণ একটু থতমত খাইয়া কন- তুমি যুধিষ্ঠিররে মারতে না কইয়া জ্যান্ত ধইরা আনতে কইলা; বিষয়টা আমারে একটু বুঝাও তো বাপ...

দুর্যোধন কয়- যুধিষ্ঠিররে মারলে যে পাণ্ডব পাঞ্চালরা কিলাইয়া আমাগো ভর্তা বানাইব সেইটা তো দশ দিনেই টের পাইছেন। তার থিকা যদি যুধিষ্ঠিররে জ্যান্তা ধইরা আইনা আবার পাশা খেলায় হারাইয়া বনে পাঠাইতে পারি তয় আন্ডাবাচ্চা নিয়া পাণ্ডবরা আবার সন্ন্যাসী হবে। এইটাই সব থিকা ভালো উপায়...

যা চাইব তাই দিবার কথা দিয়া চিপায় পড়েন দ্রোণ। পাণ্ডবগো যুদ্ধের যে নিশানা তাতে এখন পর্যন্ত যুধিষ্ঠিরের কাছে কেউই পৌঁছাইতে পারে নাই। দুর্যোধন কয় কি না তারে ধইরা আনো গুরুদেব...

দ্রোণ কথা ফিরানও না আবার কথা দেনও না। আমতা আমতা কইরা কন- আইজ আমি অবশ্যই যুধিষ্ঠিররে ধইরা তোমার কাছে দিমু; তয় খালি অর্জুন যদি না তার আশেপাশে থাকে। বোঝোই তো; অর্জুনের সামনে থাইকা যুধিষ্ঠিররে ধরা অসম্ভব...

কথাখান পৌঁছাইয়া যায় যুধিষ্ঠিরের কানে। অর্জুনরে ডাইকা কয়- তুই ভাইরে ফালাইয়া আইজ সরিস না কোথাও। না হয় কোন ফিকিরে হয়ত গুরু আইজ আমারে বাইন্ধা নিয়া গিয়া পাশা খেলতে বসায় তা মোর কপালই জানে...

অর্জুন কয়- ধইরা না হয় নিলেন। কিন্তু আপনে পাশা না খেললেই তো হয়...

যুধিষ্ঠির কয়- এমন কথা কইস না ভাই। জানোসই তো পাশা খেলার প্রস্তাব ফিরাইতে পারি না মুই...

অর্জুন কয়- সমস্যা নাই। তিনারে হত্যা করতে আমার আপত্তি হইলেও দাবড়ানি দিতে কোনো অসুবিধা নাই। ডরাইয়েন না...

এগারো নম্বর দিনে দ্রোণশিষ্য ধৃষ্টদ্যুম্ন আটকাইয়া রাখে গুরুরে বহুক্ষণ। শিষ্যের ঘাট পার হইয়া দ্রোণ মুখামুখি হন ধৃষ্টদ্যুম্নপিতা আর নিজের বাল্যবন্ধু দ্রুপদের; যে কি না আবার দ্রোণপিতা ভরদ্বাজের শিষ্য। অভিমন্যু বৃহদবলের ভুঁড়ি মাটিমাখা কইরা জয়দ্রথরে নাকানি-চুবানি দেওয়া শুরু করলে শল্য আইসা তারে ঠেকান। অভিমন্যুর আক্রমণে শল্যের সারথি মরলে শল্য অভিমন্যুর লগে গদাগিরি করতে যায় আর ভীম আইসা অভিমন্যুরে কয়- ঘটোৎকচ আমার অর্ধেক কাম সাইরা ফালাইতাছে লাথাইয়া-কিলাইয়া। এখন তুমি ভাতিজাও যদি গদাগিরি করো তয় আমার তো যুদ্ধে রিটায়ার নিয়া আবার বাবুর্চির কাম নিতে হয়। তুমি রেস্ট করো। বেইমান মামুর হাড্ডিরে আমিই বরং পাঞ্জিপুঁথি ছাড়া অমাবস্যা-পূর্ণিমা চিনাই...

শল্য কিন্তু নাদান না। ভীমের গদামে সে মাটিতে পইড়া হাঁপাইতে লাগলেও ভীমেরেও সে মাটিতে পাইড়া ফালায়। ভীম উইঠা খাড়ায় কিন্তু ততক্ষণে কৃতবর্মা নিজের রথে কইরা শল্যরে নিয়া পলায়...

ভীষ্মের অভাব এক দিনেই বোঝে কুরুক্ষেত্রের মাঠ। পাণ্ডবপক্ষের সকলেই কমবেশি পিটাইতে থাকে কুরু সেনাসৈনিক। পাণ্ডবগো মাইর খাইয়া নেতৃত্বহীন কুরু সৈন্যরা পলায় যে যে দিকে পারে। নয়া সেনাপতি দ্রোণ এরে ডাকে তারে ডাকে কিন্তু কে শোনে কার ডাক। এমন অবস্থায় নিজের নেংটি বাঁচাইতে দ্রোণ চিক্কুর দিয়া কন- তোমাগো পলাইবার যেমন কোনো কারণ নাই; তেমনি যুদ্ধ করারও দরকার নাই। তোমরা খাড়াইয়া দেখো আমি একলাই কেমনে যুধিষ্ঠিররে বন্দি কইরা যুদ্ধের ইতি টাইনা দিতাছি দুর্যোধনের পক্ষে...

সকলে খাড়াইয়া এইবার সত্যি তামাশা দেখে। দ্রোণ বাহাদুরি দেখাইতে যুধিষ্ঠিরের দিকে আগাইতে গিয়া পয়লা চোটেই বুকে তির খায় যুধিষ্ঠিরের দেহরক্ষী কুমারের হাতে। তার পরেও দ্রোণ আগায়। তার হাতে মারা পড়ে অগ্রবর্তী দলের ব্যঘ্রদত্ত আর সিংহসেন। এমন সময় দ্রোণের সামনে আইসা খাড়ায় অর্জুন। অর্জুনরে দেইখা দ্রোণ পিছনের রাস্তা মাপতে মাপতে সূর্যাস্ত হইবার আগেই ঘোষণা কইরা দেন যুদ্ধের সমাপ্তি...

যুদ্ধের এগারো নম্বর দিনটা আছিল কর্ণের পয়লা দিন। এই দিন কিছু খুচরা সৈন্য মারা আর রাজা বিরাটের লগে তিরাতিরি কইরা হাতের জাট ভাঙ্গা ছাড়া কিছুই করে না সে। তার পোলা বৃষসেন বরং এই দিন বাপের থাইকা বেশিই কোপায়...

রাত্তির বেলা দ্রোণ দুর্যোধনের কাছে মিনমিন করেন- আমি আগেই কইছিলাম অর্জুন থাকলে যুধিষ্ঠিররে আমি কিছু করবার পারব না। কিন্তু তুমি তো অর্জুনরে যুধিষ্ঠিরের কাছ থিকা সরাইবার কোনো ব্যবস্থা করতে পারলা না।

তাই আবারও কই; কেউ যদি অর্জুনরে যুদ্ধে চ্যালেঞ্জ দিয়া সরাইয়া নিয়া যায়; তাইলে আমি কিন্তু সত্যি সত্যি যুধিষ্ঠিররে ধইরা আনতে পারি...

কথাখান লুইফা নেয় ত্রিগর্তরাজ সুশর্মা আর তার ভাইয়েরা; যারা রাজা বিরাটের গরু চুরি করতে গিয়া পাণ্ডবগো প্যাঁদানি খাইছিল অজ্ঞাতবাসের শেষ দিকে। সুশর্মা কয়- হয় দুনিয়াতে অর্জুন থাকব; না হয় থাকব ত্রিগর্তজাতি; এই পণ করলাম আমরা। আমাগো সংশপ্তক বাহিনী কাইল হয় অর্জুনরে মারব না হয় মরব অর্জুনের হাতে। এইবার বাকিদের আপনেরা সামলান গুরু দ্রোণ...

বারো নম্বর দিনে সংশপ্তক ত্রিগর্ত বাহিনী মাঠের দক্ষিণ দিক থাইকা অর্জুনরে চ্যালেঞ্জ দিয়া বসে। কেউ চ্যালেঞ্জ দিলে যদি না নেওয়া হয় তবে তো মান-সম্মানের বিষয়। অর্জুন কয়- ভাইজান; জানের থাইকা বড়ো মান। আমারে তো এখন যাইতেই হয় ত্রিগর্ত বাহিনীর ডাকে...

যুধিষ্ঠির কয়- তুই যাইতে চাইলে আমার লাইগা একটা ব্যবস্থা কইরা যা; যাতে দ্রোণের খপ্পরে না পড়তে হয় আমার...

অর্জুন পাঞ্চাল বংশীয় সত্যজিৎরে দেখাইয়া কয়- আইজ সত্যজিৎ আপনেরে আগলাইয়া রাখব। আর যদি সত্যজিৎ মইরা যায়; তয় আপনি ভাগল দিয়েন। যা করার বাকিটা করব পরে...

সংশপ্তকরা পুরাটাই ভুজুং। মশামাছির মতো মরতে থাকে অর্জুনের বাণে। তির খাইয়া প্রতিজ্ঞা-টতিজ্ঞা ভুইলা ভাগতে থাকে সুশর্মার বাহিনী সংশপ্তক। পরে এদের সাপোর্ট দিতে পিছে আইসা খাড়ায় কৃষ্ণের কাছ থিকা দুর্যোধনের ভাড়া করা নারায়ণী সেনা। এরাও মরে পঙ্গপালের মতো...

অর্জুন মারতাছে। কিন্তু সংখ্যায় তারা বহু তাই অর্জুনরে ব্যস্তই থাকতে হয় দক্ষিণে। এই সুযোগে দ্রোণ কোমর বাইন্ধা আগান যুধিষ্ঠিরের দিকে। তার লগে আছে দুর্যোধন আর তার ভাইবেরাদর; যাদব বংশীয় কৃতবর্মা; কৃপাচার্য-ভূরিশ্রবা শল্য বিন্দু অনুবিন্দু সুদক্ষিণ অশ্বত্থামা জয়দ্রথ; হাতি বাহিনীসহ ভগদত্ত আর সকলের পিঠ বাঁচাইবার লাইগা সবার পিছে কর্ণ। মানে প্রায় পুরা কৌরব বাহিনী...

দ্রোণ বাহিনীরে পয়লা ঠেকায় ধৃষ্টদ্যুম্ন। আটকাইতে না পারলেও সে দ্রোণের বাহিনী ছত্রভঙ্গ কইরা দেয়। সত্যজিৎ বহুক্ষণ দ্রোণরে আটকাইয়া মইরা গেলে অর্জুনের কথামতো যুধিষ্ঠির পলায়। এর ফাঁকে পাঞ্চাল কেকয় আর মৎস্য যোদ্ধারা দ্রোণরে ঘিরা ধরে। এক পর্যায়ে সাত্যকি চেকিতান ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী সকলেই দ্রোণ বাহিনীর হাতে নাস্তানাবুদ হইতে থাকলে পাণ্ডব বাহিনী শুরু করে যুধিষ্ঠিরের মতো ভাগল। এই দেইখা দুর্যোধন কর্ণরে কয়- পাঞ্চালরা ভাগতাছে। এখন খালি ভীমের ভাগল দিবার বাকি...

কর্ণ কয়- ভুল হিসাব কইরো না দুর্যোধন। মাকুন্দা ভীম মইরা যাইতে পারে; কিন্তু ভাগব না; তারে ডর দেখানোও সম্ভব না। আমাগো বরং দ্রোণরে বাঁচাইবার লাইগা আগানো উচিত। নাইলে সবাই যেমতে তারে ঘিরা ধরছে তাতে দ্বিতীয় সেনাপতিরেও না আইজ তোমার হারাইতে হয়...

দ্রোণরে বাঁচাইতে আগাইল কর্ণ আর দুর্যোধন। অন্য দিকে হাতি বাহিনীসহ ভীমরে আক্রমণ কইরা বসে ভগদত্ত। কুরুক্ষেত্রের সবচে বড়ো হাতি বাহিনী দুর্যোধনের শ্বশুর ভগদত্তের। এই হাতিগুলা বর্মপরা হাতি। তির-বর্শার সামনেও এইগুলা দাবড়াইতে পারে। আর হাতিসোয়ার যোদ্ধার ক্ষেত্রে তির ছাড়া অন্য অস্ত্র প্রায় অচল। দূর থাইকা হাতির ডাক শুইনা অর্জুন কৃষ্ণরে কয়-

ভগদত্তরে থামাইতে না পারলে আইজ হাতি দিয়া পাড়াইয়া সে আমাগো চ্যাপটা কইরা দিব। তুমি ভগদত্তের দিকে রথ ঘোরাও...

সুশর্মা আর সংশপ্তকেরা অর্জুনের পিছু ধাওয়া করলেও সে গিয়া খাড়ায় ভগদত্তের সামনে। অর্জুনরে দেইখা ভীম ছাইড়া ভগদত্ত আগাইয়া যায় অর্জুনের দিকে। অর্জুন না যত কৌশলী যোদ্ধা তার থিকা বড়ো কৌশলী সারথি কৃষ্ণ। ভগদত্ত হাতি নিয়া দাবড়ানি দেয় অর্জুনের রথে। কিন্তু হাতির সুবিধা যেমন তার দৌড়ের গতি আর শইলের ভার; তেমনি তার অসুবিধাও তাই। হাতি একবার দৌড় শুরু করলে তারে সহজে না যায় থামানো; না যায় ঘোরানো। সে এক ধাক্কায় বহুদূর গিয়া আস্তে আস্তে থামে...

হাতির দৌড়ের লাইন ছাইড়া কৃষ্ণ নিয়া অর্জুনরে খাড়া করে ভগদত্তের হাতির পিছনে আর ভগদত্তর হাতি থামবার আগেই তার বিচিতে ঢুইকা যায় অর্জুনের কয়েকটা তির...

হাতির বিচিতে গাঁথে তির; সেই তির নিজের রানে বাড়ি খাইয়া আবার গিয়া গুঁতায় সেই বিচিতেই। এরই মাঝে উথাল-পাতাল হওয়া হাতির সোয়ার ভগদত্ত বর্শার এক নিখুঁত নিশানা কইরা বসে অর্জুনের দিকে। অর্জুন পুরা বেখেয়াল আর অসহায় আছিল এই বর্শায়। কিন্তু আঘাতটা ঠেকাইয়া দেয় কৃষ্ণ তার ঢালে...

ভগদত্তের মাহুত শেষ পর্যন্ত আর হাতি সামলাইতেই পারে না। হাতিটা থামতে গিয়া হুড়মুড় পইড়া গড়াগড়ি খায়। মাটিতে পইড়া ভগদত্ত নিজেরে সামলাইতে হামাগুড়ি দেয় আর অর্জুন কৃষ্ণরে কয়- যুদ্ধ করবা না কইয়া তুমি কিন্তু আবারো যুদ্ধে অংশ নিলা ঢাল ব্যবহার কইরা...

কৃষ্ণ কয়- অংশ না নিলে ভগদত্তের এই বর্শা খাইয়া অতক্ষণে আমারে আর এই প্রশ্ন করার সুযোগ থাকত না তোমার। লও এইবার ভগদত্তরে গাঁথো...

বুকে এক তির খাইয়া দুর্যোধনের শ্বশুর ভগদত্ত আর উঠে না কুরুক্ষেত্রের মাঠে...

কর্ণের কথাই ঠিক। ভীম এখনো একবারের লাইগাও আড়ালে যায় নাই। কর্ণ দুর্যোধন আর অশ্বত্থামা আইসা উপস্থিত হইলে ভীম তাগোরেও আক্রমণ কইরা বসে। এতগুলা বড়ো যোদ্ধার লগে ভীম একলা লড়তাছে দেইখা শেষ পর্যন্ত সাত্যকি নকুল সহদেব আইসা তারে হাত দেয়। এই ফাঁকে ধৃষ্টদ্যুম্ন আবার দ্রোণরে আক্রমণ করে আর একটু পরে দক্ষিণ দিক সাফ কইরা দ্রোণের সামনে আইসা খাড়ায় অর্জুন। অর্জুনরে দেইখা দ্রোণ কর্ণরে ডাকেন অর্জুনরে ঠেকাইতে। কর্ণ অর্জুনরে ঠেকায় কিন্তু তার তিন ভাই মইরা যায় অর্জুনের হাতে। এর ফাঁকে ভীমের গদামে শুইয়া পড়ে আরো কয়জন...

সইন্ধ্যায় দুর্যোধনের ধাতানি খাইয়া কোঁকায় দ্রোণ- কইছিলাম তো যুধিষ্ঠিররে ধইরা আনব। কিন্তু এইটাও তো কইছিলাম যে যদি অর্জুন তার আশেপাশে না থাকে। আইজ তো পিরায় তারে ধইরা ফালাইছিলাম। কিন্তু অর্জুন তো আইসা পড়ল শেষে...

- আপনার মতো যুদ্ধমূর্খরে সেনাপতি করাই ভুল হইছে। আপনার কারিগরি খালি মুখে...

দ্রোণ আরো বহুক্ষণ মিনমিন করে। তারপর আবারও সে পরের দিনের লাইগা প্রতিজ্ঞা ঝালাই করে দুর্যোধনের কাছে। তবে এইবার সে যুধিষ্ঠিররে ধইরা

আনার কথা আর কয় না। কয়- কাইল নিশ্চয়ই পাণ্ডবগো কোনো এক বড়ো বীর ফালামু আমি। এইটা নিশ্চিত। তোমারে কথা দিলাম...

দুর্যোধন খাঁকারি দেয়- পাণ্ডবগো বড়ো বীর তো অর্জুন আর ভীম। অর্জুনরে তো আপনে ডরানই। আর ভীম একলাই তো আইজ আপনাগো সন্ধ্যা পর্যন্ত পিটাইয়া তক্তা বানাইল। ঠিকাছে। দেখি কাইল কী ছিঁড়েন আপনে...

কর্ণ যে দুই দিন ধইরা যুদ্ধে নামছে; সেই দুই দিনই কৃষ্ণ অর্জুনরে দূরে দূরে রাখে। আবার সেনাপতি দ্রোণও কর্ণরে রাখেন সকলের পিছনে পিঠ বাঁচানোর কামে; কারণ পাণ্ডবগো যুদ্ধ পরিকল্পনার কোনো হিসাবই মিলাইতে পারতাছেন না তিনি...

তেরো নম্বর দিনেও অর্জুন দক্ষিণে যায় সংশপ্তকদের লগে যুদ্ধে। পাণ্ডববীর ধরার ফাঁদ বানাইতে দ্রোণ রচনা করেন চক্রব্যূহ। এইটা একটা গাণিতিক হিসাব। কোন দিকে আক্রমণ দেখাইব আর কোন দিকে আক্রমণ শানাইব তা বুঝতে শত্রুরা ধান্দায় থাকে। সামনে আগাইতে আগাইতে সৈনিকরা বহুদূর ঢুইকা যায় কিন্তু মূল আক্রমণটা আসে পিছন কিংবা অন্য অসতর্ক দিক দিয়া। সেনাবিন্যাস দেইখা কৌশল ঠিক করতে হয় চক্রব্যূহ মোকাবেলা করার। এই কামটা খুব ভালো জানে কৃষ্ণ অর্জুন কৃষ্ণের পোলা প্রদ্যুম্ন আর কিছুটা জানে অর্জুন-সুভদ্রার ১৭ বছর বয়সের পোলা অভিমন্যু...

দ্রোণের চক্রব্যূহ দেইখা ঘাবড়ায় যুধিষ্ঠির। অর্জুন দক্ষিণে গেছে; কৃষ্ণও গেছে তার লগে। এখন এই ব্যূহের ফান্দে পইড়া না সকলের প্রাণ যায়। যুধিষ্ঠির দৌড়াইয়া গিয়া অভিমন্যুর হাতে ধরে- আইজ তুই ছাড়া তোর বংশ রক্ষার আর কেউ নাই বাপ...

অভিমন্যু কয়- আমি যাইতে পারি কিন্তু ফান্দে পইড়া গেলে কেমনে এর থাইকা বাইর হইতে হয় সেইটা তো আমার জানা নাই জ্যাঠা...

যুধিষ্ঠির কয়- তুই ভাঙ্গতে পারলেই হবে। তোর পিছে পিছে আমরা গিয়া তোরে সাপোর্ট দিমু...

অভিমন্যু সামনে আর পিছনে বাকি পাণ্ডবেরা- ভীম নকুল সহদেব যুধিষ্ঠির। অভিমন্যু ব্যূহ ভেদ কইরা ঢুইকা পড়ে দ্রোণ সৈনিকের ভিতর; কিন্তু ঠিক তখনই সে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে কাকা-জ্যাঠার বাহিনী থিকা। এইটাই এই ব্যূহের কৌশল। একজন একজন কইরা আটকাইয়া কতল করা। অভিমন্যুরে ব্যূহে ঢোকার সুযোগ দিয়া অগ্রবর্তী দলের জয়দ্রথ বন্ধ কইরা দেয় বাকি পাণ্ডবগো ঢোকার পথ...

ব্যূহের ভিতরে ঢুইকা অভিমন্যু দেখে কৌরবপক্ষের সকল বড়ো যোদ্ধার সামনে সে এক্কেবারে একা। সমানে আক্রমণ করতাছে দুর্যোধন দ্রোণ অশ্বত্থামা কৃপাচার্য কর্ণ শল্য...

শল্য বইসা পড়ে অভিমন্যুর তির খাইয়া। শল্যের ভাই যায় মইরা। এই দেইখা ঘাবড়াইয়া যায় দ্রোণ। কৃপাচার্যের কাছে গিয়া কয়- অর্জুনের পোলাও দেখি অর্জুনের সমান। এরে সামলানোও তো সহজ হইব বইলা মনে হয় না আমার...

দ্রোণের এই কথা কানে যায় দুর্যোধনের। সে কর্ণ আর দুঃশাসনের গিয়া কয়- বুইড়া বামুন ডরাইছে অর্জুনের বাচ্চা পোলারে দেইখা। এরে তোমরা ফালাও...

দুঃশাসন কয়- খাড়াও ভাইজান। আমিই ফালাইতাছি তারে...

কিন্তু অভিমন্যুরে মারতে গিয়া অভিমন্যুর তিরে নিজেই অজ্ঞান হইয়া পড়ে দুঃশাসন। কর্ণ আগাইয়া আইসা কয়েকটা তির খাইয়া আবার পিছায়। দ্রোণ কৃপাচার্য নিজেগো জান বাঁচাইয়া থাকে দুরে...

এর মাঝে অভিমন্যুর হাতে মারা গেছে শল্যের পোলা রুক্মরথ আর দুর্যোধনের পোলা লক্ষণ। নিজের পোলার মরণ দেইখা পাগলা চিল্লান চিল্লাইতে থাকে দুর্যোধন। দুর্যোধনের ধাতানি খাইয়া আবার সকলে আইসা ঘিরা ধরে অভিমন্যুরে; দ্রোণ কৃপ কর্ণ অশ্বত্থামা বৃহদবল আর কৃতবর্মা। এর মাঝেও বৃহদবলরে মাইরা ফালায় অভিমন্যু। দ্রোণ আবারও ডর খায়। কয়- আমার তো মনে হয় আমি অর্জুনরেই দেখতাছি চোখের সামনে। সে কোন দিকে যায় আর কোন দিকে মারে তাই তো ঠাহর করতে পারি না। কর্ণ। তুমি ছাড়া এরে ঠেকাইবার মতো কাউরে দেখি না বাপ। যদি পারো তয় এর হাত থিকা ধনুক ফালাও আর রথ ভাঙ্গো...

কর্ণের তিরে অভিমন্যুর হাত থিকা ধনুক পড়ে। কর্ণ তার সারথি আর ঘোড়া মারে আর তার উপর একলগে তিরাইতে থাকেন দ্রোণ কৃপ অশ্বত্থামা দুর্যোধন শকুনি...

রথ সারথি আর ধনুক হারাইয়া অভিমন্যু তলোয়ার নিয়া খাড়ায়। সেইটাও দ্রোণের তিরে হাত থাইকা ছুইটা গেলে ভাঙ্গা রথের চাকা নিয়া অভিমন্যু

সবাইরে দাবড়ায়। সেইটাও হাত থিকা পইড়া গেলে হাতে নেয় গদা; কিন্তু ততক্ষণে দুঃশাসনের পোলার গদার বাড়িতে মাটিতে গড়ায় সে...

অভিমন্যুরে হারাইয়া কান্দে যুধিষ্ঠির। আর সন্ধ্যায় ফিরা পাগলা হইয়া উঠে অর্জুন। যুদ্ধে এইটা তার দ্বিতীয় পোলার মৃত্যু। এর আগে গেছে ইরাবান। অর্জুনের বিলাপ থামাইতে পারে না কেউ। সকল ভাইরে সে ঝাড়ি লয় তার পোলারে রক্ষা না করার লাইগা। শেষে কৃষ্ণ আইসা তারে ধরে- হাহুতাশ কইরা কী লাভ? দ্রোণের চক্রব্যূহের মূল দারোয়ান তো হইল জয়দ্রথ। সে যদি বাকিদের ঠেকাইয়া না রাখত তবে কি আর অভিমন্যুর এই পরিণতি হইত আইজ?

অর্জুনের সকল রাগ গিয়া পড়ে জয়দ্রথের উপর। সে সকলরে শুনাইয়া কয়- কাইল যদি না সূর্য ডোবার আগে আমি জয়দ্রথরে মারতে পারি তয় আগুনে ঝাঁপ দিয়া নিজে মইরা যামু কইলাম...

অর্জুনের পণ শুইনা ঘাবড়াইয়া যায় জয়দ্রথ। রাত্তিরে দুর্যোধনরে গিয়া কয়- হয় আমারে রক্ষার লাইগা তোমরা একটা ব্যবস্থা করো; নাহয় আমি নিজের দেশে গিয়া পলাইয়া নিজের জান বাঁচাই। কারণ অর্জুন যখন কইছে কাইল আমারে মারব; সে মাইরাই ফালাইব আমারে...

দুর্যোধন কয়- অত ডরাও ক্যান? তুমি নিজেও দ্রোণের শিষ্য আর বহুত বড়ো যোদ্ধা। তার উপরে আমরা তো আছিই তোমার লগে...

দ্রোণ কন- ডরাইও না। আমি কথা দিলাম কাইল আমি তোমারে রক্ষা করব অর্জুনের হাত থিকা। কাইল আমি এমন ব্যূহ বানামু যে অর্জুনের পক্ষে তা ভাইঙ্গা তোমারে ধরা সম্ভব হইব না...

কথাখান কইয়া নিজেই ডর খান দ্রোণ। সেনাপতি হইয়া পয়লা দিন কইছিলেন যুধিষ্ঠিররে ধইরা আনবেন। সেইটা তো পারেনই নাই। শেষ পর্যন্ত তিনি অর্জুনের ১৭ বছরের পোলা মাইরা দুর্যোধনের দুধের স্বাদ ঘোলে মিটাইছেন। এখন যে কইলেন- কাইল অর্জুনের হাত থিকা তোমারে আমি রক্ষা করব। যদি না পারেন?

ইজ্জত বাঁচাইবার লাইগা দ্রোণ নিজের কথার লগে একখান লেঞ্জা জুইড়া দেন- তয় বাপ। জন্মিলে মরিতে হয় এইটা তো জানো। আমরা কেউই বাঁচব না চিরকাল। তাই তোমারে কই; মরণের চিন্তা বাদ দিয়া তুমি যুদ্ধ করো। আমরা তো আছিই। কপালে থাকলে যে কারো মরণ হইতে পারে যেকোনো দিন...

রাত্তিরে অর্জুন ঠান্ডা হইলে কৃষ্ণ কয়- তুমি আমারে না জিগাইয়া বেকুবের মতো যে পণ করলা কাইলই জয়দ্রথরে মারবা না হয় নিজে মরবা। এত বড়ো দুঃসাহস করাটা ঠিক হয় নাই তোমার। কর্ণ ভূরিশ্রবা বৃষসেন কৃপ আর শল্যের মতো যোদ্ধারা আছে জয়দ্রথের লগে। এই অবস্থায় কামটা যদি করতে না পারো তয় সকলে যে আমাগো নিয়া হাসব সেইটা ভাবছ?

অর্জুন কয়- সর্বদাই তোমার পরিকল্পনায় আমি অস্ত্র চালাই কৃষ্ণ। কাইল না হয় আমার অস্ত্র চালানোর লাইগাই তুমি পরিকল্পনা করবা...

পাণ্ডব শিবিরে কারো ঘুম নাই। অর্জুন এমন এক পণ করছে যে; হয় সে কাইল জয়দ্রথরে মারব না হয় নিজে মরব আগুনে ঝাঁপ দিয়া। কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিররে সান্ত্বনা দেয়- আমার উপরে ভরসা রাখেন ভাই। একটা ব্যবস্থা হইব কাইল যাতে সাপ না মরলেও লাঠি থাকে ঠিকঠাক...

কৃষ্ণ পরিকল্পনা শানায়। নিজের চ্যালাগো ডাক দিয়া কয়- চাইর ঘোড়া জুইড়া আমার রথ রেডি রাখো সকল অস্ত্র বোঝাই দিয়া। দরকার পড়লে কাইল নিজেই চালামু অস্ত্র আমি...

চৌদ্দ নম্বর দিনের সকালে জয়দ্রথরে দ্রোণ রাখেন সকলের পিছে। হাতি বাহিনী নিয়া সবার আগে অর্জুনের সামনা-সামনি হয় দুর্যোধনের ভাই দুর্মর্ষণ। সেইটারে সরাইয়া অর্জুন মোকাবেলা করে দুঃশাসনের। মাইর খাইয়া দুঃশাসন দ্রোণের শরণে গেলে অর্জুন আইসা তারে সেলামালকি দেয়- পেন্নাম গুরুদেব। আপনে আমার কাছে ভগবানের সমান। আমার পণ রক্ষায় আপনে আমারে আশীর্বাদ করেন...

অর্জুনের কথায় দ্রোণ হাসেন- তেলাইয়া পার পাইবা না অর্জুন। আমারে না মাইরা কিন্তু জয়দ্রথরে ছুঁইতে পারবা না তুমি...

অর্জুন শুরু করে দ্রোণেরে মারা। কৃষ্ণ কয়- খামাখা সময় নষ্ট করো ক্যান? ইনারে ফালাইবা না যখন তখন তিরাতিরি বন্ধ করো তার লগে...

কৃষ্ণ রথ সরাইয়া নেয়। পিছন থাইকা দ্রোণ টিটকারি মারেন- অর্জুন কি ভাগতাছে দ্রোণাচার্যের ডরে?

যাইতে যাইতে অর্জুন কয়- গুরুরে জয় করা যেমন গৌরবের কিছু না; তেমনি গুরুর সামনে থাইকা ভাগাও কিন্তু লজ্জার কিছু না গুরুদেব...

কৃষ্ণ এইবার দেখায় তার রথ চালানোর আশ্চর্য কৌশল। সকলের ফাঁকে-ফোঁকরে সে প্রায় গিয়া খাড়ায় জয়দ্রথ বাহিনীর সামনে। দুর্যোধন দৌড়ায় দ্রোণের নিকট- খাড়াইয়া করেনটা কী আপনে? আমি তো বিশ্বাসই করতে

পারতাছি না যে আপনে জীবিত থাকতে অর্জুন আপনার পাশ কাটাইতে পারে। আমার তো মনে হইতাছে আপনি আমার কাছ থিকা মোটা বেতন নেন আর কাম করেন পাণ্ডবগো। ভুলটা আমারই হইছে। জয়দ্রথ যখন পলাইতে চাইছিল তখন আপনার মতো বেইমানের ভরসাতেই আমি তারে কুরুক্ষেত্রে রাখছি...

দ্রোণ শুরু করেন অজুহাত- বাপ তুমি আমার কাছে আমার পোলা অশ্বত্থামার মতো। তোমার কাছে সত্য কইতে শরম নাই। তুমি নিজেই তো জানো যে কৃষ্ণের থাইকা বড়ো সারথি এইখানে কেউ নাই। তুমি তো নিজেই দেখছ যে আমি যখন তির ছাড়ি অর্জুনরে গাঁথার লাইগা; আর সেই তির যখন গিয়া মাটিতে পড়ে তখন কৃষ্ণের ঘোড়া দাবড়ানির কারণে অর্জুন থাকে তির থাইকা একশো হাত দূরে। তিরের মুখ তো আর ঘোড়ার মতো মাঝপথে বদলান যায় না বাপ। তাছাড়া আমার যা বয়স; আমি কেমনে অর্জুনরে ধাওয়া করি বলো?

এই সব অজুহাতে দুর্যোধন আবার ধাতানি লাগায়। এইবার দ্রোণও একটু গরম দেখান- শোনো। আমি কিন্তু অর্জুনের বিষয়ে তোমারে কোনো দিনও কোনো কথা দেই নাই। আমি তোমারে কথা দিছি যুধিষ্ঠিররে ধইরা দিবার বিষয়ে। এখন যুধিষ্ঠিররে বাদ দিয়া তোমার কথামতো আমি অর্জুনের পিছে ধাওয়া দিতে পারি না। আমি আমার পণ রক্ষা করতে গেলাম। তুমি নিজে গিয়া অর্জুনরে ঠেকাও...

দ্রোণ ভাগল দিতে চান। দুর্যোধন গিয়া তার সামনে খাড়ায়- তিরন্দাজ হইয়া আপনে অর্জুনরে ঠেকাইতে পারেন না; আর আমারে কেমনে কন গদা নিয়া গিয়া তিরন্দাজ ঠেকাও?

দ্রোণ এইবার একটা বর্ম আগাইয়া দেন দুর্যোধনের দিকে- এই বর্ম পইরা তুমি অর্জুনের সামনে খাড়াও। কারো তিরই এই বর্ম ভেদ করতে পারব না। এর বেশি তোমারে কোনো সাহায্য আমি করতে পারব না বাপ। আমারে মাফ কইরা দেও...

সূর্য প্রায় ডুবু ডুবু। কৃষ্ণ-অর্জুন এখনো জয়দ্রথরে ধরতে পারে নাই। অর্জুন কৃষ্ণরে কয়- ঘোড়াদের পেটে দানাপানি নাই। একটু থামা দরকার। আমারও কিছু দানাপানি খাওয়া লাগে...

কাদা খুঁইড়া অর্জুন পানি বাইর কইরা খায়। কৃষ্ণ ঘোড়াদের দানাপানি দেয়। কিছু বিশ্রাম কইরা আবার রওনা দেয় তারা। এইবার তারা সামনে জয়দ্রথরে দেখে। কিন্তু পথ আগলায় দুর্যোধন। কৃষ্ণ কয়- বাদ দেও জয়দ্রথ। পালের গোদারে যখন পাওয়া গেছে তখন দুর্যোধনেরই পাড়ো এইবার...

দুর্যোধনরে তির মারতে গিয়া অর্জুন তার বর্মটা চিনতে পারে- এইটা গুরু দ্রোণ দুর্যোধনরে দিছেন। এই জাতের বর্ম অর্জুনও বান্ধে। এই বর্মে তির বিন্ধানো কঠিন। কিন্তু দুর্যোধন জীবনের পয়লা দিন বানছে বইলা বান্ধনে কিছু ফাঁক রইয়া গেছে। অর্জুন কয়- অসুবিধা নাই। এরেই তবে ধরি এইবার...

অর্জুনের তিরে দুর্যোধনের হাত থিকা ধনুক পড়ে। বর্মের চিপা দিয়া কিছু তির বিন্ধে তার দেহে। দুর্যোধনের ঘোড়া আর সারথি মরে। এমন সময় দুর্যোধনরে কভার দিতে আইসা খাড়ায় কর্ণ ভূরিশ্রবা কৃপ আর শল্য। অর্জুন বেকায়দা দেইখা বাজায় তার দেবদত্ত শঙ্খ। কৃষ্ণও বাজাইতে থাকে তার পাঞ্চজন্য শঙ্খ পাণ্ডবগো সাহায্যের আশায়...

এর মাঝে অন্য মাঠে অলম্বুষরে মাইরা ফালাইছে ভীমের পোলা ঘটোৎকচ। দ্রোণ তিরাতিরি করেন পাঞ্চাল বাহিনীর লগে। এমন সময় অর্জুন আর কৃষ্ণের শঙ্খ শুইনা যুধিষ্ঠির সাত্যকিরে কয়- তোমার দুই গুরু অর্জুন আর কৃষ্ণ বিপদে আছে। তুমি ছাড়া তাগোরে রক্ষার কেউ নাই...

সাত্যকি কয়- আমি সইরা গেলে কিন্তু দ্রোণ আপনেরে বন্দি কইরা ফালাইতে পারে...

যুধিষ্ঠির কয়- তুমি যাও। আমি গিয়া ভীম আর ঘটোৎকচের বগলে খাড়াইলে দ্রোণের সাহস হইব না কিছু করার...

দ্রোণ আগান না যুধিষ্ঠিরের দিকে। তিনি গিয়া সাত্যকির সামনে খাড়ান- তোমার গুরু অর্জুন তো আমার সামনে থাইকা পলাইছে। আশা করি তুমিও পলাইতে চাইবা না ডরে...

সাত্যকি দ্রোণরে পাশ কাটাইতে গেলেও তিনি তারে আক্রমণ কইরা বসেন। সাত্যকি থামে না। যাইতে যাইতে তির মাইরা দ্রোণের ঘোড়া আর রথের সারথিরে ফালাইয়া আগাইবার আগে কয়েকটা তির বিন্ধাইয়া দেয় দ্রোণের শরীরে। দ্রোণ ফিরা যান শরীরের ক্ষত মেরামত করতে। আর সাত্যকি আগায় অর্জুনের দিকে...

রাস্তায় দুর্যোধন বাহিনীরে নাস্তানাবুদ কইরা আগায় সাত্যকি। তার দাপট দেইখা দুঃশাসন আইসা দ্রোণের বগলে খাড়ায়। দ্রোণ কন- কও তো জয়দ্রথ কি জীবিত আছে এখনো? তা তুমি ভাইগা আইলা ক্যান? পাশা খেলার

আসরে তুমি না কইছিলা পাণ্ডবরা সব নপুংসক? তোমার সেই লাফানি এখন কই?

দ্রোণের খোঁচায় দুঃশাসন আবার সাত্যকির পিছু নিয়া মাইর খাইয়া দেয় আরেকটা ভাগল...

সন্ধ্যার আগে দ্রোণের হাতে মরে কেকয় রাজের পোলা বৃহৎক্ষেত্র; শিশুপালের পোলা ধৃষ্টকেতু আর ধৃষ্টদ্যুম্নের পোলা ক্ষত্রধর্মা। কৃষ্ণ আর অর্জুনের কোনো সাড়াসংবাদ না পাইয়া যুধিষ্ঠির ভীমরে কয়- আমার কেমন যেন সন্দেহ হয়। তুই গিয়া দেখ কী হইতাছে ওই দিকে এখন...

ভীম কয়- অর্জুনের লগে যতক্ষণ কৃষ্ণ আছে ততক্ষণ ডরের কিছু নাই তবুও যখন কইতাছ তখন আমি যাই...

দ্রোণ পাহারা দিতাছেন কোন সময় যুধিষ্ঠিররে একলা পাওয়া যায়। সামনে আগানও না; আবার সরেনও না। তার সামনে দিয়া যখন ভীম যাইতেছিল একটা তির ছুঁইড়া তিনি তারে নাড়ান- অর্জুন ভাগছে ডরাইয়া। আশা করি আমার ডরে তুমিও ভাগবা না ভীম?

মুখ না খুইলা হাত চালায় ভীম। তার গদামে দ্রোণের ঘোড়া আর সারথি মইরা গেলে তিনি নিজে মাটিতে লুটান। ভীম গিয়া খাড়ায় তার সামনে- আমি অর্জুনের মতো ভদ্দরলোক কিংবা দয়ালু কোনোটাই না। তোর মতো ছোটলোক বামনারে সম্মান দেখানোর ঠেকাও আমার নাই। আমি গেলে তোরে মাটিতে পুঁইতাই অন্য দিকে যামু...

ভীমরে গদা উঠাইতে দেইখা পড়িমরি দৌড়াইয়া আরেকটা রথে উইঠা নিজের জান বাঁচান দ্রোণ- বাপরে। মাইজা পোলাটারে আদব-কায়দা কিছুই শিখায় নাই কুন্তী...

রাস্তায় ভীমের হাতে মরে ধৃতরাষ্ট্রের আরো তিন পোলা; বিন্দু অনুবিন্দু আর সুবর্মা। কিছুদূর আগাইয়া অর্জুন আর কৃষ্ণরে অক্ষত দেইখা শঙ্খ বাজাইয়া যুধিষ্ঠিররে কুশল সংবাদ দেয় ভীম; কৃষ্ণ অর্জুনও শঙ্খ বাজাইয়া সংবাদ দেয় তাগো অক্ষত দেহে বাঁইচা থাকার...

দুর্যোধন আবার দৌড়াইয়া আসে দ্রোণের কাছে- গুরুদেব। পয়লা অর্জুন আপনেরে অতিক্রম কইরা গেলো। তারপর গেলো সাত্যকি। এখন দেখি ভীমরেও আপনে ঠেকাইতে পারলেন না। আপনে তো দেখি কোনো কামেরই না...

দুর্যোধনের কথায় দ্রোণ আবোল-তাবোল বকতে শুরু করেন- আমি আর কী করব? শকুনির বুদ্ধিতে তুমি যদি পাশা না খেলতা; নিজের কাকাতো ভাইগো লগে যদি যুদ্ধে না জড়াইতা তাইলে আইজ আর এই দশা হইত না...

ধুর্বাল বইলা দুর্যোধন আবার ছোটে জয়দ্রথরে বাঁচাইতে...

রাস্তায় কর্ণরে দেইখা ভীম পাশ কাইটা যায়। কর্ণ তারে ডাকে- তোমার সম্পর্কে জীবনেও যা কেউ কল্পনা করে নাই আইজ তুমি তাই করলা ভীম। শত্রুরে ডরাইয়া পাশ কাইটা গেলা...

একমাত্র কর্ণরেই ডরায় ভীম। বনবাসের তেরো বছর যতবারই ভীম বন থিকা বাইর হইয়া হস্তিনাপুর আইসা মারামারি করতে চাইছে। ততবারই যুধিষ্ঠির কর্ণের ডর দেখাইয়া তারে ঠেকাইছে। কিন্তু এত বড়ো কথার পর ভীমের পক্ষে সইরা যাওয়া কঠিন। ভীম ফিরা আইসা ধুমা তির চালাইতে থাকে কর্ণের দিকে। কর্ণ বেশ মজা পায়- গদারু মানুষ হইলেও তুমি দেখি ভালোই তির চালাইতে পারো...

কর্ণ ভীমরে মারে না। খালি তার মাইর ঠেকায় আর তারে নিরস্ত্র করে; কর্ণ ভীমের হাত থিকা ধনুক ফালাইয়া দেয় তির মাইরা। রথের ঘোড়া মারে। ভীম রথ ছাইড়া ঢাল তলোয়ার নিয়া আগাইয়া আসে কর্ণের দিকে। কর্ণ ভীমের ঢাল ভাইঙ্গা ফালায়। ভীম খেইপা তলোয়ার ছুঁইড়া মাইরা কর্ণের হাত থিকা ধনুক ফালাইয়া দেয়। কর্ণ আরেকটা ধনুক তোলে। ভীম এইবার গিয়া মরা হাতি আর ভাঙ্গা রথের আড়ালে লুকাইয়া রথের টুকরা টাকারা ছুঁইড়া মারে কর্ণের দিকে। কর্ণ কয়েকটা তির মাইরা ভীমরে কাবু কইরা সামনে গিয়া ধনুকের আগা দিয়া তার পেটে গুঁতা মাইরা হাসে- মাকুন্দা বৃকোদর। খালি যুদ্ধ করার লাইগা ফাল পাড়লেই হয় না; যুদ্ধ জানাও লাগে...

ভীম বেকুব বইনা যায়। কর্ণ তারে মারে না ক্যান? ভীম হা কইরা তাকাইয়া থাকে। কর্ণ হাসে- যাও। কৃষ্ণ আর অর্জুনরে সাহায্য করতে আসছিলা হয় সেইখানে যাও; অথবা বাড়ি ফিরা যাও; যুদ্ধক্ষেত্রে তোমার থাকার দরকার নাই...

ভীমের আঁতে লাগে। কয়-ছোটলোকের বাচ্চা আমারে দয়া দেখাইতে হবে না তোর। হয় মার না হইলে আমার লগে মল্লযুদ্ধ কর। তোরে দেখাইতাছি আমি লড়াই জানি কি না...

কর্ণ হাসে- সেইটাও একটা কথা। আমার মতো বড়ো যোদ্ধার লগে যেমন তোমার মতো নাদানের যুদ্ধ করা ঠিক না। তেমনি আমার মতো ছোটলোকের লগেও কিন্তু তোমার মতো রাজপুত্তুরের লড়াই করা মানায় না...

ভীম আবারও হা কইরা থাকে। অর্জুনের চোখে পড়ে ভীমের কাছে কর্ণ। অর্জুন তাড়া দিয়া আসে কর্ণের দিকে। ভীম সইরা গিয়া সাত্যকির রথে উঠে। কর্ণ গিয়া খাড়ায় দুর্যোধনের কাছে...

ভীমরে অর্জুনের কাছে রাইখা আসার পথে সাত্যকি মুখোমুখি হয় ভূরিশ্রবার। ভূরিশ্রবা সাত্যকিরে মাটিতে পাইড়া ফালায়। তারে লাইত্থাইতে লাইত্থাইতে এক হাতে চুলের মুঠা ধইরা আরেক হাতে তলোয়ার তোলে মাথা নামাইতে। ঠিক তখনই কৃষ্ণের চোখে পড়ে সাত্যকির দুরবস্থা। কৃষ্ণ অর্জুনরে কয়- সাত্যকিরে বাঁচাও...

অর্জুনের তির আইসা বিঁধে তলোয়ার ধরা ভূরিশ্রবার হাতে। তলোয়ার পইড়া যায়। ভূরিশ্রবা অর্জুনের দিকে তাকায়- খুব বাজে কাম করলা অর্জুন। জাউরা যাদবের কথায় যুদ্ধের নিয়ম লঙ্ঘন করলা তুমি। আরেকজনের লগে যুদ্ধ করা কারো উপর আক্রমণ করা যুদ্ধ নিয়মে নিষেধ...

ভূরিশ্রবা অর্জুন আর কৃষ্ণরে গালাগালি করতে ব্যস্ত এরই মধ্যে সাত্যকি উইঠা যে অস্ত্র ভূরিশ্রবার হাত থিকা পড়ছিল সেইটা তুইলাই ভূরিশ্রবার মাথাটা আগলাইয়া ফালায়। আশপাশে সকলে হায় হায় কইরা উঠে- যুদ্ধ নিয়মের আরেকখান লঙ্ঘন; গালাগালিরত কাউরে অস্ত্র দিয়া আঘাত করতে নিষেধ কইরা দিছেন দ্বৈপায়ন...

সাত্যকি কয়- যেকোনো উপায়ে শত্রু কমানোই যুদ্ধের সব থিকা বড়ো নিয়ম...

সূর্যাস্তের আর সামান্য বাকি। দুর্যোধন কর্ণরে কয়- আরো কিছুক্ষণ যদি অর্জুনরে ঠেকানো যায় তবে তার প্রতিজ্ঞা বিফলে যাবে আর তারে গিয়া ঢুকতে হবে আগুনে...

সাত্যকি ভীম অর্জুন। তিন বাহিনীর আক্রমণে বেসামাল হইয়া উঠে কুরু সেনাসৈনিক। অর্জুন পৌঁছাইয়া যায় জয়দ্রথের কাছে। জয়দ্রথের সারথি আর ঘোড়া মইরা গেলে জয়দ্রথ পলাইতে থাকে। পলাইতে পলাইতে গিয়া সে হাজির হয় তার পিতা বৃদ্ধক্ষত্রের আশ্রমে। বৃদ্ধক্ষত্র নিজের পোলারে রাজ্য দিয়া বহু দিন থাইকাই কুরুক্ষেত্রের পাশে সামন্তপঞ্চকে ব্রহ্মচর্য জীবন যাপন করেন। অর্জুন আর কৃষ্ণও পিছু নেয় জয়দ্রথের। এর মধ্যে সূর্য ডুইবা যায়। সূর্য ডুইবা গেছে তাই এখন অর্জুনের আগুনে ঝাঁপ দিয়া নিজের জীবন শেষ করার পালা। দুর্যোধনের বাহিনী গা ঢিলা দিয়া হাসাহাসি করে- জয়দ্রথ বাঁইচা গেলো। চলো এখন গিয়া দেখি অর্জুন কেমনে আগুনে ঝাঁপ দিয়া মরে...

পাণ্ডব বাহিনীও যুদ্ধ শেষের আড়মোড়া ভাঙ্গে। অর্জুন ধনুক নামায়। জয়দ্রথ ভালো কইরা আকাশে দেখে সূর্যের কোনো চিহ্ন আছে কি না। নাই। সূর্য ডুইবা গেছে। অর্জুনের প্রতিজ্ঞা বিফলে গেছে তাই অর্জুনও অস্ত্র নামাইয়া ফালাইছে। এখন আর তার প্রাণের ভয় নাই। নিশ্চিন্ত জয়দ্রথ এইবার আইসা খাড়ায় পিতা বৃদ্ধক্ষত্রের আশ্রমের আঙ্গিনায়। আর তখনই আশ্রমের বাইরে ঘাপটিমারা কৃষ্ণ অর্জুনের কানে কানে কয়- গাঁথো হালারে...

অর্জুনের তিরে ভ্যাবাচেকা জয়দ্রথ লুটাইয়া পড়ে ব্রহ্মচারী বাপের সামনে আর পোলার এমন মৃত্যুতে হার্ট অ্যাটাক কইরা বাপ বৃদ্ধক্ষত্র লুটাইয়া পড়েন পোলা জয়দ্রথের পাশে...

অর্জুন কইছিল জয়দ্রথরে মারব সূর্য ডোবার আগে। কিন্তু জয়দ্রথ মরল সূর্য ডোবার পরে। সকলেই কানাঘুসা করে। কেউ মাঠ ছাইড়া যায় না। দুর্যোধন খেইপা উঠে দ্রোণের উপর- আপনে না আছিলেন সকলের সামনে। আপনের না কথা আছিল পাণ্ডবগো ঠেকাইবার। গত কাইল আপনের বাহাদুরি সফল করার লাইগা পাণ্ডবগো যে জয়দ্রথ একলাই আটকাইয়া রাখল ব্যূহের বাইরে; আইজ তারেই রক্ষা করতে পারলেন না আপনে। আমার কপালটাই খারাপ। যারে আমি বিশ্বাস কইরা সেনাপতি বানাই সেই আমার লগে বেইমানি করে। পিতামহ ভীষ্ম আমার সেনাপতি হইয়া পাণ্ডবগো লগে দয়ার যুদ্ধ কইরা গেছেন। আপনেও অর্জুন ভীম আর সাত্যকিরে ডরাইয়া জয়দ্রথরে খুন করাইলেন আইজ...

দ্রোণ এইবার পাল্টা খোঁচা মারেন- খালি আমার উপরে দোষ চাপাও ক্যান? আমি তো বরাবরই কই যে অর্জুনের লগে পাইরা উঠা সম্ভব না আমার পক্ষে। কিন্তু আইজ তো তুমি কৃপ কর্ণ শল্য অশ্বত্থামা সকলেই জয়দ্রথের পাশে ছিলা; তোমরা কেন পারলা না অর্জুনরে ঠেকাইতে? কৃষ্ণ আর অর্জুন যেভাবে যুদ্ধ করে; জয়দ্রথ ক্যান; এখন তো নিজের জানের লাইগাও ডর লাগে আমার...

- আপনে এতটা অকর্মা আর কাপুরুষ তা আমি জানতাম না গুরুদেব...

দুর্যোধনের এই কথায় আবার খেইপা উঠেন দ্রোণ- রাত্তিরেও যুদ্ধ হবে আইজ। আমি কথা দিলাম; সমস্ত পাণ্ডবসেনা ধ্বংস না কইরা বর্ম খুলব না আমি...

দুর্যোধন কয়- রাত্তিরে যুদ্ধ করতে চান করেন। কিন্তু বড়ো গপ্প আর দিয়েন না। পয়লা দিন কইছিলেন যুধিষ্ঠিররে ধইরা আনবেন; তার বালও ছিঁড়তে পারেন নাই এত দিনে। তার উপরে আপনি সেনাপতি হইবার পর থাইকাই আমার বড়ো বড়ো যোদ্ধাগুলারে হারাইতাছি আমি...

দ্রোণ বাইরাইয়া যান সৈন্যসমাবেশ করতে। দুর্যোধন কর্ণরে কয়- আমার নিজের কাছে নিজেরেই পাপী মনে হইতেছে এখন। জয়দ্রথ আমার ছোট বইনের স্বামী। প্রাণ রক্ষার লাইগা সে পলাইতে চাইছিল। কিন্তু এই দ্রোণের উপর ভরসা কইরাই আমি নিজের বইনরে বিধবা করলাম। কর্ণরে; বিশ্বাসঘাতক সেনাপতির দল নিয়া এই জগতে আমার মতো আর কেউ যুদ্ধ করছে জানি না। কিন্তু একটা কথা তোমারে কইয়া দেই; কেউ না থাকলেও আমি কিন্তু যুদ্ধ কইরা যামু...

কর্ণ দুর্যোধনরে সান্ত্বনা দেয়। গুরু দ্রোণরে আর কিছু কইও না তুমি। তিনি যুদ্ধ করতাছেন ঠিক। কিন্তু বয়স্ক মানুষ; নড়তে চড়তে কষ্ট হয় তার; অস্ত্র চালাইতেও হাতে জোর পান না। যুদ্ধে তার অভিজ্ঞতাও নাই। তার পক্ষে পাণ্ডবগো জয় করা কোনো দিনও সম্ভব না। আর জয়দ্রথের পুরা বিষয়টাই কৃষ্ণের চাল। সূর্য থাকা পর্যন্ত আমরা কিন্তু অর্জুনরে ঠিকই ঠেকাইয়া রাখছিলাম। সূর্য ডোবার পর জয়দ্রথও নিশ্চিন্ত হইয়া বাইরাইয়া আসছিল বাপের আশ্রমের আঙিনায়। কিন্তু কৃষ্ণ যে সূর্য ডোবার পরেও অর্জুনরে দিয়া জয়দ্রথরে হত্যা করাইব ঘুণাক্ষরেও কেউ তা অনুমান করতে পারে নাই। সূর্য ডোবার পরে আমরা সকলেই ঢিলা দিছিলাম। আর সেই সুযোগটাই নিছে কৃষ্ণ...

রাত্তিরের যুদ্ধে ভূরিশ্রবার বাপ সোমদত্ত পুত্র হত্যার প্রতিশোধ নিতে আইসা আক্রমণ করে সাত্যকিরে। কিন্তু উল্টা তির খাইয়া ভাগতে হয় তার। অশ্বত্থামার হাতে মারা যায় ভীমের নাতি আর ঘটোৎকচের বড়ো পোলা অঞ্জনপর্বা। পোলার মৃত্যুসংবাদ শুইনা অশ্বত্থামার উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে ঘটা। অবস্থা বেগতিক দেইখা অশ্বত্থামা কয়- বাপ ঘটোৎকচ। আমি তোমার পিতার সমতুল্য; তোমার বাপ ভীম আমার থাইকা আট বছরের ছোট। তোমার লগে আমার যুদ্ধ করা ঠিক না; তুমি সম্পর্কে আমার ভাতিজা হও...

এই সব ভুজুং আটকাইয়া রাখতে পারে না ঘটোৎকচরে। সে হামলাইয়া পড়ে অশ্বত্থামার উপর। সোমদত্ত আবার ফিরা আইসা একই সাথে পইড়া যায় ভীম আর সাত্যকির সামনে। ভীমের গদাম আর সাত্যকির তিরে তারে আর উইঠা খাড়াইতে হয় না যুদ্ধের মাঠে। এরপরে সোমদত্তের বাপ বাহ্লীকরাজ আগাইয়া আসলে ভীমের এক গদামেই তার যুদ্ধের শখ মিটা যায়...

কুরু সেনাদের অবস্থা খুবই খারাপ। দুর্যোধন কর্ণের কাছে যায়- দোস্ত তুমি ছাড়া আমার সৈনিকদের রক্ষা করার কেউ নাই...

কর্ণ কয়- আমি জীবিত থাকতে তোমার চিন্তিত হইবার কোনো কারণ নাই...

কর্ণের কথা শুইনা কৃপাচার্য হাসেন- হালা গাড়োয়ানের পুত। তোমার খালি মুখে মুখেই ভড়ং। যাও না। পাণ্ডবগো সামলাইয়া দেখাও একবার...

কর্ণও খেইপা উঠে- অক্ষম ব্রাহ্মণ। বাজে কথা কইলে জিব কাইটা ফালামু কইলাম...

তারপর আবার দুর্যোধনের দিকে ফিরে- এই আরেকটা কালসাপ পুষতাছ তুমি। খায় তোমার আর গান গায় পাণ্ডবগো...

কৃপাচার্য হইল গিয়া অশ্বত্থামার মামা। ঘটোৎকচের হাত থাইকা পলাইয়া অশ্বত্থামা আসছিল বিশ্রাম করতে। মামারে কর্ণ এমন গালাগালি করতাছে দেইখা তলোয়ার নিয়া কর্ণের দিকে ধাওয়া করে অশ্বত্থামা- তুই হইলি গিয়া এক নম্বর অক্ষম। খালি নিজের ভড়ঙ্গে দুনিয়ায় আর কাউরে চোখে পড়ে না তোর। অর্জুন যখন তোর সামনে জয়দ্রথরে মারল তখন তোর ভড়ং কই আছিল? মামায় তো ঠিকই কইছে; পাণ্ডবগো লগে লড়েতে গেলে তোর নিজের গু নিজেরই খাইতে হবে। আইজ তোর ভড়ং ছাড়ামু আমি...

দুর্যোধন আর কৃপাচার্য অশ্বত্থামারে আটকান। দুর্যোধন কয়- তোমরা যদি নিজেরা মারামারি করো তয় আমি কার উপর ভরসা করি কও...

কৃপাচার্য কর্ণের দিকে ফিরেন- খালি দুর্যোধনের লাইগা আমরা তোমারে ক্ষমা কইরা দিলাম। তয় কইয়া দেই তোমার ভড়ং কিন্তু অর্জুনেই ভাঙ্গব...

অশ্বত্থামা দুর্যোধনরে কয়- আমি বাঁইচা থাকতে তোমার চিন্তার কিছু নাই। আমিই অর্জুনরে ঠেকাইয়া রাখব...

দুর্যোধন কয়- গুরু দ্রোণ পাণ্ডবগো এড়াইয়া চলেন। তুমিও তাই করো। এখন কেমনে কও তোমার উপর ভরসা করি?

অশ্বত্থামা কয়- বাদ দেও পিছনের কথা। এখন দেখো কী করি না করি...

সন্ধ্যা শেষ হইয়া অনেক অন্ধকার। তবুও যুদ্ধ থামে না। দুর্যোধন আর যুধিষ্ঠির দুইজনই নিজেগো অর্ধেক পদাতি সৈন্যের হাতে মশাল ধরাইয়া দেয় শত্রুমিত্র চিনা যুদ্ধ করার লাইগা। প্রত্যেকটা হাতির পিঠে সাতটা; রথের উপর দশটা ঘোড়ার উপর দুইটা আর সৈনিকদের সামনে-পিছনে দেওয়া হইল দরকারমতো মশাল...

যুদ্ধের আগামাথা কেউ ঠাহর করতে পারে না। কোথাও পাণ্ডবরা দাবড়ায়। কোথাও কৌরবরা। সৈনিক আর বীরেরা নিজেগো নাম উচ্চারণ কইরা শত্রুর উপর আক্রমণ শানাইতে থাকে। অর্জুনের পাগলা তিরে কৌরবরা দিশাহারা হইয়া পলায়। দুর্যোধন দৌড়াইয়া গিয়া দ্রোণের সামনে খাড়ায়- আপনি আরেকটা ফাউল ভড়ং দেখাইতে আইজ রাত্তিরে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিছেন। এখন

পাণ্ডবগো মাইর খাইয়া আমার সেনারা পলাইতাছে আর আপনে খাড়াইয়া তামাশা দেখতাছেন...

কর্ণও শুরু করে পাগলা তির। কর্ণের তিরে পাণ্ডবরা ভাগতে থাকলে যুধিষ্ঠির গিয়া অর্জুনরে ধরে- ওই দিকে কর্ণ আমার সবগুলা সৈনিক সাফ কইরা ফালাইতাছে আর তুমি এইখানে বইসা তিরাতিরি করতাছ। যাও গিয়া কর্ণরে ঠেকাও...

জয়দ্রথরে মারার সিদ্ধান্ত ছাড়া আর কোনো সিদ্ধান্তই অর্জুন নেয় না কৃষ্ণরে না জিগাইয়া। যুধিষ্ঠিরের কথা শুইনা অর্জুন কৃষ্ণের দিকে তাকায়- কৃষ্ণ। আমাগো মনে হয় কর্ণের সামনে যাওয়া উচিত...

কৃষ্ণ নড়ে না। কয়- কর্ণের সামনে তোমার যাওয়া ঠিক হইব না অর্জুন। কর্ণের ধনুক সাড়ে চাইর হাত; তোমার ধনুক থাইকা আধা হাত লম্বা। তার তিরও তোমার তির থাইকা বেশি দূর যায়। অন্য যেকোনো ভয়ংকর অস্ত্রেও কর্ণ বহুত কঠিন যোদ্ধা। তাছাড়া এই যুদ্ধে কর্ণ এখনো অক্ষত আছে। কর্ণের সামনে তোমার যাওয়া ঠিক না। কর্ণের সামনে ঘটোৎকচরে পাঠানো দরকার এখন। সে রাত্তির কালে যুদ্ধে যেমন এক্সপার্ট তেমনি গায়ের শক্তি আর অস্ত্র চালনায়ও কর্ণরে ঠেকাইয়া রাখার মতো। তুমি থাকো...

কৃষ্ণ ঘটোৎকচরে গিয়া ফুলায়- তুমি ছাড়া কর্ণরে ঠেকাইবার মতো আমাগো পক্ষে আর কেউ নাই বাপ। তুমি ভীষ্ম দ্রোণ অশ্বত্থামা ভগদত্ত দুর্যোধন শল্য সবাইরে দাবড়াইছ; খালি বাকি আছে কর্ণ। এইবার তোমার কর্ণরে থাবড়ানির পালা...

অর্জুন কয়- হ ভাতিজা। আমার মতেও এই যুদ্ধে তুমি তোমার বাপ ভীম আর সাত্যকিই হইলা গিয়া সব থিকা বড়ো বীর। আর রাত্তিরের যুদ্ধে তোমার উপ্রে কেউ নাই। তুমি কর্ণের দিকে আগাইয়া যাও। সাত্যকি পিছন থাইকা তোমারে হাত দিব...

ঘটোৎকচ একটা হাসি দেয় কৃষ্ণের দিকে- কাকা অর্জুনরে কর্ণ থিকা দূরে রাখতে চাও কাগু? অসুবিধা নাই। যদি মরি তয় ছুডু মারে গিয়া কইবা; ঘটোৎকচ নাদানের মতো বেঘোরে খুন হয় নাই। যুদ্ধ কইরা মরছে সব থিকা বড়ো যোদ্ধার লগে...

ঘটোৎকচ যাইবার আগে অর্জুনের সামনে খাড়ায়- যদি মইরাও যাই তবু নিশ্চিন্ত থাইকো কাকু। কর্ণরে ঘায়েল না কইরা মরব না আমি...

ঘটারে নিয়া দুর্যোধনের চিন্তার সীমা নাই। দুর্যোধনের পক্ষে বড়ো হড় যোদ্ধা আছিল অলম্বুষ। আজকেই ঘটা তার কম্ম সাবাড় কইরা দিছে। এখন যখন সে কর্ণের দিকে আগাইতে গেলো তখন আরেক হড় যোদ্ধা অলায়ূধরে দুর্যোধন পাঠায় ভীমেরে আক্রমণ করতে; যাতে বাপেরে বাঁচাইতে ঘটা ব্যস্ত হইয়া কর্ণ বাহিনী থাইকা দূরে থাকে। কিন্তু ভীমের কাছে পৌঁছাইবার আগেই ঘটা অলায়ূধের মাথা কাইটা ফিকক‍া ফালায় দুর্যোধনের সামনে। ঘটার আক্রমণে কর্ণের অগ্রবাহিনীর সকল কুরুসৈনিক পলায়। বেগতিক দেইখা দুর্যোধন দৌড়ায় কর্ণের কাছে- রাক্ষসটার হাত থিকা আমাগো রক্ষা করো কর্ণ। ভীমের এই পোলারে আইজ পর্যন্ত কেউ ঠেকাইতে পারে নাই...

কর্ণ আগাইয়া যায়। ঘটোৎকচ আগাইয়া আসে। বর্শার আঘাতে কর্ণের চাইর ঘোড়া মাইরা কর্ণরে মাটিতে নামাইয়া আনে ঘটা। কর্ণ রথ থাইকা নাইমা

আসে আর ঘোর অন্ধকারে কাঁসার বর্ম পরা কোঁকড়া চুলের ঘটোৎকচ সোজা গিয়া খাড়ায় তার মুখামুখি- পেন্নাম জ্যাঠা...

কর্ণ থতমত খায়। ঘটা হাসে- বুঝাইতে চাই যে অন্যরা যা জানে না তা আপনে যেমন জানেন; আমিও তেমনি জানি। আইসেন জ্যাঠা। আইজ কুন্তীর ফালাইয়া দেওয়া পোলা আর ফালাইয়া দেওয়া নাতির মইদ্যে একজন যাবে নিশ্চিত...

বহু বছর আগে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে ভীমের এই পোলাটা তারে প্রণাম কইরা নিজের পরিচয় দিয়া কইছিল- দ্রৌপদী ডর দেখাইছে যে কর্ণরে দিয়া খুন করাইব তারে। কিন্তু কর্ণ ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারে নাই যে ঘটোৎকচ তার পরিচয়ও জানে...

কর্ণ কিছুটা উদাসীন। ঘটোৎকচ হাসে- হয়ত ছুডু মা দ্রৌপদীর অভিশাপ সইত্য হইব আইজ। আপনের হাতেই মরব আমি। কিন্তু আমারে ছুডু লাঠিয়াল ভাইবেন না জ্যাঠা। কাগুকৃষ্ণ ডরাইয়া অর্জুন কাকারে পাঠায় নাই আপনের সামনে। পাঠাইছে আমারে। সুতরাং বুঝতেই পারতাছেন...

কর্ণ কয়- শুরু থাইকা আইজ পর্যন্ত এই কুরুক্ষেত্র টের পাইছে তোমার ক্ষমতা। তোমারে কেন; কোনো শত্রুরেই ছোট ভাবি না আমি...

- তাইলে আসেন জ্যাঠা। হইয়া যাক জ্যাঠায় ভাতিজায়। আপনের ঘোড়া মাইরা ফালাইলাম বইলা মনে কিছু নিয়েন না। রথের উপর বইসা তিরাতিরিতে কোনো বাহাদুরি আছে বইলা মনে হয় না আমার। আসোল লড়াই হইল সামনা-সামনি...

অন্ধকারে দীর্ঘ বর্শাই জুতসই হাতিয়ার। কর্ণ আর ঘটা দুইজনের হাতেই বর্শা। হাতিয়ার লড়াই আর গায়ের শক্তিতে অর্ধেক বয়সী ঘটোৎকচ খুব সহজ হইবার কথা না কর্ণের কাছে। তার উপর ঘটোৎকচের মূল কৌশল তার মায়াযুদ্ধ। কালো কুচকুচে ঘটা অন্ধকারে এক দিকে আক্রমণ কইরা মুহূর্তে অন্য দিকে সইরা যায় পাল্টা আক্রমণের টারগেট থাইকা; কিন্তু কর্ণ তিরাতিরির লাইগা বিখ্যাত হইলেও কুড়ালি পরশুরামের ঝুলিঝাড়া ছাত্র। অল্পকাল লড়াই কইরাই সে বুইঝা ফালায় ঘটার কলাকৌশল। ঘটা হাতের থাইকা পায়ের কাম করে বেশি। কর্ণ তার পা মাপে। নিশ্চিত হইয়া যায় ঘটা এর পরে কোনখানে লাফ দিব। ...এবং ঘ্যাঁচ...

ঘটা যেই দিকে গিয়া লাফ দিয়া খাড়াইব সেই দিকেই ঘটার হৃৎপি- বরাবর দুই হাতে বর্শা চালান দেয় কর্ণ। বর্শাটা ঘটার কাঁসার বর্ম ভাইঙ্গা বুকে বিঁধে পিছন দিকে বাইর হইয়া যায়। ঘটা পড়ে না আর কর্ণও বর্শাটা বাইর কইরা আনতে পারে না ঘটার বুক থাইকা; তার মধ্যেই আরেকটা ঘ্যাঁচ। ...ঘটার বর্শা বিঁধে যায় কর্ণের দেহে...

নিজের বর্শা ছাইড়া লাফ দিয়া সইরা আসে কর্ণ। বিন্দুমাত্র শব্দ না কইরা নিথর হইয়া পড়ে ঘটোৎকচ...

ঘটোৎকচ মরায় দুর্যোধন বাহিনী খুশি তাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু পাণ্ডবপক্ষে রথের উপর উইঠা খুশিতে নাচতে থাকে কৃষ্ণ। অর্জুন বড়ো বেশি বিরক্ত হয় কৃষ্ণের উপর- ঘটোৎকচ কথা কওয়ার সময় তোমারে ছাইড়া কথা কইত না ঠিক; কিন্তু তার মানে এইটা না যে সে মরায় দুর্যোধনের মতো তুমিও খুশিতে লাফাইবা। তোমার মনে রাখা উচিত সে আমার ভাতিজা; তার বাহিনীটাই

আছিল আমাগো পয়লা সম্বল। আর সে আমাগো পক্ষের সবচে বড়ো যোদ্ধাদেরও একজন...

কৃষ্ণ কয়- কেন লাফাই বুঝতে পারলে তুমিও লাফাইতা অর্জুন। ঘটোৎকচ মরার আগে কর্ণের বগলে বর্শা গাঁইথা গেছে। বাম হাতেই কিন্তু কর্ণ গুনে টান দিয়া তিরের নিশানা করে। ডানহাতি তিরন্দাজ কর্ণের বাম বগলে বর্শা বিঁধা মানে তার তিরাতিরির প্রায় শেষ এইটা বুঝলে খুশিতে তুমিও লাফাইতা অর্জুন। কর্ণ এখন পঙ্গু...

১৭

বড়ো বেঘোরে অসম্মানের মরা মরলেন দ্রোণ। নিজের শিষ্য তার চুলের মুঠায় ধইরা তলোয়ার দিয়া মাথাটা আলগা কইরা ফিককা ফালাইল কুরুক্ষেত্রের মাঠে। শত শত লাশের ভিড়ে শেষ পর্যন্ত তার নিজের পোলায়ও শেষকৃত্যের লাইগা খুঁইজা বাইর করতে পারল না দ্রোণের দেহখান...

মানুষটা জন্মাইছিল বিদ্বান পরিবারে; সাক্ষাৎ ঋষি অঙ্গিরার বংশে। বৃহস্পতি তার পিতামহ; পিতা ভরদ্বাজ। কিন্তু কী জানি কী কারণে বিদ্যা শিক্ষা মুনিঋষিগিরি কিংবা পুরোহিতের কাম টানে নাই তারে। হইতে পারে তার শৈশবের দারিদ্র্য তাড়না। বাপ ভরদ্বাজ থাকতেন অন্যের বাড়িতে আশ্রিত হয়ে। বিছানা-বালিশ কিছুই দিতে পারতেন না দেইখা পোলারে তিনি ঘুম পাড়াইতেন শস্য রাখার ধামায়। সেই ধামা বা দ্রোণে শুইয়া শৈশব পার করলেও সারা জীবন দারিদ্র্যচিহ্ন দ্রোণ নামটাই হইয়া উঠে তার পরিচয়। বড়ো হইবার পর তার মনে হইল ঋষিপুত্র বা ব্রাহ্মণ হইলেও রাজা হওয়া যায়। সামনে তার আদর্শ আছিলেন জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম; যিনি একাধারে ঋষি রাজা যোদ্ধা আর অস্ত্র বিশারদ...

বাপের টোলে পঠনপাঠন ছাইড়া তিনি গিয়া অস্ত্রে দীক্ষা নেন পরশুরামের ডেরায়। অস্ত্রবিদ্যা বহুত শিখলেও দারিদ্র্য তখনো তার পিছু ছাড়ে নাই; তখন হইছে তার দ্বিমুখী জ্বালা। বিদ্যাশিক্ষা করা ব্রাহ্মণ থুইয়া তারে না ডাকে কেউ পুরোহিতের কামে; পরশুরামরে থুইয়া না আসে কেউ তার কাছে অস্ত্রশিক্ষা নিতে। অবস্থা তার এমনই হইল যে একমাত্র পোলা অশ্বত্থামারে এক ফোঁটা দুধ দিতে না পাইরা খাওয়াইতেন পিটুলিগোলা। তো এই অবস্থায় হঠাৎ তার মনে হইল ছুডুকালের সখা আর বাপের টোলের সতীর্থ দ্রুপদ এখন পাঞ্চালের সম্পদশীল রাজা...

বৌ-পোলা নিয়া তিনি তার কাছে হাজির হইয়া কন- দোস্ত। ছোটবেলা আমরা যা পাইতাম দুই বন্ধুতে আধাআধি ভাগ কইরা খাইতাম। তো তোমার এখন যে রাজ্য আছে তার আদ্ধেক আমারে দেও...

- বেকুবে কী কয়? ছোটকালের মিঠাইমণ্ডা ভাগাভাগি আর রাজ্য ভাগাভাগি কি এক?

দ্রুপদ তারে খেদাইয়া দিলে বৌবাচ্চা নিয়া তিনি আইসা আশ্রয় নেন হস্তিনাপুর রাজ্যের কুলগুরু তার বৌয়ের ভাই কৃপাচার্যের ঘরে। এই সময়টাতে ভীষ্ম তার নাতিগো লাইগা ভাবতাছিলেন অস্ত্রশিক্ষার কথা। কৃপাচার্যের সুপারিশে ভীষ্ম তারে মাস্টারির চাকরি দিলেন আর তিনি খালি দ্রোণ থাইকা হইয়া উঠলেন গুরু দ্রোণ কিংবা দ্রোণাচার্য...

রাজবাড়ির চাকরিতে ভালোই দিন যাইতেছিল তার। রাজকীয় বেতন-ভাতার বাইরে আশপাশের তরুণগো শিক্ষা দিয়া উপরি ইনকামও নেহাত মন্দ আছিল না তার। খানাদানা আর সম্মান সবই একলগে পাইবার কারণে হস্তিনাপুরের গদির নিকট তার আনুগত্যও আছিল প্রশ্নের অতীত। কোনো দিনও তিনি ধৃতরাষ্ট্রের কোনো কথায় যেমন রা করেন নাই; তেমনি পোলাগো যে কাণ্ডে ধৃতরাষ্ট্র নিশ্চুপ থাকছেন গুরু দ্রোণও সেই দৃশ্য না দেইখাই থাকছেন সর্বদা। যাদের লগে হস্তিনাপুরের শত্রুতা কিংবা সামান্য রেষারেষি আছিল; তাগো কারো পোলারেই তিনি জীবনে গ্রহণ করেন নাই নিজের অস্ত্র শিক্ষার স্কুলে...

আর্য জনজাতির হাতে নিজেগো ভিটামাটি হারানোর ক্ষোভে আদিবাসী নিষাদজাতি বরাবরই ক্ষত্রিয়গো জাতিগত শত্রু। এই কারণে নিষাদ বংশজাত হিরণ্য ধনুর পোলা একলব্যরে তিনি শিষ্য না কইরা ফিরাইয়া দিছিলেন। কিন্তু তার পরেও যখন গুরুকুলের বাইরে দূর থাইকা শিষ্যগো লগে দ্রোণের

কারিগরি দেইখা নিজের চেষ্টায় একলব্য এক ভালো তিরন্দাজ হইয়া উঠল; তখন হস্তিনাপুরের রাজবাড়িরে খুশি রাখার লাইগা তিনি তার বুড়া আঙ্গুলটাই কাইটা ফালাইলেন; যাতে জীবনেও আর কোনো দিন সে তির চালাইতে না পারে। কারণ তিনি জানতেন তার পক্ষে কোনো দিনও ভীষ্ম-ধৃতরাষ্ট্ররে বোঝানো সম্ভব হইব না যে কেন একলব্য কুরু-পাণ্ডব থাইকা বড়ো তিরন্দাজ হইয়া উঠল তার দেখাদেখি...

রাজকীয় চাকরি হারাইয়া না খাইয়া থাকার ডর তারে যেমন সারা জীবন অনুগত কইরা রাখছে হস্তিনাপুর গদির তেমনি নিজের পোলারে রাজা বানাইবারও একমাত্র অবলম্বন হিসাবে তিনি সারা জীবন নিজেরে অনুগত রাখছেন হস্তিনাপুর গদির। তিনি বিশ্বাস করতেন ধৃতরাষ্ট্রের পরে দুর্যোধনই হবে রাজা; তাই তার সমস্ত কোয়ালিশনই ছিল ধৃতরাষ্ট্র পোলাদের সাথে। যদিও তিনি শিষ্যগো মাঝে গর্ব করতেন অর্জুনরে নিয়া; বিশ্বাস করতেন যুধিষ্ঠিররে আর মুখে ছ্যা ছ্যা করলেও বিপদে ভরসা করতেন কর্ণের উপর...

হস্তিনাপুরের গুরুকুলে যখন তার পয়লা ব্যাচের শিক্ষা সমাপ্ত হইল তখন তিনি তার সকল শিষ্যের কাছে সম্মিলিতভাবে গুরুদক্ষিণা চাইয়া বসলেন জীবন্ত দ্রুপদ- দ্রুপদরে বন্দি কইরা আমার কাছে আইনা দেওয়াই হবে তোমাদের গুরুদক্ষিণা...

শত কুরু পাঁচ পাণ্ডব আর কর্ণ। এই একশো ছয়জন এক পক্ষ হইয়া জীবনে মাত্র একবারই যুদ্ধযাত্রায় গেছে; আর তা গেছে দ্রোণের খায়েশ পূরণ করতে...

শিষ্যরা দ্রুপদরে ধইরা আনলে মুক্তিপণ হিসাবে আদ্ধেক রাজ্য নিয়া নিজের পোলা অশ্বত্থামারে তিনি বানাইয়া ফালাইলেন দক্ষিণ পাঞ্চালের রাজা। কিন্তু

তার পোলার তো কোনো রাজনৈতিক মিত্র নাই; দ্রুপদ যে থাবা দিয়া আবার তার রাজ্য ফিরাইয়া নিব না তার কী গ্যারান্টি? সেই গ্যারান্টি তিনি পাইলেন আবার সেই ধৃতরাষ্ট্রের কাছে; দুর্যোধনের কাছে; আর তার বিনিময়ে সারা জীবন কুরুপক্ষে বান্ধা থাকলেন আনুগত্যের শিকলে...

ধৃতরাষ্ট্র আর দুর্যোধন তারে বহু কিছু দিছে। ধৃতরাষ্ট্র তারে দিছেন মন্ত্রীর পদ। দুর্যোধন তারে দিছে পাশায় জিতা পাণ্ডবরাজ্য ইন্দ্রপ্রস্থের রাজত্ব আর ভীষ্ম মরার পর কুরুপক্ষের প্রধান সেনাপতির পদ। কিন্তু যুদ্ধে মানুষটার যেকোনো অভিজ্ঞতাই নাই; তিনি যুদ্ধে যোগ দিছেন নিজের রাজ্য আর পোলার রাজত্ব টিকাইয়া রাখার খাতিরে। যদি কুরুপক্ষ হাইরা যায় তবে তার নিজের ইন্দ্রপ্রস্থ তো যাবেই; সাথে সাথে জামাইগো নিয়া দ্রুপদ ফিরাইয়া নিব তার পোলার দখলে থাকা দক্ষিণ পাঞ্চাল...

তিনি সেনাপতি হইবার পর পরিকল্পনা আর নেতৃত্বের অভাবে কুরুপক্ষের যুদ্ধ পুরাই আউলাঝাউলা হইয়া উঠে। যত দিন তিনি নেতৃত্ব দিছেন তত দিনই খালি একটার পর একটা প্রতিজ্ঞা করছেন আর বদলাইছেন কিন্তু কোনোটাই ঠিকমতো করতে পারেন নাই। আর অন্য দিকে পাণ্ডবেরা ধুমায়ে পিটাইছে কৌরব বাহিনীরে এই কয় দিন। এই কয় দিন তিনি ডরাইয়া দিন থাকতে যেমন যুদ্ধবিরতি ঘোষণা কইরা দিছেন তেমনি দুর্যোধনরে কিছু একটা দেখাইবার লাইগা রাত্তিরে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিছেন; বিরতি না দিয়া টানা যুদ্ধ করছেন; কিন্তু কিছুতেই কোনো ফল আসে নাই; উল্টা নিজের কপালে জুটছে শিষ্য দুর্যোধনের অকথ্য অপমান...

তার সেনাপতিত্বের পাঁচ দিন একমাত্র যে বুদ্ধিমানের কামটা তিনি করছেন; তা হইল সর্বদাই সবার পিঠ বাঁচাইবার লাইগা কর্ণরে কভারে রাখা; না হইলে

হয়ত চারপাশ থিকা ঘিরা ধইরা পাণ্ডবেরা কৌরবগো পিটাইয়া তক্তা বানাইত অত দিনে...

চৌদ্দ নম্বর দিন জয়দ্রথ মরার পর রাত্তিরের যুদ্ধে কর্ণের হাতে ঘটোৎকচ মরায় পাণ্ডবপক্ষের কমান্ডের চেইন পুরাটাই ভাইঙ্গা পড়ে যুধিষ্ঠিরের আবেগে। জীবনে মাত্র একবার কৃষ্ণের উপর প্রকাশ্যে খেইপা উঠে যুধিষ্ঠির- ধিক কৃষ্ণ। ধিক। এই পুরা যুদ্ধটা তেরো বছর দেরিতে হইছে শুধু যেই কর্ণের ভয়ে; তেরোটা বছর ধইরা অর্জুন যেখানে প্রস্তুতি নিছে কর্ণরে মোকাবেলার; শুধু যে কর্ণরে ঘায়েল করার লাইগা তুমি নিজে হইছ অর্জনের সারথি; সেইখানে কি না তুমি না পাঠাইলা অর্জুনরে; না গেলা নিজে কর্ণের সামনে; ঘটোৎকচ পোলাটারে তুমি মরতে পাঠাইলা কর্ণের হাতে। ধিক কৃষ্ণ ধিক...

ঘটোৎকচ মরায় বুক চাপড়াইয়া কান্দে যুধিষ্ঠির- যে পোলাটায় বাপ-জ্যাঠার এক ফোঁটা আদর খাদ্য কিংবা সুরক্ষা কোনো দিনও পায় নাই; তবু বনবাসের দুর্দিনে জ্যাঠা-কাকার মালপত্র টানা; এমনকি সৎমায়েরে কান্ধে নিয়া পর্বত পার করার বেগারটারও দিছিল বিনা প্রশ্নে; যার বাহিনীটা আছিল আমাগো পয়লা সম্বল; সেই ঘটোৎকচ মরায় তুমি দুর্যোধনের মতো খুশিতে লাফাও? ধিক কৃষ্ণ ধিক...

পাণ্ডবপক্ষের যুদ্ধ পুরাটাই কৃষ্ণ-যুধিষ্ঠিরের পরিকল্পনা আর অর্জুন-কৃষ্ণের পরিচালনা। জীবনেও কেউ কৃষ্ণের উপর যুধিষ্ঠিররে খ্যাপতে দেখে নাই। এই খ্যাপা যুধিষ্ঠিরের সামনে যাইতে কৃষ্ণ ডরায়। অন্য কেউ সাহস করে না কিছু কইতে; পোলা হারাইয়া ভীম বইসা থাকে হাঁটুতে মুখ গুঁইজা আর যুধিষ্ঠির নিজের বর্ম ঠিকঠাক করে- ঠিকাছে কৃষ্ণ। তুমি নিরাপদ থাইকা নিজের আর অর্জুনরে জান বাঁচাও। আমিই যাই। একটার পর একটা পোলাপানের মরণ দেখার থাইকা কর্ণের হাতে মইরা যাওয়াই বহুত ভালো আমার...

যে যুধিষ্ঠির তেরো বচ্ছর ঠিকমতো ঘুমায় নাই কর্ণের ডরে; সে আইজ রওনা দিছে কর্ণের লগে যুদ্ধ করতে। কৃষ্ণ অনুমান করে এইটা শুধু ঘটোৎকচের মৃত্যুই না; ঘটোৎকচের ছোট পোলা বর্বরীকের মৃত্যুর কারণেও যুধিষ্ঠির মনে মনে খ্যাপা কৃষ্ণের উপর। ঘটার ছোট পোলা বর্বরীক এই বয়সেই ঋষি হিসাবে বহুত সুখ্যাত ছিল। যুদ্ধকৌশলে সে সবাইরে ছাড়াইয়া গেছিল একলগে তিনটা তির ছোঁড়ার ক্ষমতায়। একবারে ধনুক টান দিয়া লক্ষ্যে তিন তিনটা বাণ ছুঁড়তে পারত বইলা তিনবাণধারী নামে এরই মাঝে সে বিখ্যাত ছিল। এতে পাণ্ডবগো সুবিধাই হইবার কথা আছিল। কিন্তু এই তিনবাণধারী বর্বরীকেরে তার মা অহিলাবতী ছোটকালে কইছিল সর্বদা দুর্বলের পক্ষে থাকতে সেজন্য সর্বদাই হারুপার্টির পক্ষে থাকতে থাকতে এক্কেবারে ঋষি হারু কি সহায় হইয়া উঠছিল সে। তো যুদ্ধ শুরুর আগে যখন সৈন্যসামন্তের কমান্ড ঠিক করা হয় তখন এই হারু কি সহায় বাঁধাইল ঝামেলা- মোর মায়ে মোরে কইছে বরাবর দুব্বলের পক্ষে থাকতে...

কৃষ্ণ তারে নিরালায় নিয়া জিগায়- তা তুমি কেমনে দুব্বল আর সবল ঠিক করবা নাতি?

বর্বরীক কয়- যুদ্ধে পয়লা আমি কারো পক্ষই নিমু না। খাড়াইয়া দেখব কারা হাইরা যাইতাছে। তারপর সেই হারুপার্টির লগে গিয়া যোগ দিমু...

কৃষ্ণ কয়- আইচ্ছা মনে করো যুদ্ধ শুরু হইবার পর দেখা গেলো তোমার বাপ-দাদার দল পাণ্ডবপক্ষ হাইরা যাইতাছে; তাইলে তো তুমি গিয়া পাণ্ডবপক্ষে যুদ্ধ করবা। ঠিক কি না?

বর্বরীক কয়- হ ঠাকুরদা। এক্কেবারে ঠিক...

কৃষ্ণ কয়- তো নাতি; তিরাতিরিতে যেহেতু তোমার সুমান কেউ নাই। তো ধরো গিয়া তুমি পাণ্ডবপক্ষে আধা বেলা যুদ্ধ করলে তোমার মাইর খাইয়া কুরুপক্ষ আবার দুব্বল হইয়া পড়ব। তখন তুমি কি কুরুপক্ষে যাবা?

বর্বরীক কয়- অবশ্যই যাব। এইটাই আমার ফিলসফি; দুব্বলের পক্ষে থাকা; এইটাই মোরে মোর মায়ে শিখাইছে...

কৃষ্ণ কয়- তোমার মা খুব বুদ্ধিমান নারী; ভালো জিনিসই শিখাইতে চাইছে তোমারে; কিন্তু মনে লয় গুলাইয়া ফেলাইছ তুমি। আইচ্ছা; তারপর কুরুপক্ষ থাইকা তোমার মাইর খাইয়া যখন আবার পাণ্ডবরা দুব্বল হইয়া পড়ব তখন?

- তখন আবার পাণ্ডবপক্ষে আসুম

- তারপর আবার কুরুপক্ষ দুব্বল হইলে তাগো পক্ষে?

বর্বরীক কয়- হ। তাই তো হিসাব

কৃষ্ণ হাসে- এই হিসাবে চললে তো যুদ্ধের শেষে তুমি ছাড়া যেমন জীবিতও থাকব না কেউ; তেমনি বিজয়ীও হইব না কেউ। দুই পক্ষের সবাইরে মরতে হইব তোমার কেরামতি তিরে...

- মরলে মরব। কারণ জয়-পরাজয় বাঁচা-মরা এইগুলা আমার দেখার বিষয় না। আমার দেখার বিষয় হইল আমি দুব্বলের পক্ষে আছি কি নাই...

এমন বেকুব ষাঁড় যুদ্ধের লাইগা বড়োই মুশকিল। তার বাপ ঘটোৎকচ যতই তক্ক করুক না কেন পাণ্ডবগো নিকট তার আনুগত্য প্রশ্নের অতীত। ঘটার বড়ো পোলা অঞ্জনপর্বাও বাপের মতো। কিন্তু ছোট পোলা বর্বরীক অসাধারণ তিরন্দাজ হইবার পাশাপাশি অতি শিক্ষিত হইয়া বাঁধাইল গন্ডগোল। যুদ্ধের মাঠে অনিয়ন্ত্রিত কিংবা অতি স্বতন্ত্র মিত্র শত্রুর থাইকা ভয়ানক; যার ফলাফল এরই মাঝে পাইতে শুরু করছে দুর্যোধন। তার পক্ষে বহুত বড়ো যোদ্ধা

আছেন; কিন্তু সকলেই চলেন নিজস্ব অ্যাজেন্ডায়। নিজের অহংকারে এরই মাঝে দুর্যোধনরে যুদ্ধে ঠেইলা দিয়া ঘরে বইসা তামাশা দেখতাছে কর্ণ। কে জানে পরে বাকিরা কী করে। কিন্তু পাণ্ডবপক্ষে সেইটা হইতে দেওয়া যাবে না...

ঘটোৎকচের পোলা হারু কি সহায় তিনবাণধারী ঋষি বর্বরীকরে আর কেউ দেখে না কোথাও। কৃষ্ণ তার কাটা মুন্ডুটা উঁচা এক পাহাড়ের উপর রাইখা আইসা কয়- ঋষিসাব বাপদাদাগো বিজয় কামনায় স্বেচ্ছায় আত্মবলিদান দিয়া পাহাড়ের উপর বইসা নিরপেক্ষভাবে যুদ্ধ দেখার সিদ্ধান্ত নিছেন...

কেউ কিছু কয় না। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের মনে হয় বেকুব নাতিটারে জানে না মাইরা অন্য উপায়েও হয়ত যুদ্ধ থাইকা সরানো যাইত...

কৃষ্ণ আর অর্জুনরে উপর খেইপা যুধিষ্ঠির রওনা দিছে কর্ণরে মারতে। যুধিষ্ঠির হাঁটে আর বকবক করে- এখন পর্যন্ত দ্রোণ কিংবা কর্ণের বিষয়ে কারো মাথাব্যথা নাই। অথচ তারাই সবচে বড়ো শত্রু। যুদ্ধ তো একলাই করতাছে ভীম। অভিমন্যু মারা যাওয়ায় আমিও কষ্ট কম পাই নাই। কিন্তু তাই বইলা জয়দ্রথের পিছনে কেন অত বড়ো প্রতিজ্ঞা? অভিমন্যুরে মারছে দুঃশাসনের পোলা; জয়দ্রথরে মাইরা কী লাভ হইল কৃষ্ণ কিংবা অর্জুনের?

একে তো কর্ণের দিকে যুধিষ্ঠির রওনা দেওয়ায় পাণ্ডবপক্ষ পুরাটাই বেকুব তার উপরে তারা উতলা হইয়া উঠে যখন দেখে কৃষ্ণরে খুঁইজা পাওয়া যাইতাছে না কোথাও। অর্জুন খাড়াইয়া একবার যুধিষ্ঠিররে দেখে আরেকবার সারথিবিহীন রথের দিকে তাকায়...

যুদ্ধ বাদ দিয়া পাণ্ডবপক্ষ হায় হায় করে আর গোস্বায় গোঁৎ গোঁৎ কইরা হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ যুধিষ্ঠির শোনে- খাড়াও। বেকুবি করতাছ ক্যান?

কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের গলা। কৃষ্ণ ধইরা আইনা কৃষ্ণ দ্বৈপায়নরে খাড়া কইরা দিছে খ্যাপা যুধিষ্ঠিরের সামনে...

দ্বৈপায়ন যুধিষ্ঠিররে আটকাইয়া কন- আইজ ঘটোৎকচ না মরলে অতক্ষণে অর্জুনের মরণ কান্দনে যে তোমার বুক চাপড়াইতে হইত এইটা বোঝো? বড়ো শত্রুরে একলা ঘায়েল করা যায় না। ধাপে ধাপে অনেকের সম্মিলিত চেষ্টাতেই কাবু হয় বড়ো বড়ো শত্রু। ঘটোৎকচ মরার আগে কর্ণরে বড়ো রকমের ঘায়েল কইরা গেছে; এখন অর্জুন যুদ্ধ করলে তারে পরাজিত করা সম্ভব। বুঝছ?

কৃষ্ণ আইসা তার রথের লাগাম ধরে কিন্তু পাণ্ডবপক্ষে আর কেউ সেই রাত্তিরে যেমন যুদ্ধের কথা ভাবে না; তেমনি কুরুপক্ষও ঘটা মরার আনন্দে কিছু লাফাইয়া যুদ্ধের চিন্তা বাদ দেয়। টানা এক দিন এক রাইতের ক্লান্তিতে দুই পক্ষই যে যেখানে পারে ঝিমায়। আর কুরুক্ষেত্রের মাঠে পাগলা খোঁজা খুঁইজা দুর্যোধন শেষ পর্যন্ত ডেরায় আইসা দেখে নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতাছেন সেনাপতি দ্রোণ...

দুর্যোধন ঝাঁকি দিয়া তারে জাগাইয়া খেক খেক কইরা উঠে- ঘুমান ক্যান? ঘুমাইয়া কী সুযোগটা ছাড়ছেন আপনি জানেন? ঘটা মরায় বেসামাল পাণ্ডবগো উপর আক্রমণ করলে যে অতক্ষণে যুদ্ধ শেষ হইয়া যাইত এইটা বোঝেন?

দ্রোণ চোখ ডলেন। দুর্যোধন ঝাড়ি লইতে থাকে- ঘুমান ঘুমান। ব্রাহ্মণের তো আবার সবকিছু উপরে খাওন আর আরাম। নাক ডাকাইয়া ঘুমান। তারপর

কাইল সকালে পাণ্ডবরা যখন বিশ্রাম কইরা তাগড়া হইব তখন গিয়া আপনে তির দিয়া তাগো বগল চুলকাইয়া দিয়েন...

দুর্যোধনের ধাতানি খাইয়া ঘুম ফালাইয়া দ্রোণ চিক্কুর লাগান- যুদ্ধ কিন্তু বিরতি হয় নাই। আক্রমণ...

দুর্যোধন কয়- হ। ঘরে বইসা আক্রমণ কইলেই আক্রমণ হয়। হালার অকম্মা বামুন; খালি ভড়ং

দ্রোণ আর অপমান গায়ে মাখেন না। নিজের বর্মটর্ম পরতে পরতে কন- তোমারে আমি কথা দিলাম; সমস্ত পাঞ্চালগো না মাইরা বর্ম খুলব না আমি...

দুর্যোধন কয়- আপনে তো ডেলি ডেলি নতুন পণ করেন আর দিনের শেষে পয়দা করেন ঘোড়ার আন্ডা। যাউক গা; পণ কইরাও পাণ্ডবগো তো কিছু করতে পারলেন না; এখন পাঞ্চালগো কিছু করতে পারলেও একটা কামের কাম হয়...

দুর্যোধনের কাছে প্যাঁদানি খাইয়া দ্রোণ সূর্য উঠার আগেই বিরাট আর দ্রুপদরে মাইরা ফালান। কিন্তু তারপর অন্ধকারেরই তার সামনে আইসা খাড়ায় ভীম আর ধৃষ্টদ্যুম্ন। ভীম ধৃষ্টদ্যুম্নরে কয়- আইজ বাপের শেষকৃত্যের চিন্তা করবা নাকি প্রতিশোধ নিবা সেইটা এখন তোমার ভাবনার বিষয়...

পনেরো নম্বর দিন সূর্য উঠার পর দুর্যোধন গিয়া পড়ে বাল্যবন্ধু আর সতীর্থ সাত্যকির সামনে। দুর্যোধন কয়- দোস্ত কী দিন আছিল আর কী দিন আসলো রে ভাই। তুমি আর আমি কত খেলাই না একলগে খেলছি আচার্যের ঘরে। কিন্তু কী থাইকা কী যে হইল। আইজ তুমি আর আমি অস্ত্র লইয়া মুখামুখি খাড়া। তুমি কি কইতে পারো বন্ধু আমাদের খেলার দিনগুলা কই গেলো আর কেনই বা শুরু হইল এই যুদ্ধ? আর যেসব কিছুর লাইগা এই যুদ্ধে জড়াইছি আমরা; তা পাইলেই বা কী লাভ হইব আমাদের?

সাত্যকি কয়- সকল আকাম-কুকাম সাইরা এখন আফসোস কইরা কী লাভ? খেলাঘরের বয়সে খেলছি; এখন যুদ্ধে যা করার তাই করা ভালো। আসো...

দ্রুপদ মরার পর পাঞ্চালরা এমনিতেই কিছুটা মনমরা আছে তার উপর দ্রোণ আইজ পুরাই খ্যাপা পাঞ্চালগো উপর। কৃষ্ণ অর্জুনরে কয়- দ্রোণরে থামাইতে হবে। পোলা অশ্বত্থামার মৃত্যুসংবাদ শুনলে তিনি বেদিশা হইয়া উঠবেন। তুমি তার কানে অশ্বত্থামার মৃত্যুসংবাদ পৌঁছাইবার ব্যবস্থা করো...

অর্জুন কয়- ছি ছি ছি। এমন মিছা কইয়া জয়ের থাইকা পরাজয়ই তো ভালো...

অর্জুনের যুক্তিতে পাত্তা দেয় না কেউ। সকলে এই বিষয়েও একমত হয় যে কথাখান যুধিষ্ঠির কইলে বিনা প্রশ্নে দ্রোণ তা বিশ্বাস যাইবেন। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের আবার সত্য বলার বাতিক আর সুনাম দুইটাই আছে। সে মুলামুলি করে- এক্কেবারে ঠাডা মিছা কেমনে কই কৃষ্ণ? একটা ব্যবস্থা করো না যাতে সংবাদটাও গুরুর কানে দেওয়া যায় আর আমার সত্য বলার সুনামটারও ক্ষতি না হয়...

কৃষ্ণ কয়- মালবরাজ ইন্দ্রবর্মার একটা হাতির নাম অশ্বত্থামা। ভাই ভীম; যান তো; ইন্দ্রবর্মার হাতি অশ্বত্থামারে গদা দিয়া শুয়াইয়া আসেন...

ভীম ইন্দ্রবর্মার হাতি অশ্বত্থামারে মাইরা দ্রোণের নিকট গিয়া দেয় চিক্কুর- অশ্বত্থামারে শুয়াইয়া ফালাইছি হোহ হো...

দ্রোণ কাঁইপা উঠেন। হাত শিথিল হয় তার। মিথ্যা বলায় ভীমের গলা কাঁপে না জানলেও কথাখান ফালাইয়া দিতে পারেন না দ্রোণ। যুদ্ধ থুইয়া তিনি দৌড়ান যুধিষ্ঠিরের কাছে- বাপ। আমি জানি মইরা গেলেও তুমি মিছা কও

না। ভীমে যে কইল সে অশ্বত্থামারে মাইরা ফালাইছে; তুমি কও তো বাপ কথাখান কি হাছা?

কৃষ্ণ আইসা খাড়ায় যুধিষ্ঠিরের পিছনে; হালায় না আবার সত্য বলার বাহাদুরি নিতে যায়। কৃষ্ণ কানে কানে কয়- মনে রাইখেন দ্রোণ আরো আধা বেলা যুদ্ধ করলে কিন্তু আমাগো খবর আছে। যেমনে যা কইছি তেমনে তা কন...

ভীম আরেকপাশ থাইকা যুধিষ্ঠিররে গুঁতা দেয়- জীবন রক্ষার লাইগা মিথ্যা কইলে পাপ হয় না। বাঁইচা থাকাই সবচে বড়ো পুণ্যের কাম। যেরাম পরিকল্পনা হইছে সেরামই কইবা কিন্তু। আর সবচে বড়ো কথা হইল আমি তো হাতি অশ্বত্থামারে সত্য সত্যই মারছি। কৃষ্ণ যেমন শিখাইয়া দিছে; তেমনি খালি কও- হ। অশ্বত্থামা মইরা গেছে...

যুধিষ্ঠির আমতা আমতা করে। কৃষ্ণ আর ভীম তারে চাইপা ধরে। দ্রোণ তাকাইয়া আছেন যুধিষ্ঠিরের দিকে- তুমি না কইলে আমি বিশ্বাস যামু না যে অশ্বত্থামা মইরা গেছে ভীমের গদায়...

আরেকবার কৃষ্ণ আর ভীমের দিকে তাকাইয়া; ঢোঁক গিলা দ্রোণের দিকে চোখ রাইখা চিক্কুর দিয়া যুধিষ্ঠির কয়- অশ্বত্থামা মইরা গেছে গুরু...। তারপর একটু থাইমা আস্তে আস্তে কয়- তবে সেইটা একটা হাতি...

পরের কথাটা দ্রোণের কানে যায় না। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ আর ভীমের দিকে তাকায়- তোমরা যা কওয়াইতে চাইছিলা তাও যেমন কইলাম তেমনি শেষের কথাটা জুইড়া দিলাম যাতে আমারে কেউ মিথ্যুক না কয়...

দ্রোণ আউলা হইয়া উঠেন। অশ্বত্থামা মইরা গেলে কার লাইগা এই সব?

ধৃষ্টদ্যুম্ন আর ভীম সবেগে আক্রমণ শানায় দ্রোণের দিকে। ধৃষ্টদ্যুম্নের তিরে রথ থাইকা মাটিতে পইড়া যান দ্রোণ। ভীম কাছে গিয়া দেয় গালি- হালা লোভী ছোটলোক বামুন। এক পোলারে রাজা বানাইবার লাইগা বহুত আকাম করছ তুমি। এইবার মিটাইবা হিসাব...

রক্তাক্ত দ্রোণ মাটিতে পইড়া সাহায্যের আশায় কর্ণ দুর্যোধন কৃপ কইয়া চিল্লা¬ইতে থাকেন আর বিশাল এক তলোয়ার বাগাইয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন দৌড়াইতে শুরু করে দ্রোণের দিকে। পিছন থাইকা হায় হায় কইরা উঠে অর্জুন- ধৃষ্টদ্যুম্ন। দোহাই; গুরুরে মাইরো না; তারে জীবিত বন্দি করো কিন্তু মাইরো না গো ভাই...

ধৃষ্টদ্যুম্নের হাতে তলোয়ার দেইখা মাটিতে মাথা নামাইয়া গলা লুকান দ্রোণ কিন্তু এক হাতে চুলের মুঠা ধইরা অন্য হাতে গুরুর টানটান গলায় তলোয়ার চালাইয়া মাথাটা আলগা কইরা ফালায় নিজের শিষ্য ধৃষ্টদ্যুম্ন...

দ্রোণের মৃত্যুতে ধৃষ্টদ্যুম্নর উপর অশ্বত্থামা খেপে বাপের চুলের মুঠা ধরায় আর অর্জুন খেপে গুরুরে মারায়। দ্রোণের মৃত্যুতে যুধিষ্ঠিরের উপর অশ্বত্থামা খেপে মিছা কথা কওয়ায় আর অর্জুন খেপে শেষ বয়সে আইসা খালি জয়ের লাইগা কলঙ্ক মাখায়। দ্রোণের মৃত্যুতে অশ্বত্থামা খেইপা শুরু করে পাগলা মাইর আর অর্জুন খেইপা বইসা থাকে হাত পা গুটাইয়া...

যুধিষ্ঠির সবাইরে ডাইকা কয়- মহাপাপ মহাভুল হইছে আমাদের। আমরা আমাদের মহান শুভাকাঙ্ক্ষী গুরুরে মাইরা ফালাইছি; যিনি পাশার আসরে পাঞ্চালীর প্রশ্নে মুখ ঘুরাইয়া নিছিলেন। যিনি অভিমন্যু হত্যার পরিকল্পনা করছিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন; তুমি বহুত করছ ভাই; এইবার তোমার সেনা নিয়া তুমি বাড়ি ফিরা যাও। সাত্যকি তুমিও বাড়ি ফিরা যাও তোমার লোকজন নিয়া। কৃষ্ণ যা করে করুক; আমি গুরুমারা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে ভাইবেরাদর নিয়া আগুনে ঝাঁপ দিমু। এতে অর্জুনও খুশি হইব আর আমাদেরও গুরুমারা পাপ খণ্ডন হবে...

যুধিষ্ঠির অর্জুনরে শুনাইয়া শুনাইয়া এই সব কথা কয় আর কৃষ্ণ গিয়া সকল সৈনিকরে কয় অস্ত্র ফালাইয়া দিতে। কৃষ্ণের কথাটা ভীম ধরতে পারে না তাই গদা নিয়া খাড়াইয়াই থাকে। কৃষ্ণ গিয়া ভীমের গদা টান দিয়া হাত থিকা ফালাইয়া কয়- দ্বৈপায়নের নিয়ম মনে নাই?

ভীম বুইঝা চোখ তুইলা দেখে তার বুক বরাবর তির ধইরা বেকুব হইয়া থাইমা গেছে অশ্বত্থামা- পাণ্ডবরা অস্ত্র ফালাইয়া বইসা থাকলে সে আক্রমণ করে কেমনে?

অশ্বত্থামা ফিরা যায় আর ভীম কয়- হ। দ্বৈপায়ন ঠাকুরের নিয়মগুলা বেশ কামের...

১৮

অবশেষে কর্ণ আর অর্জুন মুখামুখি...

সতেরো নম্বর দিন শেষ বিকালে বিনা ঘোষণাতেই দুই পক্ষের সকল অস্ত্র থাইমা যায়। কেউ কাউরে মারে না; সকলে দর্শকই হইয়া আইসা খাড়ায় দুই যোদ্ধার লড়াই দেখতে...

দ্রোণ মরার পর ষোলো নম্বর দিন থাইকা কর্ণ কুরু সেনাপতি। এর আগের দুই সেনাপতি হইছিল কর্ণের প্রস্তাবে আর কর্ণের নাম প্রস্তাব করে অশ্বত্থামা। দুর্যোধন কয়- আইজ আমি আমার মূল সেনাপতিরে পাইলাম সূতপুত্র; তুমি সামনে থাকলে অর্জুন-কৃষ্ণ কেউই সাহস করব না আগাইতে...

ষোলো নম্বর দিন পাণ্ডবগো সকল চেষ্টা কর্ণরে ঘিরা রচিত হইলেও অর্জুন সামনে আসে নাই তার। অর্জুন দূরে দূরে খুচরা সেনাসৈনিক মারছে আর কৌরবগো পিটাইছে সাত্যকি ভীম...

গুরুমরার দুঃখে ষোলো নম্বর দিনও অর্জুন উদাসীন কিন্তু আগের দিনের মতো সেদিনও গুরুপুত্র তিরাইতে ছাড়ে না তারে। অশ্বত্থামা তিরাইয়া কৃষ্ণ অর্জুন দুইজনরেই রক্তাক্ত কইরা ফালানোর পর কৃষ্ণের খোঁচায় অর্জুন উইঠা অশ্বত্থামারে ভাগায়। তারপর কৃষ্ণ তারে টাইনা নিয়া গেলে হাতি বাহিনীর নেতা মগধরাজা দণ্ডধররে ফালাইয়া আইসা আবার সে সংশপ্তকগো লগে তিরাতিরি করে...

অশ্বত্থামা মারে পাণ্ডুরাজরে। নকুল গিয়া খাড়ায় কর্ণের সামনে- আইজ তরে নরকে পাঠামু আমি...

কর্ণ কয়- আগে তুমি কী কী যুদ্ধ জানো তা আমারে দেখাও...

কর্ণ নকুলের রথ আর ঘোড়া শুয়াইয়া ফালাইলে নকুল একটা মুগুর নিয়া আগায়। সেইটাও কর্ণের আঘাতে পইড়া গেলে নকুল দেয় ভাগল। কর্ণ দৌড়াইয়া গিয়া ধনুকের ছিলায় নকুলের গলা আটকাইয়া থামায়- পলাও কেন বাহাদুর? আগে যা কইছিলা তা আরেকবার কও তো শুনি?

নকুল কথা কয় না। কর্ণ কয়- যাও। নিজের থাইকা বড়ো কারো লগে যুদ্ধ না করাই ভালো...

কর্ণ তারে ছাইড়া দিছে এইটা নকুল বিশ্বাস করতে পারে না। সে বেকুবের মতো গিয়া যুধিষ্ঠিরের রথে উঠে- ভাইজান। বন্দি কইরাও কর্ণ আমারে ছাইড়া দিছে...

যুধিষ্ঠির দীর্ঘশ্বাস ছাইড়া কয়- কার মনে কী আছে কে জানে ভাই। তবে আমরা কিন্তু পাইলে তারে ছাইড়া দিমু না...

ষোলো নম্বর দিনে কর্ণের হাতে পাঞ্চাল; অর্জুনের হাতে ত্রিগর্ত সংশপ্তক; ভীমের হাতে কুরুসেনা ছত্রখান হয়। যুধিষ্ঠিরের মাইর খাইয়া দুর্যোধন অজ্ঞান আর সত্যসেনের শাবলের আঘাতে বাম হাত বিদ্ধ হইয়া কৃষ্ণ রথ থাইকা পইড়া গেলেও দিনের শেষে দেখা যায় লাভের হিসাব পাণ্ডবগো দিকেই ভারী...

সতেরো নম্বর দিন কর্ণের শুরু হয় অর্জুনের হাতে মরা কিংবা অর্জুন মারার প্রতিজ্ঞা আর শল্যরে নিজের সারথি কইরা...

গাড়োয়ানের পোলার রথে গাড়োয়ানি করতে রাজা শল্য সহজে রাজি হয় নাই। দুর্যোধন বহুত তেলানির পর; কৃষ্ণের লগে তুলনা করার পর সে রাজি হয় একটা শর্ত দিয়া- একটা শর্তে আমি ছোটলোকের পোলার সারথি হমু; আর তা হইল তারে যা ইচ্ছা গালাগালি করার অধিকার থাকব আমার...

সকলে শর্ত মাইনা নিলে শল্য কয়- দুর্যোধন। কর্ণ যদি অর্জুনরে মাইরাও ফালায় তবু মনে রাইখ; কৃষ্ণ কিন্তু তোমাগোরে শুয়াইয়া ফালাইব। আইজ পর্যন্ত কৃষ্ণের বিপক্ষে কাউরে জিততে শুনি নাই আমি...

দুর্যোধন কয়- আরে রাখেন। আপনে আছেন না? কৃষ্ণ কি কোনো দিন আপনের সামনে খাড়াইছে?

শল্য ফুইলা উইঠা নিজের সম্পর্কে বহুত কথা কর্ণরে শুনায়- হ। আমি হইলাম গিয়া ইন্দ্রের সারথি হইবার যোগ্য। তোমার সাত জন্মের কপাল যে আমি তোমার সারথি হইছি। যাউক গা; চিন্তা কইরো না; আমি তোমার রথ চালাইলে তোমার ভয়ের কিছু নাই...

কর্ণ কয়- আপনে খালি রথটা ঠিকমতো চালাইয়েন। যা করা লাগে আমিই করব...

শল্য কয়- তুমি দেখি আমারে অবহেলা করার লগে লগে পাণ্ডবগোও অবহেলা শুরু কইরা দিলা। তুমি কি জানো যে অর্জুনের গাণ্ডিবের আওয়াজ শুনলে তোমার গুমুত বাইরাইয়া যাইব ডরে?

কর্ণ কয়- চলেন যাই; পাণ্ডবগো দিকেই নিয়া চলেন...

সূতপিতা অধিরথের নিজের হাতে তৈয়ারি কর্ণের রথের চাকায় ঘরঘর শব্দ হয় না। চার ঘোড়ায় টানা এই হালকা রথ প্রায় নিঃশব্দে চলে। শল্য রথ চালায় আর কর্ণরে খোঁচায়- আমার কিন্তু সত্যি সত্যি হাসি পায় গাড়োয়ানের পুত; তুমি যাইতাছ অর্জুনরে মারতে; হি হি হি। কই নরশ্রেষ্ঠ অর্জুন আর কই নরাধম তুমি। এরেই কয় তালের গোটায় আর বালের গোটায় তুলনা...

শল্য ঘ্যান ঘ্যান কইরা অর্জুন বন্দনা করে আর কর্ণরে খোঁচায়- আইজ তোমার বাঁচার একমাত্র পথ হইল যুদ্ধ ছাইড়া ভাগল দেওয়া। না হইলে বেঘোরে মরণ নিশ্চিত তোমার...

পাণ্ডবগো সামনে আইসা কর্ণ দেখে অর্জুন কোথাও নাই। সে চিল্লায়- যে আইজ অর্জুনরে দেখাইয়া দিতে পারব; তারে আমি যা চায় তাই পুরস্কার দিমু...

শল্য কয়- অর্জুনরে খুঁজতে হইব না আর পুরস্কারের লাইগা তোমার টেকাও খর্চাইতে হইব না। যখন তোমার মরণ ঘনাইয়া আসব তখন অর্জুন আপনাতেই তোমার সামনে আইসা খাড়াইব। অপেক্ষা করো...

কর্ণ কয়- আপনের মতো মিত্র থাকলে আর শত্রুতে কী কাম? আমার তো মনে হয় অর্জুনের তিরে মরার আগে আপনের কথার বিষেই মইরা যামু আমি। আপনে আমার সারথি হইছেন নাকি আমার রথে উঠছেন আমারে ডর দেখাইতে?

শল্য কয়- ডর দেখানোর আবার কী আছে? তুমি হইলা গিয়া একটা পাতিশিয়াল আর অর্জুন একটা সিংহ। সিংহের লগে শিয়ালের যুদ্ধে কী হইতে পারে তা কইলে কি ডর দেখানো হয়?

কর্ণ কয়- কথা দিয়া শূল বিদ্ধ করেন বইলাই মনে হয় আপনের নাম হইছে শল্য। অন্য কোনো গুণের কথা তো আপনের নিজের মুখ ছাড়া কারো মুখে

শুনে নাই। আর আপনে যে কৃষ্ণ আর অর্জুনরে নিয়া অত প্যানপ্যান করেন; আপনে জাইনা রাখেন যে আমি কৃষ্ণ আর অর্জুনের ক্ষমতা সম্পর্কে যতটা জানি; তার থাইকা বেশি কেউ জানে না। তারপরেও আমি তাগোর সামনে যাইতাছি; এর মানে অবশ্য আপনের বোঝার কথা না যে আমার আত্মবিশ্বাস আর ক্ষমতা কতটুকু। ...আমার দুর্ভাগ্য; অর্জুনের রথ চালায় তার বন্ধু আর মামাতো ভাই আর আমার রথ চালায় এক বিষাক্ত বাচাল...

শল্য খেক খেক কইরা উঠলে কর্ণও খ্যাপে- আরে তোমাগো ছাতু খাওয়া মদ্রদেশের মাইনসের স্বভাবই তো এই; মাছে-মাংসে-মদে যারা একলগে মাখাইয়া খায় তাগো কাছ থিকা কথার চেয়ে বেশি আর কীই বা আশা করা যায়? এর লাইগা সবাই কয়; মদ্রদেশের লোকের লগে শত্রুতা মিত্রতা দুইটাই জঘন্য। সাপুড়েরা বিষ ঝাড়ার সময় মিয়া তোমাগো নাম কইরা সাপের বিষ নামায়। তোমরা এতই বিষাক্ত যে তোমাগো নাম শুনলে সাপের বিষও নাইমা যায়। তোমাগো দেশের মাইয়ারা মদ খাইয়া ন্যাংটা হইয়া নাচে; উট আর গাধার মতো খাড়াইয়া ঠ্যাং চেগাইয়া মোতে আর মদের পয়সার লাইগা পোলা কিংবা স্বামীরেও বেইচা দেয়। সেই দেশের মানুষ হইয়া বড়াই করো মিয়া? হালা পাণ্ডবের দালাল। তুমি খালি প্রকাশ্যে দুর্যোধনের পক্ষে আছ আর আমারও মাইনসেরে মাফ কইরা দিবার অভ্যাস আছে তাই তোমার জানটা আইজ আমার হাত থিকা বাঁইচা গেলো...

শল্য থামে না। কর্ণরে হাঁসের পালক পরা কাউয়া কইয়া গালাগাল করে। যুদ্ধে পঙ্গু লুলাটুন্ডা অক্ষম কয়। কর্ণ আবার নিজেরে সামলায়- মদ্ররাজ মনে রাইখেন। ভয় পাওয়ার লাইগা কর্ণ জন্মায় নাই। শল্য ছাড়াই আমি শত্রু জয় করতে পারি...

শল্য কয়- সেইটা আমিও পারি। হাজারটা কর্ণ যেই সব যুদ্ধ জিততে পারে না; সেই সব যুদ্ধ আমি একলাই জিততে পারি...

এই কথাটা কর্ণের পক্ষে হজম করা কঠিন। সে আবার খেইপা উঠে। শেষ পর্যন্ত দুর্যোধনরে আইসা থামাইতে হয় কর্ণ-শল্যের প্যাঁচাল। থামার পর কর্ণ কয়- যথেষ্ট হইছে এইবার রথ চালান...

শল্য রথ চালায় কিন্তু একবার দূরে অর্জুনরে দেইখা আবার হইহই কইরা শুরু করে অর্জুন বন্দনা- এইবার আসতাছে তোমার যম। এইবার আসতাছে কৃষ্ণ আর অর্জুন একলগে। এইবার বুঝবা ঠেলা...

কিন্তু দিক বদলাইয়া অর্জুনের রথ সরাইয়া নিয়া যায় কৃষ্ণ আর কর্ণের সামনে আইসা খাড়ায় পাঞ্চালসেনা। কর্ণ তাগো খেদাইয়া দেখে সামনে যুধিষ্ঠির; এক পাশে শিখণ্ডী অন্য পাশে সাত্যকি। কর্ণ শিখণ্ডী আর সাত্যকিরে ভাগাইয়া সামনে আগাইলে পাণ্ডব আর পাঞ্চাল বাহিনীর ভিতর লুকাইতে লুকাইতে যুধিষ্ঠির কয়- সূতপুত্র। তুমি সর্বদাই দুর্যোধনের লগে মিলা আমাগো লগে শত্রুতা করো; অর্জুনরে মারতে চাও। এইটা কিন্তু ঠিক না। আইজ দেখবা তুমি মজা...

যুধিষ্ঠির বাহিনী আক্রমণ করে কর্ণরে। কর্ণের বাম পাশ আহত হইলেও কর্ণ পৌঁছাইয়া যায় যুধিষ্ঠিরের কাছে। যুধিষ্ঠিরের রথ আর বর্ম যায় কর্ণের ভল্লের আঘাতে। আহত যুধিষ্ঠির অন্য রথে উইঠা পালায়। কর্ণ দৌড়াইয়া গিয়া তারে ধরে। কর্ণ তার কান্ধে হাত রাখে- তুমি না রাজা? তয় জান লইয়া ভাগো ক্যান?

বন্দি যুধিষ্ঠির থরথর কাঁপে। কথা কয় না। কর্ণ কয়- নিজেরে না তুমি কুন্তীর বড়ো পোলা কও? এইরকম কাপুরুষ বড়ো পোলার কাছে কুন্তী অত কিছু আশা করেন ভাবতেও করুণা হয়। যাও মায়ের কাছে যাও...

কর্ণ ছাইড়া দিলে যুধিষ্ঠির নড়তে পারে না। ডরে কাঁটা দিয়া উঠে তার শরীর। তবে কি যে সত্য ঘটোৎকচ জানত সেইটা কর্ণও জানে?

মাথা নীচা কইরা যুধিষ্ঠির নিজের বাহিনীতে গিয়া হম্বিতম্বি করে আর বেকুবের মতো হা কইরা চাইয়া থাকে শল্য- হালায় যুধিষ্ঠিররে মারল না কেন? ওরে মারলেই তো যুদ্ধটা এখন শেষ হইয়া যাইত? কে জানে এই কর্ণটার ভিত্রে কী আছে...

অন্য দিকে ভীম পিটাইতেছিল কুরু বাহিনী। শল্য আবার নিজের বেকুবতা কাটাইয়া পাণ্ডব বন্দনা শুরু করে। এইবার কর্ণরে কয়- দেখো একলা ভীমই তো তোমার সব সৈন্য সাফ কইরা ফালাইতাছে। তোমারে পাইলেও সে ভর্তা বানাইব আইজ...

কর্ণ কয়- ভীমের কাছেই চলেন...

ভীম চালাইতেছিল তির। কয়েকটা তির কর্ণের শরীরেও বিদ্ধ কইরা ফালাইলে কর্ণ সইরা আইসা অর্জুনরে খোঁজে। কিন্তু অর্জুনরে ভিড়-বাট্টায় সরাইয়া রাখে কৃষ্ণ। শল্য রথ চালায় আর খিস্তি-খেউড় করে। কর্ণ কিছুটা হজম করে আর কিছুটা ফিরাইয়া দেয়...

যুধিষ্ঠিররে ঘায়েল কইরা অশ্বত্থামা গিয়া পৌঁছায় অর্জুনের কাছে। অশ্বত্থামারে ঘায়েল কইরা অর্জুন আবার মিলাইয়া যায় জনতার ভিড়ে। কর্ণ অর্জুনরে খোঁজার কৌশল বদলায়। সে গিয়া আক্রমণ শানায় যুধিষ্ঠিরের দিকে। যুধিষ্ঠির আক্রান্ত হইলে কৃষ্ণ নিশ্চয় অর্জুনরে নিয়া আসব রাজারে বাঁচাইতে...

যুধিষ্ঠির আক্রান্ত হয় কর্ণের হাতে। ভীম আসে। আসে নকুল সহদেব। আসে ধৃষ্টদ্যুম্ন। কর্ণের বর্শার আঘাতে যুধিষ্ঠিরের বুক বিদ্ধ হয়; রাজমুকুট মাটিতে গড়ায়; কিন্তু অর্জুন আসে না রাজারে বাঁচাইতে কর্ণের হাত থিকা...

যুধিষ্ঠিরের বেকায়দা দেইখা শল্যমামা ভয় পাইয়া যায়। যেভাবে কর্ণ দাবড়াইতাছে একটু পরে তো যুধিষ্ঠিররে মাইরা যুদ্ধই শেষ কইরা দিব। সে কয়- আরে বাদ দেও। আধা ব্রাহ্মণ যুধারে মাইরা তোমার কী লাভ? ওরে তো এর আগে তুমি ছাইড়াই দিছিলা। চলো ভীমের কাছে যাই; অন্তত একটু হইলেও মারামারির মজা পাইবা তুমি...

পাণ্ডবমামা শল্য কর্ণরে নিয়া যায় ভীমের কাছে আর আহত যুধিষ্ঠির আহত নকুলের লগে আহত সহদেবের রথে উইঠা পলায়...

ক্ষতবিক্ষত যুধিষ্ঠির তাঁবুতে গিয়া শরীর থাইকা তির বর্শার ফালি খোলে। আর দূর থাইকা ভীমের লগে কুড়াল নিয়া যুদ্ধ করা কর্ণরে দেখাইয়া অর্জুন কৃষ্ণরে কয়- কর্ণের ভার্গবাস্ত্র চালানোর কায়দাটা দেখো; এই আঘাতগুলা না যাবে সামলানো; না যাবে তার লগে যুদ্ধের সময় পলানো; কী যে সংকট আমার...

কৃষ্ণ কয়- সময় হইলে দেখা যাবে। এখন চলো শিবিরে গিয়া রাজা যুধিষ্ঠিররে একবার দেইখা আসি। তিনি কর্ণের হাতে আহত হইছেন। একটু রেস্টও কইরা আসা যাবে...

যাইতে যাইতে পথে অর্জুন ভীমরে যুধিষ্ঠিরের সংবাদ জিগায়। ভীম কয়- কর্ণের হাতে মারাত্মক মাইর খাইলেও মনে হয় বাঁইচা যাবে...

অর্জুন কয় আপনে গিয়া তার সংবাদ নিয়া আসেন। আমি থাকি...

ভীম কয়- তুই যা। আমি মাঠ ছাইড়া গেলে পাব্লিকে কইব আমি ডরাইয়া ভাগছি...

কৃষ্ণ কয়- হ। ভাই ভীম বাঁইচা থাকতে কেউ তারে ডরালুক বলার সুযোগ দেওয়া ঠিক না। তার থিকা চলো আমরা গিয়া দেইখা আসি...

পাঁচ পাণ্ডবের মাঝে মাঠে লড়াই করে ভীম আর চাইর পাণ্ডব গিয়া আশ্রয় নেয় শিবিরে...

কৃষ্ণ আর অর্জুনরে একলগে শিবিরে দেইখা যুধিষ্ঠির খুশিতে লাফাইয়া উঠে- কর্ণরে নিশ্চয়ই মাইরা আসছ তোমরা...

খুশিতে যুধিষ্ঠির লাফাইতেই থাকে কাউরে কিছু বলতে না দিয়া- যে গাড়োয়ানের পোলার ডরে আমার পুরা জগৎ অত দিন কর্ণময় আছিল। আরেকটু হইলে আইজ যে আমারে মাইরাই ফালাইত...। সাবাশ অর্জুন সাবাশ...

যুধিষ্ঠির নিশ্চিত যে কর্ণরে না মাইরা কৃষ্ণ আর অর্জুন শিবিরে ফিরে নাই। নিজের উচ্ছ্বাসরে আরেকটু চাগাইয়া নিতে এইবার সে গিয়া অর্জুনরে ধরে- ক তো ভাই; কেমনে মারলি তুই পাপিষ্ঠ কর্ণরে; আমারে একটু বিস্তারিত বর্ণনা শোনা তো ভাই। যার ডরে আমি তেরো বচ্ছর শান্তিতে ঘুমাইতে পারি নাই; যার ভরসায় ধৃতরাষ্ট্র আর দুর্যোধন আমাগো পাঁচটা গ্রামের অনুরোধও ফিরাইয়া দিছিল সেই কর্ণরে কেমনে তুই মারলি আমারে একটু ক...

কৃষ্ণ আর অর্জুন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। যুধিষ্ঠির অর্জুনরে ঝাঁকায় কর্ণ হত্যার বিস্তারিত জানতে। অর্জুন তারে ধুনফুন বোঝায়- ভাইজান আমি আইজ বহুত মানুষ মারছি। অশ্বত্থামারে মাইরা ফালাফালা কইরা দিছি...

যুধিষ্ঠির কয়- সেইটা তো ডেলি ডেলি করস; কর্ণরে কেমনে মারলি সেইটা ক...

অর্জুন কয়- কর্ণের অস্ত্র চালনা যে কী জিনিস আইজ নিজের চোক্ষে তা আমি দেখছি ভাইজান...

যুধিষ্ঠির কয়- সেইটা আমিও দেখছি কিন্তু তুই কেমনে কী করলি সেইটা ক...

অর্জুন কয়- শুনছি আপনি কর্ণের আক্রমণে আহত হইছেন...

যুধিষ্ঠির কয়- পিরায় মাইরাই ফালাইছিল আমারে কিন্তু সেইটা কোনো বিষয় না। তুই কেমনে কর্ণরে কাবু করলি সেইটা ক...

অর্জুন আমতা আমতা করে- আমি আসছি আপনেরে দেখতে ভাইজান। ফিরা গিয়া মারব কর্ণরে...

ধপাস কইরা বইসা পড়ে যুধিষ্ঠির- সবাইরে কর্ণের হাতে ছাইড়া জান নিয়া পলাইয়া আসছ তোমরা? অর্জুন তুই মায়ের গর্ভরে কলঙ্কিত করলি আইজ। অথচ তোর ভরসাতেই আমি কর্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সাহস করছিলাম। ...থুক দেই তোর গাণ্ডিবের বড়াইরে। তুই যদি কর্ণরে এতই ডরাস তয় তোর গাণ্ডিব অন্য কাউরে দেস না ক্যান? ছি ছি ছি। জন্মের আগে ক্যান কুন্তীর গর্ভেই মইরা গেলি না তুই?

এই ধিক্কার সহ্য হয় না অর্জুনের। তার হাতে উইঠা আসে তলোয়ার। কৃষ্ণ থাবা দিয়া ধরে- করোটা কী?

অর্জুন তড়পায়- যে আমার গাণ্ডিব নিয়া কথা কয় তার ধড়ের উপরে মাথা থাকার কোনো অধিকার নাই...

- হ মার। কৃষ্ণ ওরে ছাড়ো। ও আমার শরীর থাইকা মাথাটা নামাইয়া দেউক। সেইটাই বরং কর্ণরে জীবিত রাইখা বাঁইচা থাকার চেয়ে আমার লাইগা সম্মানজনক আর অর্জুনের লাইগাও ভালো। কারণ ওর পক্ষে যেহেতু অস্ত্রধারী কর্ণরে মারা সম্ভব না; সেই হেতু আমার মতো নিরীহরে মাইরাই ওরে গর্ব করতে দেও। কাট। মাথাটা কাইট্টা ফালা আমার। কাপুরুষ অর্জুনের ভাই হইয়া বাঁইচা থাকার চেয়ে ছোট ভাইয়ের তলোয়ারে মইরা যাওয়া অনেক সম্মানের...

কৃষ্ণ অনুমানও করতে পারে নাই বিষয়টা অত দূর যাবে। অর্জুনরে সে সরাইয়া নিয়া আসছে যুদ্ধের মাঠ থিকা। সেইটাই অর্জুনের লাইগা যথেষ্ট অপমানের আছিল। তার উপর যুধিষ্ঠিরের এই খোঁচা। কিন্তু অর্জুন অতটা খেইপা উঠব ভাবতেও পারে নাই সে। অর্জুনরে সে ঝাড়ি লাগায়। যুধিষ্ঠিররে তেলায়। কিন্তু কেউ থামে না। অর্জুন কয়- তুমি যে কথা কইলা সেইটা যদি ভীম আমারে কইতেন তবে আমি তা মাইনা নিতাম। কারণ ভীম নিজে যুদ্ধের মাঠে আছে। কিন্তু কর্ণের ডরে পলাইয়া আইসা আমারে এমন কথা কেমনে কও তুমি?

যুধিষ্ঠির কয়- যা করার তা তো ভীমই করে। কিন্তু এই জীবনে তুমি আর তোমার গাণ্ডিব কোন কামটায় লাগছে আমার?

কৃষ্ণ কাউরে থামাইতে পারে না। অর্জুন জীবনেও যুধিষ্ঠিরের মুখে মুখে তর্ক করে নাই; খারাপ কথা কওয়া তো দূরের কথা। কিন্তু আইজ অর্জুনের কথা বাঁধ ভাইঙ্গা পড়ে- শত শত রথী-মহারথীরে হারাইয়া আমি দ্রৌপদীরে জয় করছিলাম; তুমি আমার সেই বৌরে নিয়া শুয়াইছ নিজের বিছানায়। তোমারে সম্রাট বানাইবার লাইগা ভীম আর আমি আশপাশের সব রাজারে তোমার অধীন করছি। আমার কারণেই তুমি রাজসূয় যজ্ঞ কইরা সম্রাট বনছিলা। আমি নিজে কৃষ্ণরে নিয়া যে ইন্দ্রপ্রস্থ রাজ্য বানাইছিলাম তোমার জুয়ার নেশায় তা হারাইয়া বনবাসে যাইতে হইছে। তোমারে আবারও রাজা বানাইবার লাইগা

যুদ্ধে আমার দুই-দুইটা পোলা মরছে। আর তুমি কও আমি কোনো কামে লাগি নাই তোমার?

কৃষ্ণ অর্জুনরে ঠেইলা নিয়া যায় বাইরে- চুপ কইরা বইসা থাকো এইখানে। সারা জীবন ধইরা যখন যুধিষ্ঠিররে কিছু কও নাই তখন এখন কওয়া ইত্রামি। বইসা ভাবো কিছুক্ষণ। কর্ণ জীবিত শুইনা যুধিষ্ঠিরের রাগ হইতেই পারে; কারণ যুদ্ধের আগে কর্ণ ছাড়া অন্য কারো কথা ভাবে নাই সে। বইসা ভাবো...

অর্জুনরে বাইরে বসাইয়া কৃষ্ণ আইসা যুধিষ্ঠিরের সামনে খাড়ায়- অর্জুনরে মাঠ থাইকা আমি সরাইয়া নিয়া আসছি যাতে সে একটু বিশ্রাম নিতে পারে। কর্ণ টানা কয়েক দিন ধইরা যুদ্ধ করতাছে; বিকাল পর্যন্ত যুদ্ধ করলে সে কাহিল হইব; তখন নতুন তেজে অর্জুন তার সামনে খাড়াইলে তারে কাবু করা যাবে। কর্ণ সহজ যোদ্ধা না সেইটা আপনেও জানেন। খালি খালি তার সামনে যাওয়া আর আত্মহত্যা করা এক সমান। তাই আমি অর্জুনরে তার সামনে নিতে চাই না যতক্ষণ পর্যন্ত না কর্ণরে পরাজিত করার সময় আসে। আর আপনার ভুইলা যাওয়া উচিত না যে আমি অর্জুনরে পাইলা-পুইষা রাখতাছি খালি কর্ণের লাইগা। এমন উল্টাপাল্টা কথা কওয়া ঠিক হয় নাই আপনার। কারণ আপনার এই সমস্ত কথায় যদি অর্জুন আউলা হইয়া উঠে তবে কর্ণের সামনে গেলে হিতে বিপরীতও হইতে পারে...

যুধিষ্ঠিরের রাগ কমে নাই। সে কয়- তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু সে আমারে কইলোটা কী তুমি শুনলা?

কৃষ্ণ কয়- শুনছি কিন্তু কানে তুলি নাই। ধইরা নেন তা আপনেও শোনেন নাই। অর্জুন আপনের কাছে মাপ চাইব। আপনি তারে খুশি কইরা দিবেন এইটাই আমার শেষ কথা। আমি আপনার কাছে রাজা যুধিষ্ঠিরের আচরণ চাই; যে

যুদ্ধের সময় তার দরকারি সৈনিকের মাথা আউলা করে না। আমি অর্জুনরে নিয়া আসতাছি...

কৃষ্ণ বাইরাইয়া যায়। অর্জুন ঝিমায়। কৃষ্ণ জিগায়- কিছু ভাবলা?

- ভাবছি। তলোয়ার যখন খুলছি তখন একটা না একটা মাথা তো কাটতেই হবে। ভাইজানেরটা যেহেতু কাটতে পারব না সেহেতু নিজেরটাই কাটার সিদ্ধান্ত নিছি...

- তাইলে তো যুধিষ্ঠিরের কথাই ঠিক। কর্ণের ডরে ভাইগা আইসা শরমে অর্জুনের আত্মহত্যা...

অর্জুন খেইপা উঠে কৃষ্ণের উপর- তোমার লাইগাই আইজ আমার এত অপমান। আমি তোমারে কইছিলাম মাঠ ছাইড়া গেলে পাব্লিকে কইব আমি ডরাইছি। তুমিই আমারে জোর কইরা নিয়া আসছ এইখানে। আইজ সারা দিন ধইরা কর্ণ আমারে বিছরায় আর তুমি আমারে নিয়া পলাও। তার থাইকা তো ভালো ছিল কর্ণের লগে যুদ্ধ কইরা মইরা যাওন...

- তাইলে এখন কর্ণের সামনে যাইতে ডরাইতাছ ক্যান?

কৃষ্ণের মুখে এই কথা হজম করা অর্জুনের লাইগা কঠিন। অর্জুন তলোয়ার নিয়া লাফ দিয়া খাড়ায় কৃষ্ণের সামনে। কৃষ্ণ সইরা গিয়া হাসে- কর্ণরে জ্যান্তা রাইখা একবার যুধিষ্ঠিরের গলায়; একবার নিজের গলায় আর আরেকবার আমার গলায় তলোয়ার ধরা; এইগুলার মানে বোঝো অর্জুন? উল্টাপাল্টা ছাইড়া চলো মাঠে যাই; কর্ণের সামনে...

অর্জুন রওনা দেয় কিন্তু কৃষ্ণ থামায়- আগে ভিত্রে চলো। বড়ো ভাইর কাছে তোমার মাপ চাওয়া লাগবে...

অর্জুন কথা তুলতে চায়। কৃষ্ণ দাবড়ানি দেয়- কোনো কথা শুনতে চাই না। কর্ণের ডরে যুধিষ্ঠির যা ইচ্ছা বলতে পারেন; কিন্তু তোমারও তার মতো অত আউলা হওয়া সাজে না। চলো...

অর্জুন আইসা পায়ে পড়ে যুধিষ্ঠিরের- এর পরে যদি আপনার সামনে আইসা খাড়াই তবে জানবেন কর্ণ মৃত আর যদি আমারে দেখতে না পান তবে জানবেন কর্ণের লগে যুদ্ধ কইরা অর্জুন মারা গেছে কিন্তু পলাইয়া আসে নাই...

যুধিষ্ঠির তারে জড়াইয়া ধরে- মাথাটা আউলা হইয়া গেছে রে ভাই। তরে বহুত কিছু কইছি। আমারে মাপ কইরা দিস...

অর্জুনরে নিয়া কৃষ্ণ যাইতে যাইতে কয়- অর্জুন তুমি বহুত বড়ো যোদ্ধা কিন্তু ভুলেও কর্ণরে অবহেলা কইরো না। মনে রাইখো; কর্ণের উদ্দেশ্য যুদ্ধজয় না; বীরত্ব দেখানো। কিন্তু তোমার উদ্দেশ্য যুদ্ধজয়...

সেই ভোর থাইকা কর্ণ অর্জুনরে খুঁইজা বেড়াইছে আর পথে পথে যুদ্ধ করছে অন্যদের লগে। কিন্তু এখন যখন কর্ণ অন্যদের লগে যুদ্ধে ব্যস্ত তখন কৃষ্ণের রথ চোখে পড়ে শল্যের। সে কর্ণরে কয়- সারা দিন ধইরা যারে খুঁজতাছিলা সে এখন তোমার দিকেই আসতাছে কর্ণ...

কিন্তু অর্জুন আসে না। অর্জুনের রথ আসতে আসতে আবার ঘুইরা ভীমের কাছে গিয়া যুধিষ্ঠিরের কুশল সংবাদ জানায়; ভীমের যুদ্ধে হাত লাগায় আর কর্ণের দিকে আগাইয়া আসে পাঞ্চাল বাহিনী...

আবারো অর্জুনের রথ আগাইতে থাকে কর্ণের দিকে। তার পিছনে ভীম। তির মারতে মারতে ভীমরে ঠেকাইতে আসে দুঃশাসন। তিরাতিরিতে দুইজনই আহত হয়। দুইজনই তির ছাইড়া বর্শা আর গদার মারামারিতে যায়। মাথায়

ভীমের গদার বাড়ি খাইয়া মাটিতে গড়ায় দুঃশাসন। দুঃশাসনের উপর ভীমের প্রচুর রাগ। এই ব্যাটাই চুলের মুঠি ধইরা দ্রৌপদীরে টাইনা আনছিল রাজসভায়; এই ব্যাটাই রাজসভায় দ্রৌপদীরে বিবস্ত্র করছিল সকলের সামনে...

দুঃশাসন পইড়া আছে চিত হইয়া। রথ থাইকা একটা তলোয়ার নিয়া নামে ভীম। পা দিয়া দুঃশাসনের গলা চাইপা তলোয়ার চালাইয়া দেয় দুঃশাসনের বুকে। রক্ত যখন ফিনকি দিয়া বাইরাইয়া আসতাছে তখন হাতের অঞ্জলি নিয়া ভীম পান করে দুঃশাসনের রক্ত। ভীম থামে না। তলোয়ারের কোপে দুঃশাসনের মাথা আলগা কইরা তুইলা ধরে মুখের উপর; তারপর মুন্ডু থাইকা গড়াইয়া নামা রক্ত খাইতে থাকে গলগল করে...

বেকুবের মতো সকলে তাকাইয়া থাকে। এমনকি কৃষ্ণ অর্জুন কর্ণ। অত দিনের যুদ্ধে বহু মানুষ মারা গেছে বহু মানুষের হাতে। ভীমের হাতেও মারা গেছে অসংখ্য মানুষ কিন্তু এমন দৃশ্য কেউ দেখে নাই...

কর্ণের দিকে যাইতে যাইতে অর্জুনের রথ আরেকবার গতি বদলায়। গিয়া হাজির হয় কর্ণপুত্র বসুসেনের সামনে। বসুসেন যুদ্ধ করতাছিল অন্যদের লগে। কৃষ্ণ অর্জুনরে কয়- এরে ফালাও...

অর্জুনের আকস্মিক তিরে মারা যায় কর্ণপুত্র বসুসেন। পোলার লাশ কোলে নিয়া হাহাকার করে কর্ণ আর ঠিক তখন তার সামনে গিয়া খাড়ায় কৃষ্ণার্জুনের রথ...

অবশেষে কর্ণ আর অর্জুন মুখামুখি। শল্য একেবারে চুপ; তার মুখে কোনো গালি উঠে না কর্ণের নামে; কোনো প্রশংসাও করে না সে অর্জুনের। এমন যুদ্ধে সারথি হওয়া কপালের বিষয়। নিশ্চুপ শল্য তার ম্যাজিক দেখায় ঘোড়ার লাগামে এইবার...

অর্জুন কয়- কৃষ্ণ আইজ হয় কর্ণের বৌয়েরা বিধবা হবে না হয় ফিরা গিয়া তোমার পিসি কুন্তী; বোন সুভদ্রা; সখী দ্রৌপদী আর রাজা যুধিষ্ঠিররে সান্ত্বনা দিবা তুমি...

নিরুত্তাপ কৃষ্ণ কয়- আমি কী করব না করব সেইটা আমি বুঝব। তুমি তোমার কাম করো। অত আবেগি হইও না। মনোযোগ দিয়া কর্ণরে দেখো...

কর্ণ অর্জুন একে অন্যরে চক্কর দেয়। শত্রুমিত্র যুদ্ধ থামাইয়া দুই যোদ্ধার পক্ষে দর্শক হইয়া খাড়ায়। দুই পক্ষই নিশ্চিত এই লড়াইয়েই নির্ধারিত হবে যুদ্ধের পরিণাম। দুই পক্ষই নিজের পক্ষে আশাবাদ রাখে আর বিপক্ষের ক্ষমতায় ডরায়। ডরে কাঁপে পাণ্ডব। ডরে কাঁপে কৌরব। সকল শত্রুতা আর হিংসা ভুইলা দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা গিয়া দুর্যোধনের হাত ধরে- দোস্ত ক্ষেমা দেও। যথেষ্ট হইছে। আমি অনুরোধ করলে অর্জুন থামব। কৃষ্ণও বিরোধ চায় না। তুমি খালি একবার শান্তির কথা কও; আমি কর্ণরেও থামামু অনুরোধ করে...

দুর্যোধন স্থির- বহু দেরি হইয়া গেছে দোস্ত। ভীম যেমনে দুঃশাসনরে মারল তাতে শান্তির আর কোনো পথ নাই। কর্ণরে বারণ কইরো না তুমি...

ততক্ষণে কর্ণ আর অর্জুনের অস্ত্র বিনিময় শুরু হইয়া গেছে। কর্ণের ধনুক সাড়ে চাইর হাত দীর্ঘ আর অর্জুনের ধনুক চাইর। কর্ণের তিরে লোহার ফলা ছোট আর অর্জুনের তিরে দীর্ঘ। কর্ণের হালকা তির যায় বহুদূর আর অর্জুনের ভারী

তির ধ্বংসাত্মক বেশি। কর্ণ আহত আর টানা কয় দিনের যুদ্ধে প্রচুর কাহিল। অর্জুন বিশ্রামে তরতাজা কিন্তু অতি উত্তেজনায় বেসামাল...

কুড়ালি পরশুরামের শিষ্য কর্ণ প্রায় তিরের সমান দূরত্বে নিক্ষেপ করতে পারে বর্শা। অর্জুনের তির গায়ে বিঁধে না কর্ণের কিন্তু কর্ণের বেশ কিছু তির আর বর্শার আঘাত আইসা বিঁধে অর্জুনের গায়...

অত দিন বিনা বিশ্রামে যুদ্ধ করা ভীমও এখন দর্শক। অর্জুনরে আহত হইতে দেইখা খেইপা উঠে সে- তুমি মাইর খাইতাছ কেন অর্জুন? সামলাইতে না পারলে সইরা খাড়াও। আমিই গাড়োয়ানের পোলারে গদা নিয়া পিটাই...

কৃষ্ণও খাঁকারি দিয়া উঠে- করতাছ কী তুমি? এখন পর্যন্ত একটাও তির বিন্ধাইতে পারো নাই। হয় ঠিকমতো কাম করো না হয় ভাগো। আমিই চক্র নিয়া নামি কর্ণের সামনে...

আইজ কী হইছে অর্জুনের। তার ভরসাতেই পাণ্ডবপক্ষ কর্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাবার সিদ্ধান্ত নিছে। আর আইজ যখন তার কর্ণের সামনে যাইবার সময় তখন যুধিষ্ঠির কয় ধনুক ছাড়তে; ভীম কয় সইরা খাড়াইতে; কৃষ্ণ কয় পলাইতে। এত অপমান কই রাখে অর্জুন। অর্জুন চোখ বন্ধ কইরা সব ভুইলা যাইতে চায়। তারপর ধীর ধৈর্যে হাতে তুইলা নেয় দীর্ঘ আর ভারী এক তির...

শত্রুর নিশানা এড়াইয়া বাতাসের বেগে চক্কর খায় কৃষ্ণ আর শল্যের রথ। কৃষ্ণ রথ চালায় অদ্ভুত। শল্য কম না মোটেও। এই মুহূর্তে শল্য যেন শুধুই কর্ণের সারথি। অথবা কর্ণের কথা ভুইলা সে রথ চালায় কৃষ্ণরে পাল্লা দিয়া। এর মাঝে স্বয়ং রাজা যুধিষ্ঠিরও আইসা খাড়াইছে দর্শক সারির ভিতর...

অর্জুন সুযোগ খোঁজে। অর্জুন তার তির ছাড়ে কিন্তু কর্ণের ঢালে তা ফিরে যায়। ভীমের চোখে পড়ে ঢাল দিয়া ফিরাইলেও এই আঘাতে কর্ণের ঢাল বিদ্ধ হইছে। ভীম চিৎকার কইরা উঠে- একই তির আবার মারো অর্জুন...

অর্জুন বিনা চিন্তায় আবারো প্রক্ষেপ করে সেরকম আরেকটা তির। কিন্তু ব্যর্থ। অর্জুনের একটা তিরও আঘাত করতে পারে না কর্ণের দেহে...

অর্জুন পাগলের মতো তির মারতে থাকে কর্ণের দিকে। তির ধরা আর তির ছোঁড়ায় প্রায় কোনো সময় ব্যবধান থাকে না তার। একটা তির লক্ষ্যে পৌঁছাইবার আগেই গুন থিকা বাইর হইয়া যায় আরো দুইটা তির। আর এই পাগলা তিরানোর ফলে ঠাস কইরা ছিঁড়া যায় তার গাণ্ডিব ধনুকের ছিলা...

এইবার শুরু হয় কর্ণের তির বৃষ্টি; ঝাঁকে ঝাঁকে কর্ণের ক্ষুদ্রক বাণে ছেয়ে যায় কৃষ্ণার্জুনের রথ। অতি ক্ষুদ্র তির; হত্যা করে না কিন্তু ঝাঁজরা কইরা দেয়। আর মাঝে মাঝে কর্ণ ছোঁড়ে বক্ষ বিদীর্ণকারী তার দীর্ঘ লোহার তির; নারাচ...

গাণ্ডিবে নতুন ছিলা পরাইতে পরাইতে অর্জুন আহত। কৃষ্ণও জর্জর কর্ণের তিরে...

নতুন ছিলা নিয়া অর্জুনের তির বৃষ্টিতে কর্ণ কিছুটা আচ্ছন্ন হয়। আহত হয় শল্য। আশপাশের সবাই দূরে সইরা যায়। শুধু খাণ্ডব দাহনের সময় অর্জুন আর কৃষ্ণ যে নাগ জাতিরে উচ্ছেদ করছিল পিতৃভূমি থাইকা; সেই জাতির

নাগপুত্র অশ্বসেন কাছে আইসা কর্ণের হাতে তুইলা দেয় এক দীর্ঘ আর ভারী তির। প্রায় বর্শা আকারের এই তিরের ফলা চ্যাপটা আর ধারালো। কাছ থিকা কারো উপর মারলে হাড় পর্যন্ত ভাইঙ্গা ফালাইতে পারে; আর গলায় গিয়া আঘাত করলে তার কার্যকারিতা তলোয়ারের কোপের সমান...

কর্ণের হাতে এই তির দেইখা হাহাকার কইরা উঠে সকলে। শল্য ভয় পাইয়া কয়- এই তির দিয়া তুমি অর্জুনের কিছু করতে পারবা না...

কর্ণ কয়- আমি একবার কোনো তির হাতে নিলে তা আর বদলাই না। তুমি অর্জুনের কাছে যাও...

অর্জুন বোঝে না কর্ণের তিরের মর্ম। সে ছোট তির দিয়া বৃষ্টি চালায়। আর অর্জুনের তির বৃষ্টির ফাঁকে খুব কাছ থাইকা কর্ণের সাড়ে চাইর হাত দীর্ঘ ধনুক ফুঁড়ে অর্জুনের দিকে নিক্ষিপ্ত হয় লোহার ভারী একটা তির...

তীরটা খেয়াল করে কৃষ্ণ। চাবুকের এক বাড়িতে ঘোড়া দাবড়াইয়া সে নিজের রথরে নিয়া কাত কইরা ফালায় খাদে আর আরেক হাতে থাবা দিয়া অর্জুনরে বসাইয়া দেয় নীচে...

কৃষ্ণের থাবা খাইয়া বেকুব অর্জুন বসতে বসতে আবিষ্কার করে কর্ণের তিরের আঘাতে তার মাথার মুকুট ভাইঙ্গা গিয়া পড়তাছে দূরে। কর্ণ তিরটা মারছিল তার গলা বরাবর। কৃষ্ণ থাবা দিয়া বসাইয়া না দিলে অতক্ষণে কর্ণের তিরে গলাটাই কাটা পড়ত তার...

নাগ অশ্বসেন আবারও আরেকটা তির নিয়া আসে কর্ণের দিকে। কর্ণ এইবার খেয়াল করে তারে- তুমি তো আমার তির জোগালি দলের লোক না। তয় তুমি কেন আমারে তির দেও?

অশ্বসেন কয়- আমি নাগ জাতির লোক; যাদের শত্রু কৃষ্ণ আর অর্জুন। তাই তুমি আমাগো মিত্র...

কর্ণ কয়- কর্ণ কোনো দিন অন্যের শক্তি দিয়া জয়ী হইতে চায় না। জানলে তোমার আগের তিরও আমি হাতে নিতাম না। তুমি যাও...

অশ্বসেন নিজেই অর্জুনের দিকে তির মারা শুরু করে আর অর্জুন রথ থাইকা নাইমা হত্যা করে অশ্বসেনরে। যুদ্ধের নিয়ম মাইনা কর্ণ খাড়াইয়া অপেক্ষা করে অর্জুনের রথ ঠিক হইবার আর এই সুযোগে কৃষ্ণ আবার নিজের ত্যাড়া রথ খাড়া করে মাটির উপর...

যুদ্ধ চলতে থাকে। দুইজনই আহত হইতে থাকে। কর্ণের মুকুট যায়। শরীরে তির খায়। আর এক সুযোগে অর্জুন একটা ভারী তির বিদ্ধ কইরা ফালায় কর্ণের বুকে। কর্ণ টইলা উঠে। হাত থিকা ধনুক পইড়া যায়। যুদ্ধের নিয়ম মাইনা অর্জুন তির থামাইয়া দেয়। কিন্তু কৃষ্ণ ধাতানি দিয়া উঠে- থামলা কেন অর্জুন? বেকুবি কইরো না। বুদ্ধিমানরা শত্রুর দুর্বল সময়রে কামে লাগায়। মারো। তির মারো। না হইলে একটু পরেই কর্ণ মারব তোমারে...

কৃষ্ণের কথায় অর্জুন তির চালায় ধনুকহীন কর্ণের উপর। কিন্তু কর্ণ সামলাইয়া উঠে। অর্জুন আর কৃষ্ণের উপর আবারো আইসা পড়তে থাকে কর্ণের তির...

তিরন্দাজরা ঢালের তেমন সুযোগ নিতে পারে না। দুই হাতই ব্যস্ত থাকে তিরে আর ধনুকে। প্রতিপক্ষের তিরের বিপরীতে তিরন্দাজের মূল ভরসা গায়ের বর্ম; লাফ দিয়া তিরের লাইন এড়াইয়া চলা আর রথের উপর থাকলে সারথির ক্ষিপ্রতা। তিরন্দাজরা যখন আহত হয় তখন সারথির ক্ষিপ্রতার উপরই নির্ভর করে তাগো আবার উইঠা দাঁড়ানোর অবসর। সারথিরা রথ চক্কর দেয় আর সেই সুযোগে শরীর থাইকা তির খুইলা আবার খাড়ায় তিরন্দাজ...

কর্ণ আর অর্জুনরে তিরাতিরি এখন বন্ধ। দুইটা রথ এখন বেশ দূরে দূরে চলে। কর্ণার্জুন দুইজনই আহত। দুজনেই ক্লান্ত। দুজনেরই কারো হিসাব মিলে নাই। দুজনেরই দূরপাল্লার ক্ষুদ্র তির যেমন দুজনের বর্মে ব্যর্থ হইছে তেমনি নিকট যুদ্ধে দুজনের ভারী অস্ত্রও ব্যর্থ হইছে সারথির কৌশলে। ঘটার হাতে আহত কর্ণের সুবিধা যেমন পাইতাছে না অর্জুন তেমনি নিজে কম লড়াই কইরা তরতাজা থাকারও কোনো ফলাফল দেখাইতে পারতাছে না সে...

কুরুক্ষেত্রের মাঠে ম্যাজিকের মতো একের নিশানার ফাঁক গইলা চক্কর মারে কৃষ্ণ আর শল্যের রথ। চক্কর মারতে মারতে অর্জুনরে নিয়া কৃষ্ণ পিছাইতে থাকে। কুরুক্ষেত্রের পুরা মাঠ কৃষ্ণের নখদর্পণে। চক্কর দিতে দিতে তিরের নিশানার বাইরে থাইকা কৃষ্ণ দূরে সইরা যায়। কৃষ্ণ দূরে যায় অর্জুনরে নিয়া আর শল্য আগায় কর্ণরে নিয়া। যাইতে যাইতে কৃষ্ণ গিয়া খাড়ায় ছোট এক জায়গায়। কৃষ্ণ এমনভাবে খাড়ায় যে শল্য সোজা ধাওয়া দিয়া আসে তার দিকে। আর অর্জুনের দিকে সোজা রথ দাবড়াইতে গিয়া শল্য রথের চাকা ঢুকাইয়া দেয় কাদায়...

কর্ণের রথ ত্যাড়া হইয়া আটকাইয়া যায় আর শল্যরে ঠিকমতো কাদায় গাড়তে পাইরা হাইসা উঠে কৃষ্ণ। কিন্তু এতে কর্ণ বিচলিত না। কারণ যুদ্ধের

নিয়ম অনুযায়ী কোনো যোদ্ধার রথ আটকাইয়া গেলে তাৎক্ষণিক যুদ্ধবিরতি। কেউ কোনো আঘাত করব না এখন...

কাইত হইয়া থাকা রথে অস্ত্র নামাইয়া খাড়াইয়া থাকে কর্ণ। কিন্তু হঠাৎ সে আবিষ্কার করে বিশাল ভারী এক তির বাগানো অর্জুনরে নিয়া কৃষ্ণের রথ কাছে আসতাছে তার। কর্ণ চিৎকার কইরা উঠে- কাপুরুষের মতো নিয়ম ভাঙতাছো ক্যান অর্জুন? অস্ত্র নিয়া জায়গায় খাড়াও। আমার রথটা উঠাইতে দেও...

অর্জুন কিছু কয় না। কৃষ্ণ চিক্কুর দেয়- যুদ্ধের একমাত্র নিয়ম হইল শত্রু মারা কর্ণ। পারলে ঠেকাও...

মুহূর্তে ধনুক তুইলা নেয় কর্ণ। আর অর্জুন বাণ চালাইবার আগেই একটা ভারী তির বিন্ধাইয়া দেয় অর্জুনের বাহুর ভিতর...

মাথা চক্কর দিয়া হাত থিকা গাণ্ডিব পইড়া যায় অর্জুনের। কর্ণ আর অস্ত্র চালায় না। অস্ত্র ছাইড়া নিজেই নাইমা ঠেলা দেয় রথের চাকায়। সারথির পোলা সে; আটকানো রথের চাকা কেমনে তুলতে হয় সে জানে। কিন্তু কাদাটা বড়োই কঠিন...

কর্ণ রথের চাকা ঠেলে আর কৃষ্ণ ঠেলে অর্জুনরে- উঠো। তির চালাও...

যুদ্ধের আগের রাত্তিরে কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের সাক্ষাতে যুদ্ধের যে নিয়মগুলা ঠিক করা হইছিল; কাদায় আটকানো রথের চাকা ঠেলতে ঠেলতে কর্ণ ভাবতেই পারে নাই তারে কাদাতে ফালাইয়া সেই নিয়মগুলা লঙ্ঘন করব কৃষ্ণ। কর্ণ

রথের চাকা ঠেলে আর কৃষ্ণ অর্জুনরে নিয়া আইসা খাড়ায় তার কাছে। একদম কাছে...

কৃষ্ণের চোখে চোখ রাখে কর্ণ। কৃষ্ণ চোখ সরাইয়া নেয়। ততক্ষণে অর্জুনের ধনুকের ছিলা থাইকা বাইরাইয়া গেছে চ্যাপটামুখ ভারী অঞ্জলিক তির। তিরের দিকে তাকাইয়া কর্ণ একটা হাসি দেয়। তার হাসিমুখ বন্ধ হয় না আর। অর্জুনের তিরটা আইসা বিদ্ধ হয় কর্ণের শ্বাসনালির ভিতর...

শল্য নির্বাক। কর্ণ অর্জুনের যুদ্ধ বেশিক্ষণ সহ্য করতে না পাইরা যুধিষ্ঠির ফিরা গেছিল শিবিরে। অর্জুন শিবিরে গিয়া তার পায়ে ধইরা খাড়ায়- প্রতিজ্ঞা বিফল হয় নাই ভাই...

কৃষ্ণের রথে উইঠা অর্জুনের লগে যুধিষ্ঠির আইসা হাজির হয় মৃত কর্ণের সামনে- শান্তিতে ঘুমাও বীর...

সবাই অস্ত্র নামাইয়া রাখছে বহুক্ষণ আগেই। এখন না আর কেউ ভাবে অস্ত্র তোলার কথা; না ভাবে কেউ যুদ্ধসমাপ্তি ঘোষণার কথা। পাণ্ডবরা বিশ্বাস করতে পারে না যে কর্ণ নাই তাই পাণ্ডব শিবিরে কোনো বিজয়োল্লাস করে না কেউ। কুরুপক্ষ বিশ্বাস করতে পারে না যে কর্ণ নাই তাই কুরুপক্ষেও হাহাকার করতে পারে না কেউ। শুধু থাইকা থাইকা শোনা যায় দুর্যোধনের মাতম- হা কর্ণ। বন্ধু আমার। আমার ভাই...

১৯

দুর্যোধন পলাইছে। শল্য মরার পরপরই ভাগল দিছে দুর্যোধন...

কর্ণ মরার রাত্তিরে কৃপাচার্য আইসা দুর্যোধনরে কইছিলেন যুদ্ধ বাদ দিয়া দিতে। কিন্তু দুর্যোধনের কথা হইল- যুদ্ধ বাদ দিয়া আমার লাইগা যারা মরছে তাগো প্রতি অসম্মান দেখাইতে পারি না আমি। আমি শান্তিবাদী বুড়া হইয়া মরতে চাই না গুরু কৃপাচার্য। হয় আমি রাজা হইয়া মরব না হয় যুদ্ধ কইরা মরব সৈনিকের মতো...

আঠারো নম্বর দিন কুরুপক্ষ শুরু করছিল শল্যরে সেনাপতি কইরা আর পাণ্ডবরা শুরু করছিল শল্য মারার পরিকল্পনা কইরা...

সহদেব মারে শল্যের পোলারে। ভীম মারে শল্যের ঘোড়া; শল্যের সারথি। কৃপাচার্য শল্যরে সরাইয়া নিলে পাণ্ডব বাহিনী আবারো গিয়া তারে ধরে। অত দিন যে যুধিষ্ঠির মেন্দামারা রাজা হইয়া আছিল; কর্ণ মরার পরে সেও আইজ বিশাল এক বীর। সে সকলরে ডাইকা কয়- তোমরা সকলেই বহুত বীর মারছ। আইজ মোরে শল্য মারার সুযোগখান দেও...

যুদ্ধ শুরুর দিন যুধিষ্ঠির শল্যরে মামু কইয়া অনুরোধ করছিল সাহায্যের আর আইজ নিজেই ঘোষণা করল শল্যের সহযোগিতার পুরস্কার- নিজ হাতে মারা...

ভীম আগে; সাত্যকি ডানে; ধৃষ্টদ্যুম্ন বামে; অর্জুন পিছনে আর মাঝখানে যুধিষ্ঠির। দ্বিতীয়বার অশ্বত্থামা শল্যরে সরাইয়া নিয়া গেলেও পাণ্ডবরা আবার গিয়া তারে ধরে...

শল্য যুধিষ্ঠিরের ঘোড়া মারে। ভীম মারে শল্যের ঘোড়া। শল্য ঢাল আর তলোয়ার নিয়া আগাইলে ভীম শাবল দিয়া ফালাইয়া দেয় শল্যের ঢাল-তলোয়ার আর যুধিষ্ঠির তার বুকে ঢুকাইয়া দেয় একখান বর্শা...

কুরু সৈনিকদের পলায়ন আর ঠেকাইতে পারে না কেউ। দুর্যোধনের কথায় তারা একবার অস্ত্র ধরে তো আরেকবার দেয় দৌড়। দুর্যোধনের শেষ হাতি বাহিনীও ভীম শিখণ্ডী সাত্যকি আর ধৃষ্টদ্যুম্নের হাতে বিনাশ হইলে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ সাংবাদিক সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্ররে সংবাদ সাপ্লাই বাদ দিয়া চাইরজন অনুচর নিয়া খাড়ায় ধৃতরাষ্ট্রের পোলাদের পক্ষে...

অর্জুন তাগো হাতে-পায়ে মারে তির; সাত্যকি তাগো লাঠি দিয়া পিটায়...

অর্জুন হিসাব করে কৃষ্ণের লগে- ধৃতরাষ্ট্রের পোলাগো মাঝে বাকি আছে দুর্যোধন আর সুদর্শন। তাগো দুই ভাইর লগে আছে অশ্বত্থামা কৃপাচার্য সুশর্মা শকুনি উলুক আর কৃতবর্মা; এই ছয়জন। আর কিছু ঘোড়া এবং পদাতিক...

হিসাব শেষ কইরা অর্জুন সাত্যকিরে কয়- আমার মনে লয় দুর্যোধন ভাগল দিছে। সঞ্জয়রে প্যাঁদানি দিলে তার সংবাদ পাওয়া যাবে। এ কুরুপক্ষের সবকিছু জানে...

পাণ্ডবগো ঝাড়া আক্রমণে অর্জুনের হাতে মরে সুশর্মা; ভীমের হাতে মরে সুদর্শন; সহদেবের হাতে মরে শকুনি আর শকুনিপুত্র উলুক। বাকি থাকে মাত্র চাইরজন; কৃপাচার্য অশ্বত্থামা কৃতবর্মা আর দুর্যোধন। এবং এই চাইরজনই দিছে ভাগল...

পিছমোড়া কইরা হাত বাইন্ধা ধৃষ্টদ্যুম্নের লগে সাত্যকি সঞ্জয়রে পিটায়- দুর্যোধন কই?

এর মাঝেই শোনা যায় একটা ধমক- খবরদার...

স্বয়ং কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন খাড়া সাত্যকি আর ধৃষ্টদ্যুম্নের সামনে- সঞ্জয়রে ছাড়ো...

দ্বৈপায়নের আদেশে মুক্তি পাইয়া সঞ্জয় দৌড়ায়। যাইতে যাইতে দুই মাইল গিয়া দেখে একলা একটা গদা নিয়া দুর্যোধন পলায়। দুর্যোধন কয়- তুমি গিয়া বাবারে কইও তার পোলা দ্বৈপায়ন হ্রদে লুকাইয়া আছে। আমি আর রাজ্যে ফিরা যামু না সঞ্জয়। আমার ভাই নাই; বন্ধু নাই; সৈনিক নাই; পুত্ররা মারা গেছে যুদ্ধে। এমন অবস্থায় আধমরা হইয়া বাঁইচা আছি আমি...

দুর্যোধন লুকাইয়া থাকে হ্রদের পাড়ে জঙ্গলে আর একটু পরেই সেইখানে আইসা হাজির হয় কুরুপক্ষের বাকি তিনজন; কৃপাচার্য কৃতবর্মা আর অশ্বত্থামা। অশ্বত্থামা কয়- আমরা তো এখনো মরি নাই তবে রাজার পলানোর কী কাম?

সন্ধ্যা পর্যন্ত দুর্যোধনের কোনো সংবাদ না পাইয়া যুদ্ধ শেষ বইলাই ধইরা নেয় সকলে। কুরুপক্ষের জোগানদারেরা কুরুক্ষেত্রে আর কোনো কাম নাই ভাইবা জিনিসপত্র নিয়া ফিরতে শুরু করে রাজ্যের দিকে। পাণ্ডবেরাও শিথিল...

যুদ্ধের শুরুর দিন ধৃতরাষ্ট্রের দাসীগর্ভজাত যে পুত্র পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিছিল; সেই যুযুৎসু যুধিষ্ঠিরের অনুমতি নিয়া হস্তিনাপুর রওনা দেয় পিতা আর বিদুররে সকল সংবাদ দিতে...

সন্ধ্যায় আবারও কৃপ অশ্বত্থামা আর কৃতবর্মা গিয়া হাজির হয় দুর্যোধনের কাছে- রাজা চলো আবার গিয়া যুদ্ধ করি...

দুর্যোধন কয়- কাইল সকালে যুদ্ধ করব। আইজ রাত্তিরে বিশ্রাম নেন সকলে...

অশ্বত্থামা কয়- আমি শপথ কইরা কই; আইজ রাত্তিরেই আমি একটা কিছু ঘটামু...

পাণ্ডবরা দুর্যোধনরে খুঁইজা না পাইয়া শিবিরে ফিরে...

ভীমের আছিল কিছু অতিরিক্ত অভ্যাসের সাথে কিছু মানুষের লগে বাড়তি যোগাযোগ। চোলাই মদ আর বিচিত্র শিকারের মাংসে আছিল তার দারুণ রুচি। তাই আশপাশের শিকারিরা ভালো শিকার পাইলে তা নিয়া আসত ভীমের কাছে পুরস্কারের আশায়। তার সেই শিকার জোগানদার দলের লোকরা সন্ধ্যায় বন থিকা ফিরার সময় দুর্যোধনরে দেইখা লাফাইয়া উঠে- আরে; আমাগো ভীম ভাইয়ের লগে মারামারি কইরা হুমুন্দির পুত দেখি এইখানে লুকায়...

তারা সোজা আইসা হাজির হয় ভীমের তাঁবুতে আর সন্ধ্যাকালেই পাণ্ডবেরা রওনা দেয় দ্বৈপায়ন হ্রদে। তাগোরে দেইখা কৃপাচার্য অশ্বত্থামা কৃতবর্মা সইরা যায় আর দুর্যোধন লুকাইয়া থাকে বনে...

কিন্তু হ্রদের পাড়ে অসংখ্য ঝোপঝাড়। যুধিষ্ঠির কয়- এই অন্ধকার বনে দুর্যোধনরে কই খুঁইজা পাই?

কৃষ্ণ কয়- বন তছনছ কইরা তারে পাওয়া যাবে না। আপনে চিল্লাইয়া তারে টিটকারি মারেন। দুর্যোধন মরতে রাজি হইব কিন্তু টিটকারি সহ্য করব না...

জীবনে একটামাত্রবার দুর্যোধনের মূল নাম ধইরা ডাইকা উঠে কেউ; আর সেইটা যুধিষ্ঠির- সূর্যোধন; ...নামটা তার বাপে রাখছিল বড়ো আহ্লাদ কইরা। কিন্তু অকামে-কুকামে তার সূর্যোধন নামটা বদলাইতে বদলাইতে দুর্যোধন হইয়া যায়...

বনের পাড়ে অন্ধকারে খাড়াইয়া যুধিষ্ঠির তার আদি নাম ধইরা ডাকে- সূর্যোধন। বীর সূর্যোধন কাপুরুষের মতো লুকাইয়া আছ ক্যান? আসো যুদ্ধ করো আমাগো লগে। তুমি যদি জানের ডরে পলাইয়া থাকো তয় যারা তোমার লাইগা মরল তাগো কাছে পরলোকে মুখ দেখাইবা কেমনে?

যুধিষ্ঠির চিল্লায় কিন্তু অন্য দিকে কোনো সাড়াশব্দ নাই। যুধিষ্ঠির কয়- এখন বুঝতে পারতাছি। তুমি মূলত আছিলা একটা কাপুরুষ কিন্তু করতা বীরের বড়াই...

এমন টিটকারিতে দুর্যোধনের সাড়া না দিয়া উপায় নাই। বনের ভিতর থাইকা সে চিল্লাইয়া উঠে- মুখ সামলাইয়া কথা কবা যুধিষ্ঠির। দুর্যোধন জানের ডরে পলায় নাই। আমি নিরিবিলি বিশ্রামের লাইগা এইখানে আসছি। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো; আমি তোমাগো সকলের লগেই যুদ্ধ করব...

যুধিষ্ঠির কয়- সেইটা তো আমি জানিই। আমিও তো জানি যে দুর্যোধন মরলে বীরের মতো যুদ্ধ কইরা মরব তবু কাপুরুষের মতো পলাইয়া বাঁচব না সে...

আড়াল থাইকা দুর্যোধন কয়- এর লগে বাঁচা-মরার সম্পর্ক নাই। আমার সকল আত্মীয়-বন্ধু নিহত। তাগো বাদ দিয়া রসকষহীন বিধবা দুনিয়ায় আমি বাঁচতেও চাই না আর। যত দিন ফুর্তি নিয়া রাজত্ব করা যায় তত দিন আমি তা করছি। এখন বুড়া বয়সে বিধবাভারাক্রান্ত রাজ্যের রাজত্ব তুমিই করো যুধিষ্ঠির। আমার আর কোনো দাবি নাই...

এই হইল দুর্যোধন। ডরে লুকাইয়া আছে; যুদ্ধে হাইরা ভাগছে তবু বনের আড়ালে লুকাইয়া সে রাজ্য দান কইরা দিতাছে পাণ্ডবদের; যেন আমার যা খাওয়ার খাইছি অতক্ষণ; এইবার দয়া কইরা তোমাগো ছোবড়া চুষতে দিলাম...

যুধিষ্ঠিরও খেইপা উঠে- আমি এইখানে তোমার দান নিতে আসি নাই। রাজা যদি হইতেই হয় তবে তোমারে মাইরাই তা হমু। তাছাড়া তোমার তো এখন রাজ্যই নাই; তয় তুমি কেমনে তা আমারে দান করো? এমন কাপুরুষের মতো আড়ালে থাইকা বকবক বন্ধ কইরা বাইরে আইসা যুদ্ধ করো...

বন দাবড়াইয়া উইঠা খাড়ায় দুর্যোধন- তোমরা অতগুলা মানুষ রথ আর অস্ত্রপাতি নিয়া নিরস্ত্র একলা আমার লগে যুদ্ধ করতে আসছ যুধিষ্ঠির? তোমরা যদি একজন একজন কইরা আসো তবে আমি একে একে তোমাগো সবাইরে নিশ্চিত মারব...

দুর্যোধন আধা প্রকাশ্য হইছে। যুধিষ্ঠির তারে পুরা প্রকাশ্য করার লাইগা কিছু না ভাইবাই কইয়া বসে- সাবাশ দুর্যোধন। আমি জানি যুদ্ধে ডরাও না তুমি। ঠিকাছে; আমি তোমারে কইতাছি তুমি আসো এবং তোমার পছন্দমতো অস্ত্রে আমাগো যেকোনো একজনের লগেই যুদ্ধ করো। আমাগো মধ্যে যেকোনো

একজনরে হারাইতে পারলেই তুমি তোমার কুরুরাজ্য ফিরত পাইবা; সেই নিশ্চয়তা দিতাছি আমি...

যুধিষ্ঠিরের কথায় কৃষ্ণ চমকাইয়া উঠে- হালা জুয়াড়িটা ঘাটে আইসা আবার নৌকা ডুবাইয়া দিলো। সে গিয়া যুধিষ্ঠিররে ধরে- কী কথা কইলেন আপনে? আপনি যে কইলেন যেকোনো একজনরে হারাইলেই সে রাজ্য ফিরা পাবে? আপনি তো সব ডুবাইয়া দিলেন। গদাযুদ্ধে দুর্যোধনের ক্ষমতা আপনি জানেন? সঠিক নিয়মে গদাযুদ্ধে দুর্যোধনরে হারানোর মতো কোনো মানুষ তো দূরের কথা; দেবতার নামও আমার জানা নাই...

কৃষ্ণ পুরাই হতাশ- আপনে একবার কারো লগে কোনো কথাবার্তা না কইয়া শকুনির কাছে জুয়া খেইলা সকলরে বিপদে ফালাইছিলেন। আইজ আবার আরেকটা বেকুবি কইরা পুরা যুদ্ধটাই মাটি কইরা দিলেন...

কৃষ্ণ হাহুতাশ করে- আমাগো মধ্যে একমাত্র ভীমই পারে তার সামনে খাড়াইতে। ভীমের শক্তি দুর্যোধন থাইকা বেশি। ভীমের সহ্যক্ষমতাও বেশি কিন্তু গদার লড়াইয়ে দুর্যোধন বেশি এক্সপার্ট। তাও যদি ভীম যায় আমি তারে বুদ্ধি দিয়া সাহায্য করতে পারি। কিন্তু আপনি কিংবা অর্জুন কিংবা নকুল সহদেব তার সামনে গদা নিয়া খাড়াইলে কেমনে কী...

অন্ধকারে বাকি পাণ্ডবরা থ মাইরা থাকে যুধিষ্ঠিরের বেকুবিপনায়। কৃষ্ণ প্রায় বিলাপ করে- রাজা হইবার লাইগা কুন্তীর পোলাগো জন্ম হয় নাই। বনবাস আর ভিক্ষা কইরা বাঁইচা থাকার লাইগাই ফুপি জন্ম দিছিল এই সব কুলাঙ্গার...

ভীম আইসা ধরে কৃষ্ণরে- চিন্তা কইরো না। দুর্যোধনরে মারতে অসুবিধা হইবা না আমার। আমার গদা দুর্যোধনের গদার থিকা দেড়গুণ ভারী...

কৃষ্ণ কয়- তোমার হাতেই যুধিষ্ঠিরের সিংহাসন আসব সন্দেহ নাই। কিন্তু ভাইজানের বেকুবির লাইগা এখন যদি দুর্যোধন অন্য কারো লগে যুদ্ধ করতে চায়?

ভীম কয়- তা করব না। দুর্যোধনরে আমি চিনি। বাকি পাণ্ডবরা মাথা পাইতা দিলেও আমারে রাইখা সে অন্যদের মারব না। আমারে গদাযুদ্ধে হারাইয়া বাকিদের তিলে তিলে মারাই তার বহু দিনের খায়েশ। জয়ের থাইকা বীরত্বটাই তার কাছে বড়ো...

কৃষ্ণ কয়- সেইটাই ভরসা। দুর্যোধনের অহংকার আর বীরত্বের গরিমাই এখন আমাগো শেষ ভরসা। কিন্তু বলা যায় না হঠাৎ কইরা যদি তার মাথায় রাজনীতি খেইলা যায়? যদি সে তোমারে বাদ দিয়া অন্য কারো লগে যুদ্ধ করতে চায়?

ভীম কয়- সেই ব্যবস্থা আমি করতাছি। সে কাউরে বাছার আগেই আমি তারে যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ দিয়া গালাগালি শুরু কইরা দিমু। তাইলে সে যেমন না পারব আমার চ্যালেঞ্জ ফিরাইতে তেমনি না পারব রাজনীতি নিয়া ভাবতে...

অন্ধকারে বন নাড়াইয়া দুর্যোধন প্রকাশ্য হইবার আগেই ভীম শুরু করে খিস্তিখেউড়- আয় পাপিষ্ঠ আয়। তুই আর তোর বাপে মিলা যত পাপ করছস আইজ তার হিসাব চুকামু আমি। তুই দ্রৌপদীরে লাঞ্ছনা করছিলি; শকুনির লগে মিলা আমাগো রাজ্য নিছিলি; সবার মরার ব্যবস্থা কইরা এখন আমার ডরে আইসা বনে লুকাইছস। আয়; বাইরাইয়া আমার লগে মারামারি কর; তোর যুদ্ধের শখ আইজ মিটামু হালা ডরালুক। সাহস থাকলে আইসা আমার সামনে খাড়া...

দুর্যোধন গদা কান্ধে সোজা আইসা খাড়ায় ভীমের সামনে- মশা মাইরা হাত লাল করার অভ্যাস দুর্যোধনের নাই। গদা দিয়া পিটাইয়া যদি কাউরে মারতে হয় তয় তোরে মাইরাই কিছুটা আরাম পামু আমি। তারপর বাকিগুলারে তো পা দিয়া ডলা দিলেই হয়...

দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরের দিকে ফিরে- ভীমের লগে লড়াই করব আমি...

হাফ ছাইড়া বাঁচে কৃষ্ণ। যুধিষ্ঠিরও বাঁইচা যায় নিজের বেকুবি থাইকা...

বনের অন্ধকারে যখন ভীম আর দুর্যোধন গদা নিয়া মুখোমুখি ততক্ষণে সংবাদ পাইয়া কুরুক্ষেত্র থাইকা বহু মানুষ আইসা হাজির হইছে দ্বৈপায়ন হ্রদের তীরে। কর্ণ আর অর্জুনের তির যুদ্ধ যেমন কেউ মিস করতে চায় নাই তেমনি ভীম আর দুর্যোধনের গদাযুদ্ধও মিস করতে চায় না কেউ। কিন্তু এইবার একজন বাড়তি মানুষও আইসা উপস্থিত। তিনি গদাযুদ্ধের উস্তাদ বলরাম। তারে দেইখা কৃষ্ণ কয়- ভালৈই হইছে। আপনের দুই শিষ্যের লড়াই দেখতে পাইবেন এখন...

বলরাম কয়- গদাযুদ্ধের লাইগা এইটা কোনো জায়গা হইল? বনের অন্ধকারে গদাযুদ্ধ হয় কেমনে? আমি কই কি তোমাগো উচিত কুরুক্ষেত্রের পাশে কোনো পরিষ্কার আর সমান জায়গায় গিয়া দুর্যোধন ভীমের লড়াই আয়োজন করা...

বলরামের কথা ফেলার সুযোগ নাই। সকলেই রওনা দেয়। গদা কান্ধে নিয়া পাশাপাশি হাঁটে দুর্যোধন আর ভীম। ভীমের লগে সকলে থাকলেও দুর্যোধন একা। কিন্তু তবুও সে নির্ভীক আর সে রাজা...

কুরুক্ষেত্রের পাশে কিছু দিন আগে যজ্ঞ করার লাইগা একটা জায়গা পরিষ্কার করা হইছিল। সেই সমান জায়গাটাই বলরাম ঠিক করে ভীম-দুর্যোধনের লড়াইর স্থান হিসাবে। শুরু হয় ভীম দুর্যোধনের গদার লড়াই। গদা বাগাইয়া ঘুরতে থাকে দুইজন দুইজনের ফাঁক খুঁজতে খুঁজতে। আক্রমণ শানায় আক্রমণ দেখায় কিন্তু আঘাত হয় না বিশেষ। একজন মারলে আরেকজন পিছায় পায়ের ক্ষিপ্রতায়...

দুর্যোধন একটা বাড়ি বসায়ে দেয় ভীমের মাথায়। ভীমও পাল্টা বাড়ি মারে কিন্তু দুর্যোধন মাথা সরাইয়া ফেলায়। বুকে দুর্যোধনের আরেকটা বাড়ি খাইয়া ভীম পড়ে মাটিতে। উইঠা দুর্যোধনের পাশে একটা বাড়ি বসাইয়া দেয়। দুর্যোধন পইড়া গিয়া উইঠা আরেকটা মোক্ষমে ভীমেরে মাটিতে শুয়াইয়া ফালায়...

ভীমের বর্ম ভাঙ্গে। ভীম রক্তাক্ত। নকুল সহদেব ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকি দুর্যোধনের দিকে তাড়াইয়া যায়। ভীম তাগোরে থামাইয়া আবার খাড়ায়। অর্জুন যায় কৃষ্ণের কাছে- মাধব। সত্য কইরা কও তো এই দুইজনের মধ্যে কে ভালো গদারু?

কৃষ্ণ কয়- দুইজনের মধ্যে ভীমের শক্তি বেশি হইলেও দুর্যোধন বেশি কৌশলী আর আর দক্ষ। দেখো না দুর্যোধন কেমনে মাইরগুলা এড়াইয়া যাইতাছে...

অর্জুন কেন প্রশ্নটা করছে কৃষ্ণ বোঝে। সে যোগ করে- নিয়ম মাইনা যুদ্ধ করলে ভীমের পক্ষে দুর্যোধনরে হারানো সম্ভব না। নিয়ম ভাইঙ্গাই তারে কাবু করতে হবে...

দুর্যোধন আর ভীমের লড়াই দেইখা অর্জুনও চিন্তিত হয়। এইভাবে চললে ভীমের শক্তি অতি দ্রুত ক্ষয় হইয়া যাবে। অর্জুন গিয়া খাড়ায় ভীমের

কাছাকাছি। ভীম লড়াই করতাছে। অর্জুন নিজের ঊরু চাপড়াইয়া দেখায় ভীমেরে। নিয়ম অনুযায়ী গদার লড়াইয়ে কোমরের নীচে আঘাত করা নিষেধ। কোমরের নীচে কেউ আঘাত করে না বইলা গদারুরা কোমরের নীচে যেমন না পরে কোনো বর্ম তেমনি না নেয় কোনো সতর্কতা...

অনেকক্ষণ লড়াইর পর ভীমেরও মনে হয় এমন যুদ্ধ অনন্তকাল চললেও জয়ী হওয়া সম্ভব না। দুর্যোধনের শরীরে সে আঘাতই বসাইতে পারতাছে না। অথচ ফাঁকে-ফোঁকরে দুর্যোধন তারে বসাইয়া দিতাছে বাড়ি আর গুঁতা। দুর্যোধনের একটা বিরাশি শিক্কার বাড়ি খাইয়া পইড়া যায় ভীম। ভীম আবার উইঠা খাড়ায়। এইবার সে অন্য সুযোগ খোঁজে এবং একটা সুযোগে সমস্ত শক্তি দিয়া বাড়িটা বসায় দুর্যোধনের উরাতের হাড়ে...

মড়াৎ কইরা ঊরু ভাইঙ্গা মাটিতে গড়ায় দুর্যোধন। ভীম গিয়া পা দিয়া দুর্যোধনের মাথা চাইপা ধরে- হালা ভ-...

খেইপা উঠে বলরাম- অসম্ভব। আমার সামনে গদাযুদ্ধের নিয়ম ভাঙ্গা। এ হইতেই পারে না। দুর্যোধনের উরাতে আঘাত কইরা মারাত্মক অন্যায় করছে ভীম। এর শাস্তি পাইতে হবে তার...

বলরাম নিজের লাঙ্গল বাগাইয়া যায় ভীমের দিকে। কৃষ্ণ দৌড়াইয়া যাইয়া জাপটাইয়া ধরে- ভাইজান থামেন। পাণ্ডবেরা আমাদের মিত্র; আত্মীয়। এদের জয়ে আমাদেরই জয়। তাছাড়া দুর্যোধনের ঊরুভাঙ্গা পাশার আসরে ভীমের প্রতিজ্ঞা আছিল ভাইজান...

গোস্বা কইরা বলরাম চইলা গেলে ধীরে ধীরে যুধিষ্ঠির মুখ খোলে- যে যাই বলুক; কৃষ্ণের নির্দেশে চইলাই আমরা যুদ্ধের সমাপ্তি টানছি আইজ...

যুধিষ্ঠির ভীমরে জড়াইয়া ধরে- মায়ের নিকট; দ্রৌপদীর নিকট আর নিজের প্রতিজ্ঞার নিকট আইজ তুই ঋণমুক্ত হইলি ভাই...

পাণ্ডবেরা ফিরার উদ্যোগ নেয়। ঊরুভাঙ্গা দুর্যোধন হাতের উপর ভর কইরা উইঠা বসে। কৃষ্ণরে ডাকে- কংসদাসের পোলা। এই জগতে যদি নিয়ম ভাঙ্গার কেউ থাকে তবে তা তুমি; চক্রান্তকারী। তুমি চক্রান্ত কইরাই হত্যা করছ ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ আর আমারে। নিয়ম মাইনা আমাগো লগে যুদ্ধ করলে কিছুই করতে পারতা না তুমি...

পাণ্ডবেরা কিছু কইতে গেলে কৃষ্ণ থামায়- সর্বদা সত্য কথা কয় বইলাই কিন্তু ওর আরেক নাম সত্যবাক। ওর কথাই ঠিক। ওরা চাইছিল বীরত্ব দেখাইতে; তারা তা দেখাইছে। আমরা চাইছিলাম বিজয়; আমরা তা পাইছি। চলো...

পাণ্ডবরা চইলা আসার পর দুর্যোধনের কাছে অশ্বত্থামা গিয়া হাজির হয় কৃপ আর কৃতবর্মারে নিয়া। সকল শুইনা অশ্বত্থামা কয়- বাপের অপমানেও অত দুঃখ পাই নাই যত দুঃখ পাইছি তোমার লগে তাগো আচরণে। তুমি আমারে সেনাপতি বানাইয়া যুদ্ধের অনুমতি দেও...

মাটিতে শুইয়া দুর্যোধন অশ্বত্থামারে সেনাপতি বানায়। অন্ধকারে দুর্যোধনরে ফালাইয়া কৃপ আর কৃতবর্মারে নিয়া মিলাইয়া যায় অশ্বত্থামা। অন্য দিকে দুর্যোধনের পতন সংবাদের লগে লগে কুরু সৈনিকরা আত্মসমর্পণ কইরা ফালায় পাণ্ডবগো কাছে। পাণ্ডব সৈনিকরাও শুরু কইরা দেয় কুরু-শিবিরে লুটপাট। আর যুধিষ্ঠির কয়- চলো আমরা হস্তিনাপুর যাই...

কৃষ্ণ আর পাণ্ডবেরা যায় হস্তিনাপুর। সেইখানে আন্ধাপোলা ধৃতরাষ্ট্রের পাশে বইসা আছেন কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন। ধৃতরাষ্ট্রের হাত ধইরা কৃষ্ণ কয়- মহারাজ; আপনি জানেন কুলক্ষয় আর যুদ্ধ বন্ধের লাইগা কুন্তীপুত্ররা কী চেষ্টাই না করছিল। শেষ পর্যন্ত মাত্র পাঁচখান গ্রাম চাইছিল তারা। আপনে তাও দেন নাই। ভীষ্ম দ্রোণ কৃপও আপনারে অনুরোধ করছিলেন। কিন্তু আপনে শোনেন নাই। এখন আপনের পি-দানের লাইগা পাণ্ডব ছাড়া আপনের বংশে আর কেউ নাই। আপনে আর মাতা গান্ধারী কাউরে দোষ দিয়েন না। ভাতিজাগো বরণ কইরা নেন...

যুদ্ধ শেষ হইয়া গেছে ভাইবা কৃষ্ণ আর পাণ্ডবরা যেমন চইলা আসছে হস্তিনাপুর তেমনি গা ঢিলা দিয়া পাঞ্চাল আর পোলাপানরা শিবিরে ঘুমাইতাছে বেঘোর। আর তখনই জঙ্গলের ভিতর কৃপাচার্য আর কৃতবর্মারে ঘুম থাইকা জাগাইয়া অশ্বত্থামা কয়- এখনই পাণ্ডব শিবির আক্রমণ করব আমি...

কেউ পলাইতে গেলে মারার লাইগা কৃপ আর কৃতবর্মারে বাইরে রাইখা অশ্বত্থামা ঢোকে পাণ্ডব শিবিরে। প্রথমেই ধৃষ্টদ্যুম্নের ঘর; লাত্থি দিয়া তারে ঘুম থাইকা জাগায়। এক পায়ে গলায় চাপ দেয় আর অন্য পায়ের গোড়ালির ঘায়ে তার শ্বাস বাইর কইরা ফালায়। কৌরবপক্ষের শেষ সেনাপতির পায়ে বিনা প্রতিরোধে প্রাণখান বাইরাইয়া যায় পাণ্ডবপক্ষের আগাগোড়া একমাত্র সেনাপতির...

ঘুমন্ত পাণ্ডব শিবিরে তা-ব চালায় অশ্বত্থামা। কেউ কেউ প্রতিরোধ করতে চাইলেও সকলেই কাটা পড়ে অশ্বত্থামার তলোয়ারে। কাটা পড়ে দ্রৌপদীর

ভাই শিখণ্ডী। কাটা পড়ে পঞ্চ পাণ্ডবের ঔরসে দ্রৌপদীর পাঁচ পোলা প্রতিবিন্ধ্য সুতোসোম শ্রুতকর্মা শতানীক আর শ্রুতসেন...

মানুষ মাইরা অশ্বত্থামা পাণ্ডবগো হাতি-ঘোড়া মারে। যারা পলাইতে যায় তারা মারা পড়ে বাইরে খাপ ধইরা থাকা কৃপাচার্য আর কৃতবর্মার হাতে...

দুর্যোধনের আশপাশ ঘিরা আছে শিয়ালের দল। অতি কষ্টে শিয়াল তাড়াইয়া বাঁইচা আছে রক্তবমি করা দুর্যোধন। এরই মাঝে অন্ধকার ফুঁইড়া তার সামনে আইসা খাড়ায় অশ্বত্থামা- পাণ্ডবপক্ষে জীবিতের সংখ্যা এখন মাত্র সাত। পাঁচ পাণ্ডব; কৃষ্ণ আর সাত্যকি। পাণ্ডবগো বাকি সব বংশধর; সমস্ত পাঞ্চাল; এমনকি হাতিঘোড়ার একটাও অবশিষ্ট নাই...

দুর্যোধন কয়- অশ্বত্থামা তুমি এক রাত্তিরে যা করলা; অত দিন যুদ্ধ কইরা ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণও তার একাংশ করতে পারে নাই। আইজ আমার থাইকা সুখী কেউ নাই। যুধিষ্ঠির হয়ত জয়ী হইছে কিন্তু তার আনন্দ করার ক্ষমতা কাইড়া নিছি আমি। যুধিষ্ঠির এখন এক হাহাকার রাজ্যের রাজা। হা হা হা...

কৃপ আর কৃতবর্মারে নিয়া অশ্বত্থামা চইলা গেলে একলা যে মানুষটারে নোয়ানো যায় নাই বইলা সারা যুদ্ধের সমস্ত সমীকরণ তৈয়ারি হইছে; সেই দুর্যোধন নেতাইয়া পড়ে অন্ধকার মাঠে আর মৃত সিংহের মাংসে দাঁত বসাইতে ধীরে ধীরে আগাইয়া আসে শিয়ালের দল...

২০

সর্বশেষ সংবাদ অনুযায়ী গত সন্ধ্যায় পতিত হইছে দুর্যোধন। তার মানে যুদ্ধ শেষ। নকুল নিশ্চয়ই এই ভোরবেলা উপপ্লব্য নগরে আইসা উপস্থিত হইছে দ্রৌপদীরে সম্রাজ্ঞীর সংবর্ধনায় নিয়া যেতে...

নকুলরে উপপ্লব্য নগরে আসতে দেইখা এমনই ভাবে দ্রৌপদী। কিন্তু তার কোনো কথার উত্তর না দিয়া নিঃশব্দ নকুল তারে নিয়া আইসা পাণ্ডব শিবিরে পৌঁছাইলে সে পয়লা ধাক্কাটা খায়। সামনে তার দুই ভাইয়ের লাশ...

এই যুদ্ধে আগে গেছে তার বাপ। ভীষ্ম আর দ্রোণের লগে লড়াইতে যাদের কিছু হয় নাই তার সেই দুই ভাই খুন হইল যুদ্ধের পর...

দ্রৌপদী কান্দে। দ্রৌপদী চিল্লায়। দ্রৌপদী প্রশ্ন করে কিন্তু নিঃশব্দ পাণ্ডবগো ভিতর থাইকা ভীম তারে ধইরা অন্য দিকে নিয়া যায়। ভীম বরাবরই তারে সকল শোক থাইকা সরাইয়া রাখে। কিন্তু এইবার ভীম তারে ভাইগো লাশের কাছ থিকা নিয়া গিয়া ফালায় অন্য এক শোকের সাগরে...

তার পাঁচ-পাঁচটা পোলাই গত রাইতে খুন হইছে ঘুমে...

এইবার আর চিৎকার করতে পারে না দ্রৌপদী। এইবার আর কোনো প্রশ্ন নাই তার মুখে। তার মাথাটা শুধু চক্কর দিয়া চাইরপাশে ঘনাইয়া আসে অন্ধকার...

২১

যুদ্ধ শেষ হইয়া গেছে। বাকি সব খুচরা আবেগ আর হিসাব-নিকাশও শেষ। ভাই আর পোলাদের দুঃখ সামলাইয়া দ্রৌপদী এক দফা দাবি জানাইছিল পাণ্ডবগো কাছে- অশ্বত্থামারে হত্যা কইরা তার মাথার মুকুটের মণি আইনা দিতে হবে তারে; অন্যথায় সে আত্মঘাতী হইয়া পোলা আর ভাইদের সাথে যাবে...

কিন্তু অশ্বত্থামা তো রাত্তিরের আকাম কইরা পলাইছে গভীর জঙ্গলে। যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীরে বহুত বোঝায় কিন্তু শেষ পর্যন্ত দ্রৌপদী তার দাবিখান জানায় তার সারা জীবনের ভরসা ভীমের কাছে আর ভীম গদা নিয়া রওনা দেয় বনে...

ভীম রওনা দিলে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিররে কয়- ভুইলা যাওয়া উচিত না যে অশ্বত্থামা দ্রোণের পুত্র আর শিষ্য। একলা ভীমের গদায় তার নাগাল পাওয়া কঠিন...

কৃষ্ণের কথায় সকলেই গিয়া যখন অশ্বত্থামারে খুঁইজা পায় তখন দেখে সে গেরুয়া আর ছাই পইরা সাধু হইয়া বইসা আছে দ্বৈপায়নের ডেরায়...

ভীমের কাছে আশ্রম-টাস্রম কিছু না। সে সোজা দাবড়াইয়া যায় অশ্বত্থামার দিকে। কিন্তু আশ্রমে বসলেও অশ্বত্থামা নিজের অস্ত্র ফালায় নাই। সেও পাল্টা আক্রমণ কইরা বসে পাণ্ডবদের...

ভীম বাঁইচা যায় কিন্তু অর্জুন তির নিয়া খাড়ায় অশ্বত্থামার সামনে। অশ্বত্থামা গিয়া লুকায় দ্বৈপায়নের পিছনে- ভগবান। ভীমের ডরে অস্ত্র চালাইলেও আমি কিন্তু যুদ্ধ ছাইড়া এখন সাধু হইয়া গেছি। আমারে বাঁচান...

দ্বৈপায়নের সামনে অস্ত্র চালায় না অর্জুন। কৃষ্ণ আগাইয়া আসে সামনে। অশ্বত্থামা ব্রাহ্মণ; তার উপরে মুনি ভরদ্বাজের নাতি; ঋষি অঙ্গিরা আর বৃহস্পতির বংশধর। এখন তওবা কইরা দ্বৈপায়নের আশ্রমে সাধু হইয়া আছে। তারে মারলে যুধিষ্ঠিরের প্রজারা ভালোভাবে নিবে না এই কাম। ব্রাহ্মণ হত্যা আর দ্বৈপায়নরে অসম্মানের দায়ে রাজা যুধিষ্ঠিররেই অস্বীকার কইরা বসতে পারে তারা। কিন্তু দ্রৌপদী কইয়া দিছে অশ্বত্থামার মুকুটের মণি তার চাই...

কৃষ্ণ সালিশে বসে দ্বৈপায়নের লগে। অশ্বত্থামা আত্মসমর্পণ কইরা মাথার মণি দিব পাণ্ডবগো আর অস্ত্র ছাইড়া বাকি জীবন সন্ন্যাসী হইয়া কাটাইব দ্বৈপায়নের লগে; এই শর্তে পাণ্ডবেরা প্রাণভিক্ষা দিব তারে...

গাঁইগুঁই করলেও শেষ পর্যন্ত শর্তগুলা মাইনা নেয় অশ্বত্থামা আর ভীম ফিরা আইসা অশ্বত্থামার মুকুটের মণিটা দেয় দ্রৌপদীর হাতে...

কুরুপক্ষে অশ্বত্থামা কৃপাচার্য আর কৃতবর্মা; পাণ্ডবপক্ষে পঞ্চপাণ্ডব কৃষ্ণ আর সাত্যকি; কুরুযুদ্ধ শেষে দুই পক্ষের হাতে গোনাদের মধ্যে বাঁইচা থাকে মোট এই দশজন। যুদ্ধ শেষ হইবার পরে অবশ্য কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস আইসা হস্তিনাপুরে তার আন্ধাপোলা ধৃতরাষ্ট্রের সম্মান আর নিরাপত্তা দুইটাই নিশ্চিত কইরা গেছেন পাকাপোক্তভাবে- পাণ্ডবরা তোমারে নিজের বাপের মতোই শ্রদ্ধা আর সম্মানে রাখব; চিন্তা কইরো না তুমি...

এই সব খুচরা বোঝাপড়ার পর রাজ-অরাজ মাতা ভগিনী পত্নী কন্যারা অনুমতি পাইয়া কুরুক্ষেত্রে আসেন স্বজনদের লাশগুলা দেখতে। দুই চোখ বান্ধা মহারানি গান্ধারী কিছু না দেখলেও মৃত শতপুত্রের জননী হিসাবে বিধবা পুত্রবধূগো দলে থাকেন অগ্রগামী নেতা...

মাঠে কারো পোশাক দেইখা শরীর চিনা যায় তো খুঁইজা পাওয়া যায় না তার মাথা। কারো মাথা পাওয়া গেলে শরীরটা যে কই কে জানে। আঘাত খাইয়া মরার পর শরীরগুলার উপর দাঁত চালাইছে অসংখ্য শিয়াল আর শকুন। চিনা বড়ো দায় নিজের মানুষটারে। চিনতে পারলেও কাছে যাওয়া আরো দায় গন্ধে আর বীভৎসতায়। কেউ কান্দে কেউ হয় অজ্ঞান কেউ করে হাহাকার আর এর মাঝে গান্ধারী গিয়া খাড়ান কর্ণের লাশের সামনে। শিয়ালে-শকুনে তার দেহের বেশিটাই নিয়া গেছে। খাবলানো মাথাটা পইড়া আছে দূরে...

গান্ধারী কর্ণের মাথাটা কুড়ান। কোলে তুইলা হাত বোলান। কর্ণ তার পোলাগো একমাত্র বন্ধু; যার ভরসায় যুদ্ধ গেছিল তারা। কর্ণ তার পোলাগো মৃত্যুরও কারণ। কারণ কর্ণ না থাকলে এই যুদ্ধ হইত না আর মরতোও না অতগুলা মানুষ...

গান্ধারী কর্ণের মাথাটা তার ছিঁড়াখোঁড়া দেহের পাশে রাখেন। তারপর উইঠা অন্য দিকে যান নিজের পোলাগো খুঁজতে। আর তার পিছনে নিঃশব্দে আসা আরেক রাজমাতা নিঃশব্দেই রওনা দেন বিজয়ী পাণ্ডব শিবিরের দিকে। কারণ তার আর দেখার কিছু নাই। তিনি কুন্তী...

কেউ জানল না কুন্তী কেন গান্ধারীর লগে আসছিলেন আর কেনই বা ফিরা গেলেন হঠাৎ। কিন্তু যেদিন পাণ্ডবেরা সকল আত্মীয়ের সৎকারের পর ধৃতরাষ্ট্ররে সামনে রাইখা গঙ্গায় রওনা দিলো মৃতদের উদ্দেশ্যে তর্পণের লাইগা; তখন কুন্তী গিয়া খাড়াইল পাঁচ পাণ্ডবরে সামনে- কর্ণের লাইগাও তর্পণ কইরো তোমরা...

যারা মারা গেছেন তারা সকলেই কুরু বংশের আত্মীয় কিংবা গুরুজন। সকলের লাইগাই তর্পণ করা যায় কিন্তু যে গাড়োয়ানের পোলার লাইগা অতটা ভোগান্তি; তার স্মৃতির লাইগা কেন তর্পণ?

অর্জুন বেকুব হয়। ভীম বিরক্ত হয়। যুধিষ্ঠিরের মুখে প্রশ্ন- এমন শত্রুর লাইগা কেন আমাগো প্রার্থনা করতে কও মা?

কুন্তী এই প্রশ্নটা আশা করে নাই যুধিষ্ঠিরের মুখে। যুধিষ্ঠির কর্ণের পরিচয় জানে। যুধিষ্ঠির কোনো দিনও কুন্তীরে প্রশ্ন করে না। কিন্তু যুধিষ্ঠির এখন সম্রাট আর কুন্তী এখন কেবলই এক গর্ভধারিণী নারী...

কুন্তী দাঁতে দাঁত কামড়ায়। বহুত হইছে যুধিষ্ঠির। বহুত কিছু করা গেছে তোমার লাইগা। কুন্তী তোমারে সম্রাট বানাইছে। যুদ্ধ জিতাইছে। সেই কুন্তীর কথায় গঙ্গার এক আঁজলা পানি তুইলা যদি তুমি বিনাপ্রশ্নে কর্ণের নামে গঙ্গায় ফিরাইয়া দিতে আপত্তি জানাও তবে আর কী থাকে বাকি? তবে আর কীসের লাইগা কুন্তীর অত গোপনতা...

কুন্তী গিয়া খাড়ায় সকলের সামনে। অতি ধীর কিন্তু অতি উদাত্ত- যে কর্ণ মারা গেছে অর্জুনের তিরে; যারে তোমরা জানতা রাধার গর্ভজাত গাড়োয়ানপুত্র বইলা; সেই কর্ণ জন্ম নিছিল আমারই গর্ভে; তোমাগো সকলেরই আগে। কর্ণ তোমাদের বড়ো ভাই...

শরীরের সমস্ত শক্তি হারাইয়া মাটিতে বইসা পড়ে অর্জুন। ভীম পাথর। ভাইঙ্গা পড়ে যুধিষ্ঠিরের মহাযুদ্ধ জয় আর সাম্রাজ্যের অহংকার- মাটিতে হাঁটু গাইড়া

নিজের হাতে মুখ লুকায় সম্রাট যুধিষ্ঠির- কী আগুন যে তুমি আঁচলে লুকাইয়া রাখছিলা জননী আর কী আগুন দিয়া যে ছারখার কইরা দিলা সব...

২২

অভিষেকের আসরে হায় হায় করে যুধিষ্ঠির- মানুষ হারতে হারতে জিতে আর আমি হতভাগা জিততে জিততে হারি। কী পাইলাম আমি যুদ্ধ কইরা? জয় তো পাই নাই আমি; গৌরবটাও নাই। যাগো মারছি তারা যেমন নিকটাত্মীয় তেমনি মারার বীরত্বও দাবি করতে পারি না আমরা। যুদ্ধ কইরা খালি গায়ের ঝাল মিটছে আমাদের। দুর্যোধন ঠিকই কইছে; সে আমারে বিষণ্ন এক বিধবা দুনিয়া দান কইরা গেছে। আমার কিচ্ছু ভাল্লাগে না রে ভাই। এমন রাজত্ব আমি টানতে পারব না। আমি বনে যামু। ভিক্ষা কইরা খামু...

অর্জুন তারে বোঝায়- অত কিছু কইরা এখন এই সব কইলে কি হবে?

ভীম তারে ধাতানি দেয়- তুমি একটা আইলসা। তুমি কাজকর্ম বাদ দিয়া ঠোলা বামুনগো মতো বকবক কইরা দিন কাটাইতে চাও তাই এমন কথা কও...

নকুল সহদেবও তারে বোঝায়। দ্রৌপদী কয়- আপনের মাথায় গন্ডগোল দেখা দিছে। আপনেরে এখন গাছের লগে বাইন্ধা রাখা দরকার...

কৃষ্ণ কয়- যারা মইরা গেছে বিলাপ করলে তো আর ফিরা আসব না তারা...

সকলে বোঝায় কিন্তু বোঝে না যুধিষ্ঠির। সে খালি কয় আমি বনে যামু। ভিক্ষা কইরা খামু। শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন কন- রাজা হইয়া সন্ন্যাসীর মতো কথা কইও না যুধিষ্ঠির। তোমার যদি মন উতলা হয় তবে যজ্ঞ কইরা প্রায়শ্চিত্ত কইরা লও। এর লাইগা সবচে ভালো যজ্ঞ হইল অশ্বমেধ...

যুধিষ্ঠির কয়- আমি রাজকর্ম জানি না ভগবান। আপনি আমারে রাজকর্ম শিখান...

দ্বৈপায়ন কন- সেইটার লাইগা উপযুক্ত মানুষ হইলেন ভীষ্ম। তিনি এখনো জীবিত। তুমি তার কাছে যাও...

গঙ্গাপুত্র ভীষ্ম এখনো শিখণ্ডীর তিরের জ্বালা নিয়া বাঁইচা আছেন। অভিষেকের পর সবাইরে নিয়া যুধিষ্ঠির তার কাছে হাজির হইয়া রাজকার্য আর ইতিহাস সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন জিগায় আর তিনি তার অভিজ্ঞতা থাইকা উত্তর দেন। বেশ কয়েক দিন চলে এইভাবে। তারপর যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুর ফিরা আসার মাস দেড়েক পর সংবাদ পায় ভীষ্মের অবস্থা যায় যায়...

তির খাওয়ার আটান্ন দিন পর মারা গেলেন ভীষ্ম আর ভগিরতীর তীরে তার শেষকৃত্য কইরা আবারও কাইন্দা গড়াগড়ি যায় যুধিষ্ঠির- কী চাইলাম আর কী পাইলাম মুই? এত দুঃখের ভার কেমনে টানি? ভীষ্ম আর কর্ণের মৃত্যুর কথা কেমনে ভুলি? আমি বনে যামু। ভিক্ষা কইরা খামু...

তার দুঃখ দেইখা শেষ পর্যন্ত মৃত পোলাদের বাপ ধৃতরাষ্ট্রও তারে বোঝান- দুঃখ করতে হইলে তো করা লাগে আমার আর গান্ধারীর। তুমি কেন অত দুঃখ পাও?

দ্বৈপায়ন ব্যাস এইবার খেইপা উঠেন- কোনোকালেই তোমার মাথায় পাকনা বুদ্ধি আছিল না; এখনো নাই। তুমি বারবার পোলাপাইনের মতো ন্যাকামি করতাছ আর সবাই তোমারে বেহুদা বুঝাইতাছে। হয় তুমি কারো কথায় পাত্তা দেও না; না হয় তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি পুরাটাই গেছে। তোমারে না কইছিলাম অশ্বমেধ যজ্ঞ করতে? তো এমন ব্য ব্যা কইরা কান্তাছ ক্যান?

যুধিষ্ঠির কয়- আমার যে যজ্ঞ করার পয়সা নাই ভগবান...

- অ এই কতা। তা কইলেই পারো সোজাসুজি...

দ্বৈপায়ন যুধিষ্ঠিররে এক গুপ্তধনের সন্ধান দেন হিমালয়ের ভেতর। কোনো এক কালে এক রাজা মরুত্ত এইগুলা সংগ্রহ করছিলেন নিজে যজ্ঞ করার লাইগা; সেইগুলা এখনো গচ্ছিত আছে হিমালয়ের ভিতর...

কিছু দিন পর সুভদ্রা আর সাত্যকিরে নিয়া কৃষ্ণ ফিরা যায় দ্বারকায় আর হস্তিনাপুরে বিষণ্ন পাঁচ পাণ্ডবের লগে দ্রৌপদী বাঁইচা থাকে অভিমন্যুর গর্ভবতী বৌ উত্তরার দিকে তাকাইয়া। হয়ত উত্তরার গর্ভেই টিকা যাইতে পারে পাণ্ডবদের বংশের বাতি। পাশাপাশি চলতে থাকে যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন। যুযুৎসুরে ভারপ্রাপ্ত রাজা বানাইয়া যুধিষ্ঠির হিমালয়ে গিয়া মাটি খুঁইড়া নিয়া আসে মরুত্তর গুপ্তধন। আর উত্তরার সন্তান প্রসবের কাল হিসাব কইরা বলরামসহ পুরা পরিবার নিয়া কৃষ্ণ আইসা উপস্থিত হয় হস্তিনাপুর...

প্রসবের দিন বাকি সব পুরুষদের লগে কৃষ্ণও আছিল প্রসূতিঘরের বাইরে। কিন্তু ভিতরমহলে নারীদের সাড়াশব্দ হঠাৎ নিশ্চুপ হইয়া গেলে সমস্ত লজ্জাশরম বাদ দিয়া সাত্যকিরে নিয়া কৃষ্ণ গিয়া হাজির হয় ভাগিনাবধূ উত্তরার প্রসূতিঘরে...

উত্তরার পোলা হইছে। কিন্তু বাচ্চাটা সম্পূর্ণ অচেতন। উত্তরা পাথর। দ্রৌপদী সুভদ্রা কৃষ্ণরে ঘিরা ধরে; কুন্তী দেয় চিৎকার- কৃষ্ণ কিছু কর...

কৃষ্ণ যুদ্ধ বিশারদ। কৃষ্ণ কূটনীতিবিদ। কিন্তু যাদব বংশ একই সাথে বহন করে দুই মহান ভার্গব; ঔষধি বিদ্যার গুরু চ্যাবন আর শল্যবিদ্যার গুরু শুক্রাচার্যের উত্তরাধিকার...

কৃষ্ণের চেষ্টায়; কৃষ্ণের ঔষধিতে শিশুটা চিৎকার দিয়া উঠে আর পাণ্ডব বংশের একমাত্র উত্তরাধিকার পাইয়া চাইরপাশে বাইজা উঠে ঢোল নাকাড়া বাদ্য বাদন আর মানুষের হাসি...

বহু পরীক্ষা পাশ দিয়া পাণ্ডব বংশ পাইছে এই উত্তরাধিকার তাই কৃষ্ণ তার নাম রাখে পরীক্ষিৎ...

কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের নেতৃত্বে যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞ হইয়া যায় ভালোয় ভালোয়। অঢেল দান পায় ব্রাহ্মণসহ সকল গরিব আর দরিদ্রজন। কিন্তু দ্বৈপায়ন আবিষ্কার করেন নতুন এক প্রচ্ছন্ন দরিদ্র মানুষ- কুন্তী...

সম্রাট যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞ থাইকা দানে পাওয়া নিজের অংশটা তিনি আইসা তুইলা দেন পুত্রবধূ কুন্তীর হাতে- এইগুলা তোমার ব্যক্তিগত সম্পদ...

২৩

কাউরে কিছু না জানায়ে কুন্তী সিদ্ধান্ত নেয় ধৃতরাষ্ট্র আর গান্ধারীর লগে বনবাসে যাবার। ধৃতরাষ্ট্র আর গান্ধারীর বানপ্রস্থে যাওয়ার কথা সকলেই জানত। যুদ্ধের পনেরো বছর পরে ভীমের জ্বালায় ধৃতরাষ্ট্র বাধ্য হইছেন বানপ্রস্থ বাইছা নিতে...

সম্রাট যুধিষ্ঠির তারে মাথায় কইরা রাখছিল যুদ্ধের পর; যেমনটা নিশ্চিত কইরা গেছিলেন দ্বৈপায়ন। রাজকার্যে তার কোনো পরামর্শ কিংবা সিদ্ধান্তও ফিরাইত না সম্রাট। বাকি পাণ্ডবরাও ধৃতরাষ্ট্ররে কুরুপিতা না ভাইবা বাপের বড়ো ভাই বইলাই মানত। কিন্তু ব্যতিক্রম সেই ভীম; যার সম্পর্কে ধৃতরাষ্ট্র কইতেন- প্রতিশোধ ভোলে না কুন্তীর ট্যারাচোখ পোলা...

ভীম যাইচা গিয়া ধৃতরাষ্ট্ররে শুনাইয়া শুনাইয়া বর্ণনা করত তার কোন পোলারে কেমনে মারছে সে...

একটা পিতা। অন্ধ বৃদ্ধ অসহায়। রাজ্যবিলাসিতায় বড়ো বেশি লোভ ছিল তবু পনেরো বছরের বেশি তিনি হন্তারকের মুখে সহ্য করতে পারলেন না নিজ পোলাদের বীভৎস মৃত্যুর বর্ণনা শ্রবণ। তিনি গিয়া যুধিষ্ঠিররে কন- বয়স হইছে বাপ। এইবার বানপ্রস্থে গিয়া ভজন-সাধন কইরা মরবার অনুমতি দাও...

যুধিষ্ঠির রাজি হয় নাই। কিন্তু দ্বৈপায়ন আইসা নিশ্চিত করেন তার আন্ধাপোলার মুক্তির পথ- তারে বনে যাইতে দেও যুধিষ্ঠির...

বনে যাইবার সিদ্ধান্ত নিয়া তিনি চাইলেন তার পুত্র; তার সকল মৃত শুভাকাঙ্ক্ষীর নামে শেষবারের মতো কিছু দান খয়রাত করেন। কিছু পয়সা

চাইলেন তিনি সম্রাটের কাছে। যুধিষ্ঠির বিনা প্রশ্নে রাজি। অর্জুনও রাজি কিন্তু অর্থমন্ত্রী ভীম রাজি না- ধৃতরাষ্ট্রের কুলাঙ্গার পোলাগো লাইগা একটা পয়সাও দেওয়া যাবে না...

যুধিষ্ঠির তারে তেলায়; অর্জুন নকুল সহদেব তারে মিনতি করে কিন্তু ভীম নড়ে না- ধৃতরাষ্ট্রের পোলারা নরকে পচুক। ভীষ্ম দ্রোণের নামে আমরাই দান করব আর চাইলে নিজস্ব তহবিল থাইকা কুন্তী দান করতে পারেন পাপিষ্ঠ কর্ণের নামে...

যুধিষ্ঠির আর অর্জুনের ব্যক্তিগত ভাতার টাকায় ধৃতরাষ্ট্র দান-খয়রাত করেন তার পোলাদের নামে। কিন্তু কর্ণ প্রসঙ্গে ভীমের কথাটা কুন্তীর কানে যায়। কুন্তী সিদ্ধান্ত নিয়া নেয়- যে পোলারে জন্ম দিয়া বুকের এক ফোঁটা দুধও দেই নাই অথচ তার কাছ থাইকাই মায়ের পরিচয় দিয়া চাইয়া আনছি তোগো জীবন। যারে জন্ম দিছি আমি আবার তোগো লাইগাই নিশ্চিত করছি যার মরণ। ...হা ভীম। আমি চাইলে তোগোর পুরা রাজ্যটাই হইতে পারত কর্ণের। সেই মরা কর্ণের আত্মার শান্তির লাইগা দুইটা পয়সা দিতে তোগো অত লাগে? অতই খিদা তোগো পেটে? খা। তবে। তোগো সম্পদ তাইলে তোরাই খা...

কর্ণের মৃত্যুতে কাঁদে নাই কুন্তী। কিন্তু আইজ কর্ণের লাইগা তার চোখ ভাইঙ্গা আসে জল- আমার মরা পোলার লাইগা যে বাড়িতে দুইটা পয়সা হয় না; সেই বাড়ির অন্ন যেন আর কোনো দিনও না উঠে কুন্তীর মুখে...

ধৃতরাষ্ট্র আর গান্ধারীর লগে বনবাসে রওনা দেয় কর্ণমাতা কুন্তী। তার পথে আইসা খাড়ায় প্রজারা। তার পায়ে হুমড়ি খাইয়া পড়ে সম্রাট যুধিষ্ঠির। পথ আগলে দাঁড়ায় ভীম। কান্তে কান্তে মাটিতে লুটায় নকুল সহদেব দ্রৌপদী...

হাঁটতে হাঁটতে কুন্তী যুধিষ্ঠিররে কয়- সবাইরে দেইখা রাখিস। ভীমেরে পথ থাইকা সরাইয়া কয়- তোগো যাতে কারো কাছে হাত পাততে না হয় তাই তোগোরে আমি চালায়া নিছিলাম। এখন আমারে আমার পথে যাইতে দে...

বিদুর পা মিলায় বনবাসী দলে। আজীবন অনুচর সঞ্জয়ও চলে ধৃতরাষ্ট্রের লগে...

বনে চলেন শতপুত্র হারানোর শোক নিয়া গান্ধারী আর তার সাথে চলেন পাণ্ডবজননী কুন্তী; তার মনেও সন্তান হারানোর দুখ...

২৪

অবশেষে সব ছাইড়া দ্রৌপদী আর পঞ্চপাণ্ডব রওনা দিছে বনবাসে। কুরুযুদ্ধের ছত্রিশ বছর পরে...

কুন্তীরা বনে যাবার বছর খানেক পর পাণ্ডবেরা বনে গিয়া দেইখা আসছিল তাদের। ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী কুন্তী ভীষণ দুর্বল আর বিদুর বদ্ধ উন্মাদ; ন্যাংটা হইয়া বনে বনে ঘোরে...

যুধিষ্ঠির বনে গিয়া বিদুররে খুঁইজা বার করলে বিদুর যুধিষ্ঠিররে জড়াইয়া ধইরা আর ছাড়ে না। অবশেষে যুধিষ্ঠির অতি ধীরে ছাড়ায়ে নেয় প্রাণহীন বিদুরের আলিঙ্গন...

পাণ্ডবেরা দেইখা আসার বছর দুয়েক পরে দাবানল থাইকা পলাইতে না পাইরা আগুনে পুইড়া মারা যান ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী আর কুন্তী। আগুনের হাত থিকা বাঁচতে পারে শুধু সঞ্জয়...

পাণ্ডবগো রাজ্য বিস্তার হইছে বহুত কিন্তু ভাইঙ্গা পড়ছে তাগো শক্তি আর শরীর। দ্বারকায় ভাইঙ্গা পড়ছে কৃষ্ণ আর বলরামের নিয়ন্ত্রণ...

কুরুযুদ্ধে যেসব বড়ো রাজা মারা গেছেন তাগো উত্তরাধিকার নবীন রাজারা অন্যদেশ আক্রমণের থাইকা নিজের রাজ্য গুছাইতে এখনো বেশি মনোযোগী। বাকি যে খুচরা বিদ্রোহী রাজ্য আছিল তারাও সবাই অশ্বমেধ যজ্ঞের কালে অর্জুনের কাছে আত্মসমর্পণ কইরা পাণ্ডবরাজের অনুগত এখন।

আর একই সাথে যুদ্ধহীন আর্যাবর্তে পেশাদার যোদ্ধা যাদব বংশ পুরাপুরি বেকার; কোথাও কোনো যুদ্ধ নাই; তাই তাগো কোনো কামও নাই। বেকার সময়ে তাগো হাত কামড়ায়। অস্ত্র টাডায়। তাই মাতলামি আর নিজেগো মাঝে হাতাহাতি কইরা তারা সময় কাটায়। মারামারি করতে করতে মাতালেরা একসময় মারামারিতেও বৈচিত্র্য খোঁজে। লাঠি গদা অস্ত্রের বদলা তারা শুরু করে একে অন্যের পাছায় ডান্ডা ঢোকানোর কাজ। আর এই প্রক্রিয়ায় পুটকি দিয়া পয়লা ডান্ডাটা ঢোকে কৃষ্ণপুত্র শাম্বের...

কৃষ্ণের সেই তাকতও নাই; হুকুমদারিও নাই। কৃষ্ণ আর চক্র চালাইতে পারে না। মেরামতির অভাবে ভাইঙ্গা গেছে রথ। ছাইড়া দেওয়া ঘোড়াগুলা ভাইগা গেছে বনে। গাঙ্গে ঝাঁপ দিয়া দ্বারকার নারীরা আত্মহত্যা করে। লুটতরাজ আর চুরিচামারি হইতে থাকে প্রচুর আর চলতে থাকে যাদব বংশের মদ খাইয়া একে অন্যের পাছায় বাঁশ দিবার কাম...

বলরামরে নিয়া কৃষ্ণ চেষ্টা করে দ্বারকায় মদ তৈরি আর বিক্রি বন্ধ করার। কাজ হয় না। নিরুপায় কৃষ্ণ অবশেষে গোষ্ঠী আর পরিবার নিয়া দেশান্তরী হয় সমুদ্রতীরের প্রভাসতীর্থে। কিন্তু সেইখানেও বদলায় না কিছু। সাত্যকি বলরাম কৃষ্ণের সামনেও মাতলামি করতে থাকে পোলাপান। আর আস্তে আস্তে এই মহামারি ছড়াইতে থাকে বড়োদের মাঝেও...

খাইতে বইসা সামান্য ঝগড়ার সূত্রে সাত্যকি খড়গ দিয়া কৃতবর্মার মাথা আলগা কইরা অন্যদেরও কোপাইতে থাকে। অন্যরা হাতের থালাবাটি বাসন দিয়া পিটাইতে শুরু করে সাত্যকিরে। কৃষ্ণের পোলা প্রদ্যুম্ন সাত্যকির পক্ষ নিতে গেলে থালাবাটির বাড়ি খাইয়া কৃষ্ণের সামনেই সে মরে সাত্যকির লগে। সাত্যকি আর পোলার মৃত্যুতে কৃষ্ণও একটা মুগুর নিয়া সবাইরে

পিটায়। শুরু হয় আউলাঝাড়া মাইর। কে কার পক্ষে জানে না কেউ। সবাই সবাইরে পিটায়। শুধু যে মারা যায় সে থামে। কৃষ্ণের সামনেই মরে তার আরো চাইর পোলা; শাম্ব চারুদেষ্ণু অনিরুদ্ধ আর গদ...

এই গিয়াঞ্জামে বিষণ্ন বলরাম তখন একলা বনে বনে ঘোরে। বহু কষ্টে কৃষ্ণরে কিলাকিলি থাইকা সরাইয়া বলরামের কাছে নিয়া আসে বভ্রু আর দারুক। বলরামের কাছে বইসা অর্জুনরে নিয়া আসতে দারুকরে হস্তিনাপুর পাঠায় কৃষ্ণ; হয়ত এই অন্তর্ঘাত থাইকা বংশের নারী আর শিশুগো অন্তত বাঁচাইতে পারব অর্জুন...

বলরামের কাছে বইসাই কৃষ্ণ বভ্রুরে পাঠায় বংশের নারীগো দেইখা আসতে। কিন্তু রাস্তাতেই বভ্রু মারা যায় কারো হাতে। এইবার কৃষ্ণ নিজে গিয়া নারীগো জানায় যে অর্জুনরে সংবাদ পাঠানো হইছে; দুশ্চিন্তার কিছু নাই। আর বাপ বসুদেবরে কয়- অর্জুন না আসা পর্যন্ত যেইভাবেই হউক আপনে নারী আর শিশুগো আগলাইয়া রাখেন...

কৃষ্ণ আবার ফিরা আসে বনে বলরামের কাছে। কিন্তু তখন আর বলরাম নাই। এক সাপের এর মইদ্যেই মৃত্যু হইছে তার...

বলরামের মৃত্যুতে বিধ্বস্ত কৃষ্ণ বনে পায়চারি করে। পায়চারি করতে করতে কৃষ্ণ বনে বইসা ঝিমায় আর এক শিকারি তারে শিকার মনে কইরা বিন্ধাইয়া দেয় একখান তির...

মাত্র একটা তিরেই শেষ হয় দুর্ধর্ষ যাদব কৃষ্ণের জীবন...

কৃষ্ণ-বলরামহীন যাদবকুলের সকল সম্পদ ভাগিনা অর্জুনের হাতে তুইলা দিয়া পর দিন বসুদেব মারা গেলে কৃষ্ণ বলরাম বসুদেবের সৎকার শেষ কইরা পরিবারের সকল নারী আর শিশুদের নিয়া অর্জুন রওনা দেয় হস্তিনাপুর। কিন্তু রাস্তায় রাস্তায় লুট হইতে থাকে অর্জুনের বাহিনী; ধনরত্ন যায়; গবাদিপশু যায়; নারীদের লুইটা নিয়া যায় ডাকাতের দল কিন্তু গাণ্ডিব চালাইবার শক্তি আর নাই অর্জুনের গায়...

লুটের হাত থিকা বাঁইচা যাওয়া মানুষগুলারে পথে বিভিন্ন সহায়ে রাইখা ইন্দ্রপ্রস্থ ফিরে আসে বৃদ্ধ অর্জুন আর আবার সন্ন্যাস চাগান দিয়া উঠে যুধিষ্ঠিরের মনে...

এইবার আর তারে নিষেধ করে না কেউ। নদীর জলে গাণ্ডিব ফালাইয়া আইসা সন্ন্যাস দলে যোগ দেয় অর্জুন। যোগ দেয় ভীম নকুল সহদেব আর দ্রৌপদী...

উত্তরার পুত্র পরীক্ষিৎরে রাজা বানাইয়া দ্রৌপদীর লগে হিমালয়ের উত্তরে মানস সরোবর উদ্দেশ্য কইরা বানপ্রস্থে রওনা দেয় পঞ্চপাণ্ডব; আর তাগো পিছে আইসা যোগ দেয়া একটা কুকুর...

বনের পথে সবার আগে আগে হাঁটে যুধিষ্ঠির। তার পিছনে হাঁটে পাঁচটা মানুষ আর একটা কুকুর। হাঁটতে হাঁটতে পড়ে যায় দ্রৌপদী; যুধিষ্ঠিরের পিছনে পা মিলায় চাইরটা মানুষ আর একটা কুকুর। পড়ে যায় সহদেব; যুধিষ্ঠিরের পিছনে চলে তিনটা মানুষ আর একটা কুকুর। পড়ে যায় নকুল; যুধিষ্ঠিরের পিছনে থাকে দুইটা মানুষ আর একটা কুকুর। পড়ে যায় অর্জুন; যুধিষ্ঠিরের পিছনে দৌড়ায় একটা মানুষ আর একটা কুকুর। পড়ে যায় ভীম; আর পিছনে

একটা কুকুর নিয়া আগাইতে থাকে কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির; যারে সর্ব অবস্থায় স্থির থাইকা সামনে আগানোর লাইগাই জন্ম দিছে কুন্তী; হোক তা ক্ষমতার দিকে আর হোক নিরুদ্দেশ যাত্রায়...

রচনাকাল: ২০১২.১১.০৯ - ২০১৪.১২.৩১